গল্প সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৬১

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—অপরূপ উকিল

মুদ্রন—ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ ১৫২, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রিয় কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়
কবিপ্রিয়া শ্রীমতী গীতাকে
স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে—

সূচীপত্র

সূচীপত্র

গল্প
সমগ্র

উপসংহার

কোর্ট হইতে ফিরিয়াছি—কোট খুলি নাই, গৃহিণী আসিয়া উত্তেজনা-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—শুনেছ তোমার ছাত্তরের কীর্তি?

উত্তেজিত হওয়া তাঁহার স্বভাবধর্ম, কাজেই বিচলিত হই না—গম্ভীরভাবে ঘাড় কাৎ করিয়া জানাই—শুনিয়াছি।

—শুনেছ? কি শুনেছ শুনি?

স্বর সন্দিগ্ধ।

গম্ভীরভাবে বলি—এই—হতভাগা বেয়াক্কেলে ছোঁড়া, বুলিকে ছাপা শাড়ী কিনে দিয়েছে—

এইখানে একটু পূর্ব ইতিহাসের আভাস দিতে হয়। এই বাড়ীখানা তিনতলা, কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব চূড়ামণি বাড়ীওয়ালা বোধ করি 'তৃণাদপি সুনীচেন' নীতির অনুশাসনে নিজে বাড়ীর অধম অংশটুকু দখলে রাখিয়া—উত্তম মধ্যম দুই অংশ ভাড়াটেদের বিলাইয়া দিয়া বসিয়া আছেন।

মাসের দোস্‌রা তারিখের তুচ্ছ ব্যাপারটুকু ছাড়িয়া দিলে—বাস্তবিক এমন মহানুভব ব্যক্তি কোথায় মেলে?

নিজের গুণকীর্তন করিব না—আমি লোকটা একটু 'বাবু'-গোছের, কাজেই মাত্রাতিরিক্ত সেলামী দিয়াও পূব-দক্ষিণ খোলা উত্তম অংশটিতে কায়েমী হইয়া আছি। দোতলায় আগে ছিলেন একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক, কিন্তু স্যাণ্ডউইচ্‌ হইয়া থাকাটা বোধ হয় তাঁহার বেশী দিন পছন্দ হইল না—কাটিয়া পড়িলেন।

সম্প্রতি আসিয়াছেন এক বাঙালী পরিবার, এবং বিপদ এইখানেই।

তাঁহার দিগ্‌গজ ছেলেটি আসিয়াই আবিষ্কার করিয়া বসিল—আমি নাকি সুদূর অতীতে তাহার শিক্ষকতা কবির্যাছিলাম। সত্য হইতে পারে—কিন্তু সুশিক্ষা যে দিই নাই সে কথা বলাই বাহুল্য, কারণ একজন নবীন উকিলের 'প্রাইভেট টিউশানির' প্রাইভেট খবরটা একজন পদস্থ উকিলের নাকের সামনে ধরিয়া দেওয়া বুদ্ধির পরিচয় নয়।

কিন্তু কি করিব? আমার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমাকে 'মাস্টার মশাই' বলিয়া ডাকিতেছে এবং পূর্ব সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়া আমার ছেলে-মেয়েদের—টফি কিনিয়া দেওয়া হইতে সুরু করিয়া সিনেমা দেখাইয়া ছাড়িয়াছে।

কাজেই "ছাপাশাড়ীটা" আমাব অনুমিত।

বলা নিষ্প্রয়োজন গৃহিণী এসব পছন্দ করেন না, শুধু ছেলেদের হইলে কথা ছিল না কিন্তু তেবো চৌদ্দ বছরের 'সোমত্ত' মেয়েকে পরের ছেলে আদর দেখাইতে আসিবে—এসব সাহেবীয়ানা তাঁহার অসহ্য।

এই তো সেদিনও এমনি—বাড়ীর চৌকাঠে পা দিয়াছি—গৃহিণী আসিয়া কহিলেন—শুনেছ তোমার ছাত্তরের আক্কেল? বুলিকে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গেল—

—বুলিকে? শুধু একলা?

—না, একেলা নয়— মন্তি খোকা আর দেবুকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে—তবে আসল উদ্দেশ্য বুলিই তো?

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—আসল উদ্দেশ্যটা বুঝলে কি করে শুনি?

—ন্যাকা! বলিয়া একটু গূঢ় হাসি হাসলেন।

সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল—বলিলাম—তাই যদি বুঝলে—তবে যেতে দিলে কেন?

—বাঃ, একেবারে চারখানা টিকিট কিনে এনে হাজিব, 'না' বলি কি করে? হ্যাঁ, তাই যদি বুঝতাম আমাকে সুদ্ধ যেতে বলছে? অবিশ্যি আমি কিছু আর যেতাম না—তবু বললে সৌষ্ঠব হ'ত কি না?

বুঝিলাম—গুরুপত্নীর বেদনাটা কোথায়। যাহারা স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধেব দ্বিতীয় কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না তাহারা নিজেদের ফুরাইয়া-যাওয়ার কল্পনায় হিংস্র হইয়া ওঠে।

কিন্তু থাক্ সে কথা। সেদিন—'বাজে খরচের' অজুহাত দেখাইয়া ছেলেটাকে একরূপ নিষেধই করিয়াছিলাম—অর্বাচীন ছেলেটা আবার বোধ করি নূতন কি উপদ্রব করিয়াছে।

না, ব্যাপার তা' নয়।

আমার পাকাধানে মই পড়ে নাই।

'ছাপা শাড়ী'র উল্লেখে গৃহিণী নাসিকা তুলিয়া কহিলেন—যা হয বললেই হ'ল? ছাপাশাড়ী আবার কোথায় শুনলে? আব দিলেই আমি বুলিকে নিতে দিতাম কিনা? প্রেজেন্ট কবার সুখ ঘুচিয়ে দিতাম বাছার। আর তা'ও বলি—বুলি ছেলেমানুষ, না হয় দিলিই এটা সেটা—কিন্তু ওকে দিতে গেলি কোন্ সাহসে? দস্যি বিধবা মেয়ে—রূপের দিকে চাইলে ভয় করে—তা'কে তোব প্রেজেন্টো করার কি দরকার?

বুঝিলাম—গোল বাধিয়াছে বাড়ীওয়ালাব বিধবা ভাইঝিটিকে লইয়া। বেচারা বাড়ীওয়ালা বাইশ বছরের ধাড়ি মেয়েকে অনেক কষ্টে একটি বিপত্নীক ভদ্রলোকের স্কন্ধে চাপাইযা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন—আব ফন্দিবাজ মেয়েটা কি না বছর না ঘুরিতেই আবার জ্যাঠাব সংসারে জাঁকিয়া বসিল?

আচ্ছা—বসুক, বান্নাবান্না ফাইফবমাস খাটা, জেঠির অপোগণ্ড শিশুবাহিনীর তদাবক করা প্রভৃতি ছোটখাট তুচ্ছ কাজগুলো করিবার জন্যও তো লোকের প্রয়োজন হয়? তাই করুক!

তাই বলিযা ভাডাটেদের জোযান ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করিবার জন্য তো কেহ মাথাব দিব্যি দেয় নাই? আব ভিতরে যদি 'কিছু' না-ই থাকে, উপহার দিবার অর্থ কি এ তো আমিও খুঁজিয়া পাই না।

বলিলাম—প্রতিভার কথা বলছো? কি দিয়েছে তা'কে শশাঙ্ক?

—বই গো বই—কেতাব। তাই কি রামায়ণ মহাভারত? কবিতে! রবি ঠাকুরের পদ্যর বই। মুখ্যু হই যা হই বয়েসকালে পড়েছি তো এক আধখানা? ভালোবাসার ছড়াছড়ি কাণ্ড একেবারে, জানি না? বিধবা ছুঁড়িকে সে সব বই দেবার দরকার কি শুনি?

'বয়েসকালে' আমিও যে রবিঠাকুরের 'পদ্যের বই' দুই চারখানা পড়িয়াছি এমন নয় কিন্তু 'ভালবাসার ছড়াছড়ি' কিসে আছে স্মরণ করিতে পারিলাম না, কি জানি হয়তো মরণকালে মতিভ্রম হইয়াছিল বুড়ার, এই যত সব বদ ছেলে-মেয়েদের সুবিধার জন্য এই সব বই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন করিলাম—দোতলা যদি একতলায় নামিয়া প্রেম নিবেদন করে তিনতলার কর্ণগোচর হয় কিরূপে? শশাঙ্ক কি সাক্ষ্য রাখিয়া উপহার দিতে গিয়াছিল?

প্রেয়সী সবিস্ময় দৃষ্টিতে প্রতিপ্রশ্ন করিলেন—বল কি গো? এ সব কথা আবার চাপা থাকে নাকি? শুনলাম বিদূষী সুন্দরী বুঝি দোতলায় এসে ছোঁড়ার মাকে 'মাসীমা' 'মাসীমা' করে বই

চাইতে আসে হামেশাই, তোমার গুণধর ছাত্তর তা'তেই একেবারে দয়ায় গলে গিয়ে পাঁচখানা বই কিনেই দান খয়রাৎ করে বসেছেন। এখন পড়বি তো পড় বাড়ীওলা গিন্নির হাতে সেই বই! শুধু দিয়ে আশ মেটেনি। কি না --"প্রতিভা দেবীকে স্নেহ উপহার"। কেন রে বাপু স্নেহ করবার আর লোক পেলি না? ভদ্দর লোকের বিধবা মেয়েকে গিয়েছিস স্নেহ করতে? এই যে বুলি টুলিকে এটা সেটা দিচ্ছিলি— আমরা কি একটা কথা বলেছি? হাজার হোক আইবুড়ো মেয়ে— আর এ দেখে একেবারে বাড়ীওলা গিন্নি 'ধেই ধেই' করে নাচছে।

দেখিলাম—স্নেহ-প্রবাহটা বুলির উপর হইতে সরিয়া গিয়া অন্য খাতে প্রবাহিত হওয়ায় বুলির জননী আশ্বস্তর পরিবর্তে বরং ক্ষুব্ধ।

হায় নারী চরিত্র!

দেখি যে মস্তি খোকা খেলা ফেলিয়া যুগপৎ পিতামাতার মুখপানে চাহিতেছে—বোধ করি ভাবিতেছে ইহারা এরূপ অর্থহীন কথা কহিয়া কি সুখ পায়?

কিন্তু অর্থহীন ব্যাপারের অর্থ গ্রহণের চেষ্টা বয়স্কদের চাইতে শিশুদের প্রবল; তাই গৃহিণীর বাক্যস্রোত বন্ধ করিতে তাড়াতাড়ি কহিলাম আচ্ছা, শশাঙ্কচরিত শেষ করে এইবার চায়ের ব্যবস্থা কর দিকিনি ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে।

--আহা, ব্যবস্থা হ'তে বাকি আছে যেন তোমার বলার অপেক্ষায়! অ বুলি, কুঁড়ের বাদশা মেয়ে! দুপেয়ালা চা করতে যে বুড়ো হয়ে গেলি।

একহাতে মহীয়সী মাতৃদেবীর জন্য এনামেলের গ্লাসে করিয়া বিস্কুট পাঁউরুটি প্রভৃতি অমেধ্য সংস্পর্শ বর্জিত পবিত্র চা, ও অন্যহাতে হতভাগা বাপের জন্য পেয়ালায় করিয়া অপবিত্র চা লইয়া বুলি সাবধানে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিজেরটি তাড়াতাড়ি হস্তান্তর করিয়া বুলি জননী কহিলেন—ওর হাত এতে দিস নি তো?

কন্যার পরিবর্তে আমিই উত্তর দিই পাগল হয়েছ? যাতে তাতে হাত দিলেই হল—তোমার হাতে মানুষ হচ্ছে না? বুলি শোন্ শশাঙ্ক তোদের প্রতিভা দিদিকে কি বই দিয়েছে আন তো দেখি--আজ আর বেরোব না ভাবছি, পড়ি একটু।

বুলি হাসিয়া ফেলে—ভারি নতুন বই কি না - 'খেয়া' 'নৈবেদ্য' আর 'রোগশয্যায়'। ও তো আমাদের বাড়ীতেই রয়েছে বাবা!

--আচ্ছা তাহলে খোঁজ করে আয় তো শশাঙ্ক বাড়ী আছে কি না।

—এটা কি হল? বুলি অদৃশ্য হইতেই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হই।

—কিছু না, হতভাগা ছোঁড়াকে একবার চাবকে দিই এই সব অশ্লীল বই কিনে ভদ্রলোকের মেয়েকে উপহার দেওয়ার সখ মিটুক।

এতটা বোধ করি আশা করেন নাই।

সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন ঢং!

কিছুক্ষণ পরেই নীচের উঠান হইতে ডাক আসিল শচীনবাবু, শুনুন একবার

বাড়ীওয়ালার কণ্ঠস্বর।

—এই যে শচীনবাবু, বসুন প্রাইভেট কথা আছে একটা—অবিশ্যি ঘরের কেলেঙ্কারী বলবার নয়, তবে—হারামজাদা ছোকরা আপনার ছাত্তর বলেই বলছি—

সুদূর অতীতের সেই শিক্ষকতার অপকর্ম স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিলাম। বলিলাম—বলুন।

—এই গিরীনবাবুর ছেলে যে কাজটি করেছে—মানে বাড়ীতে শুনেছেন তো? এতে বাছাধনকে

কোনো রকমে আইনের প্যাঁচে ফেলা যায় না?

অবাক হইয়া বলি—আইনের প্যাঁচ?....উকিল হইয়াও অবাক হই।

—হ্যাঁ, মানে ইয়ে—শুধুই কি বইয়ের কথা বলা যায়—ধরুন দু' একটা ব্যাপার যোগ করে—ইয়ে বুঝছেন তো? মানে জব্দ করা আর কি, গিরীনবাবুর কথাই ধরুন না—বাপু তোর ছেলে না হয় পাঁচটা পাশই করেছে—মোটা মাইনের চাকরীই একটা যোগাড় করেছে—তাই বলে লোকের ঘরে আগুন দেবে? সমঝে দেওয়ার দরকার তো?

বলিলাম—চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলে মন খারাপ করছেন কেন—যেতে দিন ওসব কথা, মেয়েটিকেই বরং ডেকে বুঝিয়ে দিন যাতে দোতলায় আসা যাওয়া না করে।

আমার চাইতে দশগুণ অবাক হইয়া সকণ্ঠি বাড়ীওয়ালা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিলেন—'বুঝিয়ে দেওয়া?' বলে কয়ে বুঝিয়ে দেওয়া! বলেন কি মশাই? মেবে ওর হাড় মাস আলাদা করিনি আমি? বড় হয়েছে তো বয়ে গেছে—তা ব'লে—

শুনিবার ধৈর্য বজায় রাখা কঠিন হইল—গিরীনবাবুকে নোটিশ দিন না—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

—"লাট সাহেব।"

স্বরটা অস্ফুট হইলেও কানে আসিয়া ফুটিল।

দিন দুই পরের কথা, ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, বাড়ী ঢুকিতেই গৃহিণী বিলম্বের হেতু অনুসন্ধান-রূপ মহৎ কার্যের পরিবর্তে, উত্তেজনারক্ত মুখে কহিলেন—শুনেছ কাণ্ড!

কহিলাম—কি? দিন দুপুরে মেয়ে চুরি?

—শুনেছ তা'হলে? কোথায় শুনলে? শুনলাম আর কোথায—দেখলাম যে। কোর্ট থেকে বেরিয়েছি—দেখি সামনেই শশাঙ্ক। 'কি ব্যাপাব'? বলে কি না—'মাষ্টাব মশাই, এই ভীড়ে হাওড়া স্টেশনে টিকিট কেনা তো মহা ঝঞ্ঝাট, প্রতিভা বযেছে সঙ্গে,—আপনি যদি একটু হেল্‌প করেন—তাই এসেছি।

পাষাণপ্রতিমার মুখ দিয়া একটি মাত্র শব্দ বাহির হইল—বললে এই কথা?

—বললে তো—

—আর তুমি?

—আমি? গেলাম ঘষটাতে ঘষটাতে! উপায কি? তা নইলে এত দেবী কেন? এই তো হাওড়া স্টেশন থেকে আসছি।

[১৩৫১]

বিপদ আর কাকে বলে!

পশুপতি বাড়ি ফিরিতেছে। রোজই ফেবে—পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে তাহার ছুটি হয়, তিনতলায় অফিস, সিঁড়ি ভাঙিতেই লাগে পাঁচ মিনিট। ঘাম মুছিয়া ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে ট্রাম লাইনটুকু আসিতেও প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া যায়, অবশেষে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে কোনো প্রকারে

নিজেকে ঠেলিয়া দিয়া ট্রামের ভিতর মাত্র একখানা পা রাখিবার মত স্থান সংগ্রহ করা। ব্যস্, আর কিছু করিবার নাই। পাঁচ-সাতখানা ট্রাম ছাড়িয়া দিয়াও মোটের মাথায় সাতটার মধ্যে সে নিজের রাজত্বে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে।

সেখানে স্বাধীন সাম্রাজ্য। হাস্যমুখী স্ত্রী, বাধ্য ছেলেমেয়ে, পশুপতি নিজে স্ফূর্তিবাজ লোক—সুখের সংসার পশুপতির। কিন্তু আজ আর পশুপতির মনে সুখ নাই। সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরিবার তাগাদাও নাই। ব্ল্যাক আউটের রাস্তার মত মুখ করিয়া—খড় বোঝাই গরুর গাড়ির গতিভঙ্গীতে এসপ্ল্যানেড হইতে হাঁটা মারিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

লড়াই করিয়া ইঞ্চি কয়েক জায়গা দখলের স্পৃহা আজ তাহার নাই। আজ তাহার মন খারাপ।

অবশ্য সব কার্যের মত—পশুপতির মন খারাপেরও একটা কারণ আছে, কারণটা এই যে, পশুপতি আজ হাত দেখাইয়াছে। হাত দেখানো বাতিক তাহার কস্মিনকালেও ছিল না —যাহাকে বলে "দশচক্র।"

শিরীষ শিকদার নামে যে ছোকরা ক্যাশ্ ডিপার্টমেন্টে নূতন ভর্তি হইয়াছে, কথায় কথায় হঠাৎ জানা গেল ছোকরা নাকি পামিস্ট। আর যায় কোথা? ঘরশুদ্ধলোক তাহাকে ছাঁকিয়া ধরে আর কি। টিফিনে অনেকের খাওয়াই হয় নাই আজ।

জিনিসটা এমনি মজার এক মুহূর্তে পঁয়ষট্টি টাকা ওজনের নেহাৎ কেরানীটি একেবারে ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িল। ইহার জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে সকলেই একবার আপন আপন অ-দৃষ্টের উপর চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া লইতে চায়।

পশুপতি অবশ্য দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল—এই সব বোগাস ব্যাপারে কোনকালেই তাহার আস্থা নাই, কিন্তু মাটি করিল শিরিষ নিজে। 'খপ' করিয়া পশুপতির হাতখানা টানিয়া লইয়া কহিল—দেখি গুপ্ত মশাই আপনার লাকটা? এখন তো আপনার পোয়াবারো, এই তো সেদিন কুড়িটা টাকা ইনক্রীমেন্ট হয়ে গেল।

কিন্তু হাত দেখার পর যাহা বলিল, সেটা ঠিক সৌভাগ্যের পরিচয় নয়। বার বার উল্টাইয়া পাল্টাইযা দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে কহিল—তাই তো—মুস্কিল করলে দেখছি—

—খুব ভাঁওতা দিচ্ছেন যে? মুস্কিল আবার কি মশাই?

—মুস্কিল এই—একটা পাপগ্রহের দৃষ্টি এসে পড়েছে—শিগগিরই কোনো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে! আচ্ছা লম্বা ফর্সা বেশ হাসিখুশি—মানে, বাইরে থেকে দেখতে যাকে বলে 'প্রফুল্লস্বভাবা', এমন কোনো স্ত্রীলোককে চেনেন?

—কেন বলুন তো? সন্দিগ্ধ স্বরে প্রতিপ্রশ্ন করে পশুপতি।

বর্ণনা শুনিয়া চট করিয়া অনিলার কথাই মনে পড়িয়া যায়, তবে কি তাহারই কোনো বিপদ? ইদানীং তাহার শরীরটাও যেন তেমনি ভাল নাই। এই তো কবে একদিন যেন মাথা ধরিয়াছে বলিয়া রাত্রে ভাতই খাইল না। যদিও পশুপতির এ সব হাত দেখা-দেখিতে বিশ্বাস নাই—তবু খামোকা অনিলার কথাই বা বলিল কেন শিরীষ?

শিরীষ কিন্তু বলিল অন্য কথা। বলিল—এই ধরণের কোনো স্ত্রীলোক আপনার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে।

—ক্ষতি?

—ক্ষতি বা প্রতারণা যাই বলুন। মানে আর কি, পরম আত্মীয় সেজে তলে তলে ধীরে ধীরে অনিষ্ট চিন্তা করছে। এই সবই তো বিপদ কি না। শত্রু যদি বন্ধুর ছদ্মবেশে অনিষ্ট

চিন্তা করতে থাকে—তাকে এড়ানো সহজ নয়। যাই হোক আপনার পরিচিত যদি কেউ এ রকম থাকে—'থাকে' কেন আছেই, তার থেকে সাবধানে থাকবেন।

পশুপতি যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে—আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব পরিচিত জনসমুদ্রের ভিতর এলোপাথাড়ি হাবুডুবু খাইয়াও কাহাকেও খুঁজিয়া মেলে না যে?

ছোট খুড়ি আছেন বটে লম্বা ফর্সা—কিন্তু জীবনে কি তাহাকে হাসিতে দেখিয়াছে পশুপতি? রাঙা মাসী ফর্সা বটে কিন্তু দৈর্ঘ্যে বামনের পরবর্তী স্টেজ মাত্র। মাসী পিসি খুড়ি জেঠি দিদি বৌদি কাহাকেও ঠিক ধরা না। কাহারও সহিত কালেভদ্রে দেখা হয়, কাহারও সহিত হয় না। তবে? অনিলাই কি তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে? অনিলা তাহাকে প্রতারণা করিবে? অসম্ভব! ভুল। অনেক কষ্টে গলা ভিজাইয়া বলে—কি রকম অনিষ্ট?

—ডেফিনিট্‌লি কি করে বলি এত অল্প সময়ের মধ্যে? শারীরিক মানসিক আর্থিক যে কোনো—মানে ফন্দি খুঁজছে সে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার সাহস হয় নাই পশুপতির। শুধু সেই থেকে ভাবনা শুরু করিয়াছে। অনিলা—হ্যাঁ, অনিলা ভিন্ন আর কে? আর কে তাহার ক্ষতি করিবার ফন্দি খুঁজিতেছে?

কি করিবে? স্ত্রীরা স্বামীর কী ক্ষতি করিতে পারে? কোন্ ধরণের অনিষ্ট? কিরূপ প্রতারণা? সংসারের টাকা লইয়া বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিবে? কিন্তু কেন? তাহাদের অবস্থা যে পশুপতির চাইতে দশ গুণ ভালো। তবে? পশুপতিকে লুকাইয়া—আর কাহাকেও? ছিঃ, এই দশ বছর ঘর করার পর? অসম্ভব কি? হয়তো বরাবরই—পশুপতি মূর্খ, সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমে গদ-গদ।

আচ্ছা, এ ধরণের স্ত্রীরা তো স্বামীকে বিষ খাওয়াইতেও পশ্চাৎপদ হয় না? কতই তো দৃষ্টান্ত আছে।

দূর ছাই, ও সব হাত দেখা ফেকা সব বাজে, কিছু নয়। কিন্তু নয়ই বা কেন? সকলের বিষয়ই তো ঠিক ঠিক বলিয়াছে ছোকরা।

অনিলার ব্যবহারটাও সব সময়ই কিছু আর পতিব্রতার মত নয়।

এই তো সেদিন পশুপতিকে না বলিয়া—বিপিনবাবুর শালার সঙ্গে সিনেমায় গেল! অবশ্য বিপিনের স্ত্রীও সঙ্গে ছিল। কিন্তু যাইবার দরকারটাই বা কি? অত সিনেমার ঝোঁক কেন? এটা তো ভালো নয়। সাজগোজটাও একটু যেন বেশী বেশী না? এই যে পশুপতির দিদিরা—কখনো শাড়ির সঙ্গে একখানা সেমিজ ব্যবহার করেন কি না সন্দেহ। আর অনিলার? ব্লাউস পেটিকোট সেমিজ বডিস। শাড়িরই বা বাহার কত। স্নো সাবানেও মাসের মাস কম খরচ হয় না।

এই সব খরচ জোগায় পশুপতি! আর অনিলা হয়তো তাহার অনুপস্থিতিতে—

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল— হঠাৎ চমক ভাঙিল। নিজের দরজা ছাড়িয়া বিপিনবাবুর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়া লাভই বা কি? গৃহ তো তাহার সসর্প গৃহের সঙ্গে তুলনীয়। তবু বাড়ি ভিন্ন যখন পথ নাই—ইতস্ততঃ করিতেছে কড়া নাড়িবে কিনা, তখন দরজা আপনিই খুলিয়া গেল। কে একজন বাহির হইতেছে—অন্ধকারে ভালো ঠাহর হয় না।

পশুপতি সন্দিগ্ধভাবে সরিয়া দাঁড়াইল—ভিতর হইতে অনিলার গলা—কথা থাকলো কিন্তু? ঠিক তো? ভুলে যাবে না?

এবং কপাটটা ভেজাইবার উপক্রম করিতে না করিতে পশুপতির নাটকীয় ভঙ্গিতে সশব্দ প্রবেশে থতমত খাইয়া বলে—তুমি? কখন এলে? এত দেরি করলে যে?

দেরি করে সুবিধেই করে দিলাম—বলিয়া গম্ভীরভাবে উপরে উঠিয়া যায় পশুপতি।

কথাটার গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার কথা নয়—অনিলা সবল মনে উপরে উঠিয়া আসিয়া বলে—হ্যাঁ গা, দেরি হল কেন বললে না? সেই থেকে ভেবে মরছি—

—আর থাক, যথেষ্ট হয়েছে—খুব দরদ দেখিযেছ। তবু যদি না—বলিয়া পশুপতি গজ্ গজ্ করিতে করিতে সাবান তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

অনিলা অবাক। ব্যাপার কি লোকটার? চাকরি গিয়াছে নাকি? না সাহেবের ঝাঁটা খাইয়া আসিয়াছে? থাক, মন ভালো হইলে আপনিই কথা বলিবে, বেশী প্রশ্নে কাজ নাই।

পশুপতি ভাবে—দেখেছ অগ্রাহ্য? অম্লানবদনে আপনার কাজ করা হচ্ছে। স্বামী গুরুজন—রাগ দেখিয়া ভয়ের লেশ নাই। অথচ কথা না কহিয়া পশুপতির পেট ফাঁপিতেছে। কাজেই দেওয়ালকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে হয়—"ভেবে মরছিলাম—" ভাবনার বহর কত! আড্ডার চোটে মোড়ের মাথা থেকে তো কান পাতা দায় হ'য়ে ওঠে। বিপ্‌নের শ্যালার দিন রাত্তির এখানে আসবার কি দরকার শুনি?

—ও আবার কি? দিদির ছেলে মণ্টু না? চিনতে পারলে না?

—মণ্টু? দিল্লী থেকে উড়ে এল হঠাৎ?

—উড়ে আসবে কেন, রেলে চড়েই এসেছে। দিদিকে জামাইবাবুকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে বলে চারদিনের ছুটি নিযে এসেছে। তাই বলে দিলাম— মণ্টু দিদি জামাইবাবু সবাই— কাল সকলে এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে যাবে।

পশুপতি ঈষৎ সন্দিগ্ধ সুরে বলে—কই আগে তো আসবার কথা শুনিনি?

—তবে আমি মিছে কথা বলেছি। মরণ আর কি! কুসঙ্গীব সঙ্গে জুটে নেশাভাঙ করে এসে নাকি? বলিয়া বিরক্তিভরে উঠিয়া যায় অনিলা।

পশুপতির গা ডোল হইয়া আসে। এই তো—সন্দেহের আর অবকাশ কোথায়? স্বচ্ছন্দে তাহার মরণ টাকিযা গেল অনিলা? কই কত বছর বিবাহ হইয়াছে, কোনদিন অনিলার মুখে এ সব কথা শোনা গিযাছে? ভাল মানুষি করিয়া থাকে—আজ ধরা পড়িয়া বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। হ্যাঁ, মণ্টু না ঘণ্টা, নির্ঘাৎ সেই বিপ্‌নের শ্যালা—হয়তো সিনেমা যাইবাব ব্যবস্থা করিয়া গেল! তোর 'পাশ' আছে তোর গোষ্ঠিবর্গকে লইয়া যা না বাপু? পরের বৌয়ের জন্য এত মাথাব্যথা কিসের? আচ্ছা, খুকীটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই তো সন্দেহ মেটে।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে—অনিলা পশুপতির জন্য গরম লুচি ভাজিতেছে। খুকী আসিয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ মা, বিকেল বেলা মণ্টুদা এসেছিল না? বাবা বলে কি, ও বাড়ির শ্যামল মামা—আমাকে বললে—"মিথ্যেবাদী শয়তান" —এমন কান মলে দিযেছে—উঃ জ্বালা করছে।

অনিলা কিছুক্ষণ মেয়েরই দিকে সাধু ভাষায় যাহাকে 'রোষ কষায়িত নেত্র' বলে সেই দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—বলেছে এই কথা? মেরেছে তোকে? বটে? রোসো।

পশুপতি ছাদে বেড়াইতেছে—মাথার রক্তটা কেমন চড়িয়া গিয়াছে। মেয়েটাকে না মারিলেই হইত—যদি বলিয়া দেয়? অনিলা? হাতেনাতে ধরা পড়িয়া যদি ভয়ংকর কিছু প্রতিহিংসা লইতে চায়? অনিলার হাতেই তো পশুপতির 'মরণ কাঠি জীয়ন কাঠি'—আচ্ছা তাই কি সম্ভব? পশুপতির কি মাথাখারাপ হইযাছে? দিব্য লুচি ভাজার গন্ধ আসিতেছে—পেটের মধ্যে তাগাদাও আসিতেছে দিব্য—সকালেই না অনিলা বলিয়াছিল আজ মাংস রাঁধিবে? লুচি আর মাংস?

অজ্ঞাতসারে পশুপতি রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ও কি? ভগবানই যে পশুপতিকে

পাগল করিবার ভার লইয়াছেন—অনিলা পশুপতির দুধের বাটিতে কি মিশাইতেছে? সাদা সাদা গুঁড়া? হায় ঈশ্বর!

কিম্বা ধন্য ঈশ্বর! এই তো পশুপতির জীবনলীলা শেষ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু—উঃ নারী জাতিকে কি বিধাতা এমন করিয়া গড়িয়াছেন? অমৃতে গরল—মিছরির ছুরি?

ছেলেবেলায় পড়া গিরিশ ঘোষের নাটকের ভাষা পশুপতির মনের মধ্যে কিল্‌বিল্‌ করিয়া ওঠে।

বজ্রনির্ঘোষে ভয়ানক একটা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও গলার স্বর সহজে বাহির হয় না, কণ্ঠতালু সব শুকাইয়া গিয়াছে যেন। অনেক কষ্টে যাহা বাহির হয় তাহা এই—'দুধে কি মেশানো হচ্ছে?'

অনিলা চকিতে পিছনপানে চাহিয়া মিশ্রির গুঁড়োর শিশিটা ঠুকিয়া মাটিতে বসাইয়া কহিল—বিষ।

বলা বাহুল্য দুধে না মেশাক উক্ত বস্তুটি কণ্ঠস্বরে মিশাইতে কার্পণ্য করে নাই।

—হুঁ।

ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। পশুপতি কড়িবরগার দিকে দৃষ্টি মেলিয়া বিছানায় পড়িয়া। ঘুম আসে নাই—আসিবার কথাও নয়—পেট রীতিমত যুদ্ধ শুরু করিয়াছে।

অথচ অনিলা মুখের কথাটি মাত্র না শুধাইয়া নিজে খাইয়া-দাইয়া পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের কাছে শুইয়া পড়িল।

বিছানায় পড়িয়া থাকিলেও আন্দাজে বোঝা গেল, চাকর নিবারণ খাওয়া সারিয়া রান্নাঘর ধোওয়া শুরু করিয়াছে।

পেটেব অগ্নির প্রকোপে মনের আগুন ঈষৎ যেন কমিয়া আসিতেছিল—হতাশার শেষ সীমায় আসিয়া দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। আজ পর্যন্ত কোন সতী স্ত্রী স্বামীর উপবাসেব ব্যবস্থা করিয়া অক্লেশে ঘুমায়? অথচ এই বিষধর সর্প লইয়া পশুপতি নিঃশঙ্কচিত্তে এতকাল কাটাইয়া আসিল?

যাক, নিদ্রা সর্বসন্তাপহারিণী! এক সময় দেখা দিবেনই।

হয়তো দেয়ালের কাছে, পিতলের ঢাকা চাপা দেওয়া অনিলার পরিপাটি হাতের গুছাইয়া রাখা আহার্য বস্তুগুলো চোখে পড়িলে ইতিহাস অন্যরূপ হইত। কিন্তু রঙিন শেড্‌ দেওয়া আলোব কল্যাণে ঘরের মাঝখানটা ছাড়া সহজে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

সকালে ঘুম ভাঙিতেই পশুপতির কানে গেল অনিলা নিবারণকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছে—বটে, সব পড়ে আছে? হাত দেওয়া হয়নি? আচ্ছা। যা জিগ্যেস করে আয় বাড়ির ভাত রুচবে—না বাজারের খাবার এনে সেবা হবে?

নিবারণকে অবশ্য প্রশ্ন করিতে হইল না! —আমার জন্যে কাউকে কিছু করতে হবে না—বলিয়া সদ্য নিদ্রোত্থিত পশুপতি চটিটা পায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

পড়বি তো পড় সামনেই বিপিনের শালা শ্যামল।

—এই যে পশুপতিবাবু, ভালই হল, অনিলাদিকে বলে দেবেন—দিদি বলেছেন—

হঠাৎ পশুপতি মারমুখ হইয়া দাঁত খিচাঁইয়া ভ্যাঙচাইয়া ওঠে—'অনিলাদিকে বলে দেবেন', ভারী আমার সাতকালের দিদি পেয়েছেন—চব্বিশ ঘণ্টা আমার বাড়িতে তোমার কি দরকার হ্যা ছোকরা? যাও যাও—

শ্যামল অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকাইয়া চলিয়া গেল, বোধ করি ভাবিল পশুপতি হঠাৎ

গাঁজা ধরিয়াছে। সে দিদির বাড়ি থাকিয়া এম এস-সি পড়ে, বরাবর আসা যাওয়া আছে—ভাল ছেলে, পশুপতিও তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসে—হঠাৎ এ কি?

অস্নাত অভুক্ত পশুপতিকে দেখিয়া অফিসের অনেকেই বিস্মিত হইয়া কুশল প্রশ্ন করিল। পশুপতি কাহাকেও একটা বাজে জবাব দিল; কাহাকেও দিল না। শিরিষ সিকদারকে আর একবার নিরালায় লইয়া বসিতে হইবে। ধর—, অনিলাকে বশে আনিতে কোনো বস্তু ধারণ বা কবচ টবচ—কত কি তো ছাইপাঁশ থাকে।

টিফিনের সময়টা আসিলে হয়।

কিন্তু পশুপতির আজ নিতান্তই অদৃষ্ট খারাপ, উঠি উঠি করিতেছে—উপরওয়ালার তলব আসিল। না আসিবে কেন, তাহাকে যে এখন শনিতে ঘিরিয়াছে। শিবীষ সিকদারকে নিরালায় পাওয়ার আশা ঘুচিল।

টিফিন রুমে আসিবাব অবসর মিলিতে এদিকে আড্ডা ঘোরালো হইযা উঠিযাছে। কিন্তু পশুপতিব নাম লইয়া হাসাহাসি হইতেছে মানে? পশুপতি দরজার বাহিবে দাঁড়াইযা পড়ে।

শিরীষ সিকদাব—ইযার ছোকরাটা বলে কি? বলিতেছে—দেখেছেন আজ পশুপতিবাবুর মুখখানি? 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' একেবারে। যাকে বলে শ্রীমুখমণ্ডল। খুব ব্লাফ দিয়ে দিয়েছি কাল। আপনার মুখে ওনাব গিন্নির বর্ণনা শুনে দিলাম ঠুকে এক নম্বর। আহা, ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে আমসি। উনি আবাব সেদিন বলেছিলেন—আমি মশাই কারুর ভাঁওতায় ভুলি না—সেই যে যেদিন ইনসিওরের সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন? এদিকে তো এক কথায মুখ চুন!

অমূল্য বোস্ কহিল—আরে মশাই, আপনি একেবাবে যে মোক্ষম কথা বলে বসলেন—আজ নির্ঘাত গিন্নির সঙ্গে কোঁদল হয়েছে।

—তা একটু হওয়া ভালো, প্রেম গাঢ় হয। যখন তখন গিন্নিব বড়াই! আর কি কথায় এমন ভাব দেখাতে চান—ওনাদের এই বযসেও যে রকম নিবিড় প্রেম, এমন আর একালের নবদম্পতির মধ্যেও নেই।

—আজ তো কই টিফিন করতে এলো না ভদ্রলোক?

—বাড়ি থেকে ভাতও খেযে আসেনি বোধ হয়। যাক গে মশাই, রহস্যটা ভেঙে দেবেন! একদিনেই রোগা হযে গেছে লোকটা!

পশুপতি স্তম্ভিত। মাটিতে শিকড় গাড়িযা গেছে তাহাব, শিরীষ সিকদাবেব উপব রাগ করিবার মত জোরালো অবস্থাও নাই মনের।

শুধু—অনিলাকে কি বলিয়া শান্ত কবা যাইবে—শ্যামলকে মুখ দেখানো যাইবে কেমন করিয়া, এই দুশ্চিন্তাটা যেন মাথা হইতে সর্ব শরীরে পাক দিতে থাকে।

সারাদিন চিন্তা করিয়া করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক মুসাবিদা করিয়া সন্ধির মন্ত্র রচনা করিতে হয। ধরো—এমনও তো বলা যায পশুপতি কাল একটা অভিনব পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু এমনি বোকা অনিলা! ভালো কথা—ব্লাউসের জন্য ছিটের কাপড়ের কথা বলিতেছিল না সেদিন? স্নো সাবানও যেন অনেকদিন কেনা হয় নাই। কপালের চুল পাতলা হইয়া আসিতেছে বলিয়া সেদিন আক্ষেপ করিতেছিল না অনিলা? কি নেওয়া যায়? বাথগেটের ক্যাস্টর অয়েল? জবাকুসুম? লক্ষ্মীবিলাস? মহাভৃঙ্গরাজ?

কিন্তু এত করিবার প্রয়োজন ছিল না।

পাঁচ সাতটা প্যাকেট হাতে 'বেহাতি' অবস্থায় কড়ানাড়ার পরিবর্তে জুতার আগা দিয়া সজোরে ধাক্কা দিতে নিবারণ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, এবং একটি গাল হাসিয়া কহিল—আপনি এখন এলেন বাবু? মা এই মাত্তর চলে গেলেন।

—চলে গেলেন? কোথায়?

—আজ্ঞে, কেন? দিল্লীতে। টেরেন ফেল হবার ভয়ে টেক্সিখানাকে যা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় করিয়েছে—এতক্ষণে হাওড়া ইষ্টিশ্যান পৌঁছে গেল। যাবার কি কথা ছিল না বাবু?

ভৃত্যের কাছে মান খোওয়ানোর ভয়ে পশুপতি কষ্টে শ্বাস লইয়া সহজভাবে বলে – কথা ছিল বৈকি, কথা ছিল। তবে আজই—কার সঙ্গে গেল?

—মাসীমা মেসোমশাই মন্টু দাদাবাবু, এখেনেই সব খাওয়া দাওয়া করলেন কি না।

[১৩৫১]

তাজমহল

গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে এ বৎসরের শীতের অপ্রতুলতার কথা তুলিয়া সহরবাসীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খানিকটা মামুলী হা-হুতাশের পর বাড়ীওয়ালা ভৈরববাবু আসল কথা পাড়িলেন।

তাহলে—কাল সকালের দিকেই ঘরটা ছেড়ে দেবেন কান্তিবাবু। সে ভদ্রলোক সন্ধ্যা নাগাদ আসবেন— দেখি যদি হোয়াইটওয়াশটা করিয়ে ফেলতে পারি,—ফ্যামিলি নিয়ে আসছেন।

—'আচ্ছা'—বলিলাম বটে, কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখিলাম। সত্যের অপলাপ করিব না—নোটিশ যথাসময়েই পাইয়াছি, কিন্তু মাথা গুঁজিবার মত এতটুকু আশ্রয় আজ মাসখানেকের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

অথচ 'উঠাইয়া দিতেছে' বলিয়া ভৈরববাবুকেই বা দোষ দিই কেমন করিয়া? দুই পয়সা বেশী কে না চায়? মাত্র দশটি টাকার বিনিময়ে তিনতলার উপর পূর্ব-দক্ষিণ খোলা এতবড় একখানি ঘর যে এ বাজারে নিতান্তই দুর্লভ, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব-দক্ষিণ চুলায় যাক্, শুধু চারখানা দেওয়ালও যে প্রায় ভগবানের মতই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, একথা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছি।

আত্মসম্মানটুকুতে আঁচড় লাগিবার ভয়ে কখনো বড়লোক আত্মীয়দের দ্বারস্থ হই নাই, আজ 'মরীয়া' হইয়াই পিসিমার বাড়ী চলিলাম। পিসিমার বাড়ী প্রকাণ্ড বাড়ী, ফেলাছড়া করিয়াও দশটা মানুষকে আশ্রয় দেওয়া যায়। থাকিতে চাহিলে আপত্তি করিতে পারিবেন না, এ বিশ্বাস ছিল।

তা' আপত্তি অবশ্য করিলেন না, শুধু প্রস্তাবটা শুনিয়া ভারীমুখে কহিলেন—বড় মুখ করে বলছো, 'না' করতে তো পারি না, তবে কোথায় যে জায়গা দেব তাই ভাবছি। মণি শ্বশুরবাড়ী থেকে আসছে—মেজবৌমার ও মাসে আঁতুড় হবে—ইলুর নতুন বিয়ে হয়েছে, নাতজামাইটি নিত্যি আসাযাওয়া করছে—ছেলেদের মাষ্টার আসে তার জন্যেও একখানা ঘর না দিলে চলে না—

নজীর আরো বাড়িবার ভয়ে 'কাজ আছে' অজুহাত দেখাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম।

কিন্তু আসিব কোথায় ? আমার সেই পাঁচ বৎসরের সুখ-দুঃখের সাথী প্রিয় পরিচিত আশ্রয়টুকুর মেয়াদ তো মাত্র আর একটি রাত্রি। অনেক ঘোরাঘুরির শেষে ক্লান্ত শরীর মন লইয়া আবার ফিরিয়া আসিলাম, এখনো ঘণ্টা কয়েক যাহার উপর দাবী আছে, তাহার কাছে।

সিঁড়িতে উঠিতেই কানে আসিল একটা দরাজগলার প্রশ্ন— 'উঠে যাবে মানে ? যাবে কোথায় শুনি ? এক ইঞ্চি জায়গা খালি আছে ক'লকাতা সহরে ?'

আড়ালে দাঁড়াইয়া আড়িপাতা স্বভাব নয় তবু ভৈরববাবুর উত্তরটা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া পড়িলাম।

—কোথায় যাবে সে কথা তো আমার জানবার কথা নয় মশাই, পোষাচ্ছিল না নোটিশ দিয়েছি, ব্যস্।

—নোটিশ দিয়েছি ব্যস্! বলি চোখের ওপর চামড়া আছে কি নেই ? না মশাই, কাউকে বাড়ীছাড়া করে থাকতে টাকতে পারব না। ও আমার মেসই ভালো! নেহাৎ পরিবারটাকে আনতে পারছি না বলেই —যাক আরো দু'দশদিন—

ভৈরববাবু বিরক্তিক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন— থাকবেন না তাই বলুন না থাকেন সে আলাদা কথা, তবে কান্তিবাবুকে নিয়ে আমার আর পোষাচ্ছে না মশাই, আপনি না থাকেন ভালো কথা, ভাড়াটে আমি পাবোই বিশ টাকা কেন পঁচিশ টাকাও পেতে পারি

— তা' পাবেন না কেন, ঝোপ বুঝে কোপ বসাতে পারলে পঞ্চাশও পেতে পারেন, কিছু মনে করবেন না মশাই আপনি একটি চামার। যাক, ও পাঁচশ টাকা আমিই আপনাকে দেব, কিন্তু খবরদার বলে দিচ্ছি ওসব নোটিশ ফোটিশ্ তুলে নিন— খামোকা নোটিশ দিলেই হ'ল ? লোকটা যাবে কোথায় তার খোঁজ নিতে হবে না ?

এককথায় পাঁচটা টাকা বাড়িয়া যাওয়াতেই বোধ করি 'চামার' নামক গৌরবজনক উপাধিটি হজম করিয়া ভৈরববাবু বিনীত কণ্ঠে কহিলেন তাহলে থাকবেন কান্তিবাবু, আর ভাড়া দেবেন আপনি এই তো ?

কেন, আমিই বা থাকবো না কেন শুনতে পাই না ? দু'জনেই থাকবো—আলবৎ থাকবো। মেসে থাকতে হচ্ছে না পাঁচজনের সঙ্গে ?

— তা' বেশ। আপনি বুঝুন আর আপনার কান্তিবাবু বুঝুন, আমার মশাই ভাড়া পেলেই হ'ল।

ভৈরববাবুকে থামিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কয়েকটা সিঁড়ি নীচে নামি। অনর্থক জুতার শব্দ করিতে করিতে উঠিতে সুরু করিলাম।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই ভৈরববাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—এই যে কান্তিবাবু, অনেকদিন বাঁচবেন! কথা হচ্ছে ঘর ছাড়তে হচ্ছে না আপনাকে, নীরেনবাবু দেবেন না ছাড়তে।

—তার মানে ? নূতন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে হয়।

—মানে এই, বলিয়া নিজের মাথায় হাতের তালুটি একবার বুলাইয়া, ইঙ্গিতে উক্ত নীরেনবাবুর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ভৈরববাবু মুখভঙ্গিসহকারে নামিয়া গেলেন।

থাকিয়া গেলাম।

নীরেনবাবু আমার সমস্ত আপত্তি অট্টহাস্যের জোরে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া কহিলেন—আরে 'ফ্যামিলি' মানে তো তোমার বৌদি ? সে তো আছে বাপের বাড়ী, এলে তখন বোঝা যাবে। এখন স্রেফ্ দাদা আর ভায়া, ভায়া আর দাদা বুঝলে! নাও এখন ষ্টোভটা একবার পাড় তো

দেখি—একটু চায়ের জল চড়ানো যাক, ব্যাটা বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বকে বকে গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

চায়ের জল ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে 'তুমি'টুকুও ঘুচিয়া 'তুইতে' পরিণত হইল।......

কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া বিরাট দেহখানি তক্তপোষে এলাইয়া দিয়া নীরেনদা তাঁহার নিজস্ব-দরাজগলায় হাঁক দেন—"চায়ের জল হ'ল নাকি রে কান্তি? না, কোনো কর্মের নয়—তোর বৌদি হলে এতক্ষণে চা টোষ্ট সব কমপ্লিট, তোয়ালে আর ধুতিখানি হাতে করে বলতো—'প্রাণেশ্বর মুখ হাত ধোও'।"

হাসিয়া ফেলিয়া বলি----আর কতদিন বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করবে নীরেনদা, বৌদিকে আনো?

—আনবো আনবো—তিন মাসের কন্ট্রাক্ট আছে কি না! কিন্তু তোর বৌদি এলে এসব ময়লা বিছানাপত্তরে চলবে না—নোংরা সে একেবারে দেখতে পারে না। আমার তো দেখছিস এই 'উদোমোদা' স্বভাব? যখনি বাপেরবাড়ী যায়, ঘরদোর একাকার করে রেখে দিই—এসে গাড়ী থেকে নেমেই ঝাঁটা নিয়ে লেগে যায়।

সকৌতুকে প্রশ্ন করি—তোমার পিঠটা নিয়ে নাকি?

—দূর রাস্কেল—দাদা একগাল হাসিয়া বলেন—তা' যা বলেছিস মিথ্যেও না, কম বকুনি সইতে হয় বাপ্। বলে—"তোমাকে ফেলে আমার একদণ্ড কোথাও নড়বার জো নেই।" শোনো পাগলের কথা? আর এখন? আমিও তেমনি শোধ নিচ্ছি হুঁ। যত ইচ্ছে ময়লা জামাকাপড়ে থাকি, সাতদিন দাড়ি কামাই না—কি করবেন করুন।

খাপছাড়াভাবে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে থাকেন।

বুঝিলাম, আজ আর রক্ষা নাই—বৌদির কথা উঠিলে নীরেনদা রাত্রি বারোটা বাজাইয়া ছাড়িবেন।

বৌদি কি খাইতে ভালোবাসেন, কোন্ রং পছন্দ করেন, রান্নার হাত কেমন, নীরেনদার সহিত মান-অভিমানের পালাটা কিভাবে কতদূর গড়ায়, কবে কোন্দিন একটা তুচ্ছ কারণ নিয়া কলহ করিয়া তিনদিন কথা বন্ধের পর বৌদির যাচিয়া আলাপ করিবার চতুর কৌশল ইত্যাদি খুঁটিনাটি তথ্যে দুই কান বোঝাই হইয়া উঠিবে।

বলা বাহুল্য উক্ত আলোচনা তাঁহার কাছে যতটা মনোরম, ততটা আমার কাছে হওয়া সম্ভব নয়, তবু উৎসাহ না দেওয়াটা নিতান্ত হৃদয়হীনের মত হয়, কাজেই এইসব চিরকালের পচা-পুরোনো একঘেয়েমির পুনরাবৃত্তি শুনিতে শুনিতে চোখ বড় বড় করিয়া কৌতূহলের 'ভান' না দেখাইলে চলে না।

কিন্তু আশ্চর্য! একটি অতি সাধারণ স্ত্রীলোক—খুব সম্ভব নিরক্ষর—(আজ পর্যন্ত তাঁহার কোন চিঠি আসিতে দেখি নাই); আলোচনা শুনিলে মনে হয় না বুদ্ধির বালাই খুব বেশী আছে—তাহার মধ্যে এত মুগ্ধ হইবার মত বস্তু কি থাকিতে পারে?

আর এমন লোক স্ত্রীকে দীর্ঘকালের চুক্তিতে বাপের বাড়ী পাঠায় কোন্ হিসাবে!

কি জানি প্রেমের বাঁধন দৃঢ় করিবার বোধ করি এ এক কৌশল।

কিন্তু এদের দুজনকে একঠাঁই করিয়া দেওয়াটা আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। ঝোঁকের মাথায় আমাকে থাকিতে দিয়া এখন চক্ষুলজ্জার দায়ে না পারেন তাড়াইতে, না পারিতেছেন বৌ আনিতে।

কথাটা তুলি তুলি করিয়াও সাহস সংগ্রহ করিতে পারি নাই। লুকাইয়া অনেক খোঁজাখুঁজির শেষে একটা মেসের সিট সংগ্রহ করিয়া আসিলাম। কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিব মনে মনে তাহারই রিহার্সাল দিতে দিতে ঘরে ঢুকিতেই দেখি, নীরেনদা একটি ছোটখাটো কাপড়ের গাঁঠ্‌রি ও একজোড়া প্রকাণ্ড পিতলের ফুলদানী সামনে লইয়া ধ্যানী-বুদ্ধের মত বসিয়া আছেন।

আমাকে দেখিয়াই চমকিয়া কহিলেন—কান্তিবাবু যে—সারাদিন বাবুর থাকা হয় কোথায়? চুলের ডগাটি দেখবার জো নেই? ভেবেছিলাম, কেনাকাটাগুলো তোমাব ঘাড়েই চাপাব— হাজার হোক্ তোমরা আজকালকার ছেলে—ফ্যাসান-ট্যাসান বোঝ। তা' কা কস্য পবিবেদনা।

সুযোগ বুঝিয়া কহিলাম—শোভাবাজারে একটা মেসের সিট্ ঠিক করে এলাম—

বারুদের স্তূপে হাতুড়ির ঘা পড়িল।

—'মেসের সিট ঠিক করে এলাম—?' কেন, নবাব সাহেবের এখানে কি কসুর হচ্ছে? ঠিক করে এলে? কার হুকুমে ঠিক কবে এলে শুনি?

মাথা চুলকাইয়া বলি—বৌদি এলে—একটা ঘরে কি করে থাকা সম্ভব হয় বল তো?

—এই কথা? দাদা হঠাৎ গলার স্বর কোমল করিয়া বলেন—সে তেমন মেয়ে নয় রে পাগলা, কিছুটি বলবে না। দেখিস্ একটুও আপত্তি করবে না। আমার কাছে গল্প শুনে কি ভাবিস তাকে—একগুঁয়ে অভিমানী ঝগড়াটে না? সে ভয় করিসনে। নে, দেখ দিকিন এই পর্দাটর্দাগুলো কেমন হ'ল? ফুলদানী দুটো ডিসেন্ট না?

—চমৎকার; কিন্তু দামও খুব পড়েছে তো?

—তা' নিয়েছে মন্দ নয়, ছাব্বিশ টাকা বারো আনা। কি করি—দেখে কেমন লোভ হয়ে গেল। একবার একজিবিশন দেখতে গিয়ে এমনি একজোড়া ফুলদানী দেখে তোব বৌদির সে কী ঝোঁক। ছেলেমানুষের মত বায়না, নেবেই। আমারও রোখ্, বাজে খরচ করা হবে না—তবু কতই বা দাম ছিল তখন, আট টাকা না কত। যাক্‌গে আনা গেল একজোড়া।

যদিও নীরেনদাকে দাদার মতই ভক্তি করি, তবুও মনে মনে না হাসিয়া পারিলাম না। বিরহ যে মানুষকে কতটা কাবু করিয়া আনে, আমাদের নীরেনদা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কিন্তু কি যে মুস্কিলে আমি পড়িলাম।

দাদা তো প্রেমের স্বপ্নে মস্‌গুল, দিন যত নিকটবর্তী হইতেছে, ক্ষ্যাপামি ততই বাড়িতেছে, বৌদির মনোরঞ্জনের জন্য রাজ্যের জিনিষ আনিয়া জড় করিতেছে—ঘর সাজাইবাব ধুম পড়িয়া গিয়াছে—সামনের শনিবারে আনিতে যাইবার ব্যবস্থা—অথচ আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে রাজী নয়। সে ভদ্রমহিলা আসিযা যে আমাকে কি ঠাওরাইবেন ঈশ্বরই জানেন।

শনিবার সকাল হইতেই দাদার অস্থিরতা সুরু হইয়াছে। ঘরের জিনিষপত্রগুলো এদিকে হইতে ওদিকে, ওদিক হইতে এদিকে সাতবার নাড়াচাড়ার পর গলদঘর্ম অবস্থায় ছুটাছুটি করিয়া অফিসে যাইতেই ভৈরববাবু আমাকে ডাকিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চিবানোর ভঙ্গীতে কহিলেন—তা'হলে কান্তিবাবু আছেন ভালো কি বলেন?

প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে চাহিয়া রহিলাম।

—এই আপনার নীরেনদার কথা বলছি। বলে দিলাম আপনাকে, পড়েছেন একটি পয়লা নম্বরের জোচ্চোরের হাতে, শেষ অবধি আপনার কপালে দুর্গতি আছে মশাই, দেখে নেবেন। বাড়ী নেবার সময় মশাই ডাহা মিথ্যে কথাগুলো বললে—"পরিবার বাপের বাড়ী পড়ে আছে—বাড়ীঘরের অভাবে আনতে পারছি না"—হ্যানো ত্যানো—এদিকে পরিবার আজ ছ'মাস

হ'ল পটল তুলেছেন।

চম্‌কিয়া বলিলাম—বলেন কি?

—আব বলি কি'? ওই রকমই ব্যাপার!

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া বলিলাম—এই তো আজকে অফিস ফেরৎ কেষ্টনগবে যাচ্ছেন স্ত্রীকে আনতে।

—তাই নাকি? তাহলে এটি বোধ কবি দ্বিতীয পক্ষ।

বলিয়া ভৈরববাবু মুখভঙ্গিসহকারে নামিয়া গেলেন।

নানা চিন্তার উদয হইল। কিন্তু ভৈরববাবুর কথা কি সত্যই বিশ্বাসযোগ্য? নূতন বিবাহেব কনে লইয়া হাজির হইবেন? নীরেনদাব ভিতর এতো খল-কপটতা থাকা সম্ভব?

যাক, কযেক ঘণ্টার তো মামলা।

রবিবাব বেলা দশটার ট্রেনেই আসিবাব কথা।

আসিলেন ঠিকই।

কিন্তু নূতন ক'নে লইয়াও নয় পুরানো স্ত্রী লইয়াও নয়, আনিলেন ঠেলাগাড়ীতে চাপাইয়া প্রকাণ্ড এক প্যাকিং বাক্স।

কফিনের বাক্সর মত বিশ্রী লম্বাটে গডনের বাক্সটা দেখিযা কেমন অস্বস্তি বোধ কবিতে লাগিলাম। নীরেনদা নামিযাই মুটেদেব সঙ্গে ডাকহাঁক সুরু করিযা দিলেন, ছয়জন মুটে মিলিয়া যেভাবে জিনিষটাকে সিঁড়িতে তুলিল এবং দাদা যে রকম প্রাণপণে সাবধানতার বাণী উচ্চাবণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সন্দেহ রহিল না, জিনিষটা মূল্যবান তো বটেই, ভঙ্গুরও।

কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই মাটিব পুতুল।

পুতুল ঠিক নয়, প্রতিমূর্তি। কৃষ্ণনগরের নিপুণ শিল্পীর হাতেগড়া একটি ফুল্‌সাইজের স্ত্রীমূর্তি। সুন্দরী নয়..... অতি সাধারণ একটি বাঙালী ঘবেব বধূ, শুধু শিল্পীব হাতেব গুণে এমনি সজীব প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেন এইমাত্র কথা কহিয়া উঠিবে।

—বিমূঢ়ের মত চাহিয়া আছি....প্যাকিঙেব খড়কুটা সরাইয়া নীরেনদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে ছোট ছেলেমেয়েদের পুতুল খেলার মত প্রতিমার গাযে সস্নেহ-সন্তর্পণে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিতে থাকেন....কি, বড় যে তেজ করে বলেছিলে—"আর আসব না—" হল না আসতে? গুমব ভাঙলো না? কার কথা থাকলো? কেমন জব্দ করেছি—যাও এখন বাপের বাড়ী? 'নট্ নড়নচড়ন নট কিচ্ছু', বুঝলে গো মহারাণী? কি, কথা নেই কেন? 'বাচাল' বলে বকেছিলাম বলে রাগ করে বোবা হয়ে গেছ বুঝি? অত রাগ কেন তোমার? দয়ামায়া না করে যা ইচ্ছে শাস্তি দাও......পুতুলের মুখের নিতান্ত কাছে মুখ লইয়া যাইতে দেখিয়া বোধ করি অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া থাকিব....নীরেনদা চমকিয়া অপ্রতিভভাবে হাসিয়া ওঠেন।

—কিছু মনে করিসনে ভাই, একটু প্রেমালাপ করে নিচ্ছিলাম, অনেকদিন পরে দেখা। দেখলি তো—বলিনি মান-অভিমান তো দূরের কথা, কথাটিও কইবে না? ঠিক কিনা? মুখখানা হাঁড়ি করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? 'বৌদিকে আনো, বৌদিকে আনো'—এই তো এনে দিলাম—কই কথা নেই কেন? রূপসী নয় বলে পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? আরে আরে ও কি, কেঁদে ভাসিয়ে দিলি মানে? মুছে ফেল, মুছে ফেল—বুড়ো মদ্দর চোখের জলটল দেখতে পারিনে বাপু—

বলিতে বলিতে উক্ত অপ্রিয় দৃশ্যটা এড়াইবার জন্যই বোধ করি নিজের চোখের উপর কোঁচার খুঁটটা চাপিয়া ধরেন। [১৩৫১]

মোহমুক্তি

[শ্যাম বড় কি শ্যামা বড়....এই বিষয় নিয়ে একদিন কবি-ওয়ালারা আসর জমাতো....কবির আসরেই যে এই ঝগড়া সীমাবদ্ধ থাকতো তা নয়....শ্যাম আর শ্যামার ভক্তদের মধ্যে বহু লড়াই হয়ে গিয়েছে এই গঙ্গা মৃত্তিকার দেশে....এবং সে-লড়াইয়ে ইন্ধন যুগিয়েছেন সব বড় বড় জেনারেল....ধর্ম্মের জেনারেল, গুরু যাঁদের নাম! ....উপনিষদের গুরু ধাপে ধাপে নামতে নামতে হয়ে আসেন ব্যবসায়ী গুরু....এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরও বাংলা দেশ থেকে এই তথাকথিত গুরুবাদের অভিশাপ আজও চলে যায় নি।]

—গুরুদেব আসিয়াছেন!

—কানাই মহারাজ! কানাই মহারাজ! সারা বাড়ীতে দস্তুরমত উৎসবের সাড়া। যুগ যুগান্তরের অনাচারলিপ্ত মোহান্ধ বসুবংশকে উদ্ধার করিতে যে নরদেহধারী নারায়ণ স্বয়ং আসিয়াছেন এ খবর যেন বৃহৎ জমিদার বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে, মেজের খিলানে, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনি ধ্বনিত হইতেছে।

বংশানুক্রমিক উদ্ধার কর্ত্তা কুলগুরু নয়, ভাবী গুরু। ভবিষ্য স্বর্গের সোনার সিঁড়ি একেবারে গাঁথিয়া আনিয়াছেন। 'সংসার' নামক ঘোর নরকের কীটগুলিকে পাপের পঙ্ক হইতে টানিয়া টানিয়া একবার সিঁড়ির ধাপে চড়াইয়া দেওয়ার ওয়াস্তা।

ছেলে বুড়া কর্ত্তা কর্ত্রী কাহারও উপর তাঁহার করুণার তারতম্য নাই, ইতর বিশেষ নাই। বাড়ীর দাসদাসীগুলিকে পর্য্যন্ত দীক্ষিত করিয়া ছাড়িবেন। তা ছাড়া—না করিলেই বা চলিবে কেন? 'কণ্ঠিহীনে'র হাতের জল কণ্ঠস্থ করিয়া বোসজামশায় তো আর মহারৌরবের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন না?

হাতের জল শুদ্ধ করিতে হইলে শুদ্ধিরও প্রয়োজন। অবশ্য তাহাতে তাহাদের নিতান্ত আপত্তি নাই। এই সূত্রে—প্রত্যেকের পরণে নূতন কাপড় উঠিয়াছে....এবং এমন একটা আশ্বাস পাওয়া যাইতেছে গুরুকরুণার পথ ধরিয়া, নাকি মনিব বংশের সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপন হইবে।

অবশ্য নিয়মের 'কড়াকড়ি'ও সোজা নয়, কিন্তু কেষ্ট পাওয়াই কি সোজা? কষ্ট না করিলে?...সুবাস দাসী বংশী ছোঁড়াকে সেই কথাই বোঝায়....বলে—"তেমনি ক্ষীর খাবি, মালপো খাবি, মন্দটা কি? মাছ মাংস খাওয়া মানেই তো জীবহত্যের পাপ বাড়ানো?"

বংশী সুবাসকে 'মাসী' বলে। সুবাসের কথায় বিরক্ত কণ্ঠে বলে—"তুই থাম্ মাসী, নিরিমিষ্যি ভাত চারবেলা নাকি গিলতে পারে মানুষ?

—পারে না তো বামুনের বেধবারা কি করে গেলে?

—গিলুক গে, আমি তো আর বামুনের বেধবা নই? চাকরীর নিকুচি করেছে, আমি ওসব মন্তর ফন্তর' নিতে পারবো না বাবা, কালই ভেগে পড়বো।

সুবাস তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিনী, তাই তাড়াতাড়ি মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলে—"এই চুপ খবরদার, বাবু শুনলে রক্ষে রাখবে না। ভেগে পড়লেই হ'ল কিনা? তোর মতন তামাক সাজতে কে

পারবে শুনি? যেখানে থাকবি, টেনে এনে তবে ছাড়বে। তামাক-সাজা পছন্দ না হলে—বাবু তাকে—"

—"লবডঙ্কা। তামাক খে'লে তো? গুরুদেব যে বলেছে পান তামাকেও নেশার অপরাধ লাগে—" পানের কথায় সুবাসের চমকানিটা দেখিবার মত। ....পানও ছাড়িতে হইবে? এত তুচ্ছ বস্তুও গুরুদেবের চক্ষু এড়ায় না? তবেই তো মুস্কিল। মাছের কথা যাক্, বরং ভাত না খাইলেও চলে, কিন্তু পান দোক্তা?

ভাবিয়া চিন্তিয়া চুপিচুপি বলে—"নুকিয়ে খে'লে শুকিয়ে যায়! চুপিচুপি খেয়ে মুখ ধুয়ে ফেললেই হবে। কি বলিস রে বংশী?"

বংশী বিরক্তিব্যঞ্জক উত্তর করে—" সে তো তোর? বলে, নিজের বেলায় আঁটিস্যুটি। আমি বাবা কচুর ঘণ্ট খেয়ে জীবন কাটাতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি, সগ্‌গো মাথায় থাক আমার।"

ওদিকে রান্নাঘরের মহলে আলোচনা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রিতা ও অনাশ্রিতা মাসতুতো পিসতুতোর দল, যাঁহারা নিতান্তই কর্ত্তা গিন্নীর তাড়নায় কুলপাতায় ইষ্টনাম লিখিয়া জলে ভাসাইয়া নূতন মন্ত্র লইতে স্বীকার পাইয়াছেন, তাঁহাদের সভা।

—"কালী গঙ্গা, ষষ্টি মনসা, বারব্রত, কিছুই আর থাকবে না শুনছি, সব তুলে দেবে।"...."পেন্নাম পর্য্যন্ত বারণ—সিংহবাহিনীর পেসাদ খেলে মহাপাতক, মন্দিরে পূজো পেন্নাম তো দূরের কথা, ছায়া মাড়ানো চলবে না"...."বাপ মা শ্বশুর ভাসুরকে পর্য্যন্ত প্রণাম করতে পারবে না"..."গুরু নাকি বলেছে—'একবার গোবিন্দর চরণে যে মাথা হেঁট হয়েছে সে আর কোথাও হেঁট হবে না'—ছিষ্টিছাড়া ধম্ম বাবা!" "আবার শুনছি ছেলেবুড়ো একাদশী করতে হবে, সধবার পর্য্যন্ত ছাড়ান নেই! এ কি অলুক্ষুণে কথা—এ্যাঁ? সোয়ামীর অকল্যাণ হবে না?"

—"আর সোয়ামী!" যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা, সেই জ্ঞাতি ভাগ্নে বৌটি মুখ বাঁকাইয়া বলে—"স্বামী আব স্বামী থাকবে না, 'গুরুভাই' হবে। বাড়ীর গিন্নীব ব্যবস্থা শুনেছ তো? স্বামী স্ত্রী একত্র থাকতে পাবে না—যত ব্যাটাছেলে বার-বাড়ীতে শোবে আর সব মেয়েমানুষ ভেতর-বাড়ীতে, তা নইলে সাধন ভজনের ব্যাঘাত হবে! পারবো না বাবা, তার কথা নেই। এ বাড়ীর অন্ন এবার উঠলো দেখছি।"

কিন্তু এ বাড়ীর অন্নে যাহাদের দাবী আছে ষোলো আনা, তাহারা শুধু "অন্ন উঠিল" বলিয়া মুক্তির ব্যবস্থা করিবে কোন হিসাবে? তাই চিন্তা তাহাদের আরো বেশী। মেজবৌ কলিকাতার ফ্যাসানওয়ালা ঘরের মেয়ে—কণ্ঠি গলায় দিয়া বাপের বাড়ী মুখ দেখানো অপেক্ষা গলায় দড়ি পরা তাহার পক্ষে সোজা। সে দস্তুরমত বাঁকিয়া বসিয়াছে।....শ্বশুরের কাছে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবার সাহস নাই, তাই শ্বশুর-পুত্রের কাছে করে।....

—জোর করে ধর্ম্ম হয় না, বুঝলে? আমার মন যদি সায় না দেয়, গায়ের জোরে তোমরা আমাকে মন্তর দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠাতে পারবে? কক্‌খনো আমি ওসব ন্যাষ্টি জিনিষে মত দেব না তা বলে রাখছি তোমায়, এই বেলা কিছু ব্যবস্থা করো।

তারানাথ বিব্রত ভঙ্গিতে বলে—এই এক ফ্যাসাদে ফেলছো তুমি আমায়, নিজেই বল না মাকে? বল যে তোমার ইচ্ছে নেই যখন—

—দায় পড়েছে আমার নিজে গিয়ে বলতে, কে তোমার মার মুখনাড়া খাবে শুনি? শুনেছ

তো নোটিশ ?—"যে এক মন্ত্রে দীক্ষিত হতে না চাইবে সে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে—আমার হুকুম—"

—দেখছো তো ? এখন কি করি বলো ?

—ও সব জানি না। আপত্তি জানাতে না পারো বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও আমায়। কণ্ঠি পরে বোষ্টমী হওয়ার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পারবো না— করবো না, ব্যস্।

বড়বৌ রাগী নয়, বরং অতিমাত্রায় কৌতুকপ্রিয়া... সে হাসিয়া ননদের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া বলে— ও ঠাকুরঝি, তোর দাদাদের বল্ যার যা মনোবাঞ্ছা আছে এইবেলা মিটিয়ে নিক, এর পরে তো তুইও যা আমিও তা, গুরুভগ্নী।

- মরণ আর কি- ননদ ঠ্যালা মারিয়া বলে—তোমার সব তাতেই মস্করা, ও কথা তোমায় কে বলেছে শুনি ?

—বলে নি ? বলিস কি লা ? দুপুরবেলা ঘুমিয়ে মরিস্, তত্ত্বকথা তো শুনিস না ? আমি যে রোজ হাজরে খাতায় নাম সই করে আসি। কত মজার কথা শুনি, হাসি চাপতে দম ছুটে যায়। শোন তবে বলি—কাল দুপুরে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে, মহারাজজীর তো মুখের আগল ছিট্‌কিনি নেই—সবই বলে যাচ্ছেন—বাবা বসে, মা বসে, লজ্জায় মরি আর কি। হঠাৎ মুক্তপিসির এক কূট প্রশ্ন। ..."হ্যাঁ বাবা, বৌ ছেলে সব বেম্মচারী হবে—তো এত বড় বোসবংশের গতি কি হবে ? জেঠামশাইয়ের বংশটা লোপ পাবে শেষটা—"

—ন্যাকা মাগী। ননদ ঝঙ্কার দিয়া ওঠে—"মাগী বললো এই কথা সভার মধ্যে ?"

—তা বলবে না ? বড়বৌ টানা চোখ টানিয়া কপালে তুলিয়া বলে, বলবে না কেন লা ? সভার মধ্যে আরো কত কথা হচ্ছে— এ যে ধম্ম কথা। বলে "ঘৃণা লজ্জা ভয়—তিন থাকতে নয়"— ধম্মর নামে যা খুসি করো, যা প্রাণ চায় বলো, কোনো দোষ নেই, ও সব হরিকথা। দীনবন্ধু পার করো হে।

—দীনবন্ধুর মরণ নেই, তাই তোমাকে পার করবে। বরং তুমিই তাঁকে ভবসাগর পার করিয়ে আসতে পারো বাবা, যা মেয়ে তুমি। তা মুক্তপিসির দুশ্চিন্তার কিছু উপায় হ'ল ?

—হ'ল বৈ কি। শাস্ত্রে না আছে কি ? নেহাৎ দাদাশ্বশুরের নামটা বজায় রাখতেই—দৈবে সৈবে একদিন—পাঁজীপুঁথি দেখে—গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে –

হাসির চোটে বাকী কথাটা আটকাইয়া যায় বড়বৌয়ের, হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে

বোস গৃহিণী ঘরের সামনে দিয়া যাইতে থমকিয়া দাঁড়ান, বিরক্তিব্যঞ্জক অসন্তোষের সহিত বলেন, কিসের অত হাসি রে শ্যামা ?

শ্যামা কষ্টে হাসি চাপিয়া বলে, বৌদির সব তাতেই হাসি, জিগ্যেস করো না ওকেই—

—কি জানি বাছা এত হাসিই যে তোমাদের কিসে আসে। মহারাজজী বলেন, "বৃথা হাস্য বৃথা আলাপ" বৈষ্ণব অপরাধের মধ্যে গণ্য। ওই জন্যেই তো সকলকে দীক্ষা দেওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। মানুষ মনুষ্যদেহ ধারণ করে যদি গরু গাধার মতন শুধু আহার বিহার নিয়েই কাল কাটাবে তবে আর মানুষ নামের সার্থকতা কি ? তোমাদের তো দেখি কাজের মধ্যে কেবল বাজে গল্প আর অসঙ্গত হাসি, থামো দিকিন, দেখলে গা জ্বলে যায়।

বড়বৌ অনেক কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করিয়া বলে, হাসছিলাম কেন জানেন মা ? ঠাকুরঝিকে

বলছি— এর পরে তো 'শ্যামা' নাম উচ্চারণে মহাপাতক হবে—তা তোকে কি বলে ডাকবে সবাই, খেঁদি?

উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইতে ওস্তাদ এই বৌটি।

ননদের গোপন চিমটি হজম করিয়া ভালমানুষী মুখে তাকাইয়া থাকে, যেন সত্যই মহাভাবনায় পড়িয়াছে।

শুনিয়া কিন্তু বসুগৃহিণী সত্যই দুশ্চিন্তায় পড়িয়া যান।... রহস্যের ছলে বড়বৌমা যেন একটা অনাবিষ্কৃত অন্ধকারে আলো ফেলিয়া দেখাইয়াছে।.. চিরদিনের শক্তি উপাসক ভক্তপরিবার, ছেলেমেয়েদের গায়ে তাহারই বিজ্ঞাপন আঁটা আছে।....কর্ত্তা করালীপ্রসাদের চার ছেলে—কালীনাথ, তারানাথ, শক্তিনাথ আর কামাখ্যানাথ, দুই মেয়ে—শ্যামা ও শঙ্করী। কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে ডাকিবেন? হরিনাম ধৌত পবিত্র রসনা কি মুহুর্মুহু শক্তিনাম উচ্চারণে পতিত হইবে না?....অনাবিল বৈষ্ণব ধর্ম্মের পবিত্রস্রোতে গা ভাসাইয়া কোথায় দ্রুতগতিতে পরলোকের পথে অগ্রসর হইবেন, তা নয়—প্রতিনিয়ত এই রক্তপায়িনী ভয়ঙ্করী দেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া নরকের গভীর গর্ত্তে নামিতে থাকা!

আনাজ তরকারি না হয় কোটার পরিবর্ত্তে 'বানানো' বলা চলে—কিন্তু এই স্বকৃত-দুষ্কৃতির প্রতিকারের উপায় কি? হায়! যদি যৌবনের প্রারম্ভেই মহারাজজীর দর্শন মিলিত!

যিনি এই সমস্যা সৃজন করিয়াছেন সমাধানও তাঁহার কাছেই মিলিবে। তিনি ভিন্ন আর কে আছে জগতে? এই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্নদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতে? বসুগৃহিণী দ্রুতপদে চলিয়া যান, প্রথমে স্বামীর ও তৎপরে পরম স্বামীর নিকট উপদেশ লইতে।

আর বড়বৌ হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয়....ঠাকুরঝি শোন শোন—তোদের ভাই বোনের নামকরণ করি—ফালী, ফারা, ফক্তি, ফামা, ফামাখ্যা, ফঙ্করী। কেমন, বেশ না? শক্তিনাম উচ্চারণ করে আর নরকে ডুবতে হবে না।

অসন্তোষের বিষবাষ্প ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হইতে থাকে অনেকেরই, কেহ ব্যঙ্গ পরিহাসে নিজেকে কতকটা লঘু করিয়া লয়, কেহ বজ্রগর্ভ মেঘের মত উগ্র বিদ্রোহে উদ্যত হইয়া থাকে ফাটিয়া পড়িবার অপেক্ষায়।

কিন্তু বসুদম্পত্তি দৃঢ়সংকল্প।

ওজর আপত্তির ধার তাঁহারা ধারেন না। কারণ বাধ্য রাখিবার, বশ্যতা স্বীকার করাইবার আসল চাবি "ভাত-কাপড়" যে তাঁহাদের হাতে। পুত্র যদি দুর্বিনীত নাস্তিক হয় তাহাকে দূষিত ক্ষতের মত ত্যাগ করাই উচিত, এবং সেটুকু মনের জোরের অভাব তাঁহাদের নাই।

"যার না পোষাবে সে এবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে"—এই তাঁহাদের শেষ কথা।....যখন সংসার নরকের কৃমিকীটের মত অন্ধ স্নেহের বশবর্ত্তী ছিলেন তখনকার কথা স্বতন্ত্র। তখন ছেলেরা একবার ছুটিতে বাড়ী না আসিলে বা দুদিন দেরী করিলে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেন, এখন গুরুকৃপায় দিব্যদৃষ্টি খুলিয়াছে, মায়ার বন্ধন দূর হইয়াছে, এখন ধর্ম্মপথে বিমুখ সন্তানকে ত্যাগ করিতে কাতর হইবেন এমন আশঙ্কা নাই।

শক্তিনাথ পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে।

আসিয়া পর্য্যন্ত তাহার মনে সুখ নাই। অন্য অন্যবারে ছুটিতে বাড়ী আসিলে সংসার যন্ত্রের চক্রখানি যেন তাহাকে আবর্ত্তিত করিয়াই ঘোরে। শক্তির খাওয়া শোয়ার সুবিধা বিধানে সকলেই

তৎপর থাকে, কারণ বাড়ীর মধ্যে অথবা বংশের মধ্যে একমাত্র শক্তিই তিনতিনটে পাশ করিয়া চারটে পাশের পড়া পড়িতেছে।

শক্তি এ বাড়ীর দামী ছেলে।

আবার, আচারে ব্যবহারে হাস্যে পরিহাসে কলিকাতার হাওয়া বহিয়া আনে বলিয়া দিদি বৌদিদের পরম প্রিয়পাত্র—সেই শক্তি এবার অনাদৃত অবহেলিত কোণঠাসা হইয়া পড়িয়া আছে।

সপার্ষদ কানাই মহারাজের সেবায় খোদ কর্ত্তাগিন্নী হইতে পিঁপড়েটি পর্য্যন্ত তটস্থ! শেষরাত্রি হইতে মাঝরাত্রি পর্য্যন্ত বিগলিতচিত্ত ভক্তবৃন্দ 'নিরাহারী বাবাদের' আহারের উপকরণ বহিয়া বহিয়া সদর অন্দর এক করিয়া ফেলিতেছেন।

আগামী রাসপূর্ণিমায় এক বিরাট মহোৎসবের দিন স্থির হইয়াছে।

অতএব শক্তিনাথের কোনো আশা ভরসা নাই। গুরুদেবের লীলা ফুরাইবার আগেই তাহার ছুটি ফুরাইবে। বিরক্ত লাগিতেছে....তার উপর অসম্ভব ভয়ঙ্কর কথা পূজার দালান শূন্য পড়িয়া আছে—মায়ের পূজা নাই।

এ কি অনাসৃষ্টি!!

বসুবংশের চিররক্ষয়িত্রী কুলদেবী মহাদুর্গাব পূজা বন্ধ? দুইদিন আগেও এতবড় অবিশ্বাস্য কথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত? বোসজা নিজেই পারিতেন? মায়ের পূজার অনুষ্ঠানে একবিন্দু ত্রুটি হইলে যিনি পৃথিবী রসাতলে দিয়া ছাড়িতেন! ভক্তিমতী বসুগৃহিণীর আন্তরিক আকুলতার 'মা' ডাক যে এখনো ঠাকুরদালানের ভিতর গম্‌গম্‌ করিতেছে!

সেই পূজার আয়োজন নাই!

কথাটা উঠিয়াছিল গুরুদেবের আবির্ভাবের সঙ্গেই, কিন্তু আসলে কেহই বিশ্বাস কবে নাই। সমস্ত গ্রামবাসী যে সারাবৎসর এই জমিদার বাড়ীব পূজার জন্য হাঁ করিয়া থাকে।....তাহার পরই কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা।

ভট্টাচার্য্যের সারাবৎসরের সংস্থান হয় এই তিনটি পূজা হইতে।

সংবাদ শুনিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া পড়িয়াছেন। তবু মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল, হয় তো কর্ত্তার এই সৃষ্টিছাড়া খেয়াল টিকিবে না, দিন ঘেঁষিয়া হঠাৎ প্রবল উৎসাহে তোড়জোড় পড়িয়া যাইবে....কারিগররা দিনরাত্রি খাটিয়া প্রতিমা গড়িয়া তুলিবে....মণ্ডপে 'গোলা' পড়িবে....চারিদিক হইতে ভারে ভারে জিনিষ আসিয়া হাজির হইবে, বোধনবাঁশী ঠিক সময় বাজিয়া উঠিয়া গ্রামসুদ্ধ লোককে জাগাইয়া তুলিবে, মাতাইয়া তুলিবে, অলস দেহে মনে চেতনার সাড়া পড়িয়া যাইবে।

কিন্তু কিছুই হইল না।

কুলাচারভ্রষ্ট বোসজার উপর দশপ্রহরণধারিণীর একটা প্রহরণও ভাঙিয়া পড়িল না। এমন কি একটা স্বপ্নাদেশ একটা দৈববাণী পর্য্যন্ত না। নিত্যানন্দগতপ্রাণ কানাই মহারাজের নিত্যসেবার বহর পূর্ব্বের মতই পূর্ণতেজে চলিতেছে....অথচ মহালয়া আসিয়া পড়িল।

গোবিন্দের কৃপায় যাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ সব ভুলিয়াছেন—তাঁহারা বাদে আর সকলেই শোকাচ্ছন্নের মত অবসাদগ্রস্ত দেহ মন লইয়া শূন্য মণ্ডপ ও ধূলিধূসরিত 'কাঠরা'খানার পানে চাহিয়া চাহিয়া অলক্ষ্যে চোখ মুছিতেছিল.....হায় কর্ত্তার এমন দুর্গতি কেন হইল!

আহা, আজও যদি সুমতি ফিরিয়া আসে!

শক্তিনাথ সারা সকাল এদিক ওদিক ঘুরিয়া বিষম বিরক্ত চিত্তে দালানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।....

দেখিল....কে একজন দালানের মাঝখানে একটা প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া প্রণাম করিতেছে।

তবু ভালো যে এ সংসারে এখনো একজনেরও কৃষ্ণ পাইতে বাকী আছে। কিন্তু মানুষটাকে ঠাহর করিতে পারে না....আশ্রিতা অনাথা অনেকেই আছে বটে কিন্তু তরুণী বিধবা কে আছে?

চিনিবার অপেক্ষায় সিঁড়ির একধারে বসিয়া পড়ে শক্তিনাথ।

কিন্তু কে এ? মায়ের কাছে কোন বেদনার বোঝা নামাইতে আসিয়াছে যে এই সুদীর্ঘ প্রণামেও সে নিবেদন শেষ হয় না?....দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে অধৈর্য্য শক্তিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতেই মুখোমুখি হইয়া গেল। ওঃ, এ সংসারের কেহ নয়, ভট্টাচার্য্যের মেয়ে শিবানী....

নামের মহিমা ব্যর্থ করিয়া যে বিবাহের বছরেই বিধবা হইয়া বসিয়া আছে।

মৃদু অশ্রুর আভাস গোপন করিয়া শিবানী ব্যঙ্গহাস্যে কহিল, শক্তিদা যে মায়ের দালানে? তোমাদের গোবিন্দর কাছে ফাঁসীর হুকুম হয়ে যাবে না?

অনেকদিন পরে শিবানীর সঙ্গে দেখা, শক্তিনাথ একটু থতমত খাইয়া বলে—কে—শিবানী কবে এলে?

—এলাম মানে? ছিলাম কোথায়?

—মানে—ইয়ে—শ্বশুরবাড়ী।

—থাক হয়েছে! আর আন্দাজী ঢিল ফেলতে হবে না, খবর তো রাখো কত? শ্বশুরবাড়ী গেলাম কবে?

—ওঃ, তারপরে আর যাও নি বুঝি?

অপ্রতিভ শক্তিনাথ আবার বসিয়া পড়িয়া বলে, চলে যাচ্ছো নাকি?

—বসতেই বা বলছে কে?

শক্তিনাথ একটু অবাক হইয়া তাকায়....কই বিশেষ কিছুই তো পরিবর্তন হয় নাই শিবানীর? অথচ হঠাৎ দেখিয়া মনে হয় যেন কত দূরের মানুষ। উনিশ বছর বয়সেই শিবানী থান ধরিয়াছে কোন প্রাণে?

ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলে—বসতে বলবার সাহস হচ্ছে কই? মনে হচ্ছে যেন আমাদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছো।....এ রকম কাপড় এখুনি না পরলেই নয়?

শিবানী একধাপ নীচের সিঁড়িটায় পা ঝুলাইয়া বসে, হাসিয়া বলে—নয়ই তো, নইলে নাগালের বাইরে চলে যাবো কিসের জোরে? লোকে স্বর্গের দেবী ভাববে কি করে?

—শুধু লোকের ভাবার জন্যে?

শিবানী হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলে, তা নয় তো কি পতিশোকে উন্মাদিনী হয়ে? আমরা তো আর তোমাদের মতো 'কেষ্ট' পাইনি যে লোকলজ্জা দূর হয়ে গেছে?

শক্তিনাথ আরো গম্ভীর হইয়া বলে, আমাকে ও দলে চালান করছো কেন শিবানী? এসেছি পর্য্যন্ত এই ক'দিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অবাক হয়ে যাচ্ছি, আর ভাবছি—এমন হয় কি করে? ....ভক্তিমুক্তির বালাই আমার নিজের কোনো কালেই নেই....তবু এ আমার অসহ্য লাগছে। এই দীর্ঘ দিনের সংস্কার, ঐকান্তিক ভক্তি, আচার নিষ্ঠা, ক্রিয়াকাণ্ড, যার একতিল এদিক ওদিক হবার জো ছিল না, তা এত অনায়াসে ত্যাগ করা যায়? ....এতদিনের এত প্রচণ্ড সত্য এত সহজে মিথ্যা হয়ে যাবে?

—আমিও ওই কথাই জানতে এসেছিলাম শক্তিদা! বাবার অস্থিরতা দেখে ঘরে আর টিকতে পারি নে। ভাবলাম মার কাছেই নালিশ করে যাই। বলি—সত্যিই যদি তোমার কোনো শক্তি

সামর্থ্য থাকে তো একটা উপায় করো, তা নয় তো বুঝবো নেহাৎই মাটির পুতুল তুমি। খেলা করে অরুচি ধরে গেছে তাই ফেলে দিয়ে করালীকাকা একটা পাথরের পুতুল কিনেছেন।

—নালিশের কি উত্তর পেলি ?

—মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা উপায় হবে, নইলে উঠেই তোমায় দেখলাম কেন ? এতো লেখাপড়া শিখেছ—যুক্তি তর্কের খোঁচায় তোমাদের মহারাজজীর আসনটা একটু টলাতে পাবো না ? ইনি যে বামন অবতারের মতন মাত্র ত্রিপাদ ভূমি চাইতে এসে তোমার বাবাব মাথার ওপর সুদ্ধ একখানি বিরাট পা চাপিয়ে জেঁকে বসেছেন। ওঁর রাহুর গ্রাস থেকে আর কিছু কি উদ্ধার হবে ? আর একবার ঘুরে এসে হয় তো দেখবে—এই বাড়ীটি একটি শ্রীগোবিন্দ মঠে পরিণত হয়েছে—আর বাড়ীসুদ্ধু সকলে মহারাজজীর চেলা চামুণ্ডের দাস্যবৃত্তি করছে।

—এবারেই তো প্রায় তদ্রূপ। অসহ্য লাগছে, একটু আগেই ভাবছিলাম কলকাতায় ফিরে যাই। কিন্তু তা যাব না, আমিই করবো দুর্গা পূজো।

—তুমি ? তোমার কি ক্ষমতা ?

শিবানী অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

—দেখি শক্তিনাথ নামটা সার্থক করতে পারি কি না! ভট্‌চায্ জেঠাকে বল্‌গে যা বোধন বসাবার ব্যবস্থা তিনি করুন, পূজো হবে।

নিয়মিত দিবানিদ্রার পর কানাই মহারাজ সেই মাত্র ডাবের জল ও শীতলকর ফলমূল সেবা করিয়া উপদেশামৃত দানের জন্য গুছাইয়া বসিয়াছেন।....এ সেই সভা, যেখানে বড়বৌ নিত্য 'হাজরে খাতায় নাম সই' করিতে আসে। আজকাল একা বড়বৌ নয়, কর্ত্রীগৃহিণীর শাসনে দিবানিদ্রার অলস আরাম ত্যাগ করিয়া বাড়ীসুদ্ধ বৌ-ঝি, রাঁধুনী-চাকরাণী সকলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে আসিয়া বসে।

শুধু মেজবৌয়ের বাপের নাকি শঙ্কটাপন্ন পীড়া, 'তার' পাইয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে হইয়াছে তাহাকে।....ছুটি পড়িয়াছে—কালীনাথ তারানাথ কামাখ্যানাথ সকলেই উপস্থিত ছিল, ছিল না শুধু শক্তিনাথ।

কোনদিনই থাকে না।....এবং আশ্চর্য্য এই, তাহার উপর কেউ কোন দিন শাসন চালাইতে আসে না। করালীপ্রসাদ এক-আধবার ক্ষুব্ধ অনুযোগ করিয়াছিলেন—সারাদিন টো টো করে ঘুরে, বাজে নাটক নভেল পড়ে বৃথা কালক্ষয় না করে মহারাজজীর কাছে একটু বসলেই পারো ? শরীর মন দুয়েরই উন্নতি হয়।

ওই পর্য্যন্তই। শরীর মন উভয়বিধ কল্যাণের প্রলোভনেও শক্তিকে এ আসরে দেখা যায় নাই। ....আজ হঠাৎ তাহাকে আসিতে দেখিয়া বসুদম্পতি প্রথমটায় আনন্দিত হওয়ার চাইতে বিস্মিত হইলেন বেশী।

কিন্তু বস্তুতঃ বিস্ময়ের আছেই বা কি ? যাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হইতে পারে তাঁহার কৃপায় বাচালই বা মূক হইবে না কেন ?

এত করুণা ব্যর্থ যাইবে ? বিমুখচিত্ত গুরুমুখী হইবে না ? তা কি সম্ভব ? শক্তিনাথ যে এই প্রেমভক্তি রসের আস্বাদন করিতে আসিয়াছে ইহাতে আনন্দের কারণ থাকিতে পারে, বিস্ময়ের নাই।

—আয় বাবা!

সস্নেহ ডাকে সন্তানকে আহ্বান করিয়া বিগলিত প্রার্থনায় কাতর স্বরে বসুগৃহিণী বলেন—এই

আমার সেজছেলে বাবা, এর কথাই বলছিলাম আপনাকে—এর দিকে একটু কৃপাচক্ষে চাইতেই হবে।

ভাবালস দৃষ্টি মেলিয়া একমুহূর্ত্ত শক্তিনাথের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া কানাই মহারাজ সোজা হইয়া বসেন, তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন—তোমাকে তো কোনোদিন এখানে দেখি না?

—কারণ আমি এখানে আসি না।

—হুঁ! আসো না তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন আসো না?

—এসব ভালো লাগে না আমার।....বাবা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

করালীপ্রসাদ বিরক্ত কণ্ঠে বলেন—তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা থাকতে পারে না, এটা বাজে গল্প করবার বৈঠকখানা নয়।

গুরুদেবের সঙ্গে শক্তির কথা বলাব ভঙ্গী তাঁহাকে ক্রুদ্ধ কবিয়া তুলিবে এটা অসম্ভব নয়।

—কিন্তু বাবা, আমি গল্প করতেও আসি নি, বাজে কথাও কইতে চাই না, শুধু জানতে চাইছিলাম, পূজোর হিসাবেব খাতাপত্তরগুলো কি আপনাব কাছে আছে? না সবকারমশাইয়ের কাছে পাবো?

—পূজো? কী পূজো?

করালীপ্রসাদ চশমা খুলিযা মুছিতে থাকেন। ....ছেলেটা বলে কি?

—এ সময় আর কি পূজার আয়োজন হবে বাবা? দুর্গাপূজো।

শক্তিনাথের কথার সুরে দৃঢ়তার আভাস।

—পূজোর আয়োজন মানে? পূজো এবার থেকে বন্ধ হয়ে গেছে এ কি তুমি শোন নি?

—শুনেছি বৈকি বাবা, কিন্তু বিশ্বাস কবি নি। আপনি মাযেব পূজো ছেড়ে দেবেন এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

এটা যে কানাই মহারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধির অভাব মহারাজের নাই, তাই উপর-পড়া হইয়া নিজেই বলেন—জগতে কত অবিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই ঘটছে বাবা, কে তার হিসেব রাখে? আর, অবিশ্বাসের কি আছে? তোমার বাবা এবার বডগাছে নৌকো বেঁধেছেন। কি বল হে প্রসাদ? বলিযা মৃদুহাস্য করেন মহারাজ।

—সেই জন্যেই তো আপনাকে বিরক্ত করতে চাইছি না বাবা, আমরা নিজেরাই যা পারবো করবো।

—পাগলামী কোরো না শক্তি। করালীপ্রসাদ বিরক্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—পাগলামী কোরো না শক্তি, বৈষ্ণব উৎসব ছাডা আর কোন পূজার্চ্চনা এ ভিটেয় হবে না।

—তা হলে দেবোত্তর বিষয়ের কি হবে বাবা? ঠাকুর্দ্দারা যা ব্যবস্থা করে গেছেন?

—তুমি কি আমার সঙ্গে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করতে এলে শক্তি?

—মাপ করবেন বাবা, যদি আমার বোঝাবার ভুল হয়। আমি শুধু বলছি—চিরদিনের জিনিস উঠিয়ে দিয়ে লাভ কি? গ্রামসুদ্ধ লোককে একটা এত বড় আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে—

—মাতালকে মদ খাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করাও তো তাহলে মস্ত অপরাধ বাবাজী?

কানাই মহারাজের সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে ঘরভর্ত্তি সকলে চকিত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। উদ্ধত দুর্বিনীত শক্তিনাথ কি শেষটা মহারাজের সঙ্গেও বচসা করিবে নাকি?

আকাশ হইতে বজ্র ভাঙিয়া পড়িয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে না তো? ....বসুগৃহিণীর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় না, তিনি অজ্ঞাতসারে মনে মনে দুর্গানামই জপ করিতে থাকেন।

করালীপ্রসাদের রসনার আগায় করাল হুঙ্কার থমকিয়া আছে—নিতান্ত গুরুদেবের সম্মান রক্ষার্থেই। তাঁহার সামনে তো আর মেজাজের ওজন হারাইয়া চেঁচামেচি করিতে পারেন না?

শক্তিনাথ মৃদু হাসিয়া নমস্কারের ভঙ্গীতে দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া কহে—মহারাজ নিজেই যখন দাঁড়াচ্ছেন, তখন তর্কটা আপনার সঙ্গেই হোক, অপরাধ নেবেন না। বাবার এই অদ্ভুত খেয়াল, বোধ করি আপনারই মন্ত্র ও মন্ত্রণার ফল?

—আমি কে? ....মহারাজের ওষ্ঠে মৃদু রহস্যময় হাসি....আমি তো নিমিত্ত মাত্র। অনেক পুণ্যের ফলে প্রসাদের উপর গোবিন্দের করুণা হয়েছে।

শক্তিনাথ অল্প হাসিয়া বলে, হয়েছে—সে তো আনন্দের কথা, কিন্তু তার জন্য কুলপ্রথা ছাড়তে হবে কেন? আপনাদের বৈকুণ্ঠেও কি সেই হিন্দুস্থান পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব? একজনের এলাকায় আর একজনের পা বাড়ানো নিষেধ?

—উত্তেজিত হয়ো না বাবাজী, উত্তেজিত হয়ো না। কথায় আছে "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল দেবতার সার, তাঁর শরণ নিলে আর অসার নোড়ানুড়ি ইঁট কাঠের কাছে মাথা ঠুকে মরবে কোন দুঃখে?

—কিন্তু দেবতার সার অসারের বিচার কবতে বসবে কে বলতে পারেন?

—ওর আবার বিচারের কি আছে রে বাবা? ও যে স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী।

শক্তিনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলে—স্বয়ং ভগবান যে কার কানে কানে বলে গেছেন সে খবর আপনারাই জানেন, কিন্তু মাথা ঠোকবার সময় মূর্তিটাই তো বড় কথা নয়? মাথা ঠোকার ঐকান্তিকতাটাই বড। যার হবাব তার ইঁট কাঠের ভেতব দিয়েই হয়, কিন্তু যার হবার নয়—তার সারাজীবন আপনার গোবিন্দ মন্দিরে গড়াগড়ি খেলে আর দৈনিক লক্ষ নাম জপ করলেই কি কিছু হবে?

—হয় রে বাবা, হয়। লাট সাহেবের দপ্তরে চাকরী কবলে উন্নতি হতেই হবে। পেন্সন তার যাবে কোথা? শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের ভাইস্‌রয়, বুঝলি নে ক্ষ্যাপা ছেলে!

মহারাজের অধরে মৃদু বহস্যময় হাসি।

—মাপ করবেন, বুঝলাম না ঠিক। 'এতে হবে' বলেই যে 'ওতে হবে না' এর কিছু অর্থ আছে? রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ এঁদের তা হলে—কিছুই হয নি?

—শুনতে তোদের খারাপ লাগবে বাবা, কিন্তু আমবা বলবো—কিছুই হয় নি। পিশাচসিদ্ধ ডাকিনী-যোগিনীসিদ্ধ—শুনেছিস এ সব কথা? তারা অনেক কিছু ভেল্কী বুজরুকী দেখিয়ে লোকের 'তাক' লাগিয়ে দেয়....এ একরকম তাই আর কি!

অসহ্য ক্রোধে শক্তিনাথের আপাদমস্তক জ্বলিয়া ওঠে। ....অবাক লাগে তার মাতাপিতার ব্যবহারে। এত গোঁড়ামীও সহ্য হয়? একি অন্ধভক্তি? না যাদুবিদ্যার প্রভাব? ভেল্কী যে ইঁহারাই দেখাইতেছেন।.... বিবেক বুদ্ধি বিচার সত্যই কি নাই ইঁহাদের? না সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়াছেন তাহাদের?

গভীর কণ্ঠে বলে—কোন একটা বিশেষ মূর্তি অবলম্বন না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না এ আমি মানতে প্রস্তুত নই।

ভাবাবেশে কানাই মহারাজের দুই চোখ মুদিয়া আসে....কণ্ঠ খাদ হইতে নিখাদে নামে—তুই প্রস্তুত নয় বলে কি আর তাঁর কিছু এসে যাবে? মূর্তি? মূর্তিটা একবার ভাব দিকিনি? দ্বিভুজ মুরলীধারী....আধ বঙ্কিমঠাম....অধরে মৃদুমধুর হাসি....রুণুঝুণু নূপুরধ্বনিতে যমুনার জল উতলা....আহা হা....

হঠাৎ দুই চোখে দরবিগলিত ধারা—মহারাজজী ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন।....

বসুগৃহিণীও সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া উত্তেজিত চাপাগলায় কহিলেন—চেয়ে দেখ্ হতভাগা অবিশ্বাসী, চেয়ে দেখ্।

উত্তেজিত শক্তিনাথও কম হয় নাই।

একটা লোক যে এতগুলো লোকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে এ দৃশ্য তাহার পক্ষে অসহ্য। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে—তোমরাই দেখ মা, আমার দেখার দরকার নেই। আমি শুধু ভাবছি তোমাদের সহজ বুদ্ধিগুলো এমন ঘুলিয়ে গেল কি করে? এই যে এতগুলো লোককে শুধু শাসনের জোরে এখানে আটকে রেখেছো, সত্যি কথা বলবার সৎসাহস যদি ওদের থাকে বলুক দিকিনি ক'জন ভয়ে এসেছে—ক'জন ভক্তিতে? তোমরা কর্তা, তোমাদের হাতে অন্নবস্ত্রের ভার তাই প্রত্যেকের ইচ্ছে অনিচ্ছের গলা টিপে তোমাদের মতে চালিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করবে। যখন যে ছাঁচে ঢালাই করতে চাইবে সেই ছাঁচে ঢালাই না হলে আর রক্ষে নেই—তা নইলেই দূর হয়ে যাক তোমার বাড়ী থেকে, কেমন?....মনে পড়ে মা একটা কথা? মেজবৌদি কলকাতার মেয়ে....কালীপূজোর বলি দেখে ভয় খেয়ে দালান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল....সেদিন তোমার গালাগালির স্রোত দালানের রক্তস্রোতের চেয়েও প্রবল হয়ে উঠেছিল....সেই রাত্রে বিছানা থেকে টেনে এনে বেচারাকে দিয়ে বলির পাঁঠার কাটামুণ্ড তুলিয়েছিলে....পাপস্খালন করতে। সে নাকি তার মঙ্গলের জন্যে। আজ তোমাদের অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচেছে—তাই তাদের ইষ্ট নাম জলে ভাসিয়ে দিয়ে কণ্ঠি পরিয়ে মালা ধরিয়ে ছাড়বে, কালীনাম উচ্চারণে মানা।....এও বোধ করি তাঁ'দের মঙ্গলের জন্যেই। ....আবার এ মোহও যদি একদিন ভেঙে পড়ে! স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের স্যাঙাৎ এসে কানের গোড়ায়—অহং ব্রহ্ম মন্ত্র দেন, তখন তোমাদের এই বড় সাধের দ্বিভূজ মুরলীধারীকেও বোধ করি নদীব জলে আছড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করবে না?....আর সংসারসুদ্ধ লোককে গেরুয়া পরিয়ে ছাড়বে?

—নারায়ণ! নারায়ণ!

মহারাজের ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে....তিনি শ্লেষহাস্যের সঙ্গে উচ্চারণ করেন—তোর এই ছেলেটা তো চমৎকার লেকচার দিতে পারে প্রসাদ? কালে এ ছেলে একটা কেউ-কেটা হ'বে আমি আশীর্ব্বাদ করছি।

সহসা শক্তিনাথও একটু চমৎকার হাসির সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলে—আপনার আশীর্ব্বাদের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু বাবা আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই, দালানে প্রতিমা এসে গেছেন, অথচ গোছগাছের সমস্ত বাকী....বড়বৌদি চল তো, তুমি নইলে বরণ করবে কে? শ্যামা চল, শাঁখ বাজিয়ে দিবি—ও দুটো কাজ আমাদের দ্বারা হবার জো নেই। মা, দু-চার দিন ঢাকঢোলের বাদ্যিতে তোমাদের সাধন ভজনের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হ'তে পারে, কিন্তু কী করবো বল? হতভাগা ব্যাটারা কুমোর বাড়ী থেকে ঠাকুর আসতে দেখেই নেত্য শুরু করেছে।

শক্তিনাথ দ্রুত ব্যস্তভঙ্গীতে বাহির হইয়া যায়।

আশ্চর্য্যের কথা এই....বড়বৌয়ের পিছনে শ্যামা, তার পিছনে মুক্ত পিসী, অনুসরণার্থে সুবাস কদম ও বামুনদিদি....তার পিছনে পিসতুতো মাসী আর মাসতুতো পিসীর দল যেন ভোজবাজীর মত মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যায়।....কামাখ্যানাথ আগেই কাটিয়া পড়িয়াছিল, শুধু কর্তা গৃহিণী ও বড়-দুই ছেলে সসৈন্য মহারাজজীর সামনে গুরু অপরাধের ভারে স্তব্ধ নতমস্তকে বসিয়া থাকেন।

মিনিটখানেক পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কানাই মহারাজ গভীর মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহেন—আমার তো তা হলে আর এ ভিটেয় জলগ্রহণ করা চলে না প্রসাদ? বওনা হওয়ার ব্যবস্থাটা করে দাও?

শুনিবামাত্র বসুগৃহিণী হাউহাউ শব্দে কাঁদিয়া উঠেন, আর বসুকর্ত্তা দুই হাতে মহারাজের পা জড়াইয়া ধরিয়া অনবরত মাথা ঠুকিতে থাকেন।......

কিন্তু পাথরে মাথা ঠুকিলে ক্ষতিটা কার? পাথরের না মাথার?

মহারাজজীকে টলানো যায় না।

শক্তিপূজার হাওয়া লাগিলে নাকি তাঁহাদের সাধন ভজনেব বিঘ্ন হয। তা ছাডা জলগ্রহণের শাস্ত্রীয় নিষেধ তো আছেই।

করালীপ্রসাদ আর গুরুদেবের সামনে বলিয়া রাখিয়া-ঢাকিয়া বলেন না....ক্রুদ্ধ চীৎকারে বলেন—ও ছেলেকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করবো। দূর করে দেব বাড়ী থেকে, এই দণ্ডে দূর করবো। যে ছেলে সাধনপথের অন্তরায় সে তো পরম শত্রু। দয়া করুন প্রভু, ওর ঔদ্ধত্য, দুঃসাহস, সমস্ত অপরাধের জন্যে আমার মাথায় পদাঘাত করুন।

কিন্তু পদাঘাত করিবার প্রয়োজন কি?

দুর্ব্বিনীত সন্তানকে বরং মার্জ্জনা করা যাইতে পারে, কিন্তু দেবী প্রতিমার উপর তো মার্জ্জনা চলে না? সে যে নিতান্তই কাঁচা মাটির ব্যাপার!

প্রতিমার নির্ব্বাসন না ঘটা পর্য্যন্ত এ ভিটায় থাকিবার কথা ভাবিতেই পারেন না কানাই মহারাজ। জমিদার গৃহিণীর চোখের জলে পা ভিজাইবার পরও নয।

চাবুক হাতে দুরন্ত ঘোড়ার কাছে যাইবার মত বীর বিক্রমে করালীপ্রসাদ শক্তিনাথ এবং শক্তিময়ীর উদ্দেশ্যে ঠাকুরদালানেব দিকে অগ্রসর হন। কালীনাথ এবং তারানাথও বোধ করি রগড় দেখিবার উদ্দেশ্যেই পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে....কেবলমাত্র বসুগৃহিণী মহাবাজজীর দুই পাযের উপর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকেন....বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তের মত।

কিন্তু নির্ব্বাসন দিবেন করালীপ্রসাদ কাহাকে?

এই জ্যোতিস্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে?

অপমান ঘটাইবেন কাহার?

এই বিরাট মহিমার?....দশহাতে দশপ্রহরণ বহিয়া যে বিশাল প্রতিমা আপন গৌববময আসনে বসিয়া ত্রিনযনে করুণার প্রসাদ বিতবণ কবিতেছেন তাঁহাকে সে আসন হইতে টানিয়া নামাইবে কে?

এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস কাহার আছে? করালীপ্রসাদেব?

সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়....

গুরু, গোবিন্দ, 'শ্রীভক্তিবিলাস', 'প্রেমভক্তি তরঙ্গিণী' নূতন ধর্ম্মের নবীন ঢেউ সব যেন লেপিয়া পুঁছিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে....সারাগ্রামের লোক উঠানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে কেন? শ্যামা....বড়বৌমা জরির শাড়ী পরনে, শ্রীবরণডালা মাথায় লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিতেছে কি? দেবীর আমন্ত্রণ বরণ? বরাবরই এইরকম করিত না?....কিন্তু করালীপ্রসাদ এতদিন ঘুমাইতেছিলেন নাকি? কালও শূন্য দালান পড়িয়াছিল না? হঠাৎ এত আয়োজন এত উপচার ইহারা পাইল কোথায়? মা নিজেই কি বহিয়া আনিয়াছেন নাকি দশ হাত ভরিয়া?

কর্তাকে দেখিয়াই ঢাকীঢুলির দল প্রবল উৎসাহে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য সুরু করিয়া দেয়....বখশিশ পাইবার আশা তাহারা ছাড়িবে কেন? নৃত্য যত বেশী উদ্দাম হয়, কর্তার কাছে বখশিশ তত বেশী মেলে এ যে তাহাদের জানা কথা।

—মায়ের পূজোটা তুলে দিলে করালী? কাজটা ভাল হ'ল? বলিয়া নিষ্ফল আক্রোশের ক্রুদ্ধ অভিশাপে যে কালো মুখে সেদিন এই দালান হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন ভট্চায্, সে মুখ এখন আর নাই তাঁহার। প্রসন্নহাস্যে নবপত্রিকার তোড়জোড় করিতেছেন।....কাল ষষ্ঠী, সারাগ্রামের লোক তাহাদের চিরদিনের দাবী লইয়া 'বাবুর বাড়ীর' উঠানে আসিয়া পাত পাতিবে। চারদিন ধরিয়া মহোৎসব....নিমন্ত্রণের বালাই নাই—যে আসে সেই বসিয়া পড়ে। মায়ের ঘরে চাবি নাই।....

এই আনন্দস্বর্গ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন শুধু করালীপ্রসাদ?

কিন্তু এত লোককে তদারক করিয়া খাওয়াইবে কে? সন্ধিপূজার বিরাট মোহাড়া সামলাইবে কে? ছেলেদের কি সাধ্য? জানেই বা কি উহারা? নিশ্চিন্ত চিত্তে এত বড় দায়িত্ব উহাদের মাথায় তুলিয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মার মত ঝোলামালা হাতে ঘরের কোণে বসিয়া 'লক্ষ নাম জপ' করাটা সহসা নিতান্তই ছেলেমানুষী ঠেকে করালীপ্রসাদের।....একবার ইতস্ততঃ করেন....পরক্ষণেই সব কয়টা সিঁড়ি ভাঙিয়া একেবারে দালানের উপরে উঠিয়া চিরঅভ্যস্ত দরাজ গলায় ঢুলিদের ডাকিয়া বলেন—বাজা, বাজা, জোরে বাজা বাবাসকল। দেখছিস না বেটিকে আনি নি, তবু এসেছে, জোর করে এসেছে। মান অভিমান নেই বেটির, ভিখিরী ঘরের বৌ কিনা!

সেই রাত্রেই সর্পাষদ বাবা মহারাজ করালীপ্রসাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি ও বসুবংশের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে ট্রেনে চাপেন।....নাস্তিক পাষণ্ডগুলার মুখ দেখিলেও পাপ হয়। বসুদের গৃহ ছাড়িয়া যান, কিন্তু স্বয়ং গৃহিণীকে ছাড়াইতে পারেন না। কারণ 'বাবার' চরণ ছাড়া তাঁহার আর গতি কোথায়? কুলাঙ্গার স্বামীপুত্রের উপর আর কোন মমতা নাই বসুগৃহিণীর।

[১৩৫২]

গলায় দড়ি

বিয়ের আট দিন না কাটতেই সত্যজিতের ছুটির দিন গেল কেটে।

দশ দিনের তো ছুটি—বিয়ের আগেই গেছে ক'দিন।... কাজের জায়গায় ফিরে যাবার আগের দিন সত্যজিৎ বায়না ধরে বসলো নতুন বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। অনাসৃষ্টি কথা। কনেবৌ এখনো অষ্টমঙ্গলায় বাপের বাড়ী যায়নি—'নিয়ে যাবো' বললেই নিয়ে যাওয়া হয়?

এসব আপত্তি সত্যজিৎ ফুৎকারেই উড়িয়ে দিতে পারে।

—অষ্টমঙ্গলা! অষ্টমঙ্গলা আবার কি জিনিষ?

পিসিমা বললেন—হিঁদুর ছেলে হয়ে তাও জানিস্ না? আট দিনের দিন মেয়ে জামাই 'জোড়ে' যাবে—সুবচনী-মঙ্গলচণ্ডীর পূজো হবে।

—তা ওটা আজই সেরে নাও না।

—ক্ষেপা ছেলে! এসব হ'ল 'নেমকম্ম ব্যাপার', যা-তা করলেই হ'ল?

—আচ্ছা এই যে বললে—মেয়ে জামাই জোড়ে যায় না কি—তা জামাই হতভাগা তো 'জোড়'—ভেঙ্গে পগারপার হচ্ছে তার কি?

—বালাই ষাট! বলতে যদি মুখে কিছু আটকায়? কি করবি বাবা, যাবার তো কথা নয়—নেহাৎ নাকি সাহেবের চাকরী—ও মুখপোড়াদের শরীলে কি দয়াধম্ম আছে?

সত্যজিৎ হো-হো করে হেসে উঠলো।

—তোমাদের মা মঙ্গলচণ্ডীর শরীলেও তো দয়াধম্মের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না পিসিমা? সাহেব মুখপোড়াদের মতনই কড়া আইন, দু'দিন আগু-পিছু হবার জো নেই।

—তা' বললে কি হবে, শাস্তর যে।

পিসিমা চলে গেলেন বটে কিন্তু রান্নাঘরে সত্যজিতের মায়ের কাছে গিয়ে যা বললেন সম্পূর্ণ উল্টো কথা সেটি। বললেন—ছোট বৌ, ছেলের সাধ হয়েছে বৌ নিয়ে বাসায় যাবে, তুমি অমত কোরো না বাবু।

সত্যজিতের মা চমকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—কার সাধ হয়েছে? সতের?

—হাঁগো, আমার কাছে বললে কি না পিসিমা তোমাদের বৌমাটিকেও নিয়ে পালাচ্ছি'—আহা বেটাছেলে বড় হয়েছে—ইচ্ছে হবে বই কি—হবে না? কাল ফুলশয্যা হয়েছে আর আজই দেশান্তরী, এ যেন মুখের 'গেরাস' কেড়ে নেওয়া।

সত্যজিতের ছোট বোন মার কাছে বসে রুটি বেলছিল, বেলুন ফেলে রেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে এমন হাসতে সুরু করলো যে বেলুন গড়িয়ে গিয়ে লাগল ভাতের হাঁড়ির গায়ে। মা বিরক্ত হয়ে বললেন—অশোকা, ও কি? হেসে মরছিস্ কি জন্যে?

মনে বুঝছিলেন বৌয়ের সঙ্গে মুখের গ্রাসের তুলনাটাই অশোকার হাসির উৎস উৎসারিত করে তোলবার কারণ, নিজেও হয়তো হেসে ফেলতেন যদি এইমাত্র এরকম একটা অপমানকর প্রস্তাব না শুনতেন।

অপমানকর বৈ কি, দস্তুরমত অপমান।

ছেলের মুখ থেকে বৌ নিয়ে বাসায় যাবার প্রস্তাবটাই তো যথেষ্ট অপমানের, তার ওপর কি না তিন দিন মোটে বিয়ে হয়েছে যে ছেলের। অশোকা কিন্তু মার বকুনিতে কান দিলো না, প্রায় তেমনিই হাসতে হাসতে বললো—দাদা বুঝি তোমার কাছে দুঃখ করছিল পিসিমা? আহা মরে যাই—'মুখের গেরাস' কেড়ে নেওয়া—

—হেসে মরলো মেয়ে—পিসিমাও দন্তবিহীন হাস্যে বলেন—দুঃখ করতে যাবে কেন লা? হাসতে হাসতেই বলছিল—'পিসিমা, বৌকে ফেলে রেখে যেতে মন সরছে না—নিয়েই যাই।' আমি বলি-আহা তা' যাক। এখনকার ছেলেমেয়েদের তো বয়েস-কাল গড়িয়ে গিয়ে বিয়ে, লজ্জা-সরম করবে কবে? আমি বলি—কনে বৌমাকে তুমি পাঠাতে গররাজী হয়ো না ছোট বৌ। আহা ছেলেটা মুখখানি চুন করে বেড়াচ্ছে—

—সতু তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে ঠাকুরঝি—বলে আরব্ধ কাজে মন দেন সত্যজিতের মা।

এতখানি ওকালতীর পর এভাবে মামলা ডিস্‌মিস্ হওয়ায় পিসিমা বিলক্ষণ চটে যান। তবে বিরক্তি গোপন করেই বলেন—ঠাট্টা করতে যাবে কেন ছোট বৌ? আমি কি ওর ঠাট্টা-তামাসার যুগ্যি? এই যে বাছাকে হাতের সুতো খুলতে না খুলতে চলে যেতে হচ্ছে—এতে কি তোমারই মন

সরছে?

এক-কালে পিসিমাই এ রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। দাপটও নেহাৎ কম ছিল না। তাঁর ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল না খাক্, অধস্তন ব্যক্তিরা বাঘের মতই ভয় করতো তাঁকে। দু'চারটি সন্তানের পিতা হয়েও—ছোট ভাইরা দিদির সামনে মুখ তুলে কথা কইতে সাহস করতো না। বিরুদ্ধাচরণ তো দূরের কথা।

কালের গতিকে—সেই সদাসন্ত্রস্ত কম্পমান-বক্ষ ভাইবৌরা ও ছোট ভাইরা যে কী করে হঠাৎ দিব্যি 'একজন' হ'য়ে উঠলেন সে এক আলাদা রহস্য। এখন ভাইরা যে অবহেলা করেন তা' নয়, তবে ভয়ও করেন না, সেটা বলাই বাহুল্য। ভয়ের জায়গায় একটু সস্নেহ করুণা। "বাবা রে, দিদি রাগ করবেন"—এ ভাবের পরিবর্ত্তে "আহা দিদি দুঃখিত হবেন"—এই আর কি।

দাঁতের জোর চোখের জ্যোতি এবং কোমোরের বলের সঙ্গে সঙ্গে যে গৃহিণীত্বের মর্য্যাদাও হারিয়েছেন, একথা পিসিমা নিজেও অনুভব করেন বৈ কি। তাই তাঁর কথায় আজ আদেশের পরিবর্ত্তে ওকালতির সুর। তবে বয়সের দোষে অসহিষ্ণুতা আসবেই, অসহিষ্ণুতা আর অবুঝপনা।

যেই মনে হ'ল—'আহা সতুর ইচ্ছে হয়েছে'—ব্যাস্ সতুর ইচ্ছের সপক্ষে রাশি রাশি যুক্তি সংগ্রহ করতে সুরু করলেন। যুক্তির অভাব কি? বললেন—এই তো কত দুঃখে ছুটি পেয়েছে—আবার কবে আসবে তা'র ঠিক কি? বৌকে ওর কাছে পৌঁছে দিতে যাবে কে তাই বল?

—তিরিশ বছর বৌ নইলে চলেছে আর তিনটে মাস চলবে না?—সতুর মা রুটির চাটু নামিয়ে কড়া চাপিয়ে দেন...ভাবটা যেন—এই অসম্ভব বাজে কথাটার জন্য হাতের কাজ কামাই দিয়ে কথা কইবার দরকার নেই।

—সে তো কথাই আছে ছোট বৌ, 'বিয়ে করলে আর বৌ নইলে ঘর চলে না'—বিয়ে করেনি সে এক রকম ছিল—এখন যতই হোক আস্বাদ পেয়েছে—

অশোকা আর একবার হাসতে হাসতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে—

—ও পিসিমা, বৌকে যে খাবার জিনিষ বানিয়ে দিচ্ছ?

—খাবারই জিনিষ লো, বিয়ে হলে বুঝবি। বলে আবার একবার হেসে ফেলেন পিসিমা।

বয়সের আকাশ-পাতাল ব্যবধানে—পিসিমা ঠাকুরমার পর্য্যায়ে পড়ে গেছেন প্রায়।

—তাহলে ছোটবৌ, নতুন বৌমাকে কাল সকালে একবার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে ধুলো-পায়ে ঘরবসত করিয়ে আনো?

—'ও সব তুমিই কোরো না ঠাকুরঝি, তোমারই তো করবার কথা?' বলে সমস্ত কথার ইতি করে দিয়ে তেলের কড়ায় প্রবলভাবে 'ছ্যাঁক-ছোঁক' সুরু করে দেন সত্যজিৎ জননী।

পিসিমা বুঝলেন—এ রাগের কথা। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। ....ছোট বৌ কথা কয় কম কিন্তু কথার ওজন আছে।

অথচ এমন দিন ছিল, ভাই-পো ভাইঝিরা যত অন্যায্য আবদারই করুক, পিসিমা তাদের সপক্ষে থাকলে তাদের মায়েদের টুঁ শব্দ করবার হুকুম ছিল না।

পিসিমা দোতলায় বেশী ওঠেন না, ওঠেন না কোমরের বলের অভাবেই। আজ এলেন কতকটা মনের বলেই।...

'নেমকম্ম' বা ঠাকুর দেবতার ব্যাপারেও যে গোঁজামিল চলে এ তথ্য পিসিমার অজানা নয়,

অন্ধ স্নেহের ক্ষেত্রে তিনি প্রায় আধুনিকাদের মতই কুসংস্কারমুক্ত, কাজেই ভাবনা মঙ্গলচণ্ডীকে নিয়ে নয়, ছোট বৌকে নিয়ে।

যারা কথা কয় কম তা'দের ভয় না করে উপায় নেই।

—"ক্ষেত্তরকে বলে দেখি"—এইটুকু স্বগতোক্তি করে সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠে এসে হাঁফাতে লাগলেন।

"কেদার বদরীর" পথে পাহাড় ভেঙ্গেছিল কে? পিসিমা নবতারা দেবী, না আর কেউ?

নতুন বৌয়ের আড্ডা দোতলায, সে পিসিমাকে দেখতে পেলো। বুড়ো মানুষের কষ্ট দেখে, নিতান্তই দয়া-পরবশ হয়ে কাছে এসে বসলো।

বৌয়ের রূপ আছে—অস্বীকার করা যায় না। নিষ্প্রভ চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে পিসিমা ভাবলেন—এমন মুখখানি ছেড়ে কোন্ প্রাণে যায় বেচারা? অন্যায় ছোট বৌয়েরই, ছেলেকে যদি বৌ দেবার মতলব নেই তো সাতরাজ্য খুঁজে রূপসী বৌ আনা কেন?

—জলখাবার খেয়েছ বৌমা?

বধূ ঘাড় হেলিয়ে জানালো—হ্যাঁ।

—সতু তোমায় নিয়ে যেতে চাইছে যে—

বৌ মৃদু হেসে মুখ নীচু করলে।

—তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ তো শুনে খাপ্পা—

মুখ নীচুই থাকলো, শুধু হাসিটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

—ঠাকরুণটি তো সোজা নয়, ঘর করলে বুঝবে—পিসিমার সুর খাদে নেমে পড়ে—টেঁপামুখী, একজেদি, কখনও মন খুলে কিছু বলবে না—অথচ—

হঠাৎ স্তিমিত দৃষ্টি যথাসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর উদারা মুদারা সব ছাড়িয়ে একেবারে তারায়। -কিন্তু আমিও এই বলে দিচ্ছি—ওর কথা শুনতে আমার দায় পড়েছে! মনে করেছে ভারী গিন্নী হয়েছে! সেদিনের মেয়ে—বিয়ে দিয়ে আনলাম—ওর কথা আমি শুনবো কেন কনেবৌমা, বল তো তুমি?

বৌমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাবিদিক্ চায়। বুড়ো মানুষের কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি না জানি বলে বসবেন—অপরে ভাববে বৌ সায় দিচ্ছে বা। তাই প্রসঙ্গ পবিবর্ত্তন করে বলে—পাকা চুল তুলে দেব পিসিমা?

—না বাছা! আমি একবার যাই ক্ষেত্তরের কাছে। তা' তোমার মা বাপ অমত করবেন না তো?

—কি জানি। .....সে সন্দেহ বৌযের নিজেরও ছিল না তা' নয়।

—অমত কবলে শুনছে কে? মেয়েকে দান করে ফেললে আর কিসের জোর,অ্যাঁ। এখন সতু যা বলবে তাই শুনতে হবে। হবে কিনা বলো? তোমরা তো সব বুদ্ধিমতী, বিদ্বান মেয়ে, আইন জান তো! বৌ পিসিমার ভাষায় ভঙ্গিমায় আতঙ্কিত হলেও শেষের কথাটায় হেসে ফেলে। সতু কি এখুনি আইনের ঠ্যাঙা নিয়ে লড়তে যাবে, সদ্যলব্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে?

—হাসো আর যাই করো, আমার হুকুম রদ করুক দিকি কেউ?

গৌরবময় অতীতের ক্ষীণতম একটু স্মৃতি হঠাৎ পিসিমার চিত্ত উদ্দীপ্ত করে তুলেছে বোধ হয়।

'ক্ষেত্তর' অর্থাৎ সত্যজিতের পিতার উদ্দেশ্যে মরতে মরতে তিনতলায় উঠে যান পিসিমা।

—ছোট বৌয়ের কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে ক্ষেত্তর!

এ রকম গৌরচন্দ্রিকাহীন আকস্মিক আক্রমণে যতটা বিপন্ন হওয়া উচিত ঠিক ততটা হ'ন

না ক্ষেত্রবাবু, কারণ দিদির স্বভাব তাঁর জানা। হাতের মোটা চুরুটটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বলেন—সে আর তুমি কবে শুনতে চাও দিদি?

—কেন শুনবো? ও বড় না আমি বড়? বলুক ও?

ভ্রাতৃজায়ার অনুপস্থিতির সুযোগে এ রকম সাহস-ব্যঞ্জক কথা মাঝে মাঝে বলে থাকেন নবতারা।

ক্ষেত্রবাবু মনে যাই বলুন মুখে বলেন—ওদের কথা ছেড়ে দাও দিদি, তোমার মতন বুদ্ধি-বিবেচনা হতে এখন ঢের দেরী আছে।

—ও তোমার 'মুখভারতী' কথা! আসলে ওই বৌটিই তো হয়েছেন এখন তোমার ইষ্টগুরু! বুঝি না আর কোনটা? নইলে আর ও আমায় 'থো' করে রাখে? মরুক গে—এখন কথা হচ্ছে—সতুর যাওয়া নিয়ে—

—কালই তো রওনা হতে হবে ওকে।

—সে আমি জানি, সে কথা নয়। আমি বলি কি, বৌমা যাক ওর সঙ্গে বাসায়।

—বৌমা? নতুন বৌমা?

—বৌমা আবার তোর কটা আছে ক্ষেত্তর? নতুন বৌমার কথাই বলছি।

—এখন যাবে কি বল'? ক্ষেত্রবাবুর কণ্ঠে অসন্তোষের সুর।

—সে আমি জানি—তুই বলবি ও কথা। অথচ নিজে তো এখনো বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বৌ ছেড়ে থাকতে পারিসনে—

নবতারা রাগ ভরে বাতগ্রস্ত কোমরের যন্ত্রণা ভুলে বেশ বীর বেগেই ঘর ছেড়ে চলে যান।

তাঁর কথা আর কেউ-ই গ্রাহ্য করে না।....অনেক দিন থেকেই এ রকম হয়েছে, কিন্তু নতুন বৌয়ের সামনে নিজের প্রতিপত্তি হ্রাসের প্রমাণ প্রকাশ হওয়ায় বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েন নবতারা। তাছাড়া সতু? হাজার হোক নতুন বিয়ের বর, মুখ ফুটে কি আব বলতে পারবে মা-বাপের সামনে? কত ভেবে-চিন্তে পিসিকে সুপারিশ ধরেছে—ছোটবেলায় বারোয়ারীর যাত্রা দেখবার, মেলায় পাঁপড়ভাজা খাবার বা স্কুলের সরস্বতী পূজোয় মোটা চাঁদা দেবার সখ হলে—যেমন পিসির সুপারিশ ধরে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতো।

* * *

মেয়েরা—যারা বিয়েতে এসেছে, তারা মনের সুখে দায়িত্বহীনতার সুখ উপভোগ করে নিতে এই সকালবেলাই শুয়ে বসে গান গল্প করছিল, পিসিমাকে দেখে কেউ বা ঈষৎ সন্ত্রস্ত হল, কেউ হল না।

নবতারা গম্ভীর ভাবে বলেন—তোদের বাপ-মার আক্কেল দেখলি!

—কেন গো পিসিমা?

—বলি ছেলে-মেয়ের সুখ-দুঃখ না বুঝলে আবার কিসের মা-বাপ?

—আমিও তো তাই বলি পিসিমা, কিসের মা-বাপ তবে?

কথাটা বলে সুলেখা অলক্ষ্যে বাসন্তীকে একটা চিমটি কাটে।

—তোরা আমার কথায় উপহাস্যি করিস্ তা' জানি।

বোঝা গেল, বুড়ো হলেই যে বোকা হয়ে যায় মানুষ তা' নয়।

—সে কি গো পিসিমা, কি যে বল!

—বলছিলাম—নতুন বৌমাটি তো দিব্যি ডাগর-ডোগর?

—তা দিব্যি।

—তবে আর এখন বাপের বাড়ী যাবার কি দরকার? কচি খুকী তো নয়—যে মার জন্যে কাঁদবে?

—সে ত বটেই পিসিমা, এই একবার ঘুরে আসুক, তার পর এখানেই থাকবে।

—এখেনে থাকবে?

পিসিমার বিরক্তিব্যঞ্জক প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে যায় বাসন্তী, তাঁর মতলবটা ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না এখনো। বললো—বরাবরই কি আর থাকবে? যাওয়া-আসা করবে —মার এখন শরীর খারাপ—আমরা তো যে যার শ্বশুরবাড়ী চলে যাবো, বৌটি না থাকলে চলবে কেন?

—তা' বেশ। কালনেমির লঙ্কাভাগ হয়ে গেল। কথায় আছে না 'যে এল চষে সে রইল বসে'—তোদের হয়েছে তাই। বলি যে ছোঁড়া বিয়ে করলো—তার কথা তো কেউ মুখেও আনছিস না?

তিন বোন বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পর মুখ-চাওয়া-চায়ি করে! ব্যাপার কি? যে পিসিমা 'এখনকার মেয়ে-ছেলেদের বেহায়াপনার' জ্বালায় যখন তখন হার্টফেল করতে বসেন, তিনি হঠাৎ নবদম্পতির রাইট নিয়ে ফাইট্ করতে নেমেছেন মানে?

সুলেখা একটু বেশী সাহসী, সে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বলে—তা'হলে দাদা নতুন বৌকে পকেটে করে নিয়ে যাক দিল্লীতে।

—যাবেই তো। যাবেই তো নিযে! কেনে যাবে না শুনি? সময়ে বিয়ে হলে পাঁচটা ছেলের বাপ হ'ত না? এখনও আবাব পাঁচ বছব মা-বাপের কাছে বৌ ফেলে বাখবে কেন? বাছার আমার সেখানে কষ্টেব এক-শেষ—একগাদা টাকা উপায করে, ভালো খেতে পায না। হ্যাঁ, যাবে বৌ নিয়ে! আমি বলছি, দেখি তোব মা-বাপ আমার ওপব কি করে কথা কয?

ব্যাপারটা এই, নবতাবা যদি এক কথাতেই কথার সায পেতেন, হয়তো বেশী উৎসাহিত হতেন না এ নিয়ে, কিন্তু প্রত্যেকের কাছে বিরুদ্ধবাদ শুনে শুনেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছেন। তাঁর প্রস্তাবটা যে নিতান্তই অযৌক্তিক, এ কথা মেনে নেওয়াও তো কম অপমান নয়?

ঘটনাটা ঘটাবার জন্যে কি কৌশল অবলম্বন করা যায় তাই ভাবতে থাকেন।

ধরো যদি নবতারা নিজেই যেতে চান সতুর সঙ্গে? কেন বুড়ো পিসি ঠাকুরমাকে কেউ কি দেশ-বিদেশে নিয়ে যায় না? বেশ তাই যদি যান নবতারা—একলা তো আর যাবেন না? সঙ্গে একটা মেয়েমানুষ তো থাকা চাই? বিধবা মানুষ, একাদশী দ্বাদশী আছে, শরীরের কথা বলা যায় না, কখন কি হয়—সতু তো সারাদিন বাইবে থাকবে। তবে? কে যাবে তবে, এক নতুন বৌ ছাড়া? মেয়েদের কথা শুনলে হাড় জ্বলে যায়। পাঁচ দিনের জন্যে নেমন্তন্নে এসেছে সব, এর মধ্যে না হ'ক পঞ্চাশ বার জামাই ব্যাটারা এসে ধর্ণা দিচ্ছে! দাদার বেলায় হুঁস নেই!........

আচ্ছা—ভগবান না করুন, সতুরই যদি একদিন অসুখ-বিসুখ করে? কে একটু কাছে বসে? কে একটু যত্ন-আত্তি করে? কই মা কি নিজের সংসার ফেলে, সোহাগের কত্তাটিকে ফেলে, ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে পারে? এই যে ছেলের খাওয়া দাওয়ার এত কষ্ট? হঠাৎ সতুর কল্পিত রোগশয্যার পাশে সেবা এবং সেবিকার অভাব রীতিমত পীড়িত করে তোলে নবতারাকে।....নাঃ বৌমাকে তিনি দেবেনই পাঠিয়ে—সতুর মুখে হাসি ফোটাতে।....ছেলেবেলায় যেমন বাপ-মার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কোন নিষিদ্ধ খাবার বা খেলনা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নিজের আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন নবতারা!

নতুন বৌয়ের কাছে এসে চুপি চুপি বলেন—বৌমা শোন বাছা, বলি এক কথা।

বৌমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালো...চুপি চুপি কথাতে ওর ভারী ভয়, কে কি ভাববে বাবা।

পিসিমা আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন—শোনো তা'হলে, আমার জবানীতে তোমার মাকে একখানি পত্তর লেখো। লেখো—"সাবিত্রীসমানাষু—কল্যাণীয়া ভাই বেয়ান, তোমায় লিখি এই যে—শ্রীমান্ সত্যজিৎ বাবাজী আগামী কল্য দিল্লী রওনা হইবেক, আমার ইচ্ছা বধূমাতাকেও বাবাজীবনের সহিত রওনা করাইয়া দিই। সে কারণ তুমি পত্রপাঠমাত্র যাহাতে—"ধুলাপায়ে ঘরবসত" -সুবচনী মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি নিয়ম কর্ম্মাদি কল্য প্রভাতেই সারা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেক। অন্যথা না হয়। কারণ"—

বৌ হাসি চাপবার গোপন চেষ্টায় মাথাটা যত ইচ্ছে নীচু করে বলে—আর কাউকে বলুন পিসিমা।

—না না, আর কাউকে আমার বিশ্বেস নেই বাছা! ছুঁড়িগুলো কি সোজা? বললে এখন কতো হাসবে—ন্যাকরা করবে—মা বাপের কানে তুলবে—তিলপ্রমাণ কথা তালপ্রমাণ করে ছাড়বে! এমন নয় বাবা!

—আমার ভারী লজ্জা করছে পিসিমা।

—লজ্জার কিছু নেই মা। তুমি তো আর আপনা থেকে বলছো না? আমার জবানী। আচ্ছা নয় সতুর নামের সঙ্গে 'বাবাজীবন' লিখো না। এমনি দাও। —না বাছা, পাঁচকান কোরো না, তুমি টুক্ করে লিখে দাও, আমি ক্ষেন্তিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই।

বলা বাহুল্য, পিসিমার অভয়বাণী বধূকে কিছুমাত্র ভরসা দিতে পারে না। নিতান্ত বিপদ্গ্রস্তের মত তাঁর হাত এড়াবার কৌশল চিন্তা করে। ঠিক এই সময় বিপদহারী মধুসূদনের বেশে সত্যজিতের আবির্ভাব। আপন আনন্দে টগবগ করতে করতে আসছে, লক্ষ্যই করেনি পিসিমাকে। সহাস্যে বধূর উদ্দেশে বলে, বলে এলাম তোমার মাকে। শুনে তো- -হঠাৎ বৌয়ের ঘোমটা টানার বহরে লক্ষ্য পড়লো। ঘরে পিসিমা!

অপ্রতিভ হবার ছেলে সত্যজিৎ নয়; তা'ছাড়া পাঁচ বছর বিদেশে চাকরী করে উন্নতিও হয়েছে বৈ কি। কণ্ঠস্বরকে 'কন্ট্রোল' করবার চেষ্টামাত্র না করে বলে ওঠে—এই যে পিসিমা—বলে এলাম শাশুড়ী ঠাকরুণকে! বাবা, তুমি তো তোমাদের ঐ সব ধম্মকম্ম পূজোপাঠের কথা শুনিয়ে একেবারে ঘাবড়ে দিয়েছিলে আমায়। উনি শুনে তো কই কিছুই বললেন না। বরঞ্চ খুব খুশী! বললেন "তোমার সঙ্গে পাঠাবো তার আবার বলবার কি আছে বাবা?" আমিও তাই ঠিক করে ফেললাম—এই যে বাসু, সুলেখা, তোদের বৌদির ট্রাঙ্ক সুটকেসগুলো গুছিয়ে রাখ, ওকে নিয়েই যাব ভাবছি। ছুটি পাওয়া তো সোজা নয়।....যাই কিছু মার্কেটিং বাকী আছে, ঘুরে আসি! —বলে বাসন্তীর কোলের শিশুটির নাকটা একবার নেড়ে দিয়ে, অশোকার খোলা চুলের গোছায় এক টান মেরে চটপট সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় শিস্ দিতে দিতে।

যেন শাশুড়ী ঠাকরুণের মত পাওয়াটাই চরম। আর কোনো সম্মতি অসম্মতির প্রশ্নই ওঠে না। ....বোধ করি সেই ভীতিকর এবং অপ্রীতিকর অবস্থাটা চোখ বুজে এড়িয়ে যাবার জন্যেই এই অন্যমনস্কতার ভান সত্যজিতের।

ভাবটা যেন—ছুটি নিয়ে বিয়ে করতে এসেছে—বৌ নিয়ে ফিরে যাবে—এ তো জানা কথাই, এতে বলবার আবার আছে কি? দুর্ভাবনা ছিল শাশুড়ী ঠাকরুণকে নিয়ে, যাঁর আদরের দুহিতাটিকে বেদখল করে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সম্মতিই যখন পাওয়া গেছে তখন আর কি করবার

আছে? শিস্ দিতে দিতে মার্কেটিং করতে যাওয়া ছাড়া?

যাক নবতারা তা'হলে বাঁচলেন?

যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতটা অতিক্রম করবার চিন্তায় অস্থির হয়ে এত ফন্দী-ফিকির খাটাতে বসেছিলেন—সতু সেটা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ওটা পর্ব্বতও নয়, দুর্লঙ্ঘ্যও নয়, কাল্পনিক ছায়ামাত্র।

অন্ততঃ পিসিকে আর ভাইপোর ন্যায্যদাবী আদায়ের জন্যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হবে না সেটা ঠিক। কিন্তু এত পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়ে নবতারাকে খুব কি সন্তুষ্ট করতে পারলো সতু?

মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না।

হঠাৎ যেন প্রধান অভিনেতাকে কাটা সৈনিকের পার্ট দেওয়া হয়েছে।

বাসন্তীরা হাসাহাসি করতে পারে—"ক্ষেত্তর-দম্পতি" বিরক্তি প্রকাশ করতে পারেন, নবতারা বেচারার যে কিছুই করবার নেই। কলির মেয়ে-ছেলের অকথ্য নির্লজ্জতা দেখে স্বলন্তভাষায় নিন্দে করে বেড়াবেন, সে সুখেরও গোড়া কেটে রেখেছেন নিজেই।

এত অপদস্থ মানুষে হয়? এত অবান্তর, এত গৌণ?

সহসা সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে নববধূরূপিণী ভিজে-বেড়ালটির উপর। বটে, ভেতরে ভেতরে এত? এরই মধ্যেই বরেব সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে বাসায় যাবার ফিকির করা হচ্ছে? ....মা-বাপের জন্যে কি মন কেমনও করে না ছাই? .....ছি ছি, ঘেন্নায় লজ্জায় নবতারারই যে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

লজ্জা নেই, সরম নেই, হায়া নেই, ছি ছিঃ! এই সব মেয়েছেলেবা এত কাল বিয়ে না করে ছিল কি কবে?

গলায় দড়ি—গলায় দড়ি।....

* * *

গলায় দড়ি তো বটেই—কিন্তু কার?

[১৩৫২]

জর্জ্জেট শাড়ী

বীথিকা লিখিয়াছে—"শনিবারে আমাদের 'এ্যানিভার্সারি', মনে আছে তো? এবারে আমাদের যুগ-পূর্ণ হবে, জানো?....এত বছরের মধ্যে এদিনটায় কখনো ছাড়াছাড়ি থাকিনি আমরা—আর এবারের 'যুগ-সংখ্যা'টাই মাটি হবে?....ওসব চলবে না, যেমন করে হো'ক মহারাণীর দরবারে হাজির হওয়া চাই।....হেঁটে হোক—উড়ে হোক—সাঁতরে হোক শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে আসা চাই-ই চাই।"

পিত্রালয়ে অগাধ অবসরের সুযোগে বসিয়া বসিয়া আরো অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে,—সে সব ফাঁস করিয়া দিয়া বিশ্বাসভঙ্গের পাপে লিপ্ত হইতে চাই না।

মোট কথা—"ছুটি পাইলাম না"—বলিয়া চিঠি ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার কোনো পথই খোলা

রাখে নাই।

নিজের তাগিদও যে একেবারে না ছিল তা' নয়—তবু চাকরিটা নূতন এবং প্রেয়সী সুদূরে এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু শুধু নিজের মনকে প্রবোধ দিলেই তো কর্ত্তব্য শেষ হইল না?

অগত্যা শুক্রবার 'হাফ-টাইমে' কাটিয়া পড়িয়া হাওড়া স্টেশনে ছুটিলাম। বিপদের মধুসূদন মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তো আছেই। বেলাটুকু কাটিতে দেরি হইল না! কিন্তু ট্রেনে রাত্রিটা আমার পক্ষে ভারী অস্বস্তিকর। লোকের মত ঘুমাইতে পারি না....অবশ্য ঘুমানোর মত অগাধ স্থানই যে ছিল এমন নয়। বসিতে পাইয়াছি সেই ঢের। সঙ্গে বই ছিল, কিন্তু ট্রেনের লৌহ-বর্ম্ম পরিহিত বিদ্যুতবাতির হিসেব করা আলোয় পড়া সম্ভব হইল না। একটি জানলার ধার ঘেঁষিয়া, অন্ধকার বহিপ্রর্কৃতির পানে চাহিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম—বীথিকার প্রায় হতাশ মুখখানি আনন্দে অনুরাগে গৌরবে কৃতজ্ঞতায় কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

যুগান্তর-পূর্ব্বের পুরানো দম্পতির এসব খেলোমী সদ্য-বিবাহিতেরা পছন্দ নাও করিতে পারেন, অনুকম্পার হাসি হাসিয়া ক্ষমা করিতেও পারেন, কিন্তু আমি তাহাদের গ্রাহ্য করি না।

হয়তো বলা উচিৎ ছিল....মাদ্রাজ মেলের উদ্দাম গতির বেগে যেন বর্ত্তমানকে হারাইয়া ফেলিলাম....অন্ধকার বহিপ্রর্কৃতির সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া মনে পড়িল অনুপমার মুখ। আমার সেই কৈশোরকালের কিশোরী প্রিয়ার।

যুগযুগান্তর যাহাকে ভুলিয়া বসিয়া আছি।....এমন সময় এই রকম কিছু একটা বলিলেই ভালো শোনাইত।

কিন্তু শুনিতে ভালো বলিয়া তো বানাইয়া বলিব না? কিশোর বয়সে একবার সখ করিয়া প্রেমে পড়িতে গিয়াছিলাম—কিন্তু সচরাচর যা হয়—অভিভাবকের গুঁতোয়—"অকালে কুসুম ঝরিয়া পড়িল।"

প্রখর যৌবনের প্রচণ্ড আবেগের মুখে বীথিকাকে পাইয়াছি—এবং তদবধি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া তাহাকেই ভালবাসিয়া আসিতেছি। "পড়া পুঁথির মতো", মুখস্থ হইয়া যাইবার মেয়ে বীথিকা নয়।....তার উজ্জ্বল প্রাণশক্তির প্রবাহে দাম্পত্যজীবনের এই এক যুগ কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল কে জানে?

অনুপমা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া ভূত হইয়াছে, কবে কে তাহার সন্ধান লইতে গিয়াছে? মাঝে মাঝে বীথিকাই তাহাকে অতীতের কবর হইতে টানিয়া বার করে।...."কি গো চুপচাপ বসে কেন, অনুপমাকে ধ্যান করছ বুঝি?"...."মুখখানা তোলে-হাঁড়ি কেন, অনুপমার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?"....এমনি সব টুকরো কথা।

অনুপমাকেও সে দেখে নাই এবং আমাকেও সে সন্দেহ করে না—তবু দুষ্টুমি করিতে ছাড়ে না। কবে কখন কার কাছ হইতে আমার বাল্য-কৈশোরের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছে সে-ই জানে।

....

বীথিকার পরই খোকার কথা মনে পড়ে।

এই ক'মাসে আবো কত দুরন্ত হইয়াছে কে জানে। আমাদের অনেক আরাধনার এবং এই দ্বাদশবর্ষীয় দাম্পত্যবৃক্ষের একটিমাত্র ফল; খোকাটিকে লইয়া আনন্দেরও শেষ নাই, দুশ্চিন্তারও অবধি নাই।...হঠাৎ মনে হইল খোকার জন্য কিছু নেওয়া হয় নাই। ছিঃ ছিঃ, কী অন্যায়!

বীথিকার জন্য একটা জর্জ্জেট শাড়ী লইয়াছি। প্রত্যেকবারই 'মিলন বার্ষিকী' উপলক্ষে তাহাকে নতুন শাড়ী একখানা কিনিয়া দিই। অবশ্য প্রত্যেকবারই যে এমন দামী শাড়ী উপহার দিবার ক্ষমতা হয় তা নয়, তবে এবারের কথা স্বতন্ত্র।

এক তো অনেক দিনের অদর্শনে নিত্য সাহচর্য্যের সহজ ভাবটা কেমন কমিয়া আসে, তুচ্ছ বস্তুকে শুধু ভালবাসার জোরে বড় করিয়া তুলিতে সঙ্কোচ হয়, তা ছাড়া স্থানটি শ্বশুরালয়। উপহারের মূল্যটা আর্থিক মূল্যে যাচাই করিবার মত লোকের অভাব নাই। বীথিকার মুখটা না হেঁট হয়।

একখানি সাদা জর্জ্জেটের সাধ তার অনেক দিনের, কিন্তু ইদানীং জিনিসটা বাজারে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। তবু একটি ভাটিয়া বন্ধুকে বলিয়া কহিয়া বেশ কিছু মূল্যে একখানি কালো জরিদার পাড় বসানো সাদা জর্জ্জেট শাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম পার্শেল করিবার জন্য। সেটাই সুটকেসে ভরিয়া লইয়াছি।

কিন্তু খোকনটার জন্যে? ষ্টেশনে কিছু কিনিয়া লইব নাকি? অতটুকু ছেলের উপযুক্ত খেলনা ভাবিয়া পাওয়া শক্ত, কবে যে ফুটবল খেলিতে শিখিবে।

শেষরাত্রের দিকে সামান্য তন্দ্রাবোধ করিতেছিলাম—ভাঙিয়া গেল হরেকরকম ফেরিওয়ালার হুঙ্কারে। ভোর হইয়াছে। গাড়ী ইন্ করিয়াছে—বারহামপুর ষ্টেশনে।

... ...

কিন্তু সারারাত্রি অনুপমার সঙ্গে এক ট্রেনে কাটাইয়া আসিয়াছি একথা বলিলে কি কেহ বিশ্বাস করিবে?

অথচ বিশ্বাসের অযোগ্য কত ঘটনাই ঘটে সংসারে।....

তাহাকে আমি চিনি নাই, সে-ই আমাকে চিনিল। অবশ্য নিজেকে দোষ দিতে পারি না। মেয়েরা আমাদের দিকে "ড্যাব ড্যাব" করিয়া যথেচ্ছ তাকাইতে পারে কিন্তু আমাদের পক্ষে ভদ্রমহিলার জুতার ডগাটুকু ছাড়া আর কোনো দিকে তাকানো রীতিমত বে-আইনী।

সারারাত্রি ধরিয়া সে নাকি আমাকে সন্দেহ করিতেছে—সাহস করিয়া ডাকে নাই, দিনের আলোর অপেক্ষায় ছট্‌ফট করিতেছিল।

বলিল—আজ আর তোমায় ছাড়ছি না—উঃ, এই আট দশ ঘণ্টায় কতো কথা হ'ত, কত পুরনো খবর জেনে নিতাম, বোকার মত কেন যে সাহস করলাম না? এখন এসো আমাদের সঙ্গে নামতে হবে এখানে। কাল তখন যেও।

অবাক হইয়া যাই, মেয়েরা কি না পারে? দীর্ঘদিন আগে যে ত্রস্ত-কুণ্ঠিত ভীরু কিশোরীকে দেখিয়াছিলাম—সে কি এই অনুপমা? এত দীপ্ত, এত প্রখর? এত সঙ্কোচলেশশূন্য?

"একতলার ভাড়াটেদের মেয়ে", এইটুকু মাত্র পরিচয় তাহার আমাদের হিসাবের খাতায় ছিল। ফ্রক্ ছাড়িয়া শাড়ী ধরিবার পর প্রথম যে কবে আমার মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—কবে যে তাহার প্রতি অতিমাত্রায় মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছিলাম, সে সব তো ছাই একবিন্দুও মনে পড়ে না।

সামান্য মনে পড়ে, আমার উৎসাহে উভয়পক্ষের অভিভাবকই বিশেষ উৎসাহ অনুভব করেন নাই, তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অনুপমাদের বিদায় গ্রহণ।

হয়তো তখন রাগ দুঃখ অভিমান অপমান অনেক কিছুই হইয়াছিল, কিন্তু অভিভাবকরাও সত্যি সম্পূর্ণ হৃদয়হীন নয়। তাঁহাদের দ্বিতীয়বার বিবেচনার ফলে বীথিকার আবির্ভাব।

পরবর্ত্তী ইতিহাস ঠিক একখানি ফ্রেমে-আঁটা ছবির মত। এলোমেলো উল্টোপাল্টা ব্যাপার কিছুই নাই।

অতঃপর অনুপমারা উঠিয়া গিয়া কোথায় বাড়ী ভাড়া লইল, বিবাহ হইল কি হইল না, বাঁচিয়া থাকে যদি তো কোথায় আছে, এসব খবর লইবার প্রয়োজন অনুভব করি নাই।

কোনখান হইতে কথা সুরু করিব ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না আর সে কিনা স্বচ্ছন্দে বলিয়া বসিল—"আমার সঙ্গে চলো!"

তাই বলিতেছি—মেয়েরা কী না পারে?

কিন্তু আমি? অনুপমার মুখের কথায় গন্তব্যস্থলের মাঝপথেই নামিয়া পড়িলাম কোন্ যুক্তিতে?

অনুপমা যে ভালো ঘরে পড়িয়াছে সে খবর দেখিলেই বোঝা যায়। সঙ্গের সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবকটি ও সুকুমার শিশু দু'টি যে তাহারই নিজস্ব সম্পত্তি সে কথাও বুঝিতে দেরি হয় না—কিন্তু অনুপমার এই ব্যবহার? এ আমার বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।

এ কি অবাধ স্বাধীনতা? বীথিকা পারে আমারই সামনে দাঁড়াইয়া বাল্য-প্রণয়ীকে সাদর আপ্যায়নে বাড়ীতে টানিয়া লইয়া যাইতে? তাহার বালিশ সুটকেস আমার ঘাড়ে চাপাইয়া? অদ্ভুত! সত্য কথা বলিতে কি—পুরনো প্রিয়াকে দেখিয়া নয়—তাহার ব্যবহার দেখিয়া অভিভূত হইতেছি।

ষ্টেশনে নামিয়া পড়িয়া নিজের মোটঘাট সমস্ত হিসাব করিয়া কহিল—তোমার কি শুধু এই ছোট সুটকেস আর বালিশটা? এত সামান্য সম্বল নিয়ে যাচ্ছিলে কোথায়?

—যাচ্ছি,—"রাজামান্দ্রী"।

স্থানটার নাম না বলিয়া কেন যে কেবলমাত্র দেশটাব নাম বলিলাম কে জানে?

—বেড়াতে নয নিশ্চয়ই? এত নিঃসম্বল হযে লোকে অত দূর দেশে বেডাতে যায় না। শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ বুঝি?

কথাটা সে পরিহাসচ্ছলে বলিল বলিযাই বোধ করি স্বীকার কবিতে চক্ষুলজ্জা হয়, "অশ্বত্থামা হতর" অনুসরণে কহিলাম—কেন, তোমার কি ধারণা আমি তেলেগু মেয়ে বিয়ে করেছি?

—কি জানি, আমাকে হারিয়ে মনেব দুঃখে যদি দেশত্যাগী হয়ে গিয়ে থাকো? 'কালক্রমে কোন তেলেগু সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কবিয়া—'

হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো মানে? এই নাও এ-হাতে বেডিংটা নাও, ও-হাতে বড় সুটকেসটা—আর স্কন্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর এই বোঝা দু'টি।....খোকন সোরাইটা তুই নে, বেবি তুমি টিফিন কেরিয়ার....হ্যাঁ, ব্যস, ঠিক হয়েছে। বলিয়া নিজেও একটা এ্যাটাচিকেস ও একটা হাতে ঝোলানো পিতলের কৌটো লইয়া অগ্রসর হইল—নাও চলো শীগগির! বাড়ী গিয়ে এক লক্ষ কাজ আছে আমার।

ব্যস্ত হইয়া আমিও কিছু বহিবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতে থাকি, কিন্তু শোনে কে?

—খবরদার তুমি কিছু বইবে না, তুমি আমার অতিথি—নারায়ণ।

সে ভদ্রলোক হাসিয়া বলেন—ছেড়ে দিন মশাই, পারবেন না ওর সঙ্গে, ভয়ানক জেদি, যা ধরবে তা ছাড়বে না।

বলিয়া সহাস্য-বদনে দুই হাতে এবং ঘাড়ের উপর বোঝা চাপাইয়া চলিতে সুরু করেন।

অগত্যা বাধ্য হইয়া কুলির কথা তুলি।

—কিন্তু কুলি? তাঁরাও কি তোমার নারায়ণ? বোঝা বহাতে রাজী নও?

—তা' কেন, বাঃ? আমরা স্বাবলম্বী। এখন থেকে না শিখলে ছেলেমেয়েরা বাবু হয়ে যাবে যে? 'আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাও অপরে!'

অবলীলাক্রমে চলিতে থাকে। 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী' নয়, গঠনভঙ্গী যেন নিজেকে বেশ কিছু ঘোষণা করিতে চায়।....মেদবহুল নয়—ঠিক ততটুকুই ভরাট, যতটুকু না হইলে একটা ঘরের গৃহিণী বলিয়া মানায় না। যার ঊর্দ্ধে উঠিলে 'মুটিয়ে গেছে' বলা যায়।

এতটা নজরে পড়িল তুলনামূলক সমালোচনার ফলে।....

সেই কৃশাঙ্গী কিশোরীকে এর ভিতর কতটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় তাহার হিসাব কষিতে।

ভাবিয়াছিলাম—প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া গাড়ী ধরা হইবে, কিন্তু গাড়ীর প্রয়োজন ছিল না, ষ্টেশনের গায়েই বাড়ী। মিনিট তিন চার হাঁটিতেই বাড়ী পৌঁছানো গেল।

ছোটখাটো সুদৃশ্য বাড়ীখানি। বোধ হয় রেলের কোয়ার্টার্স।

রেলের চাকরি হওয়াই সম্ভব ভদ্রলোকের।

তোমার চাকরকে নিয়ে তুমি এখন সংসারের কাজে লেগে যাও, আমি আমার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দু'টো সুখদুঃখের গল্প করি—বলিয়া স্বচ্ছন্দে একটা বেতের চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া পড়ে অনুপমা এবং আমার দিকে একখানা আগাইয়া দেয়।

—আর তোমার ছেলেমেয়েদের কে সামলাবে শুনি?

—সামলানো কিসের? নিজেরাই তো ওরা স্নান করবে, তুমি শুধু জামা জুতো বদলে দেবে। আর আমাদের সক্কলের চায়ের যোগাড় করো, তবে আমরা স্নান করতে উঠবো—কি বল অনিলদা?

—হা ঈশ্বর, কপালে এত দুর্ভোগও লিখেছিলে—বলিয়া মিঃ এন. রায় হাসি চাপিয়া ছেলেমেয়ে দুইটিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করেন।

সুটকেসে লেখা ছিল বলিযাই নামটা জানা গেল।

—সত্যি সত্যি তোমার এখানে নেমে পড়লাম দেখে বাস্তবিকই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি অনু, অথচ আজকের মধ্যেই রাজামান্ড্রী পৌঁছনো সাংঘাতিক দরকার ছিল আমার।

—কেন, অফিসের কাজ নিয়ে এসেছ বুঝি? কিন্তু কাল তো রবিবার?

—না, অফিসের কাজ নয়, একজন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে—

কেন যে বীথিকার নামটা মুখের আগায় আসিয়াও বাধিয়া গেল এ এক রহস্য।

—তোমার 'বিশেষ' আর 'সাংঘাতিকের' জ্বালায় অস্থির। বন্ধুর বিয়ে নাকি?

হঠাৎ বলিলাম—বন্ধুর নয়, বন্ধুর বোনের। আজই বিয়ে—না গেলে দুঃখিত হবে।

—হোক গে। না এলে আমি আরো দুঃখিত হতাম। চিরদিন ধরে আর একবার দেখবার সাধ মনে পোষা আছে। ভগবান যদি মিলিয়ে দিলেন—

... ...

অতঃপর কত অর্থহীন অবান্তর কথা।...

বারো বছরের ইতিহাস ও পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনিতে চায়।

অনেক কিছুই বলি, কিন্তু বীথিকার কথা আগাগোড়াই কৌশলে এড়াইয়া যাই। প্রথম মুখেই বলি নাই বলিয়াই বোধহয় শেষকালে ইচ্ছা থাকিলেও কেমন বাধো বাধো ঠেকে।

অনেক কথার শেষে একসময় বলে—আশ্চর্য্য! বিয়ে করলে না কি বলে? একি শুধুই

ফ্যাসান, না হতাশ প্রেমের জের? কিন্তু অতটা কি সত্যিই?

প্রগল্‌ভ পরিহাসের ভঙ্গীতে বলিল বটে, তবু নজর এড়াইল না ওর প্রত্যাশায় উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি।...যেন উত্তরটা পরিহাসের স্বপক্ষে হইলেই ভালো হয়।

কেমন যে দুষ্টুবুদ্ধি চাপিল—বলিলাম, কার যে 'কতটা' সে হিসেব অপরে কষবে কি করে?

হঠাৎ মুখরা অনুপমা একটু স্তব্ধ হইয়া গেল।

তারপরই হাসিয়া কহিল—বেশ যাহোক মানুষ আমি, তোমায় শুকিয়ে মারবার জন্যে মাঝপথে ডাকাতি করে আনলাম? দেখি বাড়ীর কর্তাটি কি করলেন।

উঠিয়া গেল।

বুঝিলাম—'মাঝপথে ডাকাতি' করিয়া আনার লজ্জাটা ঢাকিতেই এত বেশী বাচাল হইয়া উঠিয়াছে অনুপমা। কিম্বা এমনি বাচালই হইয়াছে আজকাল। বলিয়াছি তো, মেয়েদের অসাধ্য কিছুই নাই।

কিন্তু আমিই বা করিলাম কি? শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে বীথিকার কাছে হাজির হইবার কোনো উপায়ই রাখিলাম না।

আহারের তাগিদে স্নান করিতে উঠিলাম। আসিয়া দেখি এক কাণ্ড।

অনুপমা বোধ কবি—আমার কাপড়-চোপড় বাহির করিতে সুটকেসটা খুলিয়াছিল—দেখি এক হাতে আমার একটা ধোপদস্ত ধুতি পাঞ্জাবি ও আর এক হাতে সেই জর্জ্জেট শাড়ীখানা ঝুলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

—খুব ঠকানটা ঠকালে অনিলদা।

কারণ বুঝিয়াও ন্যাকা সাজিলাম—কেন বলো তো? হঠাৎ ঠকালাম কিসে?

—বলা হ'ল—'বিয়ে কবলাম কখন'? সুটকেসে কার শাড়ী বয়ে বেড়াচ্ছো শুনি?...আহা আমি যেন ওঁর বৌয়ের নাম শুনলে হিংসেয় মরে যেতাম!

নিজের জালে ক্রমশঃ নিজেই জড়াইয়া পড়িতেছি, বলি—কী মুস্কিল, নিজের বৌ ছাড়া জগতে আর কারুর একখানা শাড়ী বইবারও আইন নেই নাকি?

—তবে আবার কার? সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

—ধরো যদি তোমারই হয়?

—আহা! জ্যোতিষী ঠাকুর। হাতগুণে আমার জন্যে শাড়ী কিনে আনছিলেন!

—কেন এমন কি হতে পারে না? অজ্ঞাতসারে কে যেন মনের মধ্যে বলে দিলে—'তোর জীবনের একটা পরম লগ্ন আসছে'—

—হয়েছে। কবিত্ব করে কথা বলার অভ্যাসটি ঠিক আছে। বিয়ে করোনি কিনা, তা' নইলে কবে সেরে যেতো।

—কেন, বৌ এসে কি আগেই কাব্যলতার মূলসুদ্ধ উৎপাটন করে ছাড়ে?

—তা' আবার বলতে? ঘর-সংসার আর কবিত্ব একসঙ্গে চলে না। কিন্তু এ কাপড় তুমি কোথায় পেলে বল তো? আমরা তো সারা কলকাতার বাজার চষে ফেলে এরকম একখানা জর্জ্জেট খুঁজে পেলাম না। দু'চারখানা 'অখাদ্য' রঙের আছে কোনো কোনো দোকানে। এরকম কালো বর্ডারের সাদা জর্জ্জেট একখানার সখ আমার অনেক দিনের। তা' পোড়া যুদ্ধের জ্বালায় তো শাড়ীর বাজারে আগুন লেগেছে। ঠিক যে রকমটি খুঁজবে সে রকমটি নেই। কোন্ দোকানে পেলে বল তো অনিলদা?

হাসিয়া কহিলাম—কত আছে। তোমার বর তোমায় যদি বাজে কথা বলে থাকে!

—উহুঁ, আমিও তো কলকাতায় গেলেই দোকানে-বাজারে হানা দিই। এ তোমার বন্ধুর বোনের জন্যে নিয়ে যাচ্ছো বোধ হয়? চমৎকার শাড়ীটা কিন্তু।...বাবা, বন্ধুর বোনটি নেহাৎ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাই, নয়তো সন্দেহ করে বসতাম। খুব বিশিষ্ট বন্ধু নিশ্চয়?

এই সময় ছোকরা একটা চাকর সঙ্গে এন. রায়ের আবির্ভাব।

চাকরটার হাতে বড় ট্রের উপর আহার্য্যের নানাবিধ উপকরণ।

স্বামীকে দেখিয়াই অনুপমা পত্নীত্বের পেটেন্ট সুরে অনুযোগ করিয়া ওঠে—এই দেখ! তোমরা কিছুই পাও না—এই তো অনিলদা বললে, 'কত আছে।' বন্ধুর বোনের বিয়ের উপহার নিয়ে যাচ্ছে। তুমি বললে, 'সারা কলকাতায় তোমার ফরমাসী জিনিস মিললো না।'

মিঃ এন. রায় শাড়ীখানা নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন—তাই তো—ফাইন জিনিসটা। প্রাক্ যুদ্ধকালের কেনা নয় তো মশাই?

—না, এমনি পেয়ে গেলাম একটা।....কিন্তু—বন্ধুর বোনকে তো আরও কিছু দেওয়া চলতে পারে অনু, এ শাড়ীটা তুমিই নাও না?

—ওমা সেকি? ভালো বললাম বলে বুঝি? যাঃ!

লজ্জায় আরক্তিম অনুপমা শাড়ীখানা আমার গায়ের উপর ফেলিয়া দেয়।

কেন যে অমন অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়া বসিলাম—কোন দুষ্ট সরস্বতী যে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল কে জানে।

কিন্তু একবার অমন প্রস্তাবের পব আর পিছানো চলে না।

এন. বাযকে উদ্দেশ কবিযা বলি —আপনার আপত্তি আছে? যদি অনুকে এই সামান্য শাড়ীখানা প্রেজেন্ট করতে চাই?

—আমার আপত্তি? কিছু না, কিছু না। বরং ভবিষ্যতে—সাদা জর্জ্জেট সংগ্রহের দায় থেকে রেহাই পাবো।

—আহা কি কথার শ্রী। নাও এসো খাওয়া-দাওয়া হোক।

অনুপমা অস্বস্তিকর আলোচনাটায় পূর্ণচ্ছেদ টানিতে চায, কিন্তু আমারও ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছে।....তাছাড়া কতকটা চক্ষুলজ্জাও।

—শাড়ীটা তুমি না নিলে ভারী কিন্তু দুঃখিত হবো অনু। ধরো এরকম আকস্মিক দেখা না হয়ে যদি তোমার বাড়ী আসছি জেনে আনতাম—কিছু উপহার আনলে নিতে না?

—সে আলাদা কথা। এ একজনের জন্য নিয়ে যাচ্ছো—না ছিঃ! অনুপমা রীতিমত লজ্জিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু অদ্ভুত মানুষ এই এন. রায়। স্বচ্ছন্দে হাসিতে হাসিতে বলিয়া বসে—আর বেশী চক্ষুলজ্জায় কাজ কি অনু, নিয়েই নাও শাড়ীখানা। পুরনো প্রেমের স্মৃতিরক্ষণ, বা সেতুবন্ধন যে হিসেবেই হোক।

—আঃ! যা মুখে আসে বললেই হ'ল!

বলিয়া অনুপমা খাবার সাজাইতে বসে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শাড়ীখানা লইবার সম্মতি আদায় করিয়া ছাড়ি।

এন. রায়ের স্বভাব-মাধুর্য্যে তাঁহার সামনে যথেষ্ট বেপরোয়া হইলেও একসময় তাঁহার আড়ালেই বলি—শাড়ীখানা তুমি নাও অনু লক্ষ্মীটি, যদি কোনোদিন পরো, আমাকে একবার মনে পড়বে।

—মনে পড়বার জন্যে স্মৃতিচিহ্নর দরকার হয় না—বলিয়া ঈষৎ গম্ভীর ভাবে একবার চলিয়া যায়, কিন্তু মিনিট দুই পরেই আসিয়া বলে—আচ্ছা নিলাম অনিলদা। নইলে তুমি হয়তো ভাববে অনুপমার ভারী দেমাক হয়েছে।

হাস্যে-পরিহাসে, গল্পে-আলাপে সারাদিনটা কোথা দিয়া কাটিয়া গেল কে জানে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যত্ন করিল বিস্তর। আমিও ছেলেমেয়ে দু'টিকে লইয়া বিকালের দিকে বাজারে বেড়াইতে গিয়া খেলনাপাতি কিনিয়া দিলাম বিস্তর।

দেনা-পাওনা লইয়াই তো জগৎ।

রাত্রে অনুপমার সযত্নরচিত শয্যায় শুইয়া প্রথমেই মনে পড়িল—আজকের বিবাহ-বার্ষিকীটা বৃথা গেল।....বীথিকা বলিয়াছিল, জলপথে স্থলপথে আকাশপথে যেমন করিয়াই হোক আজকের তিথিতে তাহার কাছে পৌঁছান চাই।....কিন্তু তেমন তীব্র অনুশোচনা বোধ করিতেছি কই?....

আজকের এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অবস্থাটা—সমস্ত বোধশক্তিকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।....

বীথিকার প্রাপ্য তো কেহ কাড়িয়া লইবে না।

জীবনের একটিমাত্র দিন না হয় আমার বাল্য-প্রণয়িনীর জন্যই উৎসর্গ করিলাম।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ইতি করিতে পারিলেই হয়তো ভালো ছিল। আমার সম্ভ্রম এবং কাহিনীর কবিত্ব উভয় কূলই বজায় থাকিত। কিন্তু পৃথিবীটা মাটিব।

পরদিন যা ঘা খাইলাম সেটাও অপ্রত্যাশিত। বলা বাহুল্য—এ যাত্রায় বীথিকার কাছে যাইতে সাহস খুঁজিয়া পাই নাই—কলিকাতার ফিরতি ট্রেনে চড়িয়া বসিয়াছি....ভিতবে ভিতরে একটা সূক্ষ্ম অপরাধের ভাবে মনটা পীড়িত হইতেছে।....যেন কালকের ঘটনাটা না ঘটিলেই ভালো ছিল।....কোনোপ্রকারে যদি দিনটাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিতাম!

জীবনে আর কখনো অনুপমাব সঙ্গে দেখা না হইলেই বা ক্ষতি ছিল কি?....নিজের হাতে নিজের দুই গালে চুনকালি না লেপিলেই বা ক্ষতি কি ছিল?....

বারো বৎসর ধরিয়া অনুপমা যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিযাছিল, একদিনের খেয়ালে তাহার মৃত্যু ঘটাইয়া আসিয়াছি।

ট্রেনের একঘেয়েমিতে বিরক্তচিত্তে পূর্ব্বদিনের অপঠিত উপন্যাসখানার জন্য সুটকেস খুলিতেই চোখে পড়িল—বীথিকার সেই চিঠি।....সহজে চোখে পড়িবার জন্যই বোধ করি উপরেই রাখিয়াছে অনুপমা।

তাহারই পাশে অনুপমার লিখিত একটুকরো চিঠি।....“জর্জ্জেট শাড়ীখানার ভাঁজের মধ্যে চিঠিটা ছিল অনিলদা, লোভ সামলাতে পারিনি—পড়ে ফেলেছি মাপ কোরো; আর মাপ কোরো আজকের দিনে তোমাকে আটকে রাখাব অপরাধ। তোমার বিয়েতে যদি নেমন্তন্ন করতে নিশ্চয়ই বৌকে একটা উপহার দেবার রাইট আমার থাকতো!....সেই ত্রুটির পূরণস্বরূপ বীথিকাকে একখানা জর্জ্জেট শাড়ী কিনে দিও আমার হয়ে।....রাগ কোরো না যেন।....দুষ্টু অনুপমা।”—চিঠির সঙ্গে পিনে আঁটা একখানি একশত টাকার নোট।

সাদা কথায়—

অনুপমা আমার গালে ঠাস্ করিয়া একটি চড় বসাইয়া দিয়াছে।

[১৩৫২]

বিভ্রাট বাধিল জল লইয়া।

মূল বিভ্রাট কলের জলে বা জলের কলে যেখানেই হোক, প্রতিক্রিয়াটা ঘটিয়াছে ঘরে ঘরে। ভাঙা পাইপ লইয়া কর্পোরেশন জল যোগাইতে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, আর সংসার-প্রপীড়িতা বঙ্গনারীরা জলের অভাবে হিমসিম খাইতে খাইতে মন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন।

ভাড়াটে আর বাড়ীওয়ালায়, উপরতলা ও নীচের তলায়, জায়ে জায়ে আর ননদ-ভাজে সামান্য 'জল জল' করিয়া সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন ভাঙ্গিয়া যাইবার যোগাড়। কে কতক্ষণ স্নানের ঘরে থাকিল, কে কতটা চৌবাচ্চার জল অন্যায় অপচয় করিল, তাহার হিসাব শুনিতে শুনিতে অস্থির কাকচিল ভদ্রপাড়া ছাড়িয়া সুন্দরবনে চলিয়া গিয়াছে।

মাত্র কয় দিনের জলকষ্টে বাড়ির মেয়েরাই রাস্তার "টিপুকল"-বিলাসিনীদের ভাষা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। এই তো আজ সকালেই ছোট কাকীমার সঙ্গে সেজ জ্যাঠামশাইয়ের তুমুল কলহ হইয়া গেল।

অবশ্য পরোক্ষে, কিন্তু প্রত্যক্ষের চাইতে কম সারালো এবং কম জোরালো নয়। জেঠামশাইয়ের মতে জল যখন ভগবানের চাইতেও দুষ্প্রাপ্য, তখন যখন-তখন চৌবাচ্চা ছাড়ার দরকার নাই। কিন্তু শুচিব্যাধিগ্রস্তা কাকীমার পক্ষে সে আদেশ মৃত্যুতুল্য।

"এ্যাড়া বাসি জলে নৈনেত্য" করা আব তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া, একই কথা। কাজেই ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে লড়ালড়ি চলিবে এ আর বিচিত্র কি?

আমি দার্শনিক।

এ-সব তুচ্ছ কথায় কান দেওয়াকে নেহাৎ ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হয়, সংসারের আর সকলকে নিতান্ত শিশু ব্যতীত আব কিছু ভাবিতে পারি না। এদের সকলের চাইতে যে বেশ কিছু উর্দ্ধলোকে আমার বাসা সে কথা অস্বীকার করিয়া অনর্থক বিনয় প্রকাশে লাভ কি?

কাজেই যে কলহের কলকলানিতে বিরক্তচিত্ত দাদা অনাহারে অফিস চলিয়া গেলেন, তার তিক্ততা আমাকে স্পর্শও করিল না। "এই তো মানুষ এই তো সংসার" গোছের একটা "বড়ুয়া মার্কা" হাসি হাসিয়া পূবের জানালার সামনে ইজিচেয়ার টানিয়া দর্শনশাস্ত্র খুলিয়া বসিলাম।

বাড়িতে লোক-সংখ্যা এত বেশী যে গোলমালের সময় আমার উপস্থিতি অনুপস্থিতি বা নীরবতা সরবতা কাহারও মনে রেখাপাত করে না। আমি যে 'কিচ্ছু নয়', এইটাই সাধারণতঃ সকলের মনোভাব।

বই লইয়া বসিয়াছি, পাতা খুলি নাই, চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া ভাবিতেছি...কি ভাবিতেছি কে জানে...বোধ হয় ভাবিতেছি...ইজিচেয়ার না থাকিলে দার্শনিকদের কী গতি হইত!

হঠাৎ একটি তীব্র স্বর কানে আসিল..." আপনারা কি ভাবেন বাড়িওলা হলেই যা খুশী করা যায়?"...দূরাগত বংশীধ্বনি নয়, আমারই কানের কাছে বজ্রধ্বনি।

চোখের ঢাকা খুলিয়া দেখি একটি মেয়ে।

অবশ্য মেয়ে ছাড়া—বাড়ী বহিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিতে আসার সৎসাহস আর কার থাকা সম্ভব? ছেলে তো নয়ই, ছেলের বাপেরই কি আছে?

আমার দার্শনিক মনোবৃত্তিতে অনেক কিছুই 'ইহাই নিয়ম' বলিয়া মানাইয়া লইলেও হঠাৎ যেন এটা একটা নিয়মছাড়া বা খাপছাড়া ব্যাপার মনে হইল। মেয়েটির চেহারা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—শুধু লক্ষ্য করিলাম... তার বিরাট খোলা চুলের রাশি।

স্নানের পরের স্নিগ্ধ আর্দ্র কেশদাম নয়—স্নানের আগের রুক্ষ ধূসর চুলের পাহাড়। মেঘের মত চুল বোধ করি একেই বলা চলে।... কিন্তু এত কথা ভাবিতে এক মুহূর্তের বেশী সময় পাই নাই। পরক্ষণেই আরো একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন..."আপনারা কি চান আমরা উঠে যাই?"

এতক্ষণে বুঝিলাম তিনতলার ভাড়াটেদের মেয়ে।

কতদিন ভাড়া আসিয়াছে, কোন দিন নীচের তলায় নামে কি না, ভাড়াটে ভদ্রলোকের মেয়ে কি নাত্নী, ভাইঝি কি ভাগ্নী, কিছুই জানি না, তবে এইটুকু বুঝিলাম পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই।

দেখিলে মনে না বাখা হয়তো সম্ভব হইত না।

মেঘবরণ চুলেব সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা কুঁচবরণ কন্যা, 'বাব বাব তিন বার' নীতিব অনুসরণে হতাশ ভঙ্গিতে কহিল —"আপনি কি বোবা?"

সম্বিৎ ফিবিয়া পাইয়া ইজিচেযাবেব অলস ভঙ্গি ত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। বলিলাম —"বোবা ছিলাম না—"

"আমার ব্যাভারে বাক্য হবে গেছে—কেমন?"

"অসম্ভব নয়।"

"হুঁ। কিন্তু সকাল থেকে এক ফোঁটা জল না পেলে কী অবস্থা হয জানেন?"

এইখানে বলা আবশ্যক, দোতলা একতলার করুণা ভিন্ন তিনতলাব ভাড়াটেদের জল পাওয়ার দ্বিতীয় পথ নাই।

গম্ভীর ভাবে একটা চেযাব আগাইয়া দিযা কহিলাম—"বসুন।"

"বসে গল্প করতে আসিনি আমি।"

"সে তো পরিষ্কাব বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু গুছিয়ে ঝগড়া করতে হলেও তো কিছুক্ষণ সময়ের দরকার? অনর্থক দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবার—"

"আপনার ধারণা আমি কোমর বেঁধে কোঁদল করতে এসেছি?"

"তবে?"

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুধু এইটুকু বলিতে পারি।

"না, ঝগড়া করা আমার পেশা নয়—শুধু জানতে এসেছি—স্নান করতে পাওয়া যাবে—না এই অবস্থায় কলেজ যেতে হবে? তিনদিন স্নান করতে পাইনি—" বলিয়া সেই কবিরা যাকে 'রুক্ষ আলুলায়িত কেশ' বলেন তাহারই একগোছা তুলিয়া ধরিয়া স্নানাভাবের নমুনা দেখাইল।

গুছাইয়া ভালো ভালো কথা কওয়াব অভ্যাস আমার নাই...বরাবরই কাটখোট্টা তবু উত্তরে যে কথাটি বলিলাম—নিজের কানেই মন্দ লাগিল না।

ও-পক্ষ আবার তীক্ষ্ণ ও তীব্র হইয়া উঠিলেন।

"আমাকে কিসে ভালো দেখায় সে পরামর্শ নিতে আসিনি আপনার কাছে—জলের বিহিত কিছু করবেন কি উঠে যেতে বাধ্য করবেন আমাদের?"

"আমি কোন কিছু করবারই মালিক নই, আপনি ভুল লোকের কাছে এসেছেন। বাড়ীর ভেতর যান, দেখুন যদি কিছু করে উঠতে পারেন। তবে বাড়ীতেই তো এই নিয়ে মারামারি—" বলিতে গিয়া থামিলাম, কাবণ পরচর্চা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

মাথা নাড়ার সঙ্গে মেঘের উপর 'ঢেউ খেলিয়া গেল'।

"পঞ্চাশ জনের কাছে এত্তালা দিয়ে আর্জ্জি পেশ করা আমার কর্ম্ম নয়, এই আজকেও এই অবস্থায় রইলাম, কাল যদি রীতিমত ব্যবস্থা না দেখি—"

কথার শেষটা বোধ করি ভাবা ছিল না—তাই থামিতে দেখিয়া আমি অসমাপ্ত কথাটার পূরণ করিয়া দিলাম—"লাঠালাঠি করবেন—কেমন?"

"দরকার হলে তা'ও করতে বাধ্য হবো—" বলিয়া চুলের ঢাল এবং ছাপা শাড়ীর আঁচল ঝলকাইয়া সবেগে প্রস্থান।

ঘটনাটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

আমার দ্বারা বিহিত করা সম্ভব নয়—এবং চেষ্টা করিবার চেষ্টা মাত্র করিব না তাও জানি, তবু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দর্শনশাস্ত্রে মন বসিল না।...কিন্তু এত দেশ থাকিতে আমাব সঙ্গে ঝগড়া করিতে আসার হেতু কি? উপযুক্ত লোকের তো অভাব নাই বাড়িতে? বড় বৌদির—বা ছোট কাকীমার সঙ্গে লাগিয়া গেলেই তো—

শেষ পর্য্যন্ত যে তথ্য আবিষ্কার করিলাম বা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম—এখন বলিতে চাহি না।

পরদিন।

পূবের জানালার সামনে ইজিচেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, হাতে বই আছে, কিন্তু বইতে চোখ নাই...ভাবিতেছি লাঠালাঠির আবশ্যক হইয়াছে কি না। এমনও হইতে পারে...আরও এক দিনের স্নানাভাবে চুল এবং মেজাজ দুই-ই আরও বেশী রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে...কাজেই কলহ-প্রবৃত্তি আরও প্রবল হওয়া অসম্ভব নয়।

আমি নির্ব্বিরোধী মানুষ, যেখানে এক কথার উপর দুই কথা হয় সেখানে এক সেকেণ্ডের উপর দুই সেকেণ্ড দাঁড়াই না... আমার হঠাৎ লাঠালাঠির ভয় ঘুচিয়া গেল কেন? বরং কোন ধরনের কথায় কি ধরনের উত্তর দিয়া ব্যাপারটা ঘোরালো করা যায় তাই চিন্তা করিতেছি।

নটা...দশটা... সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল, কলের জল নিশ্চয় ছুটি লইয়াছে, অতএব আজ আর আশা নাই। দর্শনশাস্ত্রে মন বসিল না...ভাবিলাম ফুটপাতে পায়চারী করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।

দশটা পঁয়তাল্লিশ...'এলোচুল' ওদিকের সিঁড়ি দিয়া সটান নামিয়া আসিলেন। প্রায় পথ হইতেই তিনতলার আলাদা সিঁড়ি। আজ অবশ্য 'এলোচুল' এলো নয়, প্রকাণ্ড একটি মসৃণ কবরী।

কেন জানি না—বোধ করি হাড় জ্বালাইতেই বলিয়া উঠিলাম—"এই যে—স্নান করতে পেরেছেন দেখছি?"

হাতের খাতা দুইখানি বাগাইয়া ধরিয়া পেন্সিলের তলায় একটি তীক্ষ্ণ দংশনের সঙ্গে জ্বলন্ত প্রশ্ন—"লজ্জা করে না?"

"কই করছে না তো—আর কেনই বা করবে?"

"গঙ্গা-স্নান করে এসেছি আজ, জানেন?"

"জানতাম না, জেনে সুখী হ'লাম। মেজাজ, মাথা এবং হিন্দুয়ানী সব দিক বজায় থাকলো।"

ক্রুদ্ধ কটাক্ষের সঙ্গে গট্ গট্ করিয়া প্রস্থান।

কয়েক দিন কাটিয়াছে।

কলের জল বা জলের কল আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। চৌবাচ্চায় জলের অভাব নাই। জায়ে-জায়ে ননদ-ভাজে শাশুড়ী-বৌয়ে ব্যবহারের সমতা ফিরিয়াছে, কাকেরা সুন্দরবন হইতে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, কাজেই আশা করা যায় সেই কেশের রাশি বাসি থাকিতেছে না। কিন্তু? আরো দু'-চার দিন কর্পোরেশনের অক্ষমতা প্রমাণ হইলে ক্ষতি কি ছিল?

নূতন আর কি সুযোগ মিলিতে পারে?

পূবের জানালার সামনে বসিয়া বসিয়া হায়রাণ হইয়া পড়িয়াছি।

এক আছে ফুটপাথ। কিন্তু ঠিক দশটা পঁয়তাল্লিশে বৃষ্টি আসিলে?

গত তিন দিন একই সময়ে বৃষ্টি আসিতেছে।

দার্শনিকের শেষ আশ্রয় ইজিচেয়ারে পড়িয়া থাকা ভিন্ন সারা সকালটা কি কবিতে পারি? বেলা একটার আগে ক্লাস নাই যে।

আজ বৃষ্টি নাই, রোদও নাই, বাতাস আছে প্রচুর এবং আলোরও অপ্রাচুর্য্য নাই, এ রকম একটি দিন দৈব ঘটনার মত। এমন সুন্দব সকালটা ঠিক কি করা উচিত নির্ণয় করিতে পারিতেছি না—অথচ মনের মধ্যে কি যেন একটা অব্যক্ত বাসনা গুণ-গুণ করিয়া ফিরিতেছে...এমনি চমৎকার একটি মাহেন্দ্রক্ষণে হঠাৎ মা আসিয়া আমার দুর্ভেদ্য দুর্গে হানা দিলেন।...বোধ করি কথাগুলি ভাঁজিযা আসিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিরস্কারের সুব..."হ্যাঁ রে, তোব তো সারা সকাল সময থাকে, এক দিন বাজারটা করে দিতে পারিস না?"

এ রকম আকস্মিক আক্রমণের জন্য অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম না—কিন্তু দীর্ঘদিনের সাধনায অপ্রস্তুত হওয়াটা ছাড়িযাছি। অভ্যস্ত অবহেলাব ভঙ্গিতেই উত্তব দিই..."না পারবাব কি আছে? বাজার কবাটা কী এমন শক্ত কাজ?"

"তবে করিস না যে?"

"দরকার মনে করি না—ও বকম বাজে কাজ করবার লোকের অভাব নেই বাড়ীতে।"

মা বিস্মય প্রকাশের চবম নিদর্শনস্বরূপ গালে হাত দিয়া কহিলেন—"বাজাব কবাটা বাজে কাজ হল? তা'হলে আসল কাজটা কী, তোব এই ইজিচেয়ারে পড়ে থাকা?"

মাকে অনেকদিন রাগানো হয নাই...হঠাৎ উঠিযা পড়িলাম, মাব দুই কাঁধ ধরিযা ইজিচেয়াবে বসাইয়া দিয়া বলিলাম—"চুপ করে বসে বসে আত্মচিন্তা করো দিকিন, দেখবে এর চেয়ে দরকারি কাজ আর নেই।"

বলা বাহুল্য, মা এক মিনিটও বসিলেন না, ছেলেমানুষের মত তিড়বিড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সক্ষোভে কহিলেন—"পোড়া কপাল! আমি নইলে আর আত্মচিন্তা করবে কে? বলে—'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল', কিন্তু তুই বাবা ধন্যি ছেলে! এই বাড়ীসুদ্ধ লোক সকাল বেলা কাজের জ্বালায় চোখে-কানে দেখতে পাচ্ছে না আর তুই অম্লান বদনে বসে আছিস?"

গম্ভীর ভাবে কহিলাম—"ছেলেদের ম্লান মুখ দেখলেই মায়েদের বুক ফাটে জানি, আমার ভাগ্যে সবই উল্টো! যাক্। কিন্তু বাড়ীসুদ্ধ লোকই যখন চোখে-কানে দেখতে পাচ্ছে না—তখন একজনেরও চোখ-কান খোলা থাকা দরকার নয় কি?"

"তোমার সঙ্গে কে কথায পারবে বাছা? আচ্ছা যাই বলিস, এই যে সংসারে কুটোটুকু ভেঙে উপকার করিস না, তোব লজ্জা করে না?"

নেতি-সূচক মাথা নাড়িলাম।

"আশ্চয্যি! বড় বৌমা বলে মিথ্যে নয়—বিদ্যে-বুদ্ধি হলে কি হবে আক্কেল চরিত কিছু হ'ল না।"

হাসিয়া বলিলাম—"তাই বল, বড় বৌমার জবানী এ সব? নইলে মা হঠাৎ এলেন—আমার ভেতর আক্কেল খুঁজতে—"

"কেন, তুই কি চিরদিন খোকা থাকবি? এই যে তোর দাদার এক ঘণ্টা আগে আপিস হয়েছে—তোর জ্যাঠামশাইয়ের বাত চেগেছে, ছোটকাকার দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, গোপলার জ্বর, কে করে বাজার?"

"অগত্যা আমাকেই কবতে হয়। তোমাদের সংসার-রঙ্গমঞ্চে যে এ রকম বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হচ্ছে তা তো জানতাম না।"

"তোর সব কথাতেই রঙ্গ! যাবি তো বড বৌমার কাছে শুনে যা ভালো করে, কি কি আসবে—"

"ও-সব শোনাশুনির মধ্যে আমি নেই—বাজারে যা ভালো ভালো দেখবো—সব নিয়ে আসবো"—বলিযা বাজারের থলি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম।

"কোথায় আছে" "কোথায় গেল" শব্দ আমার দু'চক্ষের বিষ, বাড়ীর মধ্যে যা আছে তা আছেই।

"ওই জন্যেই তো তোকে বলি না কিছু, 'যা হয় তা হয়' আনলে বড বৌমা রেগে সংসার মাথায় করবে।"

"সংসারটা তো তিনি মাথায় করেই রেখেছেন—এ আর নতুন কথা কি!"

বলিয়া চটি জোড়াটা পায়ে গলাইতে গলাইতে পথে বাহির হইলাম।

বলা বাহুল্য এটি বড় বৌদির নিজস্ব মত।...যাক্। কি করি—বা কিছু করি গোছ মনোভাবই তো ছিল...না হয় এই সুন্দর সকালটাকে হত্যা করার ভারই নিলাম। বাছিয়া বাছিয়া দরদস্তর করিয়া... ওজন দেখিয়া শাক মাছ কেনা কি সময়কে হত্যা করা নয়?

বাজার করা—মানে আহার্য্য বস্তুর সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানো আমার ধাতে সয় না।

"তেলের অভাবে রান্না চড়িতেছে না"—অথবা "কয়লার অভাবে উনানে আগুন পড়িতেছে না"—এ হেন মর্ম্মান্তিক ব্যাপার লইয়া আমার কানের কাছে ঢাক পিটাইলেও ইজিচেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার কল্পনাও করি না!

জানি এক বেলা অন্নাভাবে মানুষ মরে না, তাছাড়া নিশ্চিত জানি আমি না করিলেও কাজটা ঠিকই হইয়া যাইবে, আবো ভালো ভাবেই হইবে! তবে কেন আর 'ঝুটমুট' নিজের শক্তির অপচয় করি?

বৌদি অবশ্য বলেন —"পাতের গোড়ায় বাড়া ভাত পেলে সকলেই অমন 'সিদ্ধ পুরুষ' বনিয়া থাকিতে পারে।" তা' বৌদি কাকে কি না বলেন?

কিন্তু পথে নামিয়াই যে প্রিণ্টেড শাড়ী ও "পেল্লায় খোঁপা"র দর্শন পাইব এ কথা কি দর্শনশাস্ত্রে লেখা ছিল?...বাজারের থলি হাতে পথে দাঁড়াইয়া গল্প করিবার মত অভদ্র ইচ্ছা আমার না থাকিলেও প্রিণ্টেড শাড়ী নাছোড়বান্দা।

"বাজার যাচ্ছেন বুঝি?"

ফিরিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন উপায় কি? গম্ভীর ভাবে প্রতিপ্রশ্ন করিলাম—"দেখে কি মনে হচ্ছে নেমন্তন্ন যাচ্ছি?"

"দেখে তো মনে হচ্ছে ফ্রন্টে যাচ্ছেন, মনিষ্যিকে মনিষ্যি বলে গ্রাহ্যই নেই!"

"মনুষ্য কি না সেটা বিবেচনা করা দরকার?"

"তার মানে? বলতে চান কি? নিজেকে ছাড়া সকলকেই অমানুষ মনে করেন বুঝি?"

"ঠিক তাই বা বলি কি করে—তবে—"

"থাক হয়েছে—দয়া করে মানুষ মনে না করলেও কিছু এসে যাবে না। সরুন, কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে আমার। যান প্রাণভরে কুমড়ো কাঁচকলা কিনুন গে।"

একবার ভাবিলাম বলি—ভদ্রে! কলেজের অহংকারে মটমট করিবার হেতু কি? কলেজে তো আমিও নিত্যই যাই—তবে পড়িতে নয় পড়াইতে। কিন্তু ছিঃ, আমি যা তা' তো আছিই, অপরে আমাকে বাজারের থলিবাহক মাত্র ভাবিলে ক্ষতি কি?

"ইস্, গট্ গট্ করে চলেই যাচ্ছেন! আসল কথাটা বলা হ'ল না—আমরা উঠে যাচ্ছি, বুঝলেন? টালিগঞ্জে বাড়ী দেখা হয়েছে আমাদের।"

"এই-ই আপনার আসল কথা? কিন্তু এতে বেশী বিচলিত হবার কি আছে? বাড়ী তো আজকাল পড়তে পায় না, খালি হতে যা দেরী।"

"উঃ, অহংকারে একেবারে—"

মুখ ঘুরাইয়া সবেগে প্রস্থান।

অহংকারের কথা অস্বীকার করি না। তবে মনে হইল, আর একটু পরে চটাইলে মন্দ হইত না।

ইতিমধ্যে সংসারে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে ছোট কাকীমার সানুনাসিক আক্ষেপ, অথবা বড় বৌদির তর্জ্জন-গর্জ্জন কানে আসে। সেজ জেঠামশাই মাঝে মাঝে আমার এলাকায় আসিয়া সংসার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ করিতে থাকেন, আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন, এবং অবশেষে হতাশ চিত্তে—"আমাকে বলা ও দেওয়ালকে বলায় যে কোনো প্রভেদ নাই" এই খবরটি জানাইয়া চলিয়া যান।

মোটের মাথায় সংসার-চক্র একই পথে চলিতেছে, ভিতরে ভিতরে কোনো চক্রান্ত হওয়া সম্ভব এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

খাইতে বসিয়াছি—দাদা আর আমি।

মা পাখা হাতে বাতাসের ছুতায় কাছে বসিয়া এটা-সেটা কথার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"তিনতলার গিন্নির সখ দেখেছিস?"

দেখি নাই অবশ্য, দাদাও না, আমিও না। কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ দার্শনিকের ধর্ম্ম নয়, তাই নীরবে আহার করিয়া যাই। শুনিলাম দাদা বলিতেছেন—"কেন কি হ'ল হঠাৎ? ছিটের শাড়ী, না পাউডার?"

"দূর ক্ষ্যাপা ছেলে, সে সখ নয়। সখ হচ্ছে—ওঁর ওই ধিঙ্গি নাতনীটিকে আমার বৌ করতে হবে।"

দাদা চকিত হইয়া বলিলেন—"কেন, তোমার বৌকে কি—"

"হয়েছে। কি শুনিতে কি শুনিস? বিয়ের যুগ্যি ছেলে আমার আর নেই নাকি? খোকার বৌ করতে চান।"

"ও, খোকা!" দাদা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন—"সন্নিসি ঠাকুরকে জামাই করার সখ হল

হঠাৎ?"

"সখ আবার হবে না কেন— ছেলে কি আমার ফেলনা? কিন্তু আমি বাপু ও-মেয়েকে বৌ করছি না। যেমনি বাচাল, তেমনি ধিঙ্গি, তেমনি দজ্জাল!"

মাছের মুড়াটাকে অনেক কসবতে কায়দা করিয়া দাদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বেশ খানিকক্ষণ পরে বলেন—"কিন্তু মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়, বেশ ফর্সা আছে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ ফর্সা খুব—তবে ওই যা বললাম।"

মায়ের বেশ যেন অনমনীয় মনোভাব।

আমাকে কেউ প্রশ্ন করিল না, আমিও কাহাকে কিছু প্রশ্ন করিলাম না। কিন্তু মা যে আমাব বুদ্ধির উপরও টেক্কা মাবিলেন—তা' কে জানিত?

জানিলাম পরে।

কলেজের জন্য প্রস্তুত হইতেছি—হঠাৎ আসিয়া বিনা গৌরচন্দ্রিকায় বলিলেন—"দেখ খোকা, ওরা কিছুতেই ছাড়ছে না, আমি বাপু মত দিয়েছি।"

বলিলাম— "রোসো মা, যুদ্ধের আবহাওয়ায় তুমিও মিলিটারি হয়ে উঠো না। প্রথমতঃ কথা হচ্ছে—'ওরা' কারা? দ্বিতীয় কথা—কী ছাড়ছে না? তৃতীয়—কিসের মত? তার পরে বাকিটা বোঝা যাবে।"

"আহা খোকা তো খোকা! মরে যাই"—পিছনে বড় বৌদিদি ছিলেন জানিতাম না। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন—"বোঝো না কিছু, ন্যাকা! 'ওরা হচ্ছে তিনতলার ভাড়াটেরা, 'ছাড়ছে না' তোমায় জামাই করার ইচ্ছে, আর মা মত দিয়েছেন বিয়ের—হ'ল? বাকীটা বুঝেছো?"

"না। কারণ ইচ্ছেটা ওদেব একচেটে সম্পত্তি নয়। অপর পক্ষেরও ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকতে পারে।"

"তা তোর তো বাপু অনিচ্ছে নেই?" মা মনোভাব ব্যক্ত করেন।

"কি করে বুঝলে?"

"এই তো সেদিন বললাম তোদের দুই ভায়ের সামনে—কই কিছু আপত্তি করলি না তো?"

"আমার মতামত চেয়েছিলে?"

"তা চাইনি বটে—"

"তবে? খামোকা ওপর-পড়া হয়ে আপত্তি করতে যাবার মানে হয় কিছু? কববো কেন?"

"মা ভেবেছিলেন মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।"

বললাম—"থাক্ বৌদি, তোমার বাংলাতেই রক্ষে নেই, দেবভাষা নিয়ে টানাটানি আর নাই কবলে?...কিন্তু মা, আমার যেন মনে হচ্ছে—আপত্তিটা তোমার দিক থেকে বেশ জোরালো ছিল?"

"তা সে যখন ছিল, ছিল। এখন ওরা খুব ধরাধরি করছে! তা ছাড়া মেয়ে দেখতে খাসা। একটু বেহায়া—তা আর—"

"আর একটু বাচাল।" আমি যোগ করি।

"আজকালকার মেয়েরা সবই ওই—কি করবো?"

"তা ছাড়া—সাংঘাতিক দজ্জাল।"

"ও সব শ্বশুর-ঘর করতে এলে ভালো হয়ে যাবে।"

"যেমন হয়েছে"—বলিয়া বড় বৌদির প্রতি একটি নিরীহ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলাম।

বৌদির রাগ করিয়া প্রস্থান।

মা বলিলেন—"তা'হলে ওই কথা থাকলো— ওদের বলছি তোর মত আছে।"

বললাম—"ক্ষেপেছ তুমি? বিয়ে করবো কি বল? সরো তো লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কলেজের বেলা হয়ে গেল।" বলিয়া স্তম্ভিত, ইতিকর্ত্তব্যজ্ঞানরহিত মাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

'বিবাহ' এবং 'আমি' দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিসকে কোন দিন একত্রে ভাবিতেই চেষ্টা করি নাই—কাজেই মার কথাটা ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া কিছু মাথায় আসিল না।

অথচ ক্রমশঃই ভাবিয়া দেখিতেছি, মেয়েটাকে জব্দ করা দরকার। রীতিমত দরকার। তিনতলার ছাদ হইতে পথচারী ভদ্রলোকের মাথায় গ্লাসের জল ঢালিয়া দেওয়ার মত ব্যাপার শুনিয়াছেন কখনো?

পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবির অদৃষ্টে প্রায়শঃই এরূপ ঘটিতে থাকিলে দার্শনিক মহাপুরুষেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া অসম্ভব নয়। কেবল মাত্র "বড়ুয়া মার্কা" হসি হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়া যাওয়া চলে না।

শুধুই কি জল?

কাগজের টুকরা নয়? সাদা কাগজ নয়...লেখা কাগজই...ওঃ ভারী অহংকার! কিছুতেই দৃকপাত নেই?...

মাকে আসিয়া বলিলাম—"মা, সত্যিই যদি গ্যারান্টি দিতে পারো দজ্জাল মেয়ে সায়েস্তা করতে পারবে, তবে আমার—"

মা মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"তোর আপত্তির ভয়ে হাত পা গুটিয়ে বসেছিলাম কি না। অর্দ্ধেক বাজার হয়ে গেছে বিয়ের।"

আরো কয়েক দিন পরে। দিনে নয় রাত্রে।

দরজা জানালার ছিটকিনিগুলো ভালো ভাবে আটকাইয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। বিছানার অপরাংশ জুড়িয়া সেই ফাজিল-কেষ্ট মেয়েটা। বলিলাম—"তোমায় কেন বিয়ে করেছি জানো? জব্দ করতে।"

ঘোমটার ভিতর হইতে তীব্র প্রতিবাদ —"বিয়ে তুমি আমায় করোনি... আমিই তোমায় করেছি। কেন করেছি জানো?...বাজী জিততে।"

"বাজী?"

"হ্যাঁ! তোমার ভাইঝি ইলু বেট্ ফেলেছিল —'কাকা ককখনো বিয়ে করবে না। কাকার পছন্দসই মেয়েই নেই পৃথিবীতে'—আমিও বেট্ ফেললাম—ইচ্ছে করলে আমিই বিয়ে করতে পারি—অনায়াসে। দেখলে তো পারলাম কি না?"

"সে তো—আমি নেহাৎ 'জীবে দয়া' হিসাবে করলাম তাই। দেখলাম আমাকে বিয়ে করার জন্যে হেদিয়ে মরছিলে।"

"তার মানে?"

"মানে স্পষ্ট। নইলে এত দেশ থাকতে— বা দেশে এত লোক থাকতে—কলের জল নিয়ে কোঁদল করতে আসার লোক পেলে না আর?" [১৩৫২]

দুপুর রোদে

ছুটির দরখাস্তখানা বড়সাহেবের টেবিলে রাখিয়া বাড়ি আসিয়া সুটকেস গুছাইতে বসিলাম।

বেণু লিখিয়াছে—'বিয়ে-টিয়ে করবার মতলব আছে কি নেই সোজাসুজি খুলে বলো দিকিন, না থাকে বয়ে গেল। মনে কোরো না, অভিমানে মূর্ছা যাবো। আশেপাশে এখনও এমন অনেক অ্যাড্‌মায়ারার আছে যে, শ্রীমতী বেণুর কৃপাকটাক্ষ পেলে ধন্য হয়ে যায়।

সময় থাকতে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে হবে তো আমাকে? মোটকথা বুড়ি আইবুড়ি হয়ে থাকবার বাসনা আমার নেই। তুমি ওখানে বসে বসে গ্রেড বাড়াবার জন্যে জীবনপাত করতে থাকবে—আর আমি এখানে শুকনো পুঁথির পাতা নিয়ে রিসার্চ করতে করতে জীবন মাটি করবো এর কোনো মানে হয়?'

এমন চিঠির পর স্থির থাকা শক্ত।

লাইনের ফাঁকে ফাঁকে বেণুর অভিমান-স্ফুরিত মুখখানি যেন ঝিলিক মারিয়া উঠিতেছে।

এ কথা মিথ্যা নয়, ছুটি পাইলেই কলিকাতায় ছুটি বেণুর খাতিরেই, ফিরিয়া আসিবার সময় সাধু ভাষায় যাহাকে বিরহযন্ত্রণা বলে সেটাও দস্তরমত টের পাই, কিন্তু বিবাহ করিবার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা যেন কিছুতেই মিলিয়া ওঠে না।

সত্য কথা গোপন না করিলে বলিতে হয়, সাহসেরও অভাব।

বারে বারে হিসাব করিয়াও আশঙ্কা আর কাটিতে চায় না। বেশ ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা—প্রেম করিবার দুঃসাহস না থাক, বিবাহ করিবার সৎসাহস তাঁহাদের ছিল। এবং সেই চিরজীবনের জীবন-সঙ্গিনীকে চাক্ষুষ দেখিয়া লইবারও প্রয়োজন বোধ করিতেন না। উত্তরপুরুষদের চাইতে বুকের পাটা যে তাঁহাদের বহুল পরিমাণে ছিল—সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু না, সাহস সঞ্চয় করিতেই হইবে! এমন স্পষ্ট দাবীকে অগ্রাহ্য করিব কোন্ সাহসে?

অন্য অন্য বারে অবশ্য সোজা বেণুদের বাড়ি গিয়াই হানা দিই, কিন্তু এবারে স্থির করিলাম অন্যত্র উঠিব। হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা কথা বাঙ্লা ভাষায় চলিত আছে তো!

অগত্যা পিসিমার বাড়ি।

ছেলেবেলায় পিসিমার বাড়িটাই একরকম ঘরবাড়ি ছিল, এখন আর যাওয়া-আসা তেমন নাই। নাই একরকম নিজেরই দোষে। হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি প্রবোধদা'র অফিস, কলিকাতায় যাইতে আসিতে ওই অফিস হইতেই তত্ত্বার্তাটা সারিয়া লই।

আজও স্টেশনে নামিয়া ভাবিলাম—অফিসটা ঘুরিয়া যাই, অনেকদিন খোঁজখবর জানা নাই। খানিকটা যাইতেই দেখি পরেশবাবু টিফিন করিতে বাহির হইয়াছেন, প্রবোধদা'র এক টেবিলেই বসেন—মুখ চেনা ছিল। ডাকিয়া প্রশ্ন করিলাম—একা যে? প্রবোধদা' বেরোন নি?

পরেশবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—কে, সোমেনবাবু নাকি? আপনার প্রবোধদা' তো আসছেন না—ছুটিতে রয়েছেন যে! আমারই হয়েছে মৃত্যু। সায়েব ব্যাটা হচ্ছে তেমনি রগচটা, একটু উনিশবিশ হলেই সর্বনাশ, আমি মশাই একা ক'দিক সামলাই?

দাঁড়াইয়া শুনিলে যে পরেশবাবু টিফিন খাওয়া ভুলিয়া সায়েবের আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে সুরু করিয়া সপিণ্ডকরণ পর্যন্ত সারিবেন এ অভিজ্ঞতা কিছু কিছু ছিল, কাজেই ব্যস্ততার ভান করিয়া বলি—তাই তো বিশেষ দরকার ছিল তাঁর সঙ্গে, বাড়িতে যেতে হচ্ছে তবে। কিন্তু ছুটিতে কেন বলুন

তো, অসুখ-বিসুখ নাকি?

—না মশাই অসুখ-বিসুখ নয়, বছরে টু উইকস্ ক'রে ছুটি পাওনা হয় আমাদের, তা সে ভদ্রলোক যদি জন্মেও নেবেন? এর জন্যে আমরা কত সময় 'ইয়ে' করেছি ওঁকে, এবারে বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়ে কি মন হ'ল নিয়ে ফেললেন ছুটিটা। তা বাইরে কোথাও যান নি বোধ হয়, বাড়িতেই পাবেন, যান।

কিন্তু বাড়িতে পাইলাম না।

দুপুর রৌদ্রে গলদঘর্ম অবস্থায় মোটঘাট সমেত আমার এরকম নাটকীয় আবির্ভাবে যতটা না বিস্মিত হইলেন বৌদি, তাব চতুর্গুণ হইলেন প্রবোধদা'ব ছুটিব খবরে।

অবিশ্বাসেব হাসি হাসিয়া কহিলেন—কি যে বল সোমেন, কাব অফিসে যেতে কাব অফিসে উঠেছিলে হযতো! ছুটি নেবেন তোমাব দাদা? তা হলেই হয়েছে! যেমন চমৎকার অফিস...বৌ মবে গেলে ছুটি দেয় না ওবা!

কিন্তু আমি-ই বা বিশ্বাস কবিব কেন? প্রবল আপত্তি তুলি—আমায় কি পাগল পেলেন? প্রবোধদা'ব অফিস ভুলে যাবো? সেদিনও এসেছিলাম...আচ্ছা পবেশবাবুব নাম শুনেছেন?

—খুব। এক টেবিলেই কাজ কবে যে- -

—তবে? ভদ্রলোক নিজে বললেন—প্রবোধদা' দু'সপ্তাহ ছুটিতে বয়েছেন। তিনি একেবাবে কাজ নিয়ে বেসামাল হযে যাচ্ছেন।

—নির্ঘাত ধাপ্পা দিযেছে তোমায, ভেতরে ঢোক নি তো?

ঢুকি নাই সত্য। কিন্তু পবেশবাবুব মত একজন সামান্য পবিচিত ব্যক্তি অসামান্য পবিহাস করিয়া বসিবেন কোন্ হিসাবে তাহাবও কোনো সদ্যুক্তি খুঁজিযা পাই না।

বৌদিকে বুঝাইতেও পাবি না—তিনি একই ভাবে হাসিযা বলেন—ছুটি যদি, তো আছেন কোথায়? সত্যি তো আর পাগল নয় যে বাস্তায রাস্তায ঘুবে বেড়াবেন? সেই তো পৌনে ন'টায় ভাত দুটো মুখে দিযেই ছুটেছেন। ওই ছুটির জন্যে বলে—গত বছর সে কী মর্মান্তিক ব্যাপার—

—তার মানে?

বৌদি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবাব সিঁড়িব ধাপে বসিযা পড়িয়া বলেন—তা হলে শোনো বলি—একঘেয়ে সংসার কবতে করতে তো ভাই পচে গেছি, কোথাও এক পা বেরোনো নেই, বাবা মাবা গিয়ে পর্যন্ত বাপেব বাড়ি যাওয়াও ঘুচে গেছে, থেকে থেকে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয় কোথাও গিযে একটু হাঁফ ফেলে আসি। ভেবে চিন্তে ধরলাম তোমার দাদাকে—চল একটু পুরী যাই দু'জনে একলা। হাসছো যে, দু'জনে একলা হয় না? —সত্যি, সংসারের ঝামেলা ঘাড়ে কবেই যদি যাবো তো কলকাতা কি দোষ করলো? চব্বিশ ঘণ্টাই তো তোমার দাদার সঙ্গে চলেছে আজকাল—

বাধা দিয়া বলিলাম—ঝগড়া চলছে আপনাদের? চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবো না, বোধ করি সখের ঝগড়া!

—সখের? ওই আনন্দেই থাকো। রীতিমত দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ, বুঝলে? যাক গে, শুনে আসছি বরাবর—সমুদ্রের হাওয়ায় যেমন ফুটো ফুসফুস রিপু হয়, তেমনি ঝাঁঝরা প্রেম ঝালাই হয়, তাই পুরীর বায়নাই নিলাম। এদিকে পাঁচজনের কাছে বলতে হয়—'জগন্নাথ টেনেছেন'। নইলে মান থাকে না। একলা বেড়াতে যাবো বললে তো ফাঁসির হুকুম!

...জগন্নাথও টেনেছেন আমারও ট্রাঙ্ক সুটকেস সব গোছানো। ছেলেমানুষের মতন আহ্লাদে রাত্রে ঘুম নেই, দিনরাত সমুদ্রের স্বপ্ন দেখছি; হঠাৎ যাওয়ার আগের দিন ঘ্যাঁচ ক'রে বলে বসলেন—ছুটি পাওয়া গেল না, বড়সাহেব রাঁচি না কোন্ চুলোয় যাচ্ছে।...বোঝো ব্যাপার! মনে হ'ল গলায় দড়ি দিয়ে আফিঙ্ খাই।... সে মানুষ নাকি দু'সপ্তাহের ছুটি পেয়েছেন, হুঁ! তাও আবার আমি জানি না!

গল্প লেখার বাতিক আছে—যেখান-সেখান হইতে প্লট যোগাড় করি, হঠাৎ মনে হইল রহস্যের আবরণে ঢাকা যে প্রচ্ছন্ন বেদনার কাহিনীটুকু এইমাত্র শুনিলাম তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক করুণ ছন্দের গল্প লেখা যায়।

কিন্তু থাক গল্প, পরে লিখিলেও চলিবে, সোজাসুজি বোকা বনিয়া থাকা চলে না। বিচিত্র নয়—যে প্রবোধদা' 'ঘর পর' উভয়কে লুকাইয়া নূতন কোথাও চাকরির উমেদারী করিতেছেন, হঠাৎ একদিন পাঁচ-সাত শো টাকার পোস্টে বসিয়া তাক্ লাগাইয়া দিবেন সকলকে।

সেই সন্দেহই ব্যক্ত করি।

বলা বাহুল্য—বৌদি উক্ত আকাশ-কুসুমে লেশমাত্র আস্থা স্থাপন করিলেন না, উপরন্তু আমাকে ঘোলের সরবৎ খাইবার অনুরোধ করিলেন। অর্থাৎ রোদে ঘুরিয়া মাথা গরম হইয়া যাওয়া নাকি অসম্ভব নয়, অগত্যা প্রতিকারার্থে ঘোল!

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—কিন্তু অসময়ে পাবেন কোথায়?

—মজুত রাখতে হয়, নইলে তোমাদের 'ঘোল' করবো কি ক'রে? বলিয়া বৌদি বেশ সশব্দেই হাসিয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গেই উপর হইতে পিসিমার কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিল, নিচে কে এসেছে বৌমা? কার যেন গলা পেলাম?

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই বৌদি ঠোঁটে আঙুল ঠেকাইয়া নির্বাক থাকিবার ইঙ্গিত করিলেন। অবাক হইবার মত কথা—কিন্তু বেশি হই না, কারণ দীর্ঘদিন পরে দেখা হইলেও বৌদির পূর্বকালের কৌতুকপ্রিয়তার কথা বিস্মৃত হই নাই।

মিনিটখানেক পরেই পিসিমার আরো অধীর স্বর শোনা যায়—বৌমা, হঠাৎ চুপ ক'রে গেলে যে? বলি এই এতক্ষণ তো বেশ দিব্যি হাসাহাসি চলছিল।

ভাবিলাম এইবার বোধ হয় হাসিয়া ফেলিবেন বৌদি, কিন্তু ঘটনাটা ঘটিল অন্যরূপ, গলার সুরে কৌতুকের লেশমাত্র নাই, তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, আপনি তো ঘুমোচ্ছিলেন—হাসাহাসি শুনলেন কখন?

—ঘুমোচ্ছিলাম বই তো মরে থাকিনি বাছা? বেতো মানুষ পা নিয়ে নড়তে পারি নে, তাই সাপের পাঁচ পা দেখেছো বটে? ব্যাটাছেলের গলা আমি শুনেছি –

রহস্যের গতি যে এমন জঘন্য মোড় লইবে—এমন কল্পনা স্বপ্নেও করি নাই, অপ্রতিভভাবে উঠিতে চেষ্টা করি—কিন্তু উঠিতে পারি না। বৌদি আমাকে আরো অবাক করিয়া দিয়া গম্ভীরভাবে হাত ধরিয়া সিঁড়িতে বসাইয়া দিয়া বলিয়া ওঠেন—থাকো চুপ ক'রে, দেখি কত চেঁচাতে পারেন!

—কিন্তু লাভ কি এতে?

—লাভ আবার কি? বরং লোকসান।

—তবে?

—কিছু না। খুশি আমার, বাতের ব্যথায় নড়তে পারেন না তাই সর্বদাই সন্দেহ—ওঁর অসাক্ষাতে কখন কি ক'রে ফেলছি। বাড়িতে কেউ এলে দু'দণ্ড কথা কইবার জো নেই, অমনি

ডাকাডাকি। ছিলই বাতিক, পঙ্গু হয়ে পর্যন্ত বেড়েছে। দুঃখের কথা ব'লবো কি—মেয়েদুটো বড় হয়ে অবধি তাদেরও শান্তি নেই, যেন মেয়েমানুষ মাত্রেই খারাপ হ'বার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে—যেন খারাপ হবার ইচ্ছে থাকলে কেউ কাউকে শাসনের জোরে আটকাতে পারে!

ছেলেবেলায় পিসিমার কাছে আদর খাইয়াছি, আবদার করিয়াছি, স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিখানিই স্মরণে ছিল, একই ব্যক্তি একের কাছে অমৃত ও অন্যের কাছে গরল হয় কেমন করিয়া কে জানে?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাথার দোষ ঘটে নাই তো?

সন্দেহ প্রকাশ করিবামাত্র বৌদি যেভাবে অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইলেন, সেটা কেবলমাত্র মেয়েমানুষের পক্ষেই সম্ভব! নিতান্ত সাধারণ মেয়েমানুষ, যাহারা কথায় কথায় ছড়া কাটিতে পারে, অন্যের উপর আক্রোশ করিয়া ছেলে ঠ্যাঙায়, ঠ্যাং ছড়াইয়া বসিয়া এক কাঁসি সজিনাখাড়ার সঙ্গে পতিদেবতার মস্তকটি চর্বণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না।....কিন্তু বৌদি কি ইহাদের একজন মাত্র?

এমন একটা সময় ছিল যখন এই বৌদিই ছিলেন প্রায় আমার আদর্শ। সেই সঙ্গীত বিভোর রবীন্দ্র-পাগল তরুণীটি হারাইয়া গেল কোথায়?

বিশ বছর আগে পূর্বরাগেব চলন বেশি ছিল না—থাকিলেও স্কুলের ছাত্রীর উর্ধ্বে আর উঠিত না, কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে যে তাহারা পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের চাইতে কিছু কম ওস্তাদ ছিল, এমন মনে করিবাব হেতু নাই।

স্কুলেব ছাত্রী হইয়াও বৌদি কেমন কবিযা টিফিনের সময় স্কুল পলাইয়া হেদোর মাঠে আসিয়া হাজির হইতেন, এবং প্রবোধদা' কলেজে প্রক্সি ঠেকাইয়া আসিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা রৌদ্রদগ্ধ লোহার বেঞ্চে বসিয়া সেই অমূল্য সময়টুকুব প্রতীক্ষা করিতেন, সে খবব আর কাহারও জানা না থাকিলেও আমার ছিল।

দশ বছবের ছোট বড় হইলেও কেমন কবিযা যে প্রবোধদা'ব বন্ধুর পর্যায়ে পডিয়া গিয়াছিলাম ঠিক বলিতে পাবি না; হযতো আমার অকালপক্কতা ও তাঁহাব সবল সহৃদযতার যোগফল।

মোট কথা, তাঁহাদের প্রেমে পড়ার আগাগোড়া ইতিহাস সঠিক বলিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব নয। এক রকম আমাকে সাক্ষী রাখিয়াই অগ্রসব হইতেন তাঁহারা। ইচ্ছা কবিয়াই যেন একটু আড়াল রাখা, অবাধ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় কিঞ্চিৎ খর্ব করা।

প্রায়ই কোনো ছুতায় আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন—এবং বোধ করি নিতান্ত শিশুবোধে আমাকে জলছবি ও ডালমুট ঘুষ দিয়া নিকটেই কোথাও বসাইয়া রাখিতেন।

বলা বাহুল্য, প্রবোধদা'ব ধারণা অনুযায়ী সবল শৈশবকাল তখন পার হইয়াছি—নিবিষ্টচিত্তে ডালমুট খাওয়ার ভানে উৎকর্ণ হইয়া প্রেমালাপের সমস্ত অক্ষরগুলি কর্ণস্থ করিতাম, এবং অন্তরস্থ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিছু কিছু যে না করিয়াছি এমন নয়।

বেশ মনে আছে, একদিন অভিমানের সুরে অনুযোগ করিয়াছিলেন বৌদি—সোমেনকে রোজ রোজ আনো কেন বলো তো?....ভয় করো বুঝি? কেন, বাঘ না ভালুক আমি?

স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্যে উত্তর করিয়াছিলেন প্রবোধদা'—ভয় তোমায় করি না নিরু, করি নিজেকে, আমিই না কোন সময় বাঘ ভালুক ব'নে যাই এই ভয়।

—ইস্, তবু যদি খোলা পার্ক না হ'ত।

—দুপুর রোদে খোলা পার্কেই বা ভরসা কি?

অস্বীকার করিব না, সেই বযসে পক্ক কম ছিলাম না। একটা কিছু অনুমান করিয়া অন্যমনস্কের ছলে খানিকটা দূরে সরিয়া গেলাম, এবং আড়চোখে দেখিতে লাগিলাম খোলা পার্কের মর্যাদা

থাকিল না গেল।

থাক সে সব কথা, তবে বিবাহের পর বৌদির অনুগত ভক্তদের মধ্যে আমিই প্রধান। লজ্জানম্র নববধূর রহস্যঘন পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করিয়া নিকটে পৌঁছিবার দুঃসাহস আর কাহার থাকিতে পারে আমি ভিন্ন?

যেন আমারই বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য, মনে মনে এমনি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতাম, মুগ্ধ করিয়া দিত তাঁহার হাসি, গল্প, গান, সেতার-বাজানো, কবিতা-আবৃত্তি সব কিছুতে।

বয়সের তারতম্য না থাকিলে বোধ হয় সেই অন্ধ আনুগত্যকে প্রেমের পর্যায়ে ঠেলিয়া দিয়া লোকে অপবাদ দিয়া বসিত। নিতান্ত বালক বলিয়াই সে যাত্রা রেহাই পাইয়াছিলাম।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে আকর্ষণ কখন শিথিল হইয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? এখন সমস্ত দিন-রাত্রি, সমস্ত চিন্তা-কল্পনা, অতীত-ভবিষ্যৎ সব গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে বেণু, পৃথিবীতে কখনো কোনো প্রিয়জন ছিল সেটুকুও মনে পড়ে না।

অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় যে আনন্দটুকু বোধ করিতেছিলাম তাহার সুর কাটিয়া গেল। আরো বেসুরো লাগিতেছে পিসিমার ভাঙা গলার উচ্চ চীৎকার।

বোধ হয় নাতিনীদের উদ্দেশ করিয়াই বলিতেছেন—মেয়েগুলোও কি হয়েছে তেমনি বজ্জাত, অজ্ঞান হয়ে নাটক নভেল পড়ছে—বাড়িতে কে এলো গেলো তার হিসাব নেই। ওরে শ্যামলী, অ-হারামজাদা মেয়ে, বলি আছিস কোথায়? কানের মাথা খেয়েছিস নাকি—দেখ্ না নিচেয় নেমে কে এসেছে?

শ্যামলী বোধ করি অজ্ঞান সমুদ্রের তলদেশ হইতে একবার মাথা তুলিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—কে আবার আসতে যাবে ঠাকুমা, তোমার দিনরাত্তিরই ওই এক বাতিক।

কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম কে জানে—দুই মিনিটও হইতে পারে, দশ মিনিট হওয়াও বিচিত্র নয়।

এক সময় মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম—বৌদি, আপনার বয়স কত হ'ল?

—চৌত্রিশ, কেন?

—এই সব সহ্য করেন এখনো?

—কি করবো বলো, বাড়ি থেকে তো চলে যেতে পারি নে?

—বিদ্রোহ করতেও তো পারেন?

—ওরে বাবা! কৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলিয়া বৌদি গালে হাত দিলেন—বললে কি সোমেন? স্বর্গাদপি গরীয়সী! বরং নালু-টুলুর বৌ এলে এর শোধ নেব। বলিয়া চমৎকার একটু হাসিলেন।

অথচ এমনই হয়, এই অবিশ্বাস্য রহস্যও সত্য হইয়া উঠে। সারা জীবনের সঞ্চিত তিক্ততার গ্লানি সুদে আসলে উসুল হয় পরবর্তীদের জীবনে।

ইহার পর পিসিমার সঙ্গে দেখা করিবার স্পৃহা না থাকিলেও কর্তব্যবোধে করিতে হইল। ঘোলের সরবৎ ও সন্দেশ খাইলাম—বিবাহ-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য-বিষয় সকল পিসিমার গোচরীভূত করিলাম। অবশেষে সুটকেস ঘাড়ে করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম।

থাকিবার ইচ্ছা অনেকক্ষণ লুপ্ত হইয়াছিল। দূর ছাই—বেণুদের বাড়িই ভালো।

দুইদিন বাদে তো জামাই হইবই।

প্রবোধদা'র সংবাদটা সঠিক জানিতে আর একবার আসিলেই চলিবে, আপাতত দক্ষিণ কলিকাতার দিকে রওনা হই। আর্ল স্ট্রীটে বেণুদের বাড়ি। দশের-এ বাস হইতে রিচি রোডের মোড়ে নামিয়া ভাবিলাম 'ম্যাডক্স' পার্কের ভিতর দিয়া পথটুকু সংক্ষিপ্ত করিয়া লই, কিন্তু কে জানিত এমন এক মূর্তিমান বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল পার্কের মধ্যে!

গরমকালের চারটে আন্দাজ বেলা, চারিদিকে রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, মাঠের এই রাক্ষসী মূর্তি দেখিয়া অনুমান করা কঠিন—ঘণ্টাদুই পরেই এখানে শান্তির হাওয়া নামিবে, দলে দলে রঙীন প্রজাপতির মেলা বসিয়া যাইবে, জাতি ধর্ম বর্ণের অপূর্ব সমারোহে!

কিন্তু যা বলিতেছিলাম—

বিস্ময় বসিয়াছিল প্রবোধদা'র বেশ ধরিয়া।

মুখের সামনে ছাতা আড়াল করা থাকিলেও—সর্বাঙ্গেব পরিচিত ভঙ্গিটুকু যেন আমাকে কাছে টানিয়া আনিল।

প্রবোধদা'-ই বটে—বিস্ময়ে প্রশ্ন করতে ভুলিয়া যাই, কথা তিনিই আগে ক'ন। আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া ছাতা সরাইয়া প্রশ্ন করেন—কিরে, তুই হঠাৎ দুপুর রোদে এখানে? এলি কবে? যাচ্ছিস কোথায়?

—সব বলছি, আগে তোমার খবর বলো।

—আমার! আমার আবার খবর কি?....হাওয়া খাচ্ছি।

—হাওয়া খাচ্ছো? সময় ভালো—হাওয়া খাবার উপযুক্ত, কিন্তু এ রকম রহস্যময় হয়ে উঠলে কবে থেকে? অফিসে গিয়ে শুনলাম ছুটিতে আছো, অথচ—

বাধা দিয়া গম্ভীরভাবে বলেন—ছুটিই তো, নইলে পার্কে বসে আছি কি ক'রে?

বেঞ্চের অপরার্ধ দখল করিয়া কহিলাম—কিন্তু বাড়িতে জানাও নি কেন?

—কে বললে জানাই নি? সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করেন প্রবোধদা'।

—বাড়ি গিয়ে শুনলাম, বৌদি তো....

—বাড়ি গিয়ে?

অকস্মাৎ ভূত দেখিয়া চমকাইয়া ওঠেন প্রবোধদা'।

—বাড়ি গিয়েছিলি? ফাঁস ক'রে এলি ছুটির কথা?

—বলব না কেন তা তো বুঝছি না।

—বুঝবে কোত্থেকে? আকাশে পান্‌সি ভাসিয়ে প্রেমের পাল তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছো—বুঝবে কি ক'রে কত ধানে কত চাল! সর্বনাশ ক'রে এলি একেবারে।...মামলায় হারিয়া আসার মতই হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়েন প্রবোধদা'।

সান্ত্বনা দিব, না অপরাধ স্বীকার করিব, সেটাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—বাড়ি ফেরবার আর পথ রাখলি না আমার, মিলিটারী লরী চাপা পড়ে আর ফিরতে না হলে বেশ হয়। উঃ, কত কষ্টে যে এই বারোটা দিন আত্মগোপন ক'রে আছি। চেনা পাড়া দিয়ে হাঁটি না, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে ছাতা আড়াল ক'রে স'রে যাই, একপথে দু'দিন বেড়াই না, পাছে বলে দেয়—আর তুই অক্লেশে আমার মাথাটা খেয়ে এলি?—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট!

এতদিন পরে দেখা—কুশলপ্রশ্নের পরিবর্তে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকেন প্রবোধদা'।

কিন্তু এই দীর্ঘ বিলাপোক্তির মধ্য হইতেও আত্মগোপনের মূল তথ্য আবিষ্কার করিতে পারি না। অনুমানের উপর আস্থা হারাইয়া সোজাসুজি প্রশ্নই করিতে হয়।

বিস্তর সাধ্যসাধনায় মুখ খুলিল।

পকেট হইতে একমুঠা ঝালছোলা বাহির করিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া গম্ভীর সুরে কহিলেন—নে খা'। নিজেও একগাল চিবাইতে চিবাইতে অন্যমনা সুরে বলেন—ছুটির কথা লুকোচ্ছি কি আর সাধ ক'রে? অনেক দুঃখে,—জানালে কি আর রক্ষে ছিল রে? ওৎ পেতে বসে থাকে, বুঝলি? পরের চাকরি করি, কথাটি কইতে পায় না—ছুটির গন্ধ পেলে বাঘের মত হালুম ক'রে পড়ে। রবিবার দিয়ে দেখেছি তো? রাজ্যের কাজ তুলে রেখে দেয় ওই একটি দিনের জন্যে।

হাসিয়া প্রশ্ন করি—এত কিসের কাজ?

—কিসের? কিসের নয়? ঝাঁজিয়া উঠিয়া মেয়েলী ভঙ্গিতে আঙুলের পর্ব গুণিতে থাকেন—'ছুটি পেয়েছো, এ মেয়ের পাত্তর খোঁজো, ও মেয়ের তত্ত্ব পাঠাও, বুড়ো শ্বশুরের খবর আনো, রুগ্ণা শালীকে দেখে এসো'—কত বায়নাক্কা। তা ছাড়া সেলাই-কল ভেঙ্গে আছে, পায়খানার ট্যাঙ্কে জল নেই, রান্নাঘরের ছাদ ফুটো, কাপড়ের অভাবে লজ্জা বাঁচছে না, ঝি পালিয়েছে, ধোপা আসে না, তেল নেই!...বলে কি না কিসের কাজ? হুঁ! এর ওপরে আবার মা জননীর দেশের বাড়ি নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি লেগেই আছে। সম্পত্তির মধ্যে একখানা ভাঙ্গা দালান, আর একটা বুড়ো ডুমুর গাছ, তাই জ্ঞাতিরা ভোগ করছে বলে বুক ফেটে যাচ্ছে। এতোদিন ছুটি দেখলে অতিষ্ঠ ক'রে ছাড়তেন, বুঝেছিস? দেখলে না, দেখলে না,—আরে বাপু চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশের ডুমুর গাছ পাহাবা দিলেই শান্তি হ'ত তোমার?

যেন আমিই প্রতিপক্ষ।

হাত মুখ নাড়ার ভঙ্গি দেখিয়া হাসি চাপা দায় হয়।

তবে হাসি দেখিয়া রাগ করেন না, উদার ভাবে বলেন—হেসে নে, যে ক'দিন পারিস।

বলিলাম, ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে আরামটা কি ভোগ করছো? এই বোদে টো টো ক'রে—

দাদা ক্রুদ্ধস্বরে বলেন—রোদে টো টো করবো না তো বালিগঞ্জের পাড়ায় কে আমার সুইটহার্ট বসে আছে যে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বরফজল খাওয়াবে শুনি?....আরাম না থাক, স্বস্তি আছে বাবা। ন'টা বাজলেই দিব্যি কেটে পড়ি, যতক্ষণ খুশি ঘুবে বেড়াই, যেখানে খুশি বসে থাকি, খিদে পেলে ছোলাভাজা কিনি, তেষ্টা পেলে সোডা খাই,—ছ'টা বাজার আগে বাড়ির দিকে পা বাড়াই না। কলকাতার রাস্তাগুলো ভুলে গিয়েছিলাম রে, আবাব সব মুখস্থ করলাম।—বেশ লাগে গরমের দুপুরে রোদ্দুরে ঘুবে বেড়াতে।

বেশ লাগার নজীরটা ভালো।

কিন্তু বৌদির কথা ভাবিয়া দুঃখিত হই। আহা, বেচারার সমুদ্রের স্বপ্ন সফল হইলেও হইতে পারিত।

আচমকা প্রশ্ন করিয়া বসি—তার চেয়ে বৌদিকে নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে এলে পারতে? ধর পুরী—

—পাগলের মত কথা বলিস নে সোম, বৌদিকে নিয়ে পুরী, যেন সাহেব বিবি? আরে বাপু—বুড়ো মাকে একটু তীর্থ করাতে পারি নে, নিজেরা বেড়াতে যাবো কোন্ লজ্জায়! এই তো, আর বছরেই ঝোঁকের মাথায় একবার বলে বসেছিলাম, ব্যস্ তোড়জোড় দেখে কে?

'এটা চাই ওটা চাই' ইয়া লম্বা এক ফর্দ, যেন হনিমুনে যাচ্ছি। এদিকে মার মুখ ভাব! আব সত্যিই তো, বুড়ো বয়সে তাঁর ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা হাওয়া খেতে যাওয়াটা কি ন্যায্য? আমিও আজকাল চালাক হয়েছি—ছুটি 'ক্যান্‌সেল' ক'রে দিয়ে বললাম, পেলাম না, বড়সায়েব রাঁচি গেছে—বাবা, সাপও মরলো, লাঠিও বাঁচলো।

অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকি—সত্যই কি এটা খাঁটি মনের কথা? না যাহা দেখিতে শুনিতে ভালো—তাহার ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করিয়া নিজের 'ভালোত্ব'টা জাহির করিবার কষ্টকর চেষ্টা মাত্র?

যাহারা প্রতিনিয়ত নিজেকে নিজে বঞ্চনা করিয়া চলে, তাহারা বঞ্চিত জীবনের সমস্ত গ্লানির দায় পরস্পরের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হয় কোন্ হিসাবে?

ফেরারী আসামীর মত হাস্যকর ভাবে নিজেকে তাড়াইয়া বেড়ানোর চাইতে অবসব উপভোগ করিবার আর কোনো ভালো পথ ইহাবা খুঁজিয়া পায় না কেন? স্বল্পাবসর জীবনেব বিবল কয়েকটি মুহূর্ত রঙিন করিয়া তুলিবার ক্ষমতা কি ইহাদের সত্যই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

প্রবোধদা' আমার মুখেব দিকে একবার তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—অমন মনমবা হযে গেলি যে? ভাবছিস তোর বৌদি খুব দুঃখিত হ'ল?—দুঃখিত হওয়া তার কুষ্ঠীতে লেখে নি, বুঝলি? আগুন আগুন, দিনরাত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে। কখন কি মেজাজ বোঝা ভার! তাই তো সেদিন বেশ ভালো মনে বললো—চল 'উদয়ের পথে' দেখে আসি, আমিও বাজী হয়েছি—মানে অফিসেব সবাই ধন্যি ধন্যি কবছিল বইটাকে, ভাবলাম দেখি ব্যাপারটা। তা সে, যেই বলেছি—মেয়ে দুটোও চলুক, আবদার নিচ্ছে, ব্যস অমনি বলে বসলো—যাবো না! বোঝো কথা? আসলে এই মেয়েমানুষ জাতটাই হিংসুটে, বুঝলি সোমেন?

কি বুঝিলাম কে জানে, বোধ হয মেয়েমানুষ জাতটাব ভয়াবহ হিংস্রতাব কথাই চিন্তা করিতেছিলাম—

হঠাৎ ফোঁস্ করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিযা প্রবোধদা বলিয়া ওঠেন—ও আমাকে সুদ্ধু হিংসে করে, জানিস? বিশ্বাস করতে পাবিস? বলে কিনা—আমি নাকি আফিসের কাজেব ছুতোয় দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই—আমার নাকি বয়েস ছাড়া কাঁচা চেহারা—আব উনি হরদম সংসার ক'রে ক'বে বয়েস ছাড়া বুড়িয়ে যাচ্ছেন—বোঝো? আরে বাপু দিনরাত মনের ভেতর আগুন জ্বালালে আব শুকিযে যাবে না মানুষ?

যাইতে পারে—যাওয়াই সম্ভব, কিন্তু জলের পরিবর্তে অবিরত ইন্ধন পড়িলেই বা মানুষ করে কি? সে আগুন কে ঠেকাইয়া রাখিবে কোন্ শুভবুদ্ধির জোরে?

পার্কে লোক আসিতে সুরু কবিয়াছে। সামনে দিয়া দুইটা ছেলে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দুই-একটি বড়লোকের বাড়ির ঝি, রঙিন জামা-পরা কাঁচের পুতুলের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া মদগর্বে ধরার দিকে সরার ন্যায় অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া ছায়াচ্ছন্ন জমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ যেন প্রবোধদা'র হুঁস্ হয, পকেট উল্টাইয়া ধূলা ও খোসা সমেত বাকী ছোলাভাজাগুলা হাতে ঢালিয়া ফুঁ দিতে দিতে বলেন—নিজের কথাই সাত কাহন, তোব খবর বল্। তোব বেণুর খবর বল্।

কেমন যেন শ্রান্ত লাগিতেছিল, উঠিবার উদ্যোগ করিযা বলি—শুনো পবে, যাবো কাল-পরশু। হ্যাঁ ভালো কথা, ও ছুটির কথাটা তুমি চেপেই যেও বাড়িতে, হেসে উড়িয়ে দিও, বোলো—ঠাট্টা ক'রে গেছে সোমেন।

—পাগল! আর এখন বিশ্বাস করলে তো?

বলিলাম—ঠিক করবেন, মজা এই—বিশ্বাসটা এখনো ঘোচে নি, ওটা গেলে দাঁড়াবার আর ঠাঁই থাকবে না বলেই বোধ হয় প্রাণপণে আঁকড়ে আছেন—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াই।

—এটা কি হ'ল?

—কিছু না, এমনি—আচ্ছা চলি—বলিয়া দাদার সবিস্ময় প্রশ্নকে এড়াইয়া চলিতে সুরু করি।

—আমিও উঠি এবার—চল্ একসঙ্গেই যাই।

ছাড়াছাড়ি হইবার মুখে সহসা প্রশ্ন করিলাম—কলেজ পালিয়ে দুপুর রোদে হেদোর ধারে বসে থাকার কথা মনে পড়ে প্রবোধদা?

প্রবোধদা যেন আচমকা হোঁচট খাইলেন, চকিত দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া কি বলিতে গিয়া থামিলেন। আর দুই পা আগাইয়া গিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন—পড়বে না কেন, পড়ে। তোরই কি একদিন মনে পড়বে না—দুপুর রোদে ভবানীপুরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো?

[১৩৫২]

লাল শাড়ী

অনাদিবাবুর স্ত্রীকে শ্মশানে লইয়া যাইবার ভার চাপিল আমাদেরই ঘাড়ে।

মৃত্যুটা এমনি আকস্মিক যে করিবার আর কিছু ছিল না।

শুধু সাটিফিকেটের জন্যই একজন ডাক্তারকে আনা হইল। ধ্রুবেশবাবু খাট ও ফুল আনিতে গেলেন, সুবোধ নড়বড়ে বাইকখানায় চাপিয়া বাহক যোগাড় করিতে ছুটিল। আর নিস্তব্ধ রাত্রের অসীম অন্ধকারের পটভূমিকায় বিদ্যুৎবাতি জ্বালাইয়া মৃতদেহ আগলাইয়া বসিয়া রহিলাম আমি।....

অথচ অনাদিবাবুর সঙ্গে এমন কিছু হৃদ্যতা কাহারও ছিল না যে এতটাই করিবার প্রযোজন হইত। উপস্থিত থাকিলে অনাদিবাবু আমাদের ডাকিতেন কি না সন্দেহ।

অফিসের কাজে দিন কয়েকের জন্য কোথায় যেন গিয়াছেন অনাদিবাবু—এইটুকু মাত্র শুনিয়াছিলাম—ভুলিয়া যাইতেও দ্বিধা করি নাই।....ছোট দু'টি ছেলেমেয়েকে লইয়া ভদ্রমহিলা একাকিনীই আছেন, না অভিভাবকের 'একটিনি' খাটিতে কোনো হিতৈষী আত্মীয়কে আনিয়া রাখিয়াছেন, সে খোঁজ লইবার প্রয়োজন অনুভব করি নাই।

শুদ্ধান্তঃপুরের নির্মল অন্ধকারের গভীর গুহায় প্রতিবেশীর সন্ধানী দৃষ্টির উঁকি যে অনাদি বাবুর অত্যন্ত অপ্রীতিকর, সে খবরটা জানা ছিল বলিয়াই নিরভিভাবক প্রতিবেশিনীর তত্ত্বতল্লাস করিবার মত কর্তব্য-বুদ্ধিও জাগ্রত ছিল না।

মাঝখান হইতে ভদ্রমহিলা হঠাৎ মরিয়া বসিয়া যে পাড়াসুদ্ধ ভদ্রলোককে এমন বিপদে ফেলিবেন—একথা কবে কে ভাবিয়াছিল?

রাত বোধ করি বারোটার কাছাকাছি—বিছানায় আশ্রয় লইয়াছি, অথচ ঘুম আসে নাই, এমনি একটি মোহময় মুহূর্তে সহসা পাশের বাড়ীর গোলমালে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম অনাদি বাবুর বাড়ীর সমস্ত আলোগুলো জ্বলিতেছে....ছোট ছেলে মেয়ে দুটি একসঙ্গে কান্না জুড়িয়া

দিয়াছে এবং বাড়ীর ঝিটা তারস্বরে ডাকাডাকি সুরু করিয়াছে—আমাদের জানলা লক্ষ্য করিয়া।

চটিটা পায়ে গলাইয়া বাহির হইতে গিয়া দেখি মা ও কাকীমা আগেই প্রস্তুত। আমাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন মুখে কহিলেন—ওদের কর্ত্তা তো বিদেশে, গিন্নির যদি ভালো মন্দ কিছু হয়ে থাকে, কি হবে তারু?

বলিলাম—হবে আর কি! মৃত্যুব দূত তো কারুর বিদেশ থেকে ফেরবার আশায় ব'সে থাকে না?

বলিলাম বটে, কিন্তু নিজেও খুব বেশী ভরসা বোধ কবিতেছিলাম না।....শুনিলাম এক ঘুমের পর উঠিয়া হঠাৎ বাচ্চা মেয়েটাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "বড় গরম! বাতাস! বাতাস কব একটু খুকু!" হতচকিত শিশু হাতপাখা সংগ্রহ করিয়া আনিবার আগেই খাটের উপব হইতে গড়াইয়া মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

পরবর্ত্তী ইতিহাসও অলঙ্কারবহুল নয।

তাঁহাদের কোনো আত্মীয়কে আমরা চিনি না যে, ঘটা করিয়া শোক করিবার জন্য সংবাদ দিয়া আনাইব। বাড়ীর বাকী তিনটি বাসিন্দা এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই করিতে পারিল না।

অতএব 'বাসি মড়া' হইবার ভয়ে নিছক প্রতিবেশীর মনোভাব লইয়া কর্ত্তব্যানুরোধেই পাড়ার আরো ক'জন ভদ্রলোককে ডাকিয়া তুলিয়া ধ্রুবেশবাবুকে খাট ও ফুলের মালা এবং সুবোধকে বাহক আনিতে পাঠাইয়া শবদেহ আগলাইয়া বসিয়া আছি।

ঘরের বাহিরে দালানে মৃদু আলোকে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া কাকীমা ছোট্ট ছেলেটাকে চাপড মারিয়া মারিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার একটানা আবদেরে কান্না এখনো বন্ধ হয় নাই। অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েটা সেই একবার যা চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর হইতেই একেবারে নির্ব্বাক হইয়া মাটির পুতুলের মত নিথর বসিয়া আছে।

আমার মার বোধ হয় তখনো কৌতূহল নিবৃত্তি হয় নাই। ঝিটাকে ডাকিয়া পুনঃ পুনঃ এই অদ্ভুত আকস্মিক মৃত্যু-কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা কবিয়া দেখিতেছেন কোনো সূত্রে কোনো হদিস মেলে কি না।

সন্দেহ যে আমারও হয় নাই এমন নয়....কিন্তু ডাক্তার যখন "হার্ট ফেলিওর" বলিয়া বিজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত কবিয়া গেল, তখন সন্দেহকে মাথা তুলিতে না দেওয়াই ভালো। হাঙ্গামা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না।

অনাদিবাবুর স্ত্রী যে 'দ্বিতীয় পক্ষ' এ খবর এতদিন জানিতাম না। আজ জানিলাম। ঝিটা বারবার বলিতেছিল—"বাবুর পেরথম পক্ষের মেয়ের ছিরামপুর না রিষড়ের কোথায় যেন শ্বশুরবাড়ী, তেনাকে একবার খবর দিতে পারলে—"

দিতে পারিলে ভালই হইত নিঃসন্দেহ, কিন্তু "ভালো হইবার" খাতিরে রাত্রি বারোটার সময় রিষড়া কিম্বা শ্রীরামপুরের রাস্তায় অজ্ঞাতনাম্নী "পেরথম পক্ষের কন্যা"কে খুঁজিয়া বেড়াইতে যাইব এমন কল্পনা পাগলেও করে না।

মৃতার পানে আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম....হ্যাঁ, এ সন্দেহ আগেই করা উচিত ছিল, অনাদিবাবুর তুলনায় বয়স অনেক কমই বটে।

পাশের বাড়ীতে বাস করিলেও মুখ দেখিবার সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত কোনো দিনই হয় নাই।

আমাদের বাড়ীর দিকের বাতায়ন চিররুদ্ধই থাকিত, ছাদে ওঠারও বোধহয় নিষেধ ছিল। পথে বাহির হওয়া তো স্বপ্নের কথা। কদাচ কখনো দালানের জানলা খোলা থাকিলে একটি অবগুণ্ঠনবতী নারীর দৈহিক আভাস চোখে পড়িত মাত্র।

মিথ্যা বলিব না—অনাদিবাবুব মত বয়স্ক লোকের স্ত্রীর সম্বন্ধে কৌতূহলী হইবার প্রয়োজন কখনো অনুভব করি নাই, বরং ঘোমটার ঘটা দেখিয়া হাসিই পাইত।

বিশ্বসুদ্ধ সমস্ত পুরুষকেই যে অনাদিবাবু সন্দেহের চোখে দেখেন, এ খবরটুকুও কানাঘুষায় কানে আসিত। কিন্তু অমন তো কত লোকেরই স্বভাব থাকে—এমন কিছু নূতন নয়।

নূতন লাগিতেছে অনাদি-জায়ার অকস্মাৎ মরিয়া যাওয়ার ভঙ্গী!....ঘরে তীব্র আলো জ্বলিতেছে এবং চিরঅবগুণ্ঠনবতী সমস্ত লজ্জা ভয় দ্বিধা সঙ্কোচ অনায়াস মহিমায় পরিত্যাগ করিয়া নির্লজ্জ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই প্রখর আলোর পানে চাহিয়া স্থির হইয়া শুইয়া আছে।

স্বল্পাবরণ দেহে একখানা চাদর টানিয়া ঢাকা দিয়াছিলাম—কিন্তু না দিলেই বা ক্ষতি ছিল কি?

জগতের সমস্ত পুরুষের উপরই ওর আজ সমান অগ্রাহ্য!

শিথিল এলায়িত দেহে সেই অপরিসীম অবহেলার ছবি!

অবাক হইয়া ভাবিতেছি—এমন একখানি মুখের সঙ্গে এতদিন পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছি, অথচ কোনদিন দেখি নাই! জীবন্ত থাকিতে না জানি কত অপূর্ব্বই ছিল! এই মুখে হর্ষ-বিষাদ বাগ-অনুরাগেব বিদ্যুতদীপ্তি কী সুন্দর ভাবেই খেলিত! কি জানি হয় তো বা এই ভালো, এই পাংশু অধবেব কোণে যে বিজযিনীর দর্পিত হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে, কারাবাসিনী অবগুণ্ঠিতা কোথায পাইত সে হাসি?

মধ্যবাত্রিতে ঘুম ভাঙাইয়া শ্মশানযাত্রী যোগাড করা সহজ নয়, সুবোধ আশঙ্কাতিরিক্ত দেরী করিতেছে। ধ্রুবেশবাবু ফুলের মালার সঙ্গে ভালমত দুইটি তোড়াও আনিয়া ফেলিয়াছেন, শিশি-খানেক সুগন্ধি এবং এক থান সিঁদুব আনিতেও ভোলেন নাই। এই কাজ করিতে করিতে ধ্রুবেশবাবু ঘুণ পাকাইয়া ফেলিলেন—অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না।

শাড়ীর কথাটা মনে পড়াইয়া দিলেন তিনিই। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হাসিয়া বলিলেন—"নতুন কাপড় পরানোর একটা রীতি ছিল, এইবার সে প্রথা ঘুচলো। বলে জ্যান্ত মানুষেই কাপড় পবতে পারছে না—তা মড়া! কি বল হে তারক?"

ধ্রুবেশবাবুকে কোনদিনই অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আজ তাঁহার এই অর্থহীন হাসি এবং প্রগল্ভ ধূমপান অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিল। দেবমন্দিরের ভিতর কাহাকেও জুতা পায়ে ঢুকিতে দেখিলে যেমন বিরক্তি বোধ হয়, তেমনি বিরক্তভাবে বলিলাম—কিন্তু এ শাড়ী পরিয়েও তো নিয়ে যাওয়া যায় না ধ্রুবেশবাবু?

—যায় না বললে করছো কি হে? তবে দেখ যদি চেলি টেলি কিছু থাকে, অনেকে তো দেখি বৌ মরলে সখ করে চেলি পরিয়ে নিয়ে যায়। তা' যাঁর বৌ, তিনি তো হাওয়া। এ যেন সেই—"কার শ্রাদ্ধ কে করে, খোলা কেটে বামুন মরে।"

বুঝিলাম ধ্রুবেশবাবুর উপর রাগ করা বৃথা। ক্রমান্বয়ে এই কাজ করিতে করিতে নির্ব্বিকার হইয়া গিয়াছেন ভদ্রলোক।

মাকে ডাকিয়া বলিলাম—মা, ঝিটাকে বলো তো, বাক্স খুলে এঁর একখানা ভালো শাড়ী

বার ক'রে দিতে—

ঝিটা প্রথমটা ভয় খাইল—বাবু আসিয়া নাকি আস্ত রাখিবেন না তাহাকে, অবশেষে আমার ধমকে রাজী হইল।

...আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইলাম—চাবির অধিকারিণী এক তিলও আপত্তি করিল না।

তেমনি নিষ্পলক নেত্রে বিজলীবাতির প্রখর আলোটার পানে চাহিয়া থাকে....আঃ, চোখ কি উহার জ্বালাও করে না?

হ্যাঁ ঠিক হইয়াছে—লাল শাড়ী। রূপালী জরির আলপনা আঁকা লাল বেনারসী।....যে শাড়ী পরিয়া একদিন এ ঘরের চৌকাঠের ভিতর আসিয়া আশ্রয় লইযাছিলে, সেই শাড়ীখানি পরিয়াই বাহির হইয়া চলো এদের গণ্ডি ভাঙিয়া, চৌকাঠ ডিঙাইয়া, সুদূর দিগন্তের উন্মুক্ত স্বাধীনতায়!....

কিন্তু এতই বা ভাবিবাব কি আছে? অনাদিবাবুব স্ত্রী আমার কে? আশ্চর্য্য!

মৃতের প্রেমে পড়িয়া গেলাম নাকি?

অবশেষে সুবোধও আসিল।

আলতা সিঁদুর পুষ্প গন্ধ, কিছুরই ক্রটি হইল না।

চিরসন্দিগ্ধ অনাদিবাবুর লোহার কৌটায় লুকাইয়া রাখা রূপসী স্ত্রী রাজেন্দ্রাণীব মত সাজিয়া নিরাবরণ মুখে কলিকাতাব রাস্তাব উপব দিয়া সদর্পে চলিয়া গেল।

অনাদিবাবু আসিলেন দিন তিনেক পরে।

অফিসের ঠিকানা যোগাড কবিয়া নারাণবাবু 'তাব' করিয়া দিয়াছিলেন। লোকটা যে অত্যন্ত মুসড়াইয়া পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। শুধুই তো শোক নয়— অত্যাচারীর অনুশোচনাও কম তীব্র নয়! ডাক্তারের জবাবে পুলিশের জবাবদিহির হাত হইতে বেহাই পাইলেও বিষ খাওয়ার সন্দেহটা পল্লবিত হইতে বিলম্ব হয় নাই, এমন কোনো হিতৈষী কি অনাদিবাবুর নাই যে দেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুখবরটা কর্ণগোচর করিয়া দিবে?

সকালবেলা আর ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে মন হইল না।....ভাবিলাম রাত্রে যাইব। মাতৃহীন শিশু দুটি আমাদের বাড়ীতেই ছিল দু'দিন, মাকে বলিয়া গেলাম—অনাদিবাবু চাহিবার আগে পাঠাইয়া কাজ নাই, হয় তো ভাবিবেন আর একটা বেলাও—

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী আসিয়া যা শুনিলাম, শুধুই অদ্ভুত নয়, ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট।....সকাল বেলা আমি বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনাদিবাবু নাকি প্রায় ধূলা-পায়েই আসিয়া আমাদের উদ্দেশে যাচ্ছেতাই করিয়া শিশুদের লইয়া গিয়াছেন।

দেখা করিতে যাইবার প্রবৃত্তি আর হইল না।

কিন্তু তিনি নিজেই আসিলেন। ভাবিলাম—বোধ করি সে রাত্রের খরচাটা শোধ করিতে আসিতেছেন....মানী লোক! কি ভাবে জিনিসটা প্রত্যাখ্যান করিব ভাবিতেছি, হঠাৎ গম্ভীর প্রশ্ন কানে আসিল—আমার স্ত্রীর সঙ্গে মশাইয়ের কত দিনের আলাপ ছিল?

প্রশ্নের ভঙ্গী যতটা অরুচিকর, ততটা বিরক্তির সঙ্গেই প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—আলাপ ছিল? এ সন্দেহের মানে?

—আছে মানে। আমি তো আর দুগ্ধপোষ্য শিশু নই যে এই সাদা কথাটাও বুঝবো না? আলাপ না থাকলে অত দরদ কিসের মশাই?

—মরে গেলে পুড়িয়ে আসাটা যদি দরদের লক্ষণ হয়, সে দরদ একদিন আপনার ওপরও

দেখাবো ভয় নেই।

ভীমরুলের চাকের মত মুখ বাঘের মত হইয়া উঠিতেছে....

—হুঁ! মরণ টাঁকা হচ্ছে আমার? কিন্তু আর লাভ কি? পাখী তো খাঁচা ভেঙে হাওয়া! দরদ নয়! শুধু মরে গেলে পুড়িয়ে আসা? বলি আমার বাড়ী চড়াও হয়ে আমার পরিবারকে ফুলের মালা ফুলের তোড়া দিতে যাবার কি দরকার ছিল শুনি? আবার বাস্‌কো ভেঙে চেলির কাপড় বার ক'রে নিয়ে বাহার দেওয়া হয়েছে! কিসের জন্যে এসব সদ্দারী করতে কে বলেছিল আপনাকে?

—বলেছিল আমার বিবেক। নিজে তো গিয়েছিলেন পশ্চিমের হাওয়া খেতে! কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৈফিয়ৎ তলব! ধন্য বটে!

—কৃতজ্ঞতা? কৃতজ্ঞতা কিসের শুনি'' আমার পরিবার আমার ঘরে ম'রে পচুক, আপনাদের মাথাব্যথা কেন? এসেন্স পাউডাব মাখাবার আস্পদ্দা হয় কোন আইনে? পরস্ত্রীর গায়ে হাত ঠেকাতে লজ্জা করে না? খুব তো লম্বাচওড়া কথা....শিক্ষিত ব'লে গুমোর, অন্যের অনুপস্থিতিতে তব ঘরে ঢুকে যা খুসী করার আইন আছে কি না খোঁজ করেছিলেন?

স্তম্ভিত হইলেও উত্তর দিলাম।

—সেই বে-আইন কাজটুকুর জন্যেই যে আপনাকে আইনের প্যাঁচে পড়তে হ'ল না সে খোঁজ রাখেন? এতক্ষণে ঘানি টানতে হ'ত যে! ডাক্তারটি নেহাৎ নারায়ণবাবুর পরিচিত ব'লেই এ যাত্রা বেঁচে গেছেন, তা' জানেন?

—হ্যাঁঃ! ঘানি অমনি রাস্তায় পড়ে আছে। আগেরটা গলায় দড়ি দিলে, তাই বড়—যাক্ গে ও সব কথা। কিন্তু আপনার কাছে আমি কৈফিয়ৎ চাই, কোন সাহসে দুশো টাকার কাপড়খানা নষ্ট ক'রে এলেন?....ঝি আপনাকে বারণ করে নি? সোজা দাম ওসব কাপড়ের আজকাল?

—তা' দামীই হোক আব যাই হোক, আপনি তো আব লাল বেনারসীখানা পরতেন না? যাঁর জিনিস তিনিই—

—খবরদার! খবরদার বলছি মশাই, আমার পরিবারের নাম মুখে আনলে ভালো হবে না। 'যাঁর জিনিস'! মেয়েমানুষের আবার জিনিসের স্বত্ব কিসের? কন্যা দান করবার সময় গয়না কাপড় সবই স্বামীতে অর্শায়, তা জানেন? আমি পরবো না তা জানি। বলি, আসছে বারেরটাকে ওইটে দিয়েই গায়েহলুদের তত্ত্ব সারা যেত না? বলতে গেলে 'আনটাচ্‌ড্' ছিল একেবারে!

* * * *

ঘটনাটা ছবির মত মনে পড়িতেছে আগাগোড়া।

বস্তুতঃ দুই মাস আগের ঘটনা এ সব।

আজ আবার একখানা লাল বেনারসী দেখিয়া এত বেশী মনে পড়িয়া গেল।....এইমাত্র লাল শাড়ীর আঁচলে গাঁটছড়া বাঁধিয়া অনাদিবাবুর পিছন পিছন তাঁহার তৃতীয় পক্ষকে চৌকাট ডিঙাইতে দেখিলাম।

এ শাড়ীখানা হয় তো অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। সত্যই কি আর প্রত্যেকবারই অনুপস্থিত থাকিবেন অনাদিবাবু?

[১৩৫২]

হোমশিখা

জনসমুদ্র ? হাঁ সমুদ্রই বটে।

আলঙ্কারিক উপমা নয়, সত্যই পূর্ণিমার সমুদ্রেব মত উত্তাল জনসমুদ্র প্রবল তবঙ্গে আছড়াইয়া পড়িয়াছে রাজপথের উপর। কোথায় ছিল এত লোক ? কোন গুহায় লুকাইয়া ছিল এই মানবাত্মার ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ? অনেকদিনের দাবাইয়া রাখা চাপা অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জন যেন আজ মন্দ্রগর্জ্জনে ফুলিয়া ফাঁপিয়া ভাঙ্গিযা ফেলিতে চায় সমস্ত বিধিনিষেধ। ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়—শাসনযন্ত্রের কঠিন নাগপাশ, বে-আইনি আইনের বেড়াজাল।

যুগ-যুগান্তরে শিলীভূত মনুষ্যত্বের তুষারিভূত রক্ত বুঝি টগবগ করিয়া ফুটিয়াছে অনেকদিনের ক্ষয়ক্ষতি, অন্যায় অনাচারের অগ্নিদাহে।

কিন্তু দাবী করিলেই যদি পাওয়া যাইত! অত সোজা নয়। বেয়াদাব ঘোড়াকে সাযেস্তা করিবার মন্ত্রও আছে। হতভাগ্য দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত অপমানিত নগ্ন নিরন্নের ভিতর হইতে বাছিয়া জনকয়েককে অনেকটা ক্ষমতা অনেকটা প্রভুত্ব দিয়া রাখিবার অর্থ কি তাহা হইলে ?

কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার নীতিই যে কূটনীতির গোড়ার কথা।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে আয়ত্তে আনিতে না পারার লজ্জায় আর ক্রোধে রক্তবর্ণ চৌধুরী সাহেব দাঁতে দাঁত চাপিয়া হুকুম কবিলেন—ষ্টার্ট ফাযাবিং।

পুলিশ অফিসের একজন হোমরা-চোমবা কর্ত্তা চৌধুরী সাহেব, হত্যাকাণ্ডেব আদেশ দিবার অধিকার তাঁহাব থাকিলেও থাকিতে পারে,আর নয় তো কোন ফাঁকে তারে-বেতাবে আসিয়াছে খোদকর্ত্তার হুকুমের হুম্‌কি।

জনতার সে খবর জানিবার কথা নয়। তাহারা—দেশের নিরস্ত্র ছেলে-মেয়েরা, কাছেব লোকেব মুখ হইতেই পাইয়াছে—এই চরম দণ্ডাজ্ঞা।

সুরু হইল হত্যার বীভৎস লীলা।

গুলি চলিতেছে যেখানে সেখানে...যৌবনোদ্ধত সতেজ মানুষগুলো ছিটকাইয়া পড়িতেছে পথের ধূলায় মাথা গুঁজিয়া।...মাথা আর তাহারা তুলিবে না সেটা নিশ্চিত, শুধু খানিকটা তাজা রক্ত পথের ধূলার খানিকটা ভিজাইয়া দিতেছে—ব্যস্‌। অনেকদিনের তৃষ্ণার্ত্ত-ধূলি মুহূর্ত্তে শুষিয়া লইবে সেই রক্ত! বিচার করিবে না, তর্ক করিবে না, পরিবর্ত্তের দাবী করিবে না।

আস্তে আস্তে খান্‌ খান্‌ হইয়া যায় জনতার ঢেউ। আলগা হইতে থাকে মানুষের চাপ। বাঁচিয়া থাকিবার চিরন্তন প্রবৃত্তি তাহাদের লইয়া যায় এখানে সেখানে—গলিঘুঁজিতে।

শাসনকর্ত্তাদের ভাঁড়ারে মজুত করা সত্যকার আগুন সন্দেহহীন বাস্তব আগুন নিরস্ত্র আর নিরন্ন মানুষের হৃদয়ের অগ্নিশিখাকে দাবাইয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট বৈকি।

স্ফুলিঙ্গ-কণা আবার যদি কোণে কোণে জমা হইতে থাকে হোক্‌, এখন তো রক্ষা হইয়াছে চারিদিক। রক্ষা পাইয়াছে আইনের বেড়া, রক্ষা পাইয়াছে বড় চাকরী।

চৌধুরী সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া এতক্ষণে একটা সিগার ধরান। নাঃ! আর আশঙ্কার কিছু নাই—এবার যাওয়া যায়। বাকী যা কাজ লাল পাগড়ীধারী ক্ষুদে লাটসাহেবরাই পারিবে। উঃ, কম ভোগানটা ভোগাইয়াছে এই মূর্খ ছেলেমেয়েগুলো ?

দেশকে স্বাধীন করিবে—বায়না কত! ক্ষ্যাপা কুকুরের মত রাস্তায় রাস্তায় চেঁচাইয়া বেড়াইলেই যদি দেশ স্বাধীন হইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না।

আর কিছুই নয়—শুধু এস চৌধুরীদের মত পদস্থ লোকদের উপরওয়ালাদের কাছে খানিকটা অপদস্থ করিবার মতলব। যাক্ এবারের মত ফাঁড়াটা কাটিয়াছে। 'ফিরিতে রাত হইবে' এই খবরটুকু মাত্র টেলিফোনযোগে বাড়ীতে জানাইয়া চৌধুরী সাহেব ধীরে সুস্থে বড়কর্ত্তার সহিত মুলাকাৎ করিতে যান। বর্ত্তমান ঘটনার রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। তাছাড়া—জয়লব্ধ পুরস্কার—ভবিষ্যৎ পদোন্নতির আশা যাহাতে এইবেলা কায়েমী করিয়া লওয়া যায়, সে চেষ্টারও দরকার। এমন সুযোগ আবার সহজে না আসিতেও পারে।

ঘরে বসিয়া মনোজিনীর এদিকে ছটফটানির অন্ত নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে "দারোগা হইবার" আশীর্ব্বাদ দেওয়ার যুগ গিয়াছে। এখন পুলিশ-কর্ম্মচারীর স্ত্রীকে অনেক দুর্ভাবনা লইয়া ঘর করিতে হয়। তাই "এয়োত"কে লোহার বেড়ি দিয়া কষিয়া বাঁধিবার প্রচেষ্টায় দুই গাছার উপর আরো দুই গাছা লোহা পরিয়া থাকে মনোজিনী, তীর্থ প্রত্যাগত আত্মীয় বন্ধুর কাছে চাহিয়া লয় "সাবিত্রী" আর "বিমলা" দেবীর অক্ষয় সিঁদুর।

ক্ষ্যাপা কুকুররা তো শুধুই চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় না—মাঝে মাঝে যে কামড়ও দেয়। তবু আগে ভাবনা ছিল শুধুই স্বামীকে লইয়া, এখন আবার নূতন এক ভাবনা জুটিয়াছে ছেলেমেয়েদের দিক হইতে। স্বামীকে ববং বোঝা যায়, অনেকদিনের অভ্যাসে গা-সহা হইয়া গিয়াছে মনোজিনীর, শশাঙ্কর এই অহঙ্কার একগুঁয়েমী প্রভুত্বপ্রিয়তা, ক্ষমতার দম্ভে পৃথিবীকে তুচ্ছ করা।

সমস্ত ধারালো অনুভূতিগুলো আস্তে আস্তে অদ্ভুতভাবে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে মনোজিনীর—শশাঙ্কর সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইবার—খাপ খাওয়াইয়া লইবার আপ্রাণ চেষ্টায়।

কিন্তু এরা তিনটী ভাই-বোন? মনোজিনীর পেটের ছেলে-মেয়েরা? এরা এমন ধারালো হইয়া উঠিয়াছে কোন ফাঁকে? নিজের সন্তান বলিয়া চিনিতে পারা কঠিন। ইহাদের ভাব-ভাষা আশা-আকাঙ্ক্ষা মনোজিনীর কাছে কোনটাই নির্ভরযোগ্য নয়। কী যে এরা চায়—আর কী না চায়—সে হিসাবই বা মনোজিনী রাখিবে কিসের জোরে?

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন নিতান্ত পর হইয়া গিয়াছে তাহারা— এ বাড়ীর অন্নে আর রুচি নাই তাদের। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পরিবারে জন্মাইয়াছে বলিয়াই যেন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িয়া আছে এখানে, পরিবেশটা যতটা সম্ভব তফাতে রাখিয়া।

ভাবনা এদের এই স্বাতন্ত্র্য লইয়া।

শশাঙ্কর প্রভুত্ব-প্রিয়তাকে মানিয়া লইতে পরের মেয়ে মনোজিনী দ্বিধা মরে নাই; করিতেছে—শশাঙ্কর নিজের ছেলেমেয়েরা। ইচ্ছা করিয়া এড়াইয়া চলে বাপকে, কথার ফাঁকে ফাঁকে ফুটিয়া ওঠে অবজ্ঞা, চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট ধরা পড়ে তীব্র ঘৃণার ছবি।

মনোজিনী আর কত আগলাইয়া বেড়াইবে? কখন কোন ছুতায় সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এই ভয়ে কাঁটা হইয়া থাকে বেচারা। এক সংসারে দুইটী বিরুদ্ধ শক্তিকে মানাইয়া লইয়া সংসারকে স্বাভাবিক ছন্দে চালানোও কম কথা নয়।

ভয় ছাড়া আর সমস্ত অনুভূতিগুলো ভোঁতা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই হয়তো পারা সম্ভব হয় মনোজিনীর পক্ষে।

মেয়েটিও হইয়া উঠিয়াছে ধিঙ্গি, ভাইদের মতই ইচ্ছামত চরিয়া বেড়ায়। যেখানে খুশী আর

যখন খুশী বাহির হইয়া যায়, যখন খুশী আসে, কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত দেয় না।

অথচ স্বামীর কাছে অনুযোগ করবারও সাহস হয় না মনোজিনীর।

আজও ছেলেমেয়েদেব কলেজ হইতে ফিরিবার সময়টা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও মনোজিনী শশাঙ্কর সামনে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে পারে নাই। মিছামিছি বানাইয়া বলিয়াছে—"আসতে দেরী হবে। তারা বলে গেছে, কোথায় যেন যাবে।"

হয় তো আর একটু থাকিলেই ধরা পড়িত অস্থিরতা; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় টেলিফোনে ডাক পাইয়া নীচে বাহিরের ঘরে নামিয়া গেল শশাঙ্ক।

এখন বরং মনোজিনী জানলায় আর বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া থাকিতে পারে।...এমন দেরী যে ওরা না করে না'ও নয়, তবু আজ মনোজিনীর বুকের ভিতরটা যেন কেমন একটা অহেতুক আশঙ্কায় হিম হইয়া আসিতেছে।...

কেন কে জানে।

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ধৈর্য্য ধরা নিতান্তই কঠিন হইয়া উঠিলে অগত্যা মনোজিনীই বাহিরে খবর পাঠায়—গাড়ী পাঠাইয়া কলেজে খোঁজ লইতে; এবং ইহারই উত্তরে নীচের তলা হইতে খবর আসে, কোথায় নাকি অবাধ্য ছাত্র-ছাত্রীর মিছিল বাহির হইয়াছে। তাহাদের প্রবল প্রতাপে সাম্রাজ্য বুঝি যায়-যায়। চৌধুরী সাহেব এইমাত্র গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন বানচাল নৌকাকে বশে আনিতে।

এমনই জরুরী ডাক যে মনোজিনীকে জানাইয়া যাইবারও সময় হয় নাই শশাঙ্কর।...

কোথায় মিছিল, কিসের দাবী জানাইতে আজ বাধ্য দেশের ছেলেমেয়েরা অবাধ্য হইয়া পথে বাহির হইযাছে সে কথা মনোজিনী জানিতে পারে না। শুধু তাহার মাথার ভিতর যেন অগণিত মানুষের মিছিল আনাগোনা করিতে থাকে...দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা বলে... শিশির সমীর আর অরুণা দূরে দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসে।...পরিহাসের হাসি নয়...ব্যঙ্গ আর অবজ্ঞার বাঁকা হাসি।

ঘন্টার পর ঘন্টা কাটে...মনোজিনী স্তব্ধভাবে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া থাকে।...এই পথ দিয়া যাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে তাহাবা আবার ফিরিয়া আসিবে তো? মনোজিনীর মনের ভিতর আজ এত অমঙ্গল চিন্তা কেন? সে চিন্তাকে তাড়ানো যায় না... প্রেতের মত কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতে চায়।...

বামুন ঠাকুর আসিয়া প্রশ্ন করিল—মা, দিদিমনি দাদাবাবুদের বিকেলের খাবার তো পড়ে আছে, রাত্তিরের খাবার হবে কি?

মনোজিনী এতক্ষণে যেন একটা কথা খুঁজিয়া পায়। বিরক্তকণ্ঠে ঠাকুরকে বলে—খাবার করবে না তো ওরা এসে সেই ঠাণ্ডা খাবার খাবে নাকি? তোমার আক্কেলটা তো বেশ ঠাকুর!

নিজের আক্কেলের দোষ খুঁজিয়া না পাইলেও ঠাকুর অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গীতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সরিয়া পড়ে।

পুরানো চাকর যোগীন আসিয়া রিপোর্ট দিল—মা, মিত্তিরদের বাড়ী, ডাক্তারবাবুর বাড়ী, অনুকূল উকিলের বাড়ী, আর দিদিমনির গান-মাষ্টারের বাড়ী, সক্কল বাড়ী খুঁজে এলাম, কোথাও নেই দিদিমনি দাদাবাবুরা। সবাই বলছে কোথায় নাকি যতো ছেলেমেয়ে মিটিং করতে গেছে—তেনারাও গেছে হয়তো। এখন কী হয়? বাবু জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবেন না। এমনিতেই তো রেগে আগুন হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাবু জানিতে পারিলে যে রক্ষা থাকিবে না সে কথা মনোজিনীর চাইতে বেশী আর কে

জানে? কিন্তু না জানাইয়াই বা রক্ষার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কই? তাই ব্যাকুল হইয়া মনোজিনী 'বাবু'কেই জানাইতে বলে। বলে—এত রাত হয়ে গেল আমি তো আর স্থির থাকতে পারছি না যোগীন, তুমি বরং বাবুকেই একবার ফোন করো—

যোগীন একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল—বাবুকে এখন কোথায় ফোন করবো মা, থানার ভেতর তো বসে নেই? সোজা ঝক্‌মারীর কাজ তো নয়, যখন তখন ছোঁড়াগুলো "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" করে বেড়াবে, মিটিং করবে, হ্যানা চাই ত্যানা চাই করবে—বাবুকেই তো সে সব থামিয়ে বেড়াতে হবে। এর ওপর আবার প্রাণটি হাতে করে কাজ। আজকালকার ছোঁড়াগুলোও তো কম গোঁয়ার নয়! ভদ্রলোকের ছেলে—লেখাপড়া শিখবি, চাকরী করবি, গাড়ী বাড়ী করবি এই তো জানি, তা নয় রাস্তায় রাস্তায় গুণ্ডামী করে বেড়াবে—এ যে কি ফ্যাসানই হয়েছে মা! মনোজিনীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বোধ করি যোগীনের বক্তৃতাশক্তি আরো সতেজ হইয়া উঠে। হাত মুখ নাড়িয়া বলে—আপনিই বলুন না মা, এ কি ভাল হচ্ছে? কি করছিস? লাভের মধ্যে মার খাচ্ছিস্ আব মবছিস্! এ্যাঁ? যোগীন আর একবার অভ্যস্ত উচ্চাঙ্গীয় হাসিটুকু হাসিয়া থামে।

কিন্তু মনোজিনী ভাবিতেছে অন্য কথা, যোগীন থামিতেই কাতরভাবে বলে—একটা ট্যাক্সি ডেকে আমার সেখানে নিয়ে যেতে পারো যোগীন?

—কোথায় মা?

—সেই মিটিঙে—যেখানে তোমাদের বাবু গেছেন।

—পাগল হয়েছেন মা, সেখানে যাবেন আপনি? অনুকূলবাবুর ছেলেরা বললে—খুব নাকি জোর গোলমাল চলছে সেখানে, খুনোখুনি হয়ে যেতে পাবে।

—তা'হলে কি হবে যোগীন?

যোগীন চিন্তিতভাবে বলে—তাই তো ভাবছি মা, আমার তো নিশ্চয় বিশ্বাস দাদাবাবুরা সেখানেই গেছে, এত রাত্তির অবধি কি আর বন্ধুর বাড়ী আড্ডা দেবে? তা'ছাড়া দিদিমনি সুদ্ধ—নাঃ ভারী ভাবনায় ফেলছে সব। তোবা বাপু পুলিশের ছেলে তোদের ওর ভেতর যাওয়া কেন?

মনোজিনী কিছু একটা বলিবাব আগেই মেনকা আসিয়া কহিল—মা, বাবু এই মাত্তর টেলিফোন করলেন—'আসতে রাত হবে'—আর ঠাকুর বলছে—শুধু শুধু বসে থাকতে পারবে না।

—বাবু কোথা থেকে ফোন করলেন?

—তার আমি কি জানি মা? "হেল্লো হেল্লো" করতেই বাবুর গলা পেলুম—"আমাব ফিবতে দেরী হবে, ভাবনার কিছু নেই।"

—আর কিছু বলেন নি? শিশির সমীরের কথা? অরুণাব—

বাধা দিয়া যোগীন বলে—মায়েব কী কথা, বাবু কোথায়—আর দাদাবাবুরা কোথায়? হাজার হাজার লোকের ভীড় হয়েছে—সেখানে কে কার মা বাপ, কে কাকে চিনছে?

—ছেলেদের খোঁজ করবার তা'হলে কোন উপায়ই নেই যোগীন?

—আমি তো কিছু দেখছি না মা! দেখি ডাক্তারবাবুর বাড়ী আর একবার পরামর্শ করে আসি। ওনাদের তো রবীন দাদাবাবু আসেন নি, ডাক্তারবাবুর মা ঘরবার করছে। পোড়া মা গুলোর হয়েছে দগ্ধানি।

খানিকটা ঘোরাঘুরির পর যোগীন আসিয়া খবর দিল—ডাক্তারবাবু, অনুকূলবাবু দুজনেই বল্লেন—"আসে তো আর খানিক পরে আসবে, এতটা রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে আসতে

হবে তো? গাড়ী মোটে চলতে দিচ্ছে না, দেখলেই ইট ছুঁড়ছে আর না হলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আর তা' না তো সেই কাল সকালে আসবে! কোন রাস্তায় নাকি পুলিশও যেতে দেবে না, ওরাও ছাড়বে না, দলকে দল ছেলে রাস্তায় বসে আছে। বলছে—রাতভোর বসে থাকবে।

অতএব মনোজিনীরও আর কিছু কবিবার নাই রাত-ভোর বসিয়া থাকা ছাড়া।

কিন্তু শশাঙ্ক আসিয়া প্রশ্ন করিলে?

মনোজিনীর কাছে কি উত্তর আছে!...ছেলেদের বিপদের আশঙ্কা ছাপাইয়া শশাঙ্কর কাছে জবাবদিহির আশঙ্কাটাই যেন ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে।...হে ভগবান, শশাঙ্ক ফিরিবার দুই মিনিট আগেও যেন ছেলেরা ফিরিতে পারে।

কলির ভগবান কালা, শ্রবণশক্তি তাঁহার অনেককাল লুপ্ত হইযাছে...কাজেই মনোজিনীব প্রার্থনা কোনো কাজে লাগিল না...রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল, ছেলেরা আসিল না—আসিল শশাঙ্ক।

—কি, তুমি এখনো জেগে আছো যে?

মনোজিনী একটু ফিকা হাসি হাসিয়া কহিল—তুমি বাড়ী আসোনি—

—এই দেখ পাগলামী, ওই জন্যেই তো ফোন করে দিযেছিলাম। জানি তো তোমাকে? খাওয়াদাওযা কবোনি নাকি?...কি আশ্চর্য্য, চলো চলো—ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে?

মনোজিনীর অব্যক্ত উত্তব আর আলগা ঘাড়-নাড়ার মধ্যে সদুত্তর ছিল কি না অত লক্ষ্য পড়িল না চৌধুরী সাহেবেব। প্রশ্নটা বাহুল্য মাত্র, সন্দেহের অবকাশই ছিল না।

এতরাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবে—এর মধ্যে সন্দেহের কি আছে?

মনোজিনী কষ্টে গলার স্বর পরিস্কার করিয়া কহিল—হ্যাঁ গো, কি সব হ'ল সেখানে?

—হ'ল আর কি, খানিকটা রক্তপাত। আজকালকার ছেলেগুলো হয়েছে যেমনি ত্যাঁদোর—তেমনি শয়তান! যতক্ষণ না মরবে, ততোক্ষণ জেদ ছাডবে না। গুলি করবার ইচ্ছে আমার ছিল না—কিন্তু বাঁদরামী এত বাড়িয়ে তুললো যে বাধ্য হয়ে—থাক্ থাক্, সে সব কথা শুনলে তুমি আবার মূর্চ্ছা যাবে। চলো এখন খেয়ে নেওয়া যাক্। স্নান করে আসি।

কিন্তু পতিব্রতা মনোজিনীর আজ স্বামীর ক্ষুধার সংবাদেও ব্যস্ততা আসে না...গুলি করবার হুকুম তুমি দিলে?

—কি করবো? উপায় কি?

—মানুষের গায়ে লাগলো তো গুলি?

—পাগলামি কোরো না—শশাঙ্ক বিরক্ত হইযা ওঠে, মানুষের গাযে লাগবে না তো যাবে কোথায় শুনি? সে যে কি ভীষণ ভীড ধারণা করতে পারবে না তুমি! দু'দশটা মরতে তবে ভীড় ভাঙলো।

—শুনলুম নাকি যত ইস্কুল কলেজের ছাত্ররা—

—তবে আবার কি? বাঁদরামি তো তাদেরই বেশী। গোটাকতক মরার দরকারও ছিল, আগুনে হাত দিতে গেলে যে হাত পোড়ে এ খবরটা বাছাধনদের মাঝে মাঝে টের পাওয়া উচিৎ।

—কি দোষ করেছিল তারা যে একেবারে খুন করে শিক্ষা দিতে হবে! হঠাৎ যেন মনোজিনীর চিরবাধ্য বিনীত কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর বাজিয়া ওঠে।

শশাঙ্করও অনেক হয়রানি গিয়াছে, বিরক্ত কণ্ঠে বলে, কি দোষ করেছে না করেছে সে তোমাকে বোঝানো অনেক সময়ের ব্যাপার, কিন্তু তুমি কি রাতদুপুরে আমার সঙ্গে তর্ক করতে

এলে?

—তর্ক নয়, শুধু জানতে চাইছি, কতটা অপরাধে তোমরা গারদে ঠেলে দাও আর কতটা অপরাধে প্রাণ নাও।

—জানবার যদি নেহাৎই সাধ যায়, একদিন সময় করে নিশ্চিন্ত হয়ে শুনো বরং, এখন আর বাজে গল্প করবার ক্ষমতা নেই আমার। শুধু একটা কথা জেনে রেখো, মানুষের অপরাধের তালিকা সীমাবদ্ধ নয়, তাই বাঁধা আইনের মাপকাঠিতে সব বিচার হয় না, নতুন নতুন আইনও সৃষ্টি করতে হয়।

—তোমাদের সেই নতুন আইন বুঝি নিরস্ত্র মানুষকে কুকুরের মত গুলি করা?...

উত্তেজনায় মনোজিনীর সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপে, মুখের উপর আসিয়া জমা হয় প্রবল রক্তোচ্ছাস, তীব্রকণ্ঠে বলে, হুকুম দেবার সময় মনে পড়ে না ওদেরও মা বাপ আছে? তোমার নিজের ছেলেরা যদি থাকতো ওর মধ্যে?

—আমার ছেলেরা?

শশাঙ্ক এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হা হা শব্দে হাসিয়া ওঠে, প্রথম কথা হচ্ছে আমার ছেলেরা ওর মধ্যে থাকতে পারবে না, তবে যদি থাকে নিশ্চই মরবে--ও কি, কে ওখানে?

—আমি।

অরুণা আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছে।

বিশৃঙ্খল কেশ-বেশ। মুখের উপর উদ্ধত অবিনয়ের ছাপ, শাড়ীর আঁচল রক্তে ভেজা।

—এ কি, অরুণা!

কঠোর দৃষ্টিতে একবার মা ও মেয়ে দুইজনের পানে তাকাইয়া চৌধুরীসাহেব রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—এর মানে কি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—কোথায় ছিলাম সে তো আপনারই ভালো জানবার কথা বাবা! যাক্ মা, দয়া করে তোমার চাবিটা একবার দেবে? ছোড়দার একটা ধুতি পাঞ্জাবি বের করে নেব—

—ছোড়দার ধুতি পাঞ্জাবি তুই নিতে এসেছিস কেন লক্ষ্মীছাড়ি! বল্ শীগগীর কোথায় সে?...মনোজিনী বাঘিনীর মত মেয়ের উপর প্রায় ঝাঁপাইয়া পড়ে।...কোথায় ছিলি তোরা বল্, কোথায় তোর দাদারা?

আশ্চর্য্য! অরুণা এতটুকু বিচলিত হয় না! এমন অদ্ভুত শক্তি কোথায় পাইল ইহারা? কোন ফাঁকে অর্জ্জন করিল এত দুঃসাহস?

—ছোড়দা কোথায়, সে কথা আমি বলতে পারব না মা, বরং বাবাকে জিগ্যেস কোরো! বড়দা আছে নীচে, বাড়ীর বাইরে। জিনিষ দুটো শুধু দয়া করে দিয়ে দাও আমায়। এও নতুন সিল্কের পাঞ্জাবি আর ভাইফোঁটার ধুতিটা।

—ডাক শিশিরকে! চৌধুরীসাহেব হঠাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়েন, কিসের জন্যে বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে? কৈফিয়ৎ চাই আমি কোন সাহসে তোমরা দুপুররাতে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও? ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে হল্লা করো? লজ্জা করে না?

সামান্য একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অদ্ভুত একরকম হাসির সঙ্গে অরুণা বলে—করে বৈকি বাবা অহরহ করে। লজ্জায় মরে যাই, যখন দেখি এ বাড়ীর অন্ন স্বচ্ছন্দে গলা দিয়ে নামছে! এ সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়াসে গায়ে কাঁটা ফোটে, জগতের সামনে নিজেদের পরিচয় দিতে। ওই যত 'ছোটলোক'দের চাইতে যে কত ছোট আমরা, সে কথা চিন্তা করলে সত্যিই

ওদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা করে।

—বটে নাকি, খুব যে লম্বা লম্বা বুলি কপচাচ্ছো, এসবের গুরুটি কে শুনতে পাই না? ভেতরে ভেতরে এতদূর তৈরি হয়ে উঠেছো তা জানতাম না। এসব তোমার প্রশ্রয়ের ফল তা জানো?

রাগের ঝাল গিয়ে পড়ে মনোজিনীর উপর।

কিন্তু মনোজিনীরই বা হঠাৎ জুজুর ভয় কমিয়া আসিতেছে কেন?

স্বচ্ছন্দে বলিয়া বসিল, আমার প্রশ্রয়ের ফলে যদি ওরা মানুষ হয়ে উঠে থাকে সেই আমার জীবনের পুরস্কার! শশাঙ্কর অগোচরে আজকাল বাড়ীতে বড় বড় কথার চাষ হইতেছে নাকি? কিন্তু কথার তড়পানিতে শশাঙ্ক চৌধুরী কাবু হন না। কোন অস্ত্রে কাকে জব্দ করা যায় সে বিদ্যা জানা না থাকিলে অনুল্লেখযোগ্য তুচ্ছ একটা পদ হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া আর উচ্চ সম্মানের মগডালে চড়িয়া বসিতেন না। তাই রূঢ়কণ্ঠে যতদূর সম্ভব কর্কশতা আনিয়া বলেন, অরুণা, তোমার এই লক্ষ্মীছাড়া বেশভূষা আব রাতদুপুরে বাইরে বেরোনোর কারণ কি আমি জানতে চাই। চরিত্রের সন্দেহ কবে দূর করে দিতে পারি তোমায়, তা জানো?

অবহেলাব সুরে অরুণা উত্তব কবে—তাও হয় তো আপনি পাবেন; কিছুই অসম্ভব নয় আপনার পক্ষে।

—বটে, বটে! কার সামনে কথা বলছো খেয়াল নেই লক্ষ্মীছাড়া বদমাইস মেয়ে! কোন সাহসে এত স্পর্দ্ধা তোমাব?

ঝুলন্ত চুলগুলো মুখের উপব হইতে সরাইয়া দিয়া অরুণা তেমনি অকম্পিত গলায় উত্তর দেয়—শুধু মানুষ হযে জন্মানোব সাহসে বাবা, পুলিশের বড কর্ত্তার মেয়ে বলে নয়। দাদাকে ডাকতে বলেছিলেন? এ বাডীব চৌকাঠে পা দেবার প্রবৃত্তি তার আর নেই। ভয় নেই আমিও যাচ্ছি, শুধু মাকে একবার জানানো দরকার বোধ কবছিলাম। ওকি মা, ভুল চাবি দিয়ে আলমারি টানাটানি কবছ কেন? ওটা যে ড্রয়ারেব চাবি।

ততক্ষণে চাবিব কল সমেত খুলিয়া আসিয়াছে আলমারীর কপাট। উন্মত্তের মত কাপড়ের গোছা ছড়াইয়া ফেলিয়া মনোজিনী সমীরেব সিল্কের পাঞ্জাবি খুজিতেছে।...সিল্কের পাঞ্জাবি আর ভাইফোঁটার নতুন ধুতি।

রাত্রি এক সময় শেষ হয বৈকি। প্রকৃতি কবে কার মুখ চাহিয়া কাজ করিয়াছে?...ভোরের আলো চোখে লাগিতেই চৌধুরী সাহেব হঠাৎ চমকাইয়া ওঠেন। বিশ্রী খাকির সুটটা এখনও ছাড়া হয় নাই কেন? অসময়ে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন নাকি?...গত রাত্রের ঘটনাগুলো দুঃস্বপ্ন নয় তো? বাড়ীটা এত নিস্তব্ধ কেন? বাডী শুদ্ধ সকলে ঘুমাইতেছে নাকি? ভোরের আলো ওদের শীতরাত্রের সুখ-শয্যার উপর এখনও হানা দেয নাই বুঝি?

অভ্যাসমত যোগীন বলিয়া ডাক দিতে গেলেন, স্বর ফুটিল না। ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা বসিয়া গিয়াছে হয় তো।... কিন্তু স্বপ্ন কি দিনের আলোতেও টিকিয়া থাকে? আলমারীর কপাটটা হাঁ করা কেন? ঘরের মেঝেয় এত জামা কাপড় ছড়ানো কিসের? সেই তখন কি যেন হাতে করিয়া মনোজিনীও ছুটিয়া নামিযা গিয়াছিল না অরুণার পিছন পিছন?...ঠিক মনে পড়িয়াছে, সমীরের জামা কাপড়। কিন্তু শীতেব দিনে হঠাৎ পাঞ্জাবি পরার সখ কেন সমীরের?

আচ্ছা মনোজিনীর হাত চাপিয়া ধবিয়া আটক করিতে গিয়াছিলেন না চৌধুরী সাহেব? হাত

ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে মনোজিনী। শশাঙ্ক চৌধুরীর হাত ছাড়া হওয়া তো সহজ কথা নয়, এত সাহস কোথায় পাইল মনোজিনী? কিন্তু শুধুই তো মনোজিনী নয়...ঘরে বাহিরে দুঃসাহসের ছড়াছড়ি।... পথের ধূলিকণাটাও যেন দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধায় রুখিয়া দাঁড়াইতে চায়...এত স্পর্দ্ধার এত দুঃসাহসের যোগানদার কে?...ওই আবার গোলমাল সুরু হইয়াছে না? শশাঙ্কর নিজের বাড়ীর সামনেই তো! হল্লা করিবার আর ঠাঁই পায় নাই বুঝি বদমায়েসের দল?

ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগীন আসিয়া হাউ হাউ শব্দে কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়ে, ও বাবু—বাবু গো!...ছোট দাদাবাবুকে এখেন দিয়েই নিয়ে যাচ্ছে...আমাদের সোনার ছোট দাদাবাবু গো—

স্তম্ভিত দৃষ্টি মেলিয়া উপব হইতে নীচের দিকে চাহিয়া থাকেন চৌধুরী সাহেব। সোনার ছেলে? আহা সোনার ছেলেই বটে! প্রথম ভোরের সোনালী আলো আসিয়া পড়িয়াছে চন্দনপরা সুন্দর মুখখানিতে... নতুন সিল্কেব পাঞ্জাবিটা পরিয়াছে নাকি?

নাঃ, কিছুই দেখা যায় না, আস্ত মানুষটা ঢাকা পড়িয়াছে ফুলের ভারে।...এত ফুল লোকে কোথায় পায়?... কই শশাঙ্ক চৌধুরীর তো কখনো একটাও ফুল চোখে পড়ে না!

শোভাযাত্রাকারীর দল চলিতে চলিতে রাস্তা ছাড়াইয়া যায়, ক্রমশঃ মিলাইয়া আসে সমস্ত কোলাহল, শেষ মানুষটির পদচিহ্নও মুছিয়া যায়। শিশির...অকণা... মনোজিনী—উহাদের পদচিহ্নও মুছিয়া গেল যে! শশাঙ্ক চৌধুরীর বাড়ীর সুমুখ দিয়া অনায়াসে চলিয়া গেল ওরা? নিতান্ত অপরিচিতের মতো? চোখ তুলিযা একবার তাকাইয়া দেখিতেও রুচি হইল না বুঝি।

শশাঙ্ক চৌধুরীর স্ত্রী কন্যা দিনেব আলোয় রাজপথের উপব দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে হাজার লোকের গায়ে গা মিলাইযা? এ কী! কেমন করিয়া এত দুঃসাহস হইল ওদের?

অকস্মাৎ একটা জটিল প্রশ্নের উত্তব মিলিযা যায়।

এতো দুঃসাহসের যোগানদাব কে?...অনেকদিন একথা ভাবিযাছে শশাঙ্ক চৌধুবী।

সমীরের মৃত্যুজ্যোতির্ম্ময মুখের ছবিতে সেই উত্তর লেখা রহিয়াছে? সত্যই তো, চরম ভয় তো মৃত্যুর, তাই পরম সাহসও আসিতেছে তাহারই ঘর হইতে। মৃত্যু ভয়টাকে একবার তুচ্ছ করিতে পাবিলেই তো সর্ব্বভয়শূন্য হওয়া যায়।

[১৩৫২]

আমায় ক্ষমা করো

প্রায় আধখানা গ্রাম জুড়িয়া যে ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদশ্রেণী বহিয়া ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মত ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে, আজও তাহারা দর্শকের মনে একটা সকরুণ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে।

মজুমদার বংশের অতীত মহিমার মূক সাক্ষী।

একদিন নাকি ইঁহাদের "রাজা" বলিয়া খ্যাতি ছিল।

'বারমহল', 'অন্দরমহল', 'কাছারিঘর', 'নাটমন্দির', 'দুর্গাদালান', 'ভোগমণ্ডপ', 'রান্নাবাড়ী' ইত্যাদি নামের আড়ালে ভাঙা ইঁটের স্তূপের ভিতর যে অস্পষ্ট ছবি ভাসিয়া ওঠে তাহার সামনে মাথাটা আপনিই কেমন নত হইয়া আসে, আর আসে একটা 'হায় হায়' ভাব...কেমন ছিল

সেই বিচিত্র সমারোহের কোলাহলময় দিনগুলি...কেমনই বা ছিল ইহাদের অধিবাসীরা...যাহারা এখানে একদিন জন্ম-মৃত্যু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে! ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে এখনও কি তাহাদের অতৃপ্ত নিঃশ্বাস জড়াইয়া আছে? ভোগের এই অজস্র উপকরণ ফেলিয়া যাওয়ায় অতৃপ্তি?

চৈত্র-বৈশাখের এলোমেলো সন্ধ্যায় কপাট-খসা জানলার ফোকরে ফোকরে যে আর্তস্বর হাহাকার করিয়া ফিরে—সে কি তাহাদেরই সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস?

চামচিকা ও গোলাপায়রার ঝাঁক ছাড়া এখানে অন্য কোন জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব বাহির হইত বিশ্বাস করা শক্ত—বরং বেশী সহজ ভূতের অস্তিত্ব কল্পনা। তবু আছে সে অস্তিত্ব।

হয়তো নেহাৎ নিরুপায় বলিয়াই আছে।

অন্দরমহলের মধ্যে যে ঘরগুলো এখনো কোনো প্রকারে টিকিয়া আছে তাহারই একখানিতে থাকেন "নতুনগিন্নী"। নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, মাজাভাঙা খুনখুনে বুড়ি, চোখের চাহনি নিষ্প্রভ, শুধু গলার জোর আছে সমান।

দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার হোঁচোট্ খাইতে খাইতে কোন গতিকে বুড়ি নিজের পেটের ব্যবস্থা করিয়া লয়, আর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে সুরু করিয়া পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ দেব-দানব সকলের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকে।

বিশ্বসংসারে সকলের উপর ওর অদ্ভুত এক বিজাতীয় ক্রোধ। পৃথিবীটাকেই দাঁতে পিষিয়া ফেলিতে পারিলে যেন ওর শান্তি হয়।

গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের তাপ অসহ্য হইলে ভাঙা কোমর সোজা কবিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কোমবে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া চোখের উপর হাত আড়াল করিয়া আকাশমুখী হইয়া তীব্রস্বরে বলে—'মরছ আগুন জ্বেলে? পুড়িয়ে মারছো পৃথিবীকে? তোমার মরণ হয় না অনামুখো? ভর্ দুপুরে শাপ দিই তোমায়—জ্বলে পুড়ে মরো, জ্বলে পুড়ে মরো।'

অবশ্য সূর্য্যদেবের গায়ে ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাতের আগুন স্পর্শ করে কি না তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু বুড়ির এই অযথা শক্তিক্ষয়ে আলস্য নাই।

আবার বর্ষার দিনে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ ছাপাইয়া অসন্তোষ মুখর হইয়া ওঠে —'ঝাঁটাখেকো দেবতা, কেঁদে মরছেন, কোন্ যমে ধরেছে তোমায়?

কাক চিল ইঁদুর আরশোলা সকলের সঙ্গেই প্রতিপক্ষের ভঙ্গিতে বাক্যবাণ বর্ষিত হয়।

উঠানের ওপারে শ্যামাকে দেখা গেল...দুই হাতে একগোছা সজিনা ডাঁটা ও একটা পোকা বেল, কোঁচড়ে কয়েকটা পাতিলেবু। নতুনগিন্নিকে দেখিয়া অপ্রতিভের ফিকা হাসি হাসে...সাধ্যপক্ষে ইহার সামনে পড়িতে চায় না সে।

শ্যামাকে দেখিয়াই তেলেবেগুনে জ্বলিযা ওঠে বুড়ি—এই যে পাড়া বেড়ানি 'খুদ মাঙুনী' এলেন! সক্কাল বেলাই লোকের দোরে গিয়ে হাত পাততে লজ্জা করে না শামি? অমন পেটে আগুন ধরিয়ে দে, আগুন ধরিয়ে দে! ভাতার-পুতের সংসার নয়—একটা পোড়া পেট, তার জন্য এত আহিখ্যে? ছিঃ ছিঃ, আমি হলে গলায় দড়ি দিতুম।

শ্যামার যে এ বাড়িতে সত্যকার কি দাবী আছে সেটা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, হয়তো অতি সূক্ষ্ম একটু সম্বন্ধের রেশ থাকিলেও থাকিতে পারে, হয়তো কেবলমাত্র আশ্রয়হীনতার দাবীতেই সে আছে। অথচ এতবড় ভাঙা বাড়ীতে তাহার মন টেঁকে না, তাই সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সময় অসময়ে লোকের উপকার করিতেও ছাড়ে না এবং ভদ্রতার আবরণে

ভিক্ষাবৃত্তি করিয়াই তাহার দিন চলে।

আরো একজন বাসিন্দা আছে সে হৈমন্তি।

প্রেতপুরীর অন্ধকার গহ্বরেও কি সোনার প্রদীপ জ্বলে? জ্বলিলে হয়তো হৈমন্তির সঙ্গে তুলনা করিবার মত বস্তু একটা মিলিত।

এ বাড়ীর শেষ বংশধর সমুদ্রনারায়ণের স্ত্রী হৈমন্তী। সৌন্দর্য্য আর সুলক্ষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া আনা মেয়ে। কিন্তু কোষ্ঠিকারকদের শাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া হৈমন্তীর জীবন-ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে অদ্ভুত অলক্ষণের মধ্যে।

নিতান্ত দরিদ্রের ঘর হইতে যখন এ বাড়ীতে বধূ-বেশে আসিয়া দাঁড়াইল হৈমন্তী, তখনও—বাজনার শেষে সুরের রেশের মত এদের পূর্ব্ব গৌরবের কিছু জের আছে। জীর্ণ জামিয়ারের আংরাখা গায়ে দিয়া আর চওড়া কল্কাপাড় শান্তিপুরী ধুতি পরিয়া দাদাশ্বশুর বিশ্বনারায়ণ রূপার থালায় পাঁচখানি আকবরী মোহর দিয়া কন্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

হৈমন্তী পশ্চিমের মেয়ে, দরিদ্র পিতার ঘর হইতে সে প্রচুর ঐশ্বর্য্য বহিয়া আনিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু আনিয়াছিল অনবদ্য রূপ আর অপূর্ব্ব সঙ্গীতানুরাগ। ইহাদের বনেদী জমিদারের ঘরে মলপরা নোলোকপরা অষ্টাঙ্গ গহনায় মোড়া মেয়েদের মাঝখানে হৈমন্তী যেন একটা আবির্ভাব।

তা সমুদ্র তাহার মান রাখিয়াছিল, সনাতন নিয়মের গণ্ডী কাটাইয়া তাহার জন্য রাখিয়াছিল অনেকখানি আকাশ, অনেকটা আলো। কিন্তু কয়দিনই বা? উৎসবাড়ীর হাজার বাতির ঝাড়ের মত নিমেষে মিলাইয়া গেল সেই সমারোহের দিনগুলি।

সে দিন চাঁদ উঠিয়াছিল......সদ্য ফোটা চাঁপাফুলের মদির গন্ধে বাতাস ছিলো উন্মনা......দীঘির ঘাটের বাঁধানো চাতালে হৈমন্তী বসিয়াছে সেতার হাতে......জ্যোৎস্নায় মাজা দেহ, পরণে নীলাম্বরী......পায়ের কাছে সমুদ্রনারায়ণ......

হৈমন্তী বলিয়াছিল—আজ আর বাজাতে ভাল লাগছে না, কি জানি কেমন যেন ভয় করছে। মনে হচ্ছে—

—কি মনে হচ্ছে বল তো?

—মনে হচ্ছে এত সুখ বুঝি সইবেনা—বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ—

নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে কথার শেষ হারাইয়া গিয়াছিল। সমুদ্র হাসিয়া বলিয়াছিল—বুকের এত কাছে থেকে ভয় কেন হৈম? কিসের ভয়? ওটা দক্ষিণে হাওয়ার গুণ। কবিরা তাই বলেন, মাতাল বাতাস! তোমার সেই সুরটা বাজাও, সেদিন ছাদে বসে যেটা বাজালে।

হৈমন্তী ধীরে ধীরে বাজনাটা তুলিয়া লইয়াছিল—কিন্তু হাত খুলিল না, সুর কাটিয়া গেল বার বার। কাতরভাবে বলিয়াছিল—আজ থাক্—শুধু তুমি আমার আরো কাছে এসো, খুব কাছে।

—আরো কাছে? সমুদ্র হাসিয়া ফেলিল কিন্তু হাসির সুর মিলাইবার আগেই বাড়ীর ভিতর হইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ক্ষীরোদা ঝি—দাদাবাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে—

—কি রে ক্ষীরোদা, ব্যাপার কি?

—ইন্দির দাদাবাবু নাকি বাগ্দীপাড়ায় গিয়ে কি কেলেঙ্কারি করেছিল, তারা পাড়া ঝেঁটিয়ে লাঠি নে' তেড়ে এসেছে—

মুহূর্তে মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল...আবার এই কাণ্ড? এই সেদিন ইন্দ্রের জন্য কত হাঙ্গামা কত অপমান সহিতে হইল। পুলিশকে আক্কেল সেলামী দিতে গিয়া সমুদ্রের উঁচু মাথাটা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। পিসির ছেলেকে লইয়া নিত্য এত ঝঞ্ঝাট পোহানোর দায় কিসের?

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই ভীত ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিয়া কাতরভাবে বলিল—ছোড়দা, তোমার পায়ে পড়ি বাঁচাও, ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে—

—ওরা? ওদের হাতে পড়বার আগে আমিই তোমায় খুন করবো রাস্কেল—

আচম্‌কা একটা ধাক্কা খাইয়া ইন্দ্র উঁচু রোয়াকের উপর হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল শানবাঁধানো উঠানে।

আশ্চর্য্য! পড়িল আব উঠিল না!

সমুদ্রকে জব্দ কবিবাব জন্য সত্যই খুন হইয়া গেল ইন্দ্র!

জোয়ান ছেলে, স্বাস্থ্য সবল দেহ, এতোটুকু উঁচু হইতে পড়িয়া মরিয়া যায? হয় তো আশঙ্কায় আর উত্তেজনায় স্নায়ুশিবায টান হইযাছিল, এতটুকু আঘাতেই ছিঁড়িযা খান্ খান্ হইযা গেল।

এখনও সে দৃশ্য চোখেব উপর ভাসিযা উঠে হৈমন্তীর। উঠানেব মাঝখানে ইন্দ্রব মৃতদেহ ঘিরিয়া বাগ্‌দী প্রজাদেব নীরব জনতা, একজনের হাতে একটা মশালের আলো দপদপ কবিতেছে....দুরন্ত বাতাসে তাহার সঞ্চরণশীল আলোছায়ায় সমুদ্রনারায়ণ মুহূর্তে মুহূর্তে যে হারাইয়া যাইতেছে।

চাঁদ বোধ কবি তখন অস্ত গিয়াছে।

কেমন কবিয়া সেই বাগ্‌দীদের সাহায্যেই লাশ সবানো হইল, কেমন করিযা তাহাদেব নির্ব্বন্ধে সেই রাত্রেই সমুদ্র গ্রাম ছাড়িয়া ফেবার হইল, সে সব কথা এখন আর হৈমন্তীব বোধ করি ভাল মনে পড়ে না।

শুধু সমুদ্রের শেষ কথাটা মনে পড়ে....'পুলিশের হাতে ধরা দেবাব সাহস খুঁজে পাচ্ছি না হৈম, তোমাকে বিধবা করতে পারব না...পারব না তোমায় ফেলে মরতে..."

তাই দীর্ঘ এক যুগ বৈধব্য আর সাধব্যের অদ্ভুত ত্রিশঙ্কুলোকে কাটাইয়া আসিতেছে হৈম। আর মাস দুই গেলেই সিঁদুর মুছিয়া থান ধরিবার ব্যবস্থা, এক যুগ কাটিয়া গেলে নাকি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া গণ্য কবিতে হয।

আঠারো বছর হইতে ত্রিশ বছরের দরজায় আসিতে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে হৈমন্তীকে, সেকি এতই ক্লান্তিহীন? খুনীর স্ত্রী, ফেবারী আসামীর স্ত্রী, এই ঘৃণ্য পবিচয় লইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছে হৈমন্তী কি হিসাবে?

হয়তো মবিবার সাহস সেও খুঁজিয়া পায় নাই।

সমুদ্র যদি কোনদিন ফিবিযা আসে...যদি ডাক দেয...সাড়া দিবে কে?

শবরীব প্রতীক্ষার মতই বুঝি ধৈর্য্যহীন প্রতীক্ষা হৈমন্তীর।

তবু এ বাড়ীতে টিকিয়া থাকা আশ্চর্য্য বইকি! কেবলমাত্র শ্যামা আব নতুনগিন্নির মত লোকের আবহাওয়ায় হৈমন্তীব মত মেযে এতদিন কাটাইল কেমন করিয়া, যেখানে রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে? দারিদ্র সহ্য করা সহজ, কিন্তু নির্লজ্জ নগ্নতা সহ্য করা কঠিন নয কি?

সমুদ্রের ফটোয় টাটকা মালাগাছটি পরাইয়া বাসি, মালাটি খুলিয়া জল ভাসাইয়া দেওয়া হৈমন্তীর নিত্য কাজ। নতুনগিন্নিব যে সে কথা জানা নাই এমন নয়, তবু খিড়কির দরজায় শাড়ীর পাড়ের

শেষাংশটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুনগিন্নি ওদিককার দালান হইতে চীৎকার করিয়া শ্যামাকে প্রশ্ন করেন—মেমসাহেবটি কোথায় হাওয়া খেতে বেরুলেন লা শামি?

—কি জানি, দীঘিতে বুঝি—

—'কি জানি' কি লা? জানিস না তুই? ন্যাকা! বলে, চোবের সাক্ষী গাঁটকাটা আর শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। কিন্তু এও বলি মা, ঘরের বৌ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বাড়ীর বার হওয়া কিজন্যে। মালা গাঁথছেন—ফুল ভাসাচ্ছেন—কত রঙ্গই জানেন। এই তো—আমার ষোলো বছর বয়সে সোয়ামী গিয়েছিল, বলুক দিকিন্ কেউ, কোনো দিন আদিখ্যেতা করতে দেখেছে?

তাঁহাকে ষোলো বছর বয়সে দেখিবার সৌভাগ্য যাহাদের হইযাছিল—তাহারা অবশ্য কেহই উপস্থিত নাই, তবু শ্যামা তোষামোদের ভঙ্গীতে সায় দেয়।

—তোমাদের সঙ্গে কাব তুলনা দিদিমা—

দিদিমা বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে বলিয়া উঠেন—খোসামোদ করিসনে শামি, খোসামোদ শুনলে গা জ্বলে যায়।

নিঃশঙ্ক পথিককে এইরূপ আকস্মিক আক্রমণ করিয়া বসা তাঁহার স্বধর্ম্ম। শ্যামা অপ্রতিভ মুখে বসিয়া থাকে, চট কবিয়া উঠিতে পারে না এবং আলোচনাটা ভিন্ন খাতে বহাতেই বোধ করি একটা নূতন সংবাদের অবতারণা করে।

—সকাল বেলা আমাদের দীঘির ঘাটের ওদিক থেকে আসতে একটা মানুষ দেখলাম দিদিমা—কোট 'পেন্টুল' পরা লম্বা জোয়ান লোকটা, গোরাই হবে নাকি কে জানে, বকুল গাছের ওদিকটায় ঘুর ঘুর করছিল দেখে কেমন ভয-ভয করলো পালিয়ে আসতে পথ পাই না—মনে হল—নতুন এসেছে গাঁযে—

—তা মনে হবে বইকি, তোমার তো আব গাঁ-সুদ্ধ চিনতে কাউকে বাকী নেই। বলি পালিয়ে এলি—বললি না কিছু?

—আমি কি বলবো বাবা? কোট 'পেন্টুল' দেখলে আমাব ভয কবে।

—কচি খুকি! মেযে-ঘাটে পুরুষ আসে কোথা থেকে তাব হিসেব নেই? আজ এসেছে কি রোজ আসে কে জানছে? ও সব মালা ভাসানোর লীলা-খেলা কেন তাই বা কে জানে? কালামুখী তলে তলে কি কীর্ত্তি করছে তা' ভগবানই বলতে পাবেন। সোয়ামী যার বাবো বছর দেশত্যাগী, তা'র পরিবারের এখনো সেমিজ কামিজ পবে পটের ছবি হযে বেড়াতে লজ্জা করে না! ধন্যবাদ!

নতুনগিন্নির মর্য্যা রাখিতেও হৈমন্তী সম্বন্ধে এতবড় কথাটায় স্পষ্ট অভিমত দিতে মুখে বাধে শ্যামার। নতুনগিন্নি পুনশ্চ যোগ করেন, বুড়ো হযেছি, কোমর পড়ে গেছে, চারদিকে চোখ রাখবার ক্ষ্যামতা নেই, নইলে দেখিয়ে দিতাম সবাইকে—বলিয়া হাপাইতে থাকেন।

ঘাটের পথ হইতে ফিরিয়া হৈমন্তী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—কাগজ এখনো দিয়ে যায়নি শ্যামা ঠাকুরঝি?

—কই না।

নতুনগিন্নি কাঠের উনানে ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে ঘরের ভিতর হইতে খনখনে গলায় বলেন—মেম সাহেবের রোজ খবরের কাগজ না পড়লে চলে না—ধন্যি বাবা, আমি হলে এতদিন গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতাম, ছিঃ। ঘাটে পথে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াবার সাহস

কি অমনি আসে?

চব্বিশ ঘণ্টা কাগজ কেতাব নিয়ে থাকলেই বুকের পাটা বাড়ে।

হৈমন্তী বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দুই দণ্ড শ্যামার মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

হৈমন্তী কবে কাহার সঙ্গে আলাপ করিল? ঘৃণায় লজ্জায় পৃথিবীর বুক হইতে নিজেকে তো প্রায় লুপ্ত করিয়াই রাখিয়াছে। শুধু একখানি খবরের কাগজের সেতু দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে এতটুকু একটু যোগসূত্র রাখা।

কিসের আশায় যে রাখিয়াছে সে কি নিজেই জানে? বুভুক্ষুর মত তন্ন তন্ন করিয়া সমস্তটুকু না পড়িলে তৃপ্তি হয় না কেন কে বলিবে?

কিন্তু নতুনগিন্নির মিথ্যা দোষারোপকে আর মিথ্যা বলা চলে কই? সন্ধ্যার অন্ধকারে দোতলার বারান্দার এককোণে হৈমন্তী অমন থর থর করিয়া কাঁপে কেন—শ্যামা-বর্ণিত সেই "সাহেবের মতন" লোকটার সামনে দাঁড়াইয়া? অমন ভয়কাতর অস্থির ভাব কেন দু'জনের?

অমন আকুল আগ্রহে সে হৈমন্তীকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল কোন সাহসে? কে সে? সমুদ্রনারায়ণ? সমুদ্র এখনো বাঁচিয়া আছে?......

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া হৈমন্তী কম্পিতকণ্ঠে কহিল—লুকিয়ে পালিয়ে যাবো? লোকে কি বলবে?

—লোকে যা খুসী বলুক না হৈম, ক্ষতি কি? তোমাকে নিয়ে যাবো আমার সেই নতুন রাজত্বে, জঙ্গল কেটে যেখানে গড়ে উঠছে নতুন শহর, সেইখানে নতুন করে গড়বো আমাদের সংসার। সেখানে আমি সমুদ্র নয়, আমি 'মিষ্টার মুখার্জ্জি'।

—নাম বদলেছো?

—বদলাবো না? বারে! পুলিশের ভয়ে নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তুমি যখন চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে থেকেছ—আমি তখন প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটোছুটি করেছি কুলিমজুরের কাজ নিয়ে।......

দীর্ঘকাল জাপানে আমেরিকায় কাটাইয়া অনেক ভাগ্য-বিপর্য্যয়েব মধ্য দিয়া সমুদ্র অবশেষে কেমন কবিয়া আজ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ফরেষ্ট অফিসার হইয়া বসিয়াছে—সঞ্চয় করিয়াছে প্রচুব অর্থ, তাহারই ইতিহাস শুনাইতে বসে হৈমন্তীকে। পাহাড়ের কোলে জঙ্গল ঘেঁষিয়া তাহার বাড়ীখানি, আরামের আর বিলাসের সমস্ত উপকরণ আনিয়া বোঝাই করিয়াছে হৈমন্তীর জন্য, শুধু হৈমন্তীকে ঘিরিয়া তাহার এতদিনের স্বপ্ন আর সাধনা।

—একবারও তো খোঁজ নিলে না? যদি মরে যেতুম?

—কক্ষনো না, আমি নিশ্চয় জানতাম হৈম, আবার আমাদের দেখা হবে। আমার তপস্যা ব্যর্থ হবে না।

হৈমন্তীও সমুদ্রর মতন অমন সুন্দর করিযা বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না, বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পারে শুধু।

কান্না আর কথার মধ্য দিয়া রাত্রি গভীর হইতে থাকে......শেষ রাত্রে হৈমন্তীকে লইয়া পলাইয়া যাইবে সমুদ্র, রোমাঞ্চকর সেই কল্পনায় মুখর হইয়া ওঠে সে—পরের বৌ নিয়ে পালানোয় তো নতুনত্ব নেই হৈম, তাই নিজের বৌ নিয়ে পালাবো আমি! বেশ চমৎকার মৌলিক হবে না ব্যাপারটা?......তুমি অমন কাঁদছ কেন বল তো? কত পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে, কত অগাধ

সমুদ্র পার হয়ে ফিরে এলাম তোমার কাছে—সারা রাতটুকু কেঁদেই নষ্ট করবে?...আচ্ছা এদিকে কেউ এসে পড়বে না তো? এতদিন পরে আবার ধরা পরতে রাজী নই কিন্তু।

—কেই বা আছে? নতুন ঠাকুমা সিঁড়ি উঠতে পারেন না, শ্যামা ঠাকুরঝিব ভূতেব ভয়, সন্ধে হলে ঘরের বার হয় না।

—তা'হলে আজকের রাতটুকু নির্ভয়ে আশ্রয় পেতে পারি তোমার ঘরে?

ঘরে খিল লাগাইয়া সাবধানে আলো জ্বালে হৈমন্তী।

—ঘরের চেহারাটা প্রায় একই রকম রেখেছে দেখছি, কি আশ্চর্য্য লাগছে হৈম, সেই পালঙ্ক, সেই আয়না দেরাজ ছবি আলমারি, সেই জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তোমার মুখে, সেই তুমি প্রায় তেমনই সুন্দর রয়ে গেছ, যেন কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটে নি তোমার জীবনে, যেন আমি এই কিছুদিনের জন্য শুধু বিদেশ ঘুরে এলাম, অথচ কত ঝড় বয়ে গেল আমার জীবনে...

টুক্‌রো কথা...টুক্‌রো হাসি...

এ ছবি কার? গুরুদেবটেব নয় তো? কি আশ্চর্য্য এই হতভাগার ছবিতেও মালা ঝোলে? নিলাম এটা আমি, আজ আমার পাওনা। বিশ্রী এই খাকির পোষাকে ফুলেব মালা মানায না, কি বল? ..কাপড? ...ধুতি? ধুতি কি আমি সার্টের পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছি?...তুমি দেবে? আমার জামা কাপড তুলে বেখেছ এতকাল ধরে? হৈম...হৈম...

—তুমি কি কাউকেই দেখা দেবে না? নতুন ঠাকুমা, শ্যামা, ক্ষীবোদা—কাউকে বলব না?

—পাগল হয়েছ? বললে চাপা থাকবে না, ষ্টেশনে ষ্টেশনে হুলিয়া বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে রূপকথার রাজপুত্তুর পক্ষীবাজ ঘোড়ায় চেপে এসে বাতারাতি দুঃখিনী বাজকন্যাকে নিয়ে উধাও। দেখছো...খুব বুড়ো হযে যাইনি কিন্তু হৈম। এত সুখ কি আমাব জন্যে সত্যিই তোলা ছিল?......

কথার শেষ নাই, বাত্রিব শেষ আছে। পাণ্ডুব চাঁদেব ফ্যাকাশে হলদে আলো ভোবেব নতুন আলোর কাছে সহসা কোন ফাঁকে আত্মসমর্পণ করিযা বসিবে কে জানে!

হয়তো একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল...তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সমুদ্র হৈমন্তিকে ডাকিয়া তোলে—'মিসেস মুখার্জ্জি', উঠুন উঠুন—তৈরী হযে নিন, চারটে চল্লিশের ট্রেন ধরতে হবে, অবাক হয়ে তাকাচ্ছো কি? মনে নেই আমি আর শ্রীল শ্রীযুক্ত সমুদ্রনারায়ণ মজুমদার নয়—মিষ্টার এস্ মুখার্জ্জী, কাজেই তুমি মিসেস মুখার্জ্জী।...তোমার ওই আধা ধুতির মত বিশ্রী শাড়ীটা আমার ভারী খারাপ লাগছে কিন্তু, ভালো একটা কিছু পরে নাও চট করে।

—ভালো আর কি আছে? হৈমন্তী ম্লান হাসে।

আশু বৈধব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে চওড়াপাড় শাড়ী অনেকদিন ছাড়িয়াছে সে।

—তবে থাক, যা আছে থাক, মনের সাধ মিটিয়ে সাজাবো এর পরে। শুধু দেরী করে ফেলো না লক্ষ্মী রাণী আমার, সকাল হয়ে গেল, ভাবো অবস্থাটা!

হৈমন্তী শূন্যদৃষ্টি মেলিযা চারিদিকে চাহিয়া দেখে... এই তাহার চিরপরিচিত আবেষ্টন, তাহার ধ্যান, ধ্যানেব দেবতা, শুচিস্মিতনির্ম্মল জীবনখানি, এই মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিয়া যাইতে হবে। শুধু

মালা গাঁথিয়া ফুল ভাসাইয়া বাকী জীবনটুকু কাটানো যায় না? সহসা সমুদ্রের এই রূঢ় পোষাক পরা বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহখানা হৈমন্তীর নির্জ্জন একক শয্যায় কেমন বেমানান অশুচি লাগে।

হৈমন্তীর জীবনে সমুদ্র কি অবান্তর নয়? সত্যকার রক্তমাংসে গড়া সমুদ্র, পুরুষের দাবী লইয়া যে ডাক দিল?

ছবি লইয়াও তো দিল কাটিতেছিল মন্দ নয়।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তীকে লোকে বলিবে কি? শ্যামা আর ক্ষীরোদা যখন পাড়ায় পাড়ায় রটাইয়া আসিবে হৈমন্তীর নিরুদ্দেশের খবর?

—আমায় ক্ষমা করো।

কে বলিল? হৈমন্তী? সমুদ্রের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া যে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

হতবুদ্ধি সমুদ্র শুধু প্রশ্ন করিতে পারে—যাবে না?

—আমায় ক্ষমা করো।

[১৩৫২]

না দিলে খুলে দ্বার

কোচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, জাজিম-বিছানো ফরসা, ধবধবে তাকিয়া, রূপোর গড়গড়ায় অম্বুরী তামাক আর রূপোর ডিবেয় মিঠে-খিলি। আগাগোড়া ভঙ্গীতে মধ্যযুগীয় জমিদারের ছাপ।

গড়গড়ার নলে গুটিকয়েক 'সুখটান' দিয়ে অর্ধশায়িত রাজবল্লভ এলায়িত দরাজ সুরে হাঁক দিলেন—প্রিয়বল্লভ!

দু'বার ডাকতে হল না, প্রিয়বল্লভ এসে দাঁড়ালো। ঢিলে লংক্লথের পায়জামা, রঙিন স্মার্টকলার শার্ট, ব্যাকব্রাশ চুল। ....সাজসজ্জায় বাপের সঙ্গে তিনপুরুষের ব্যবধান। শুধু এ যুগের ছেলের ঘাড়ে সে যুগের নামটা চাপিয়ে রেখে কিছুটা সমতা রক্ষা করেছেন রাজবল্লভ। আর সে নামের আদ্যোপান্ত উচ্চারণ করা চাই তাঁর, দরাজ ভরাট গলায়। আধখানা নাম ধরে ডাক রাজবল্লভের কোষ্ঠী-বিরুদ্ধ।

প্রিয়বল্লভ ফরাসের এককোণে বসে মাথা চুলকোচ্ছে। বাপকে বাঘের মত ভয় করে এমন নয়, বাপের রাজকীয় ভঙ্গীর সামনে এলেই কেমন যেন ক্ষুদ্র মনে হয় নিজেকে, নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এক মিনিট .....দু' মিনিট.....পাঁচ মিনিট.....রাজবল্লভ আপনমনে ধূমকুণ্ডলী সৃজন করে চলেছেন আশ্বিনের সাদা হাল্কা মেঘের মতো।

এক সময় সাহসে ভর করে ঝাঁ করে বলে ওঠে প্রিয়বল্লভ,—ডাকছিলেন কেন?

—ডাকছিলাম—

মুখের থেকে নল সরিয়ে একবার উক্ত শব্দটী উচ্চারণ করে আবার নলে মুখ লাগান।........এক মিনিট ....দু' মিনিট.....অধরচ্যুত নল এবার কিছুটা নেমে তাকিয়ার ওপর আশ্রয় পেল।

—বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস কেন?

—ঝগড়া!

প্রিয়বল্লভ আকাশ থেকে প। কখন ঝগড়া করলাম?

—হ্যাঁ করেছ ঝগড়া—আলবৎ করেছ।

উপযুক্ত উত্তরের অভাবে প্রিয়বল্লভ মাথা চুলকোতে সুরু করে। অবশ্য চুল খারাপ করে না, সাবধানে পিছনের চুলের উপরই আঙুল চালায়।

—দেখ প্রিয়বল্লভ! আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না। ঝগড়া তুমি করেছ, নিশ্চয় করেছ। মাপ চাইতে হবে—

—দায় পড়েছে ওর মাপ চাইতে—

সুরলতা এসে ছেলের কাছ ঘেঁষে বসেন। বুঝতে আটকায় না, এমন জায়গায় ছিলেন এতক্ষণ, যাবে পিতাপুত্রের বাক্যবিন্যাসের উপর লক্ষ্য রাখা চলে।

রাজবল্লভ আর একবার নলটা তুলে নিয়ে স্ত্রীর প্রতি একটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ কবলেন কেন, দায় পড়েছে কেন?

—পড়বেনা? কোথাও কিছু নেই— খামকা ও যাবে বৌমার কাছে মাপ চাইতে?

—হ্যাঁ যাবে—আলবৎ যাবে—আমার হুকুম।......মা লক্ষ্মী!

'মা লক্ষ্মী'ও ধারে কাছে ছিলেন না এমন নয়—কিন্তু ধরা পড়াটা বোকামি,—কাজেই সরে পড়েন।........

কাজেই রাজবল্লভকে আবার ডাকতে হয় আরো উচ্চগ্রামে। এইমাত্র হঠাৎ শুনতে পেয়েছে এইভাবে মৃদু অথচ ব্যস্ত পায়ে ছুটে এসে 'মা-লক্ষ্মী' হাতখানেক ঘোমটা টেনে শ্বশুরেব কাছ ঘেঁষে বসেন, প্রিয়বল্লভেব দিকে সম্পূর্ণ পিঠ ফিরিযে। কথাও নেপথ্য: ডাকছিলেন বাবা?

—হ্যাঁ মা, বলছি। ওই আহাম্মক শয়তানটা তোমাব সঙ্গে ঝগড়া কবেছে কি না?

—হ্যাঁ বাবা।

গলার আওয়াজ অস্পষ্ট হলেও মাথা নাড়ার ভঙ্গীটা স্পষ্ট।

স্ত্রীর আর ছেলের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রাজবল্লভ 'মা-লক্ষ্মী'র পিঠে সস্নেহ করস্পর্শ রেখে বলেন—কি বলেছে মা?

—বলেছে—'ভারী সাহস হয়েছে—মজা দেখাচ্ছি।'

—দেখলে? তুমি তো ছেলের পক্ষে উকিল হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দেখছি। বলি রায়টা কি হবে?

—'রায়' দেবার কর্তা তো রায়কর্তা। সুরলতা হেসে ফেলেন।

—না না, হাসি নয়—দস্তুরমতো বিচারকের ভঙ্গীতেই উত্তর দেন রাজবল্লভ: হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়, মাপ চাইতে হবে, প্রিয়বল্লভ!

—সব বিচ্ছিরি—

অস্ফুট মন্তব্য করে সুরলতা রাগ করে উঠে যেতে চেষ্টা করেন। প্রিয়বল্লভ আটকায়, ইসারায় জানায়, শুনেই যাও সবটা।

—বসে কি করবো! আমার অত আদিখ্যেতা ভালো লাগে না।

ছেলের অনুরোধে ওপাশে বসে পড়েন। অর্থাৎ পুত্রবধুর বিপরীতে। পুত্র তো দণ্ডায়মান। ...বাড়াবাড়ি! ঢং!

পুত্রবধুর মুখটি দেখা যাচ্ছে না। সুরলতা বেজার মুখে। মন্তব্যটা অবশ্য জনান্তিকেই। তবে শোনা কি আর না যায়।

শোনা গেলেও রাজবল্লভ এসব ছোট কথায় কান দেন না, নিজস্ব পেটেন্ট বিলম্বিত ছন্দে আদেশ করেন—প্রিয়বল্লভ! বৌমা যা বলেন, শুনতে হবে। আর ভবিষ্যতে যেন—

প্রিয়বল্লভ অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে—'রায়' তো দিয়ে দিলেন এক তরফা বিচারে—দোষ কার তার ঠিক নেই।

—দোষ? দোষ আবার কার হবে—তোমার ছাড়া? .....মা-লক্ষ্মী শ্বশুরের আরো কাছ ঘেঁষে বসে নিতান্ত ভালোমানুষের মতো পাকাচুলের সন্ধান করেন।

—তুমি তো সব সময় ছেলের দোষ দেখ, ছোট থেকে একরকম। আব এই যে একজামিনে ফার্স্ট হয়ে জলপানি পেলো—

চুপ করে থাকবো ভেবেও সুরলতা গমগম করে ওঠেন।

—জলপানি? পেয়েছে বুঝি? তা'—হাতী-ঘোড়ার কি আছে ও না পেলে আর কেউ পেতোই। কুলীন বামুনের ঘরের ছেলে হয়ে ম্লেচ্ছর পোষাক পরে বেড়ায়, তার আবার গুণ! আগাগোড়াই দোষ।

প্রিয়বল্লভ বুকের উপর দুই হাত আড় করে দাঁড়িয়ে অবগুণ্ঠনবতীর দিকে একটি বাঁকা কটাক্ষ করে শ্লেষের সুবে বলে—আব কুলীন বামুনের বাড়ীর বৌ হয়ে জুতো পরে হেঁটে হেঁটে মিটিংযে যেতে চাইলে দোষ হয় না— না? গাড়ী চড়ে গেলে চলবে না, হাঁটা চাই। আমার দোষেই শুধু ঝগড়া হয়, কেমন?

—তাই বুঝি বলছিল বৌমা?

সুরলতার স্বরে সন্দেহযুক্ত বিরক্তির আভাস।

বার্ধক্যের ছাপহীন দৃপ্তমুখে সামান্য একটু মেঘলা ছায়া হয়তো পড়ে, হয়তো পড়ে না, মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণে ঝলসে উঠলো একটা প্রশান্ত হাসির দীপ্তি। অর্ধশায়িত ভঙ্গী ত্যাগ কবে উঠে বসেন রাজবল্লভ—মিটিংয়ে যাবে? স্বদেশী লেকচার শুনতে? এ তো ভালো কথা। যাবে নাকি মা-লক্ষ্মী?

কুণ্ঠিত মুখে যথাসম্ভব করুণ সরলতার ভাব ফুটিয়ে তুলে মা-লক্ষ্মী চুপি চুপি বলেন—'যাবো' তা তো বলিনি বাবা! শুধু বলছিলাম—'ওরা বেশ যাচ্ছে!'

—নিশ্চয়ই বলবে, কেন বলবে না? তুমিও যাবে। ওরা যাবে, তুমি যাবে না? আলবৎ যাবে। প্রিয়বল্লভ! বৌমাকে নিযে—

সুরলতা আবার একবার প্রতিজ্ঞা ভুলে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—কি যে বলো,—বৌমা যাবে জুতো খটখটিয়ে লেকচার শুনতে? আর 'বলু' তাই নিয়ে যাবে?

—নিশ্চয় যাবে। আমার হুকুম। বৌমা, তোমার বাবার দেওয়া—কি যে সেইসব ছক্কা-পাঞ্জা জুতো আছে, পরে তৈরী হয়ে নাও তো, দেখি ও নিয়ে যায় কিনা!

আলবোলার নল তুলে নেন রাজবল্লভ।

ব্যস! এখনকার মতো নিশ্চিন্দি। আর কোনো কথা, কোনো উত্তর প্রত্যুত্তব আদায় করা যাবে না তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত।

সুরলতাও আর কথা কন না।

নিস্প্রয়োজন বোধেই কন না। বিরক্ত মুখে উঠে যান।

হিমাচলের নড়চড় আছে-রাজবল্লভের কথার নেই, একথা সুরলতার চাইতে বেশী কে জানে? এগারো বছর বয়স থেকে এই একচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কে জেনে এসেছে?

পূর্বপুরুষরা ছিলেন বনেদী জমিদার।

অপব্যয় আর অনাচারে জমিদারীর বনেদ তাঁরা মেরে রেখে গেছেন, এক ছটাক জমিও অবশিষ্ট রেখে যাননি উত্তর পুরুষের জন্য শুধু রক্তে সংক্রামিত করে রেখে গেছেন তাঁদের নীলরক্তের প্রভাব। হয়তো আর থাকবে না। আজকের পৃথিবীর এলোমেলো হাওয়ায় উড়ে যাবে—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে প্রভাব প্রিয়বল্লভের জীবন থেকে। তাই আঁকড়ে ধরে রাখবার এত প্রাণপণ চেষ্টা রাজবল্লভের।

পদে পদে সেই খেয়ালের খেসারৎ যোগাতে হয়েছে সুরলতাকে।

অবশ্য রাজবল্লভ অকৃতী নন, বনেদী চাল বজায় রাখবার সাধনাই শুধু নয়, সাধ্যও আছে তাঁর। হয়তো তাই সুরলতাও কখনো অবকাশ পাননি বিরুদ্ধাচরণের। উৎসব উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ভিন্ন জীবনে কখনো বাপের বাড়ী গিয়ে থাকবার অনুমতি পাননি সুরলতা। কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষাও করতে গিয়েছেন কিনা সন্দেহ।.........পথেব লোক তো দূরের কথা—পাড়ার লোকেই কি বলতে পারবে সুরলতার মুখশ্রী কেমন?

ছাদে বাবান্দায় জানালার ধারে জীবনে কখনো সুরলতার ছায়া পড়েছে, রাত্রির অন্ধকারে ছাড়া?

অথচ স্বামীকে অত্যাচারী বলে, দুর্দান্ত রাগী বলে কল্পনা করলেও পাপ হবে। স্বামীর কাছে আদর পেয়ে এসেছেন অজস্র, অপর্যাপ্ত। সুরলতার দিক থেকে যেটুকু প্রতিবাদ কখনো এসেছে, দমন কববাব চেষ্টা করেননি, হেসে উড়িয়েছেন।

'অমৃতং বালভাষিতং' নীতিতে অগ্রাহ্য করেছেন সুবলতার বিবক্তি।

শাসন নয়—অনুশাসন।

লঙ্ঘন করবার সাহস যদি-বা হয়, ইচ্ছাতেই বাধে। আভিজাত্যেব যে সহজ অবহেলার বর্ম বাজবল্লভকে ঘিরে আছে, তার গায়ে ঠেকে নিষ্ফল হযে ফিবে আসে সমস্ত প্রতিবাদ।

আজকে হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন সুরলতা। বধূর আদরের মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে তাঁর পরাজয়ের গ্লানি। 'বলুর' বৌ তাঁদের সমুখ দিয়ে প্রকাশ্য দিনের আলোয় বরের হাত ধরে জুতো খটখটিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে পথে নামবে! যেয কথা ভাবতে গেলে সারা শরীর শিউরে ওঠে সুরলতার, ভালো করে ভাবতেও পারেন না, সেই হুকুম দিয়েছেন রাজবল্লভ। কেন? কেন?

কেন? হয়তো রাজবল্লভ বুঝেছেন নিজেহাতে দরজাটা খুলে না দিলে কপাটটা ভেঙে পড়বে।

[১৩৫৩]

জনমত

দুর্ঘটনার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলো না। অবশ্য দুর্ঘটনার জন্য ঠিক প্রস্তুত কেই বা কবে থাকে?

জুতা জামা কিনিতে গেলেই আমরা টেঁকসই দেখিয়া কিনি, আগামী বৎসর পূজার ছুটিতে কোথায় বেড়াইতে যাইব, এ বৎসরের শীতকালে তাহার প্রোগ্রাম ঠিক করি।

অথচ অহরহই দেখিতেছি, যে-কোনো সময়ে সেই নিঃশঙ্ক জীবনপথের উপর চপল বালকের হস্তনিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ডের মতো দুর্ঘটনা আসিয়া পড়ে।

যেমন, আজকের হারাধনের ব্যাপারটা। নিঃশঙ্ক হারাধন নিত্যকার মতোই, নিত্যকার পথ দিয়া চলিতেছিল, অকস্মাৎ পথপার্শ্ববর্তী 'মজুমদার বাহাদুরের' বাড়ীর ছাদের কার্নিশ হইতে একখানি ইঁট

খসিয়া হারাধনের মাথায় পড়িল।

হারাধন পাড়ার সনৎ উকিলের বাড়ীর চাকর।

মনিব বাড়ীতে হঠাৎ নূতন জামাই আসিয়া পড়ায় ছুটিতে ছুটিতে বাজারে গিয়াছিল এবং ততোধিক ছুটিতে ছুটিতে ফিরিতেছিল— বড়ো চিংড়ি ও ভালো নৈনিতাল আলু লইয়া।

'মজুমদার বাহাদুরের' বাড়ীর পাশ দিয়া তাহার মাথাটা 'পাস্' করিতে দুই-এক সেকেণ্ডেব বেশী সময় লাগিবার কথা নয়, লাগেও নাই। —তবু—এই ক্ষণিক মুহূর্তের অবসরেই ঠিক হারাধনের ব্রহ্মতালু 'তাক্' করিয়া ইঁটখানা পড়িল।

মাথায় ইঁট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাধন নিজেও পড়িল এবং মুহূর্তে ভোজবাজীর ন্যায় কোথা হইতে যেন শহবের অর্ধেক লোক আসিয়া হারাধনেব আশে-পাশে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

কিন্তু এতোগুলো লোকেব 'আহা' 'উহু' 'জল' 'পাখা' 'হাসপাতাল' 'এ্যাম্বুলেন্স' ইত্যাদি দরদী উক্তি ও ইঁটপড়ার কারণ সম্বন্ধে বহুবিধ বাক্‌বিতণ্ডাকে উপেক্ষা কবিয়া হারাধন কৈবল্যধামপ্রাপ্ত হইল। আর মবিবাব সময় বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করিয়া গেল, ইঁটটা স্বয়ং বিধাতা পুরুষের হস্তনিক্ষিপ্ত।

শোনা যায়, মরণকালে নাকি মানুষের দিব্যজ্ঞান জন্মায়। সেই চকিত জ্ঞানের আলোকে হারাধন অলক্ষিত বিধাতাব কুটিল হাস্যপূর্ণ মুখ ও ইষ্টক নিক্ষেপোদ্যত উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হস্ত দেখিতে পাইয়াছিল, অথবা চিবঅজ্ঞান অন্ধকাবাচ্ছন্ন হৃদয়ের নির্বোধ সংস্কারেব বশে কথাটা বলিয়াছিল, সে এখন আর জানিবাব উপায় রহিল না, কাবণ বলাব সঙ্গে সঙ্গেই হাবাধন চোখ বুজিল।

গোলমালের সূচনাতেই অপবাধী-বাডীব মালিক বৃদ্ধ রায়বাহাদুব বসন্ত মজুমদাব দোতলা হইতে রাস্তায় নামিয়া আসিযাছিলেন। একে বৃদ্ধ তায ব্লাডপ্রেসাবেব বোগী, এহেন অভূতপূর্ব দুর্ঘটনায যেন দিশেহারা হইয়া পডিলেন ভদ্রলোক। বাডীব চাকব তাডাতাডি একখানা চেয়াব আনিয়া ফুটপাথেই বসাইয়া দিযা গেল।

মজুমদারের কৃতবিদ্য বয়স্থ ছেলে দুটিও সঙ্গে সঙ্গে নামিযা আসিয়াছিল। ব্যাপারটা বুঝিবামাত্র একজন তাড়াতাড়ি বাড়ীব মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া থানায় ও হাসপাতালে ফোন কবিল ও অপরজন গ্যারেজের চাবি লইয়া ছুটিল গাড়ি বাহির করিতে।

পুলিশ আসিল।

যথারীতি বাড়ীর মালিকের নাম-ধাম টুকিয়া লইল, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, অবশেষে 'লাশ' চালান দিবার হুকুম দিল। বসন্তবাবুব বড ছেলে লাশের সঙ্গে গেলো।

ছোট ছেলে গাড়ী লইয়া কোথায় গেলো কে জানে।

বৃদ্ধ মজুমদার বাডী গিয়া নীচের তলার ঘরেই বিছানা পাতিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন আর দোতলায় উঠিবার মতো সামর্থ্য সংগ্রহ কবিতে পাবিলেন না।

শববাহী গাড়ী আসাব সঙ্গে সঙ্গেই পথচারী দর্শকেরা যে যার আপন আপন পথ দেখিল। দুই-একজন নাছোড়বান্দা শ্রেণীর লোক গাডী বাহির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারাও গাড়ী বাহির হইয়া গেলে নানা মন্তব্য করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

রাস্তা ফর্সা হইয়া গেল।

হারাধনের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বালেশ্বর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি কুটীরে বসিয়া বোধ করি তখন কাঁচালঙ্কা ও লবণ সহযোগে 'বাসিভাত' দিয়া প্রভাতিক জলযোগ সারিতেছিল, তাহারা এতো কাণ্ডের বিন্দু-বিসর্গও জানিল না।

শুধু পাড়ার যে গুটি আষ্টেক দশেক 'উজ্জ্বল রত্নকে' দিনরাত্রের মধ্যে অন্ততঃ ঘণ্টা চৌদ্দ পনেরো

সময় রায়বাহাদুরের সদর রোয়াকে বসিয়া আড্ডা দিতে দেখা যায়, তাহারা খানিকটা তফাতে একটা গ্যাসপোষ্টের নীচে জটলা করিতে থাকিল।

এতো ভীড়ের মধ্যেও হারাধনের হস্তচ্যুত বড়ো চিংড়িগুলা কাকের উদর গহ্বরে স্থান পাইয়াছিল, আলুগুলার কি গতি হইল কে জানে! কে জানে কাকে কাঁচা আলুও খায় কিনা! তাদের পথে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল না।

মোটের উপর শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দেখা গেল বস্তির দুইটা ছেলে মাত্র গোটা তিন-চার আলু লইয়া ডাং-গুলি খেলিতেছে।

সনৎ উকিলের গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন,—"কি রকম দিনে কী রকম কাণ্ড! দিল্লী থেকে জামাই এলো, একটি দিন বৈ থাকবে না, আজকেই এই কাজ ....আর জন্মে আমার কী মহাশত্রুই ছিলো হারাধন! আর দেখো—দু'টি মাস কাজ দেখিয়ে দিয়ে—শেষকালে কিনা মরে আমার মাথা খেয়ে গেলো গো! অমন চাকর আর পাবো? মাথা খুঁড়ে আমারই মরতে ইচ্ছে করছে।"

সনৎ উকিল কহিলেন— "ও হতভাগা যে একদিন অপঘাতে প্রাণ হারাবে এ আমি আগেই বুঝেছিলাম! যে উজবুকের মতো রাস্তা দিয়ে হাঁটতো!..........কি দিয়েছিলে? দশ টাকার নোট? ....কপালে দণ্ড ছিলো আর কি! কে জানে—এখনও কতো দণ্ড আছে কপালে—"

দুই মাসের পুরনো চাকরের জন্য এর চাইতে অধিক শোকপ্রকাশ করা সম্ভব নয়। করিলেই বাড়াবাড়ি ঠেকিত।

মানুষ মাত্রেই মানবতাবিহীন, একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে।

হারাধনের মনিব-বাড়ী ছাড়াও পাড়ার প্রত্যেকটি বাড়ীতেই হারাধনের এই শোচনীয় মৃত্যু লইয়া আলোচনা ও আপসোস হইতে থাকিল এবং সকলেরই দৈনন্দিন কর্মধারায় অল্পবিস্তর ছেদ পড়িল বলা চলে।

কলেরা, বসন্ত ইত্যাদির পরিবর্তে মাথায় ইঁট পড়িয়া মরার গৌরবে জগতে নিতান্ত অখ্যাত হারাধন কিছু বিখ্যাত হইবার সুযোগ পাইল।

হারাধনের সামান্য কয়দিনের মনিব সনৎ উকিল হারাধনের বালেশ্বর জিলায় অবস্থিত কুটীরের ঠিকানা জানিতেন না, জানিবার কথাও নয়, কাজেই "পরিচয় অজ্ঞাত" ঐ পরিচয়ে কর্তৃপক্ষ লাশ জ্বালাইয়া দেওয়ার হুকুম দিলেন।

হারাধনের গল্প এইখানেই সমাপ্ত হইল।

কিন্তু গল্পের পরেও থাকে গল্পের পরিশিষ্ট। মৃত্যুর পরে যেমন শ্রাদ্ধ।

হারাধন মারা পড়িল বটে, কিন্তু 'হারাধনের না হইলেও প্রায়-বেওয়ারিশ যে দশটি ছেলে' পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইত, পরিশিষ্টটা তাহাদের লইয়া!

অনেক সময় মৃত্যুর পর 'শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়ায়'। গড়াইবার ব্যাপারে কিভাবে কাহার হাত থাকে বলা শক্ত।

কে জানে মৃতের প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাশীলেরাই শ্রাদ্ধকে গড়াইয়া দেয় কিনা।

তবে এক্ষেত্রে দেখা গেলো—যে ছোক্‌রা কয়টিকে হারাধনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলিয়া সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র হেতু ছিলো না, তাহারাই শ্রাদ্ধকে গড়াইয়া দিবার ভার লইয়াছে।

পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে আলোচনাটা যখন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে তখন সহসা রাস্তায় একটা উৎকট হৈ-চৈ চীৎকার উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক ইঁট ছোঁড়ার 'দমাদম' শব্দ!

পাড়ার কর্তারা তখন অনেকেই অফিসে, আদালতে। গৃহিণীরা সচকিতে ছুটিয়া আসিলেন জানালায়,

বারান্দায়, ছাতে। 'হৈ-চৈ' কাণ্ডের কারণ বুঝিবার উপায় ছিলো না, তবে দেখা গেলো, মোড়ের মাথায় মজুমদার বাহাদুরের সুদৃশ্য মোটরখানা 'হঁটাহত' অবস্থায় অনড় দাঁড়াইয়া আছে। আর গাড়ী হইতে নামিয়া পড়া 'ছোট মজুমদারকে' ঘিরিয়া রীতিমত একটি ব্যূহ রচনা হইয়া গিয়াছে।

নীরব ব্যূহ অবশ্য নয়।

সম্মিলিত দশটি কম্বুকণ্ঠে উচ্চ নিনাদ ধ্বনিত হইতেছে—"মার শালাকে".. ...."ধর শালাকে"........"শালা গাড়ি চড়ে বড়মানুষী দেখাতে এসেছে".........."মেরে তক্তা বানিয়ে দে"..........."দে, শালাকে হাবাধনের কাছে পাঠিয়ে দে "

বাতায়নবর্তিনীরা অবাক বিস্ময়ে দুর্গানাম জপ করিতে থাকেন।...... ..অনেকে তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান করেন— বাস্তার দরজায় খিল দেওয়া আছে কিনা। বাহিরের গোলমাল অকস্মাৎ না ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে।

পরবর্তী দৃশ্য এই... ..

ছোট মজুমদার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া, ঘড়ি চশমা ভাঙিয়া, আঙটি মনিব্যাগ হারাইয়া, কোনগতিকে মাথা বাঁচাইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন এবং সম্ভবতঃ সেই আক্রোশে মজুমদার ভবনের উপর 'দমাদ্দম' শব্দে ইঁট পড়িতেছে।

শার্শির কাঁচ চূর্ণ, দেওয়ালের পলস্তারা বিধ্বস্ত ও বারান্দার কার্ণিশ ক্ষত বিক্ষত।

ওদিকে আহত গাড়ীখানা তেমনি অনড় দাঁড়াইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে

রহিয়া রহিয়া কর্মিবৃন্দের উল্লাস ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে.. ...'শালার বাড়ীখানাকে ইঁটিয়ে শেষ কর না রে'— 'বুড়ো ঘুঘু গেলো কোথায়, ফুটপাথের ওপর সিংহাসন পেতে বস না চাঁদ...' 'কোরপোরেশন'কে ঘুষ দিয়ে এসে পার পাবে ভেবেছে বাবা ?'........ইত্যাদি ইত্যাদি।

দর্শক মহিলারা শিহরিত কলেবরে দুর্গানাম জপ করিতে থাকিলেও সংলাপ এবং দৃশ্যের বিচ্ছিন্ন অংশকে জোড়া দিয়া দিয়া ও অনুমানের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া মূল নাটকটি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

বোঝেন—বড়লোকের ছাতের ইঁট পড়িয়া পথের গরীবের প্রাণ যাওয়ায় পাড়ার সাম্যবাদী যুবকেরা ক্ষেপিয়াছে।.......এই নাট্যাভিনয় তাহারই কিঞ্চিৎ বহির্বিকাশ মাত্র।

ঘরে ঘরে, বারান্দায় বারান্দায়, জানলায় জানলায়, মহিলা মহলের মধ্যে স্তম্ভিত ও বিক্ষুব্ধ মন্তব্যের আর অন্ত থাকে না। মূল সুর অভিন্ন।

খানিকটা নমুনা এই—"এ কী সর্বনেশে কাণ্ডরে বাবা, ভদ্দরলোকের ঘরে এমন সব খুনে ছেলে জন্মায় কি করে!......'নিয়তি' বলে কথা! হাবাধনের কপালে ছিলো—অপঘাত মৃত্যু! ওদের কি দোষ ? ...ওরা কি ইচ্ছে করে ইঁট ছুঁড়েছে ?.... আর এই যে তোরা ইঁট ছুঁড়ে পয়লট্ট করছিস, এতে দোষ হচ্ছে না ?. .....তোদের ইঁট যদি কারুর মাথায় লাগে ? পুরনো বাড়ীর কোথায় কোনখানে নোনা ধরছে, ওরা জেনে রেখেছে ? পড়লে তো ওদের ছেলেপুলের মাথাতেও পড়তে পারতো!.......আহা-হা.. ....অমন গাড়ীখানাকে দাঁড়িয়ে পুড়িয়ে মারলো গো! নিরীহ ভদ্দরলোকের এ কী লোকসান করিয়ে দেওয়া!..... . নির্বিরোধী মানুষ ওঁরা— কখনো কারুর ক্ষেতি করেননি। ওঁদের ওপর নাহক একি জুলুম! .....আহা, অমন মান্যমান ছেলেটাকে কি অপমানটাই করলো। আবার বুড়ো ভদ্দরলোককে শুদ্ধু যাচ্ছেতাই গালাগাল করছে গো!.........যতো সব নিষ্কর্মা বখাটে ছোঁড়া জুটেছে পাড়াতে। কাজ নেই তাই অকাজ করবার তালে বেড়াচ্ছে......" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকে আবার ইহাদের মা-বাপকেও অভিযুক্ত করেন।

ভুলিয়া যান, মা-বাপের হাতের বাহিরে যাওয়া ছেলে ভিন্ন এমন কাজ আর কেহ করে ?

মজুমদাব পবিবাবেব প্রতি পাড়াব সকলেই শ্রদ্ধাশীল। পবিবাবেব প্রত্যেকেই ভদ্র ও অমায়িক, পবোপকাবীও বলা চলে। পাড়াব সকল সংসাবেব 'উৎসবে ব্যসনে'..... ইত্যাদি সর্ববিধ প্রযোজনে ইঁহাবা বাহিবেব ঘব দু'টি ছাড়িয়া দেন, আবশ্যকীয় বড়ো বাসন সবববাহ কবেন, কার্পেট, সতবঞ্চ, ববাসন প্রভৃতি ব্যবহাব কবিতে দেন, সময় সময় বামুন চাকব পর্যন্ত ধাব দেন।

'বড়োলোক' বলিয়া ঘৃণা কাববাব কোনো কাবণ আজ পর্যন্ত ঘটে নাই।

বাড়ীব নামকবণটাও শ্রদ্ধাবই অভিব্যক্তি বলা চলে

একদা কর্তা মজুমদাব কোনো এক সবকাবে অনাচাবেব প্রতিবাদে 'বায বাহাদুব' খেতাব বর্জন কবিযাছিলেন, সেই বীবত্বব্যঞ্জক বাহাদুবীকে উপলক্ষ কবিযা তাঁহাকে 'মজুমদাব বাহাদুব' আখ্যা দেওযা হয। তদবধি মজুমদাব বাহাদুবেব বাড়ীই বলা হয।

বাড়ীটা প্রকাণ্ড বটে, তবে প্রাচীন, কর্তাব পিতাব আমলেব বহুবাব বহু অংশেব পবিবর্তন ও পবিবর্ধন কবা হইযাছে —কিন্তু কোন্ বন্ধ্রে যে একখান অসতর্ক ইঁট স্খলিত অবস্থায উদাত হইযাছিল কে জানে!

ইঁটখানা শুধু হাবাধনেব মাথা ভাঙিযাই ক্ষান্ত হইল না, মজুমদাব গোষ্ঠীব কপালও ভাঙিল। সাম্যবাদী যুবকেব দল নিমিত্ত মাত্র।

নিমিত্তেবও আবাব নিমিত্ত থাকে। তাহা এই —

মজুমদাবদেব বোযাক আলো কবিযা তাহাবা যখন বিড়িব ধোঁযায আকাশ আচ্ছন্ন কবিযা আড্ডারূপ মহৎ কর্মে লিপ্ত থাকিত, তখন তাহাদেব উপব মজুমদাবদেব পক্ষ হইতে যে ভাব প্রকাশ পাইত, তাহাকে ঠিক ভক্তিভাব বলা চলে না। প্রত্যেকে প্রাত্যহিক আসা যাওযাব পথে ইহাদেব প্রতি যে প্রকাবেব দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিযা যাইতেন তাহাকেই বোধ কবি সাধু ভাষায 'অবজ্ঞা' বলে।

কাজেই বহু দিনেব পুঞ্জীভূত উত্তাপ, এই একটা দেশলাই কাঠিকে উপলক্ষ কবিযা মহোৎসাহে জ্বলিযা উঠিযাছে

পুবাপুবি তিনবেলা ইঁট লাঠি ও কদর্য কটূক্তিব প্রহবায অববুদ্ধ থাকিয়া উত্যক্ত মজুমদাববা ফোন কবিযা পুলিস জানাইল। কাবণ ডাক্তাবেব আসাব পথও নিবাপদ ছিলো না। অথচ কর্তা মজুমদাব বক্তচাপ বৃদ্ধিতে প্রায সংজ্ঞাহীন অবস্থায কাটাইতেছেন। তাহাব স্নাযুব উপব কম ধকল তো চলিতেছে না!

পুলিশ ভ্যান্ আসাব সঙ্গে সঙ্গেই আব একবাব ভোজবাজীব খেলা দেখা গেলো। অতোগুলি বীবপুরুষ তাহাদেব লাঠি ও সংগৃহীত ইঁটেব স্তূপ লইযা মুহূর্তে যেন মন্ত্রবলে নিশ্চিহ্ন হইযা গেল।

পুলিশ আসিযা মজুমদাবদেব এজাহাব লইল, পাড়াব দুই একজনকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কবিল এবং শেষ পর্যন্ত হাতেব কাছে কাহাকেও না পাইযা, পুলিশেব প্রতি কৌতূহলাক্রান্ত পথে দাঁড়াইযা থাকা গোটাকযেক বস্তিব ছেলেকে 'ভ্যানে' তুলিযা লইযা প্রস্থান কবিল।

ভ্যানটা বাহিব হওযাব সঙ্গে সঙ্গে 'বে বে বে বে' শব্দে বীব যুবকবা আবাব ভোজবাজীব মতোই বাহিব হইযা আসিল এবং শাসাইতে লাগিল.........

"বজ্জাত বুড়ো, হাবামাজাদা ব্যাটাবা! পুলিশ এনে জব্দ কববি আমাদেব? ....বোস তোদেব টেব পাওযাচ্ছি! ..... গাড়ীতে আগুন ধবিয়েছি, এবাবে বাড়ীতে আগুন ধবাবো!...... .আমাদেব এখনো চেনোনি বাবা!........গাড়ীব ধুলো উড়িযে বড্ড লপ্‌চপানি মাবা হচ্ছিলো; এইবাব? ক'খানা গাড়ী কিনবি? ....আমাদেব ইঁট এখনও ফুবোযনি।"

দেখা গেলো বিধাতাপুরুষ হইতে সুরু করিয়া মর্ত্যবাসী জীব পর্যন্ত সকলেই ইঁটের প্রতিই বিশেষ আস্থাবান।

মজুমদাররা যদি এই সব আস্ফালন ও কটূক্তির মৌখিক কোনো প্রতিবাদ করিত, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহাদের কিছুটা সম্মান বজায় থাকিত। কিন্তু 'সন্ত্রান্ত বুদ্ধি' মজুমদাররা মুখোমুখির ধারে-কাছেও গেলো না!

দীর্ঘ বিয়াল্লিশ ঘন্টাকাল তাহাদের বাডীব সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিলো, পবদিন দেখা গেলো সমস্ত খুলিয়াছে এবং দবজায় দুই-দুইটি রাইফেলধারী পুলিশ!

তাহাদের একজন দবজায় স্থিব হইযা আছে, ও অপরজনকে প্রহরী করিয়া বড়ো ভাইযের গাড়ীতে ছোটভাই এবং বাড়ীর ছেলেবা একযোগে অফিসে ও স্কুলে যাতায়াত করিতে সুরু করিযাছে। অতএব আপাততঃ ইঁটেব চাকরী খতম হইযা গেলো!

কিন্তু 'গেলো' বলিলেই কি সব যায়?

ইঁটের চাইতেও দুর্ধর্ষ অস্ত্র আছে।

কি বিধাতার, কি মানুষেব।

সে অস্ত্র—কলম! যেখানে ইঁটে কাজ না হইবে, সেখানে কলম অব্যর্থ।

বকেব ছেলেরা গ্যাসপোস্টেব নীচে জটলা বাঁধিযা প্রস্তাব কবিল—তবে কলম!!

সমস্বরে হাততালি পড়িল।

ওরই মধ্যে একজনেব 'কবি'খ্যাতি ছিলো, বিবৃতি রচনার ভাব সে লইল।........

সনৎ উকিল কহিলেন—অসম্ভব। এই স্টেটমেন্টে সই দেবো? আমি তো ক্ষেপিনি! আমার চাকর মরেছে তো তোমাদেব কি মাথাব্যথা বাপু? ....যাও যাও, নিজেব চবকায় তেল দাও গে—।.......

ছোকরারা কহিল—সই না দিলে স্যব, আপনাব দবজায হত্যে দিযে পড়ে থাকবো!

উকিল কহিলেন—থাকো! —কহিয়া আদালতে যাইবার উদ্দেশ্যে চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে গেলেন! গেলেন বটে তবে পারিলেন না।

পুরনো দশটি ছেলে পায়ের নীচে শুইয়া এবং নূতন আমদানী আর দশটি ছেলে সাম্‌নে লাইন দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সনৎচন্দ্র সেদিন আদালতে গেলেন না।

পরদিন না।

তৎপবদিনও না।

সেদিন অবশ্য যাইবার ক্ষমতাও ছিলো না। হাঁটুর হাড় সরিয়া গিয়াছিল।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ হইতে রঙ্গমঞ্চে আবার ইঁটের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

অনবরত উঠানে ঢিল, রান্নাঘরে গরুর হাড় এবং সদরে অহিংস প্রতিরোধের নিপীড়নে নিরুপায় আলিপুরী উকিল সনৎচন্দ্র বিবৃতিতে সই দিলেন!!

রাইফেলধারী সান্ত্রীর প্রহরায় সুরক্ষিত বনেদী গম্ভীর চেহারার বাড়ীখানার প্রতি অনবরত তাকাইতে তাকাইতে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে সূক্ষ্ম ঈর্ষার বিষ সঞ্চারিত হইতেছিল, অসম্মতির দৃঢ় বনেদ টলাইবার পক্ষে সেও কিছু কাজ করিল বৈ কি।

এই মূল্যবান দলিলটুকু সংগ্রহ করিবার পর আর কোনো বাধা থাকিল না। ছেলেরা মহোল্লাসে অপরাপর বাড়ীতে হানা দেওয়া সুরু করিল।

প্রত্যেকেই শিহরিত কলেবরে প্রবল আপত্তি করিতে থাকেন, তাঁহারা যে ক্ষ্যাপেন নাই, এ বিষয়ে পরিষ্কার ঘোষণা দেন, ছেলেগুলাকে কটু-কাটব্যও করেন।

কারণ মজুমদারদের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল।

কিন্তু হইলে কি হয়!

ওদিকে যে জীবিকার ব্যাপার 'বানচাল' হইবার উপক্রম। কে কয়দিন বাড়ী বসিয়া থাকিবে?.....অফিস আদালত যাওয়া হয় না, বাজাব করা হয় না।

যুগপৎ ইঁট ও অনুরোধের প্রবল দাপটে—অবশেষে প্রতিপক্ষেব সামনে সকলকেই একে একে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল।

একটি একটি করিয়া স্বাক্ষরের সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পাইতে থাকে, দলিল ততো শক্তিশালী হয়। .....কয়েকদিন পরে আর ইঁটের প্রয়োজন হয় না, শুধু অনুরোধেই কাজ হাঁসিল হয়।

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নামে চোখ বুলানোর সঙ্গে সঙ্গেই তলায় অপ্রতিবাদে স্বাক্ষর পড়ে। এমন কি ক্রমশঃ যেন সকলেরই মনে হয়— ছোকরারা যা লিখিয়াছে ঠিকই।.......

সত্যই মজুমদার পরিবার উন্নাসিক ও অহঙ্কারী। কখনোই গবীবকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেন না। পাড়াপ্রতিবেশীর সহিত সে অমাযিক ব্যবহার করিয়া থাকেন সে যেন অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপা!

রাইফেলধারী পুলিশ বসাইয়া বাড়ী বক্ষার ব্যবস্থা হইল; কেন, পড়শীর সাহায্য লওয়া চলিত না? 'চাল'! 'চাল!'

পড়শীনীরাও সহসা মজুমদাব গৃহিণীব 'মদগর্ব' ও বধূযুগলের 'দেমাক' আবিষ্কার করিযা পূর্ব সহানুভূতি হারাইয়া ফেলেন। এবং উঁহাদেব বিরুদ্ধে একটা তোড়জোড় চলিতেছে দেখিযা একটু যেন আনন্দিতই হ'ন।

সাধনার জয় হয়!

কয়েকদিন বাদে—

কাগজে কাগজে এই সংবাদ ছাপা হয়—নিরীহ পথচারীর শোচনীয় জীবনাবসান। দরিদ্রের প্রতি ধনীর হৃদয়হীন ঔদাসীন্য। মৌন মানবতার নিদারুণ লাঞ্ছনা।....ইত্যাদি।

সংবাদ পরিবেশনের অপর পৃষ্ঠায় বিবৃতি ছাপা হয়—কেমন করিয়া জনৈক রায় বাহাদুরের বাড়ীর একটি নন্দদুলাল ছেলে খেলার ছলে ছাদ হইতে ইঁট ফেলিয়া হতভাগ্য হারাধনের প্রাণনাশ করিযাছে, কেমন করিয়া ওই পরিবারভুক্ত সকলে একযোগে ফুটপাথের উপর সারি সারি চেযাব পাতিয়া বসিয়া সেই কৌতুক দৃশ্য উপভোগ করিয়াছে, কিভাবে প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া গুপ্ত কৌশলের সাহায্যে পুলিশকে 'হাত' করিয়া অপরাধী ব্যক্তিরা স্পর্ধিত বিক্রমে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতঃপর জনসাধারণের প্রতি সকরুণ আবেদন জানানো হইয়াছে, অবিলম্বে যেন উক্ত ধনী পরিবারের প্রতি যথোযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়।

কারণ ইহাকে দৈবদুর্ঘটনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া—অন্যায় অসঙ্গত। ইহা যুগ যুগ সঞ্চিত মানব ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের পুনর্লিখন।....দরিদ্রের জীবনমরণের প্রতি ধনীর অবহেলা ঔদাসীন্যের চরম পরাকাষ্ঠা।

নিহত হারাধনের পরিবারবর্গের প্রতিপালন ব্যপদেশে ওই ধনীব্যক্তির নিকট হইতে সমুচিত অর্থ আদায় করিবারও বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে।

কারণ—মরণকালে নাকি হতভাগ্য হারাধন "অগ্নিস্রাবী ক্ষীণকণ্ঠে" আবেদন জানাইয়া

গিয়াছে....'প্রতি—শো-ধ!'

* * * *

সনৎচন্দ্র সমাদ্দাব প্রমুখ ষোলোজন ভদ্রব্যক্তিব স্বাক্ষব সম্বলিত এই আবেদন কাগজে বাহিব হইবাব পবেব বাত্রে ব্লাডপ্রেসাবেব বোগী বৃদ্ধ মজুমদাব সহসা হৃদযন্ত্রেব ক্রিযা বন্ধ হইযা মাবা গেলেন।

প্রতিপক্ষ বলিল—হুঁ হুঁ বাবা, ধর্মেব কল বাতাসে নড়ে, গবীব মেবে পাব পাবি?

দুই একদিন পবে ছেলেবা বাড়ীতে তালা লাগাইযা সপবিবাবে কাশী বওনা হইল, তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা কবাব উদ্দেশ্যে। ....পাড়াব কাহাকেও কিছু বলিযা গেল না।

গম্ভীব চেহাবাব বনেদী বাড়ীখানা মুখে কুলুপ লাগাইযা মৌন মহিমময় অবিচল দাঁড়াইযা ....থাকে ....।

পাড়াব সকলে সেইদিকে তাকাইযা তাকাইযা অসতর্কে নিশ্বাস ফেলে! ...... সমাবোহেব শ্রাদ্ধ হইত সন্দেহ নাই! ...হযতো তিন চাব বেলাব বেশন বাঁচিযা যাইত! ....পাড়াব লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াগুলো, কী উৎখাতই না কবিল ভদ্রলোকদেব!

[১৩৫৩]

ধ্বংসের মুখে নারী

না, নাবীমহিমা কীর্তন আমাব পেশা নয। ববং ববাববই ওদেব সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসি, নাবীহৃদয তত্ত্বেব অনেক তথ্যই আজ অবধি আমাব অজানা।

শুধু--

গত কযেকদিন অনিবার্য্য কাবণে অজস্র নাবীমণ্ডলীব মাঝখানে ঘুবিতে ফিবিতে ক্ষণে ক্ষণে নাবীচবিত্রেব যে অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিযা অভিভূত হইযাছি তাহাবই একটু আভাস মাত্র। অভিভূত অনুভূতিব সম্পূর্ণ বর্ণনা? সে কি আব সম্ভব! সামান্য চেষ্টা।

সান্নিধ্যেব সূত্রটা এই— একটা "বেস্কিউ পার্টিব" কিছুটা পার্ট গ্রহণ কবিতে হইযাছিল। না কবিযা উপাযও ছিল না...জগমামা ছাড়িবেন কেন? নিজেকে তিনি পৃথিবীসুদ্ধ দুর্গতেব গার্জ্জেন মনে কবিতে পাবেন, সকলেব দুর্গতি মোচনেব দাযিত্ব লইযা হাঁকাহাঁকি কবিতে পাবেন, কিন্তু চাবখানাব বেশী হাত পা তো গজাইতে পাবেন না? কাজে কাজেই— প্রাকৃতিক, মানবিক, দৈবিক, ভৌতিক, যে কোনো দুর্য্যোগেব সূচনা দেখিলেই বুঝিতে দেবী হয না, আমাবও ভাগ্যাকাশে দুর্য্যোগেব মেঘ আসন্ন। জগমামা ডাক দিবেনই।

এবাবেও ডাক পড়িল.......জগদ্বিখ্যাত "প্রত্যক্ষ দিবসেব" তাল সামলাইতে। যথাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশান্তে মহোৎসাহে আমাব পিঠ ঠুকিযা দিযা কহিলেন— "লেগে পড়্। তোব ওপবেই আমাব বেশী ভবসা।" হযতো জনান্তিকে সকলকেই এই একই ঔষধ প্রযোগে চাঙ্গা বাখেন, তবু এত উৎসাহেব মুখে বলিতে বাধিল যে আমি নিজে তো—'ভবসা' শব্দটিব আদ্যক্ষর ছাড়া মনেব মধ্যে আর কিছুই খুঁজিযা পাইতেছি না।

অগত্যা 'দুর্গা' বলিয়া দুর্গম সমুদ্রে ঝাঁপাইযা পড়া ছাড়া গতি কি? 'দয়া' 'মায়া' 'সহানুভূতি' ইত্যাদি বড় বড় কথা থাক, চক্ষুলজ্জাকে তো বিসর্জ্জন দিতে পাবি না। পাড়াব যত ছেলে— জগমামাব

'স্বোপার্জ্জিত' বিরাট ভাগিনেয় বাহিনী— সকলেই যখন দিকে দিকে বিপন্নের সন্ধানে ছুটিতেছে— আমি কোন্‌মুখে ঘরের কোণ আশ্রয় করিয়া বসিয়া থাকিব? ভবিষ্যতে কি আর সে-মুখ দেখানো সম্ভব হইবে? অবশ্য ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি আমি এবং জগমামা গুণ্ডার চোখ এসকাইয়া শেষ অবধি টিকিয়া থাকি!

আমার উপর ভার ছিল মেয়েদের বোর্ডিং হোস্টেলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার। অবশ্য আপদ আসবার পূর্ব্বেই যথারীতি বা যথাসম্ভব রক্ষাকবচ সঙ্গে লইয়া প্রথমেই গেলাম—হোস্টেলে। হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিসেস ঘোষাল আমাদের আশায়, বিশুদ্ধ বাংলায়— 'হানফান' করিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া আনন্দে মূর্চ্ছা যাইতে যাইতে কোনপ্রকারে সামলাইয়া লইয়া কখনো ছলছল, কখনো বিস্ফারিত চক্ষে ঝড়ের বেগে যে বাক্যরাশি বহাইয়া গেলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে- "গত তিন দিন যাবৎ প্রায় পঁযতাল্লিশটি মেয়ে লইয়া তিনি যে উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়াছেন সে শুধু তিনিই জানেন.....তিন দিন তিন রাত্রি কাহারও আহার নিদ্রা নাই ...! ইত্যাদি......

রাত জাগিয়া পেটের ভাত চাল হইয়া যাইবার ভয়ে মেয়েরা ভাতে বসিতে রাজী হয় না-- খাইবেই বা কি? উপকরণ তো কচু আর কুমড়া! মুহুর্মুহু চা চায়, অথচ চিনি নাই। আতঙ্কে আতঙ্কে এবং চায়ের অভাবে মেয়েরা প্রায় পাগল হইয়া উঠিয়াছে!... অনেকের আবার ফিট্ এর ধাত! এদিকে ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, টেলিফোন বন্ধ, মিসেস ঘোষালের স্নায়ু নিতান্ত সবল বলিয়াই এতটা টান সহ্য হইয়াছে কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ সহ্যের বাহিরে যাইতে বসিয়াছে—এভাবে আর এক বেলাও চালাইতে হইলে- থাক্, অকল্যাণের কথাটা আর নাই উচ্চারণ করিলাম।

নষ্ট করিবার মত সময় অবশ্য আমাদের ছিল না।

সামান্য কিছু কাপড় চোপড় লইয়া মেয়েদের নামিয়া আসিতে বলিলাম। পঁযতাল্লিশটি উন্মাদিনীপ্রায় তরুণীকে সামলাইয়া লইয়া যাইবার ভার পাইয়া সত্য গোপন করিব না, বেশ একটু উন্মাদনা বোধ করিতেছিলাম। এত ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও।

আশ্বাস দিবার ছলে— আলাপ করিতে যাইব না তা ঠিক, সাহসও নাই তবু নিজেকে যেন ঐতিহাসিক যুগের 'হীরো' মনে হইতেছিল। হয়তো এই নামই একদা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে নারীত্রাতা বীরপুরুষদের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু সে যাক্ ..ইহাদের এত দেরী কেন? সামান্য কিছু কাপড়-জামা গোছাইয়া আসিতে এত সময় লাগে? মিসেস ঘোষালের হিসাবে তো যাইবার জন্য আলগোছ হইয়া আছে সব....তবে?

ফিট্ হইল না তো কাহারও?.....সারা সংসার তুলিয়া আনিতেছে নাকি? মিসেস ঘোষালেরও পাত্তা নাই, সেই যে উপরে উঠিয়াছেন। এ-দিকে রেডক্রশের গাড়ী অপেক্ষা করিতে রাজি নয়, মিনিটে মিনিটে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছে। কি করি....দোতলার সিঁড়ি ধরিয়া সোজা উঠিয়া যাইব? না, আসিতেছেন—আসিতেছেন! একে একে দুইযে দুইযে নামিয়া আসিতেছেন...হাতে ভ্যানিটিব্যাগ, পায়ে হাইহিল, পরণে ঢাকাই, টাঙাইল, ছাপা সিল্ক, রঙিন তাঁত, চোখে কাজল, ঠোঁটে রং! মাপ করিবেন, এত নিখুঁৎ দৃষ্টিপাত আমার স্বভাব নয়, শুধু দেখিয়া বেশী শক্ খাইয়াছিলাম বলিয়াই!...কোথায় আলুথালুবেশা আলুলায়িতকেশা— অর্দ্ধ-উন্মাদিনী আশ্রয়-প্রার্থিনী কাতরা রমণীর দল, আর কোথায় সুসংবদ্ধবেশা হাস্যোৎফুল্লা তরুণীর সারি!

ভাবিলাম ধন্য বঙ্গবালা! এই ঘোর দুর্দ্দিনে—লোকের যেখানে মাথার ঠিক থাকে না সেখানে

চোখের কাজল ঠিক রাখা কম আয়াসসাধ্য ব্যাপার?... কিন্তু পথের লোকে দেখিলে কি ভাবিবে? হয়তো ভাবিবে, আমি যেন নব-বিবাহিত শাঁসালো জামাই, বিরাট শ্যালিকাবাহিনী লইয়া চলিয়াছি মেট্রো-লাইটহাউসে।

চলিতেছি....মধ্য কলিকাতা হইতে দক্ষিণ কলিকাতায়! গাড়ীর উল্কাবেগের মধ্যেও টুক্‌রো-টাক্‌রা কানে আসিতেছে ...."উঃ বাবা, যে তাডা লাগালেন মিসেস ঘোষাল, একটা শাড়ী বার করবার পর্য্যন্ত সময় হল না"...."বেলাটা তবু এর মধ্যেই খুব সেজে নিয়েছে....।" দীপ্তি কি কাণ্ড করেছিস? সব শাড়ী ব্লাউসগুলো এনেছিস নাকি? কত বড় প্যাকেট!" "সব আবার কোথা? কি যে বলিস! মাত্র গোটা-আষ্টেক শাডী আব এগারোটা ব্লাউস....কত দিন থাকতে হবে ঈশ্বর জানেন...কি করে যে চালাবো"....."উঃ, আমাব দুর্দ্দশার কথা যদি শুনিস, একটা জুতো কিনবো বলে ঠিক করছিলাম—মাঝখানে এই কাণ্ড! ছেঁড়া জুতো পরে লোকসমাজে বেবোনোর চাইতে গুণ্ডাব হাতে মরা বরং ভালো ছিল—উঃ, কী ভীষণ খারাপ যে লাগছে।" —"খারাপ লাগা? কার বা না লাগছে শুনি? বাসন্তী চ্যাটার্জীর কথা শোন একবার!" "কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে কে জানে! হযতো এক ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হবে....বাথকম পাবো না.....শাডী ব্লাউস হারিয়ে যাবে"...."বেঙ্গল-ডায়ার্সে আমার নতুন ধনেখালি শাডীটা পড়ে থাকলো"—একটি নিশ্বাস। "শুনছি নাকি পাঁচশো মেয়েকে কোন একটা ওই—কলেজেব বাড়ীতে নিযে গিয়ে তুলেছে!!" —জানি না বাবা, কপালে কত দুর্গতি আছে... কী ভীষণ বিশ্রী লাগছে ভাই!".... "আমি বাবা থাকছি না ওখানে, কাছেই দিদির ননদেব বাডী আছে, চলে যাবো...." "ছাডবে তো?"...."ছাডবে না মানে? জেলেব কযেদী নাকি? ....."তবে তো আমিও চলে যেতে পারি সুকোমলদা'কে খবব দিযে—"...."সুকোমলদা? ওঃ! তোর সেই 'তিনি'? .....তা'হলে তো দেখছি তোর পোয়াবাবো এই সুযোগে..." "ভাগ্ অসভ্য মেযে! কিন্তু সত্যি বলতে কি ভাই, এরকম পালানোয় বেশ যেন এ্যাড্‌ভেঞ্চাব আছে"..."নীলিমা চুপচাপ আছিস যে বড? তুমি বাবা সোজা মেয়ে নও—কী উপায়ে তোমাব সেই 'ইযে দাদার' সঙ্গে দেখা করতে পারো তাই ভাবছো নিশ্চয়?" "পাগল আর কি! মিসেস ঘোষাল তো যাচ্ছেন পরের ট্রিপে।"...."আরে দূর, ওখানে আবার মিসেস ঘোষাল! জনতার চাপে হাবিয়ে যাবেন।" ..."সাউথ ক্যালকাটার মেয়েগুলো শুনেছি ভীষণ চালিয়াৎ, একসঙ্গে থাকতে হবে কি না কে জানে! কি যে হবে....এত জঘন্য লাগছে ভাই।"

গাড়ীর গতি উল্কাবেগকে হাব মানাইবাব পণ ধবিয়াছে.....কথার লাইন ভাঙিয়া খান্ খান্, আর স্পষ্ট কিছু বোঝা যাবে না....শুধু কথার ধ্বনি ....হাসিব গিট্‌কিরি....! বোধ করি কেহ কাহারও "ইয়ে দাদাব" বহস্য ফাঁস করিয়া দিয়াছে— তাই হাসির এত ঘটা! 'বিশ্রীলাগা'র লক্ষণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

একটা ট্রিপ্ নামাইয়া আবার রওনা হইবার মুখে ক্ষেতু আসিয়া হতাশ সুরে বলিল—'সবুদা, অবস্থা ঘোরালো।'

—ঘোরালো সে কি নতুন বলবি? আবার কোন্ বাজারে আগুন লাগলো?

—আরে দুর ও-আগুন নয়, তবে হ্যাঁ, 'আগুন' বটে। তুমি না গেলে হবে না, চলো জগমামা ডাকছেন।

—কোথায় যেতে হবে তাই বল?

আর কোথাও নয়, এই বাড়ীর মধ্যেই।—যেখানে সমস্ত আগুনের খাপরাদের এনে এনে জড়

করা হচ্ছে। তুমি আর কজনকে এনেছো? দেখোগে ইতিমধ্যে কতো এসে গেছেন, চারিদিক থেকে! আর আগুন—

—কেন? কোন গোলমাল হয়েছে নাকি? ব্যাপার কি?

—বলে বোঝাবার নয়। জগমামা অকূল পাথারে পড়েছেন— তুমি দেখগে যাও। আমি বরং তোমার কাজটা চালিয়ে দিচ্ছি।

—তাহলে ভেতরেই পাবো জগমামাকে?

—কি জানি এতক্ষণে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন কিনা, বলছিলেন 'পালাই'। এক কাজ করো বরং, আগে জগমামার বাড়ীটাই দেখে এসো! দেরী কোরো না, কি যে হচ্ছে কে জানে—! আমি তো— পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

ক্ষেতু আমাকে ঠেলিয়া পাঠাইল।

কিন্তু কে জানিত যমের মুখে ঠেলিয়াছে। ....জগমামাব বাড়ী গিয়া দেখি জগমামা নাই! দুর্গা শ্রীহরি— বাড়ী নাই। যিনি আছেন তিনি জগমামী।

কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে বারকতক 'কে? কে?' প্রশ্ন করিয়া সশব্দে কপাট খুলিয়া দাঁড়াইলেন।.....আর একদিন এমনি দাঁড়াইয়াছিলেন, সরস্বতী পূজাব চাঁদা চাইতে আসিয়াছিলাম—জগমামা বাড়ী ছিলেন না। ....সেই অবধি চাঁদা তোলাব ভাব আব নিই না।

আজও দাঁড়াইলেন। বারকয়েক আমাব আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন— তোমরাই 'রেস্কু' হযেছ?

সভয়ে মাথা নাড়িলাম, অবশ্য নেতিসূচক নয়।

—তা বেশ কোর্চ্ছো, ভালো কাজ কোর্চ্ছো, বাপমার 'আউট্' ছেলে, যা কোর্চ্ছো শোভা পাচ্ছে! কিন্তু এ বুড়োমানুষটাকে টানা কেন? তোমাদেব মতন ধেই ধেই করে বেডাবাব বয়েস ওব?

ভিতর হইতে প্রতিবাদের প্রবল তাগিদ অনুভব করি—ভাষা খুঁজিয়া পাই না। অথচ ওপক্ষে ভাষাব অগ্নিস্রোত।

—কেন, আপনারা মুরোদ বেব করে দেশ উদ্ধার করোগে না বাছা, বাবণ তো করেনি কেউ! 'মামা! মামা!' সাতকালের মামা! যেখানে যা হবে— বন্যে ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ মড়ক সবেব দাযিক 'মামা'। মামা যেন চোব-দায়ে ধরা পড়ে বসে আছে!

গোবেচারা ভালোমানুষ মামাটিকে ভাঙাইয়া খাইতে খাইতে মামীর সংসারের জন্যে যে তাঁহার আর কিছুই অবশিষ্ট বাখি নাই, সংসারের কুটাটুকু ভাঙিয়া উপকার করিবার ক্ষমতাও নাই তাঁহার, ক্ষমতা আছে শুধু শিঙ্ খোয়াইয়া বাছুরের দলে নেত্য করিয়া বেড়াইতে—ইত্যাদি খাঁটি কথাগুলি শুনাইয়া দিয়া পরিশেষে মন্তব্য করিলেন জগমামী—'পাডার ছেলে আসো যাও বলি না কিছু, এবারে কিন্তু নিজমূর্ত্তি ধরবো আমি।'

'ঝনাৎ' শব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাঁচিলাম বলিলে ভুল হয় না, কিন্তু 'নিজমূর্ত্তির' স্বরূপটা আর কল্পনায় আনিতে পারি না।.... যাক—জগমামার পাত্তা পাওয়া তো দরকার। কোথায় আর যাইবেন—সেই সেখান ছাড়া? ক্ষেতুর ভাষায় যেখানে আগুন জ্বলিতেছে।

আসিয়া দেখি—হাঁ, আছেন— দরজার সামনেই। বিপন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

মামা কিছু বলিবার আগেই বলি, দেখো মামা, তোমাকে ঝোকা-সোকা ভালমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে দেশোদ্ধার করিয়ে নিচ্ছি, এটা তো ভালো কথা নয়?

—কেন ? কেন ? আমার বাড়ী গিয়েছিলি বুঝি ? .....জগমামা উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করেন—খুব যাচ্ছেতাই করলে তো তোদের মামী ? ক্ষেতুকেও করেছে। আচ্ছা কী পাগল বল্ তো— বলে কি না "দেশে এত লোক থাকতে তোমার কেন মাথাব্যথা—" আরে মাথা থাকলে তবে তো মাথাব্যথা! সে যাক্, ওসব মেয়েলীকথায় কান দিলে চলে ? এখন এদিকে মস্ত বিপদ!

বলিলাম—ক্ষেতুও বললে বিপদ। বিপদ তো পদে পদে, নতুন আব কি ? প্রাণ তো সুতোব আগায় ঝুলছে—

—আরে না না, ওসব কিছু না, বিপদ হচ্ছে—এরা বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন! মানে,—বেজায় অসুবিধে বোধ করছেন।

—কাবা ? বিস্মিত প্রশ্ন কবি।

—আঃ কি বিপদ। 'এঁরা'। মানে যাঁবা এসেছেন।

—ওঃ, তাই বলো। তা' অসুবিধে তো বোধ করবেনই—ঘরবাড়ী ছেড়ে একবস্ত্রে চলে এসেছেন—

—কি বিপদ। তবে আমবা কবলাম কি ? ভদ্রঘবেব মেয়েবা রযেছেন সব। একজনেব ছোট ছেলের নাকি সক্কালবেলা উঠেই দুখানা গজা আব দুখানা বিস্কুট খাওযা অভ্যেস, শুধু বিস্কুট দেখে ফেলে দিয়ে কান্নাকাটি কবছে! তাব মা তো চটেমটে লাল। বলেন, —"ছেলেপিলে যদি ঠিকমতন খেতে না পেলো তবে আব আনা কেন ? এব চেযে গুণ্ডাব হাতে মবা ভাল ছিল।"....আর একটি ভদ্রমহিলা হর্লিক্সেব অর্ডার দিযে বসে আছেন, একজন জামা কাপড় কিছু আনতে পাবেননি বলে স্নান কবতে পাননি....কাঁদছেন! ওদিকে ঠাকুর-চাকরগুলো এতো যাচ্ছেতাই চা তৈবি করেছে যে কেউ মুখে করতে পারেননি! আবাব কে বুঝি বাসিকাপড়ে কার কাচাকাপড় ছুঁযে দিয়েছে সেই নিয়ে হুলস্থূল ব্যাপার! কি যে করি ? তোব ওপবই আমাব বেশী ভবসা।

বলিয়া জগমামা আর একবার পিঠ ঠুকিয়া দেন।

অথচ আমার তো হৃৎকম্প শুরু হইযাছে।

জানি জগমামা যাওয়াইযা ছাড়িবেন তবু শেষ অস্ত্র হিসাবে বলি—যেতে দাও না মামা, 'মেযেলি কথায় কান দিলে চলে ?'

—বলিস্ কি সব ?

মামা আকাশ হইতে পড়েন।—ওঁবা সব ভদ্রঘবেব মেযে।

যেন সে দাবী জগমামীব নাই!

—বুঝলাম। খুবই অসুবিধেয় পড়েছেন, কিন্তু ইচ্ছে কবে তো অসুবিধেয ফেলিনি আমরা ? যেমন করে হোক মাথাগুঁজে থেকে— বিপদ উদ্ধার হওযা বৈ তো নয় ?

—সেকথা কে বোঝে বল্!

জগমামা হতাশ ভঙ্গী করেন।...তুই বরং বুঝিয়ে দেখ্‌গে—

গেলাম।

নিজে কিছু বুঝিবার আগেই একটি আধাবয়সী সধবা মহিলা প্রায় তাড়িয়া আসিয়া বলিলেন—এই যে, তোমাদেরই খুঁজছিলাম। বলি বাবা, এই যে গাডী গাডী মেয়েমানুষকে এনে এনে জন্তু-জানোয়ারের মতন খোঁয়াড়ে পুরছো—তারা খেলো কি, না খেলো, কিছু পেলো কি না পেলো দেখতে আসছো একবার ? তাই বলছি—মরতেই যদি হয়—ঘর-বাড়ী ছেড়ে এখানে মরতে আসা কেন ? এর চেয়ে গুণ্ডোর হাতে মরা ভালো ছিল!

—কি আশ্চর্য্য, খাওয়া-দাওয়ার তো যতোটা সম্ভব ভালো বন্দোবস্ত করা হয়েছে!

—হবে না কেন, মাছমাংস, বিস্কুট পাঁউরুটি, সত্যিক-জাতের ছোঁয়া জল, সব খেতে পাবলে ব্যবস্থা আছে। তা তো আর পাবিনে বাছা। আজ দশবছর ওসব ছেড়েছি—একদিন 'কাবে' পড়েছি বলে জাতধম্ম খোয়াবো নাকি ?

সধবাদের বাছবিচার থাকে না, তাই জানা ছিল তবু সবিনয়ে প্রশ্ন করি সে কি ? যাঁরা নিরামিষ খাবেন তাঁদের তো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা ছিল ?

—ওই শুনতেই আলাদা, তাকিয়ে দেখলে আর জ্ঞান থাকে না আঁশঘরের বামুন নিরামিষ-ঘরে এসে পান খাচ্ছে! আর চাও কিছু ?

হতাশ ভাবে বলি—তাহলে আপনার কি ব্যবস্থা হবে ?

—আর ব্যবস্থা! বিধাতা এখন কত দুর্গতি লিখেছেন কে জানে! আমাকে তুমি বরং বাজারের খাবার কিছু আনিয়ে দাও।

—বাজারের খাবার ? চলবে ?

—উপায় কি! মাছমাংসর চাইতে তো ভালো। . আমাদের কায়েতের ঘরে তো তবু একরকম, ওদিকে দেখোগে এক ব্রাহ্মণকন্যে হত্যে হচ্ছেন, কাল থেকে জলবিন্দুটি মুখে যায়নি।

—কি আশ্চর্য, কোথায় তিনি ? যাঁদের কিছুই চলবে না তাঁদের জন্যে তো ফল আর গঙ্গাজলের ব্যবস্থা আছে।

ভদ্রমহিলা হাসিয়া ওঠেন বিদ্রূপের হাসি।

থাক বাছা, ব্যবস্থার বড়াই আর কোর না তোমরা, কী অব্যবস্থা! কী অব্যবস্থা! মা, মা, এতখানি বয়সে এমন জগাখিচুড়ি কাণ্ড আর দেখিনি মস্ত মস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বাড়ীও দেখেছি তো, দুবেলায় পাঁচশো পাত পড়ছে—টুঁ শব্দটি নেই, আর এ একেবারে হৈ হৈ কাণ্ড

যেন আমার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি ইঁহাকে

কিন্তু সেই মরণোন্মুখ ব্রাহ্মণকন্যা ?

শুনিলাম স্পর্শদোষ এড়াইয়া তিনতলার ছাতে বসিয়া আছেন। অথচ জগমামা ভার দিয়াছেন সকলকে বুঝাইয়া সোজা করিতে আমার ওপরই নাকি বেশী ভরসা তাঁহার

সামান্য কয়টা সিঁড়ি ভাঙা ? এমন আর শক্ত কি ? প্রশংসার সুরাও তো কম বলবর্দ্ধক নয়!

সিঁড়ির মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম আছেন বটে— কিন্তু নিঃসঙ্গ নিশ্চয়ই নয়, তুমুল গল্প চলিতেছে! অনেকরকম কণ্ঠ! "তারপর দিদি, সে কী অবস্থা, ওদিকে পাশের বাড়ী পুড়ে পড়ছে, এদিকে বাড়ীর বাবুদের ধমক,— "কিছু নিতে হবে না, সব ফেলে দিয়ে এসো!" হাত পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে . তার মধ্যে বৌ-ঝি সক্কলকার গায়ের গয়না খুলে পুঁটলি বেঁধে কয়লার গাদার নীচে রেখে এলাম একখানা একখানা করে ঘুঁটে কয়লা কি উটকোবে ? কি বল দিদি, অত সময় পাবে কোথায় ?....

—আহা তুমি তো দিদি তবু সময় পেয়েছ, আমি তো গাড়ীতে উঠে তবে সব পেটকোঁচড়ে পশি।....

—ধনেপ্রাণে মারা যাওয়া! স্থিতভিত সব গেল, আর কি তেমন গুছিয়ে সংসার পাততে পারবো ?

—অবিশ্যি হবেই আবার, কথায় বলে 'হাড় থাকলেই মাস হয়।' তবে এক পক্ষে মন্দই বা কি আমার কথাই বলি—জা ভাসুরের সঙ্গে একতিল বনছিল না, নিত্যি-দিন খিটিমিটি, এদিকে কর্ত্তাটির ধনুকভাঙা পণ 'ভেন্ন' হবো না। আমিও বাবা 'কোট্' ধরেছি, এই সুযোগ। আবার যে সবাই মিলে ভেড়ার গোয়ালে ঢুকবো—সেটি হচ্ছে না।. ..শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে জায়ের এগারটি কাচ্চা-বাচ্ছা।

—এগা-রো! নমস্কার করি বাবা! আপনার?

—আমার তো 'এই মেয়েটি'। ওই একটি বৈ দুটি নয়—মনের মত করে খাওয়াতে মাখাতে ইচ্ছে করে কিনা বলো দিদি? তা' রাবণের পুরীতে হবার জো কি? এই যে তিরিশ টাকা দিয়ে নাচের মাষ্টার রেখেছি... তা জায়গা পায় না যে প্রাণখুলে একটু নাচবে!...খুকু, সেই 'ময়নামতী নাচ'টা দেখিয়ে দাও তো এঁদের—লজ্জা কি বোকা মেয়ে, এই যে এখানে সরে এসো—

সর্ব্বনাশ!

আর নেপথ্যাভিনয় সমীচিন নয়। 'ময়নামতী' সুরু হইলে কি রক্ষা আছে? বঙ্গস্থলে দেখা দিলাম; বামুন মেয়েকে চিনিতে বিলম্ব হইল না।

উন্নাসিক আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা, ধবধবে থানপরা, সিল্কের চাদর গায়ে, বয়েস চল্লিশের বেশী নয়। তুমি সম্বোধন না করিয়া 'আপনি' বলিলাম। সসম্ভ্রম প্রশ্নের উত্তরে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—উপোসে মরব না, সে জোর রাখি, তবে গঙ্গাজলের কথা যদি বললেন তো বলি—বালতীতে-রাখা গঙ্গাজল, তা'র আবার মাহাত্ম্য!

—ওঃ, বালতীতে রাখা চলে না বুঝি? .....সত্য বলিতে কি সম্ভ্রম না আসিয়া উপায় ছিল-না—এমনি দৃপ্তভঙ্গী! ব্যস্তভাবে বলি—বলেন তো আলাদা আনিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু খেতে তো হবেই কিছু!....বুঝতেই পারছেন, এখানেই কিছুদিন থাকতে হতে পারে, কাজেই—

ঈষৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে কিছু ভাবিয়া বলিলেন— চারটি চিঁড়ে আর চিনি পেলে ভালো—গঙ্গাজলে ভিজিয়ে—

—নিশ্চয় নিশ্চয়, এখুনি সব ঠিক করে আনিয়ে দিচ্ছি—

নিজেই ছুটিলাম। গঙ্গা দূরে নয়—

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলাইয়া দুই বোতল গঙ্গাজল আনিয়া মহোৎসাহে বলি—এই নিন, বোতল আগে ভালো করে গঙ্গায় ধুয়ে এনেছি—

মুখের কথা শেষ হইল না, একটি তীক্ষ্ণহাসি যেন বুকের হাড়ে গিয়া বিঁধিল।...—বোতলে গঙ্গাজল? আপনি হিন্দু তো? না কি? কাঁচের বোতলে খাওয়া আর মাছমাংস খাওয়ার তফাৎ?

তফাৎ যে কিছুই নাই—তা জানিতাম না! কাজেই—বুঝিতে পারি না—গোলমাল হইয়া যায়।

তিনিই বুঝাইয়া দেন....নতুন মাটির কলসীতে নাকি গঙ্গাজলের বিশুদ্ধতা কিছুটা বজায় থাকে।...অতঃপর চিঁড়া! যাইতেছি, পিছনে ডাক—দেখবেন আবার সেদ্ধ চিঁড়ে এনে বসবেন না—

—না না, সে কি! সেদ্ধ কেন? কাঁচাই আনবো তো—শুকনো!

—হয়েছে! অবোধ শিশু নাকি? আতপ চিঁড়ে জানেন না?

জ্ঞান হইল। জানিতাম না তা নয়, বলিয়াছি তো গোলমাল হইয়া যাইতেছে।...ছুটিলাম। সাইকেলের সাহায্যে মাইল তিন চার ঘুরিয়া তিন টাকার দরে একসের আতপ চিঁড়া আনিয়া যখন পৌঁছিলাম—সন্ধ্যা হয়-হয়।....

ব্রাহ্মণকন্যা সেগুলি আলগোছে লইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, সামান্য জিনিষের জন্যে এত দেরী, এ শুধু আপনাদের পাড়াতেই দেখছি....একটু গঙ্গাজল আর দুটো শুকনো চিঁড়ে যোগাড় করতে একটা বেলা কেটে গেল! ধন্যবাদ। থাক, আজ আর খাচ্ছে কে!

ধন্যবাদ হজম করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখি জগমামা।

—এই যে সবু, সব হ'ল?

—হল।

—বাঁচলাম বাবা, জানি তুই যেখানে আছিস—সব ঠিক হয়ে যাবে। যে মেয়েটা হবলিক্‌স্ চেয়েছিল তারা পেয়েছে?

—জানি না।

—জানিস না? সে কি?...যারা বাথরুম না পেয়ে রাগ করে পদ্মপুকুরে গা ধুতে গিয়েছিল তারা ফিরেছে?

—জানি না।

—তাও জানিস না? তবে! ....বলি—কুমড়ো ছাড়া আর কিছু তরকারি যোগাড় হয়েছে?

—কিছুই জানি না আমি।

—তবে এতক্ষণ চাঁদমুখ নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে চাঁদ? প্রেয়সী খুঁজছিলে? বলি, একঘরে খাওয়া-শোওয়া নিয়ে নীচুজাত উঁচুজাতে যে ঝগড়া হচ্ছিল তার কিছু মীমাংসা হয়েছে?

এটা জানিতাম। কারণ ঝগড়াটা নিতান্ত নীরবে হইতেছিল এমন মনে করিবার হেতু নাই। আসা যাওয়ার পথে কানে গিয়াছে। ...বলিলাম, মীমাংসার আছে কি? বর্ণহিন্দুরা তপশীলিদের ছায়া মাড়াতে রাজী নয়; অথচ তপশীলিরা ন্যায্য আসন চায়। ঝগড়া তো চলতেই থাকবে।

—তা' হলে?

—ও কিছু না। অভাবের জাঁতায় মুগমুসুরি এক হয়ে যাবে।

মামা কাতরভাবে বলেন—ক্ষেপেছিস? পুরুষ মানুষের কথা আলাদা, এ যে মেয়েছেলে! ওরা কখনো স্বভাব ছাড়ে? ইস্কুলবাড়ীর মেয়েদের কথা শুনেছিস? তারা নাকি—

—কাল শুনবো মামা।

বলিয়া বড় বড় পা চালাই।

ছোটখাটো একটা ষ্টেশনারী দোকান আমার ছিল, দাঙ্গার হাঙ্গামায় আজ এগারো দিন অনাথার মত দোর বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছে। ভাবিলাম 'দুর্গা' বলিয়া খুলি।

তালা খুলিয়া সবে ঢুকিয়াছি....তখনো কাউন্টারের সামনে বসি নাই, একটি ছোকরা হন্তদন্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—এই যে দোকান খুলেছেন—যেখানে যাই দোকান বন্ধ, এমন মুস্কিল হয়েছে— "টাঙ্গী লিপষ্টিক" আছে? 'টাঙ্গী'? আর কিছু হ'লে চলবে না। দেখুন না শিগগির—

ঔষধাভাবে শিশুপুত্রের রোগ বাড়িতে থাকিলে পিতা যেমন মরিয়া হইয়া ছুটাছুটি করে তেমনি ব্যস্ত ভাব।

বুঝিলাম কোনো 'ভুতো দাদা'। পাছে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিত বস্তুটি আগে আনিয়া হাজির করিয়া বাহবা আদায় করিয়া বসে তাই এত ছুটাছুটি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রার্থিত বস্তু পাওয়া গেল না।

অবশ্য আজকাল অমন অনেক জিনিষই থাকে না, 'বিস্কুট নাই' 'হবলিকস নাই' 'অজন্তা সাবান নাই' 'এটা নাই' 'ওটা নাই' বলিতে বলিতে হায়রাণ হইয়া যাই।

ছোকরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—নেই? কি নিয়ে যে দোকান দিয়েছেন আশ্চর্য্য! বেচারা মেয়েদেরই হয়েছে দুর্দ্দশার একশেষ! যথাসর্ব্বস্ব ফেলে রেখে বাড়ী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, অথচ এখানে কিছু মিলছে না।

অপরাধীর মতো বলি—এই আর একটা রয়েছে—'কমলিকা'! 'টাঙ্গীর' মতো অতো ফাষ্ট কালার না হলেও—

—থাক মশাই, ও চলবে না— 'টাঙ্গী' ছাড়া আর কিছু ব্যাভার করে না সে। দেখি এখন কোথায় পাই। .. .ঝঞ্ঝাট দেখুন না—ভ্যানিটি ব্যাগ এনেছিস যখন—বিশেষ দরকারী জিনিষগুলো তো ভরে নিতে হয়? এখন একেবারে অস্তির ব্যাপার, বলে কিনা—এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে গুণ্ডার হাতে মরা শ্রেয় ছিল'। বুঝুন?

ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু বুঝিব কি! আমি যে তখন বিহ্বল অভিভূত বুঝিবার ক্ষমতা কই?

পুরুষ বলিয়া বীরত্বের বড়াই করি, অথচ প্রায়ই কতো তুচ্ছ কারণে দাড় কামাইতে আলস্য করি. ..জুতায় কালি দিই না, কোটের বোতাম ভুল ঘরে লাগাই, পকেটে রুমাল থাকিতে ফর্সা কোঁচার আগায় তেলতেলে ঘাড় মুছি। আর এতটুকু বিপদে পাড়লেই বিচলিত হই! ছিঃ! আমাদের আবার বড়াই?

[১৩৫৩]

সত্যাসত্য

রাধারাণীকে রাজী করানো নিয়েই ভাবনা

সে নিঃসন্তান নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, ঝামেলা পোহাতে চাইলে তো? তবু সাহসে ভর করে বলেই ফেললো বিভূতি কথাটা। রাত্রে খেতে বসে ছাড়া আর কখন বলবে?

রাধারাণী দুধটা বেশী গরম করে ফেলে তাড়াতাড়ি একটি থালায় ঢেলে জুড়িয়ে দিচ্ছিল—বিভূতির প্রস্তাব শুনে মুখ তুলে শুধু বললে— 'ক বললে?

বাচা গেল! শুনতে পায়নি তাহলে রাধারাণী, বিভূতি ভাবলো আর কোনো কথা তুলে আগের কথাটা চাপা দিয়ে ফেলি, কিন্তু অমলের মুখখানা? দু'খানা ঘর খুঁজে বেড়ানোর জন্যে তার পাগলামী? দুর ছাই, বলতেই বা কি?

গম্ভীর ভাবে বললে—বলছি— আমাদের নীচের ঘর দু'খানা তো পড়েই আছে—

—পড়ে থাকবে না তো কি ডানা মেলে উড়ে যাবে?

কিন্তু বিভূতির এতই বা ভয় কেন? বাড়ী কি রাধারাণীর? যা থাকে কপালে—বললে—ভাবছি ভাড়া দেব।

—ভাড়া দেবে? তা ভালো। কাবলীওলা না দাড়িওলা গুণ্ডা?

এই। এই জন্যেই রাধারাণীর সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে বিভূতির। প্রতিবাদ করুক না, তার কাটান আছে। তর্ক করুক—যুক্তি আছে। রাগ করুক—তারও উত্তর আছে, কিন্তু এরকম ঠাণ্ডা বিদ্রূপের কি ছাই আছে? থাকলেও বিভূতির জানা নেই। যা জানা আছে সেটা ভয় চাপা দিয়ে বিরক্তির ভাণ, সেই সুরেই বলে—

—গুণ্ডা? গুণ্ডার কথা ওঠে কেন? দিই তো অফিসের একটি ছোকরাকে—

—ওঃ, ব্যবস্থা হয়েই গেছে তা'হলে?

—না, ঠিক হয়ে যায়নি। ছোকরাই দুঃখ করছিল অফিসে, দু'খানা—নিদেন একখানা ঘরও যদি পাই! কলকাতা সহর নাকি চষে ফেলেছে ঘরের জন্যে।...এদিকে মুস্কিল, এই সম্প্রতি মা গিয়েছেন

মবে; কচি বৌটা একলা দেশে পড়ে আছে—থাকেই বা কি কবে? ও তো মাত্র হপ্তায় একবাব বাড়ী যায়। আবাব শুনছি না কি এ অবস্থায় একলা থাকা ভালো নয়! পাড়াগাঁয়েব গাছপালা ঝোপ-জঙ্গলেব বাড়ী—

তৎক্ষণাৎ বাধাবাণী কথা কয়, সন্দিগ্ধ ভাবে বলে—'এ অবস্থা' মানে?

—মানে আব কি, ইয়ে—ছেলে পুলে হবে না কি বলছিল।

তবে আব কি, তোমাব বাড়ীতে এনে তোলো

বহুক্ষণ ভণ কবা বিবক্তিতে আব কুলোয় না, কুণ্ঠিতভাবে বলে—ছোকবাব অস্থিবপণা দেখে সত্যি, মানে কথা না দিয়ে থাকা গেল না। তবে ওই যত দিন না বাড়ী পায়—

বাধাবাণীব দিক থেকে আব কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

অথচ পবদিন অফিসে গেলেই অমল ছোকবা নিশ্চয় ধবে বসবে— কি দাদা, বৌদিদিকে বাজী কবাতে পাবলেন?

দূব ছাই, বললেই হবে ঘব দু'খানা বিভূতি আগে দেখেনি, ছাদ দিয়ে জল পড়ছে....কিন্তু দোতলাব নীচে একতলাব ঘবে কি জল পড়ে?

পবদিন বাত্রে নিজেই হঠাৎ কথাটা পাড়লো বাধাবাণী, —তোমাব ভাড়াটে কবে থেকে আসছে?

বিভূতি উদাস ভাবে বলে আসছে আব কই? বাবণ কবে দিলাম তো—

কেন? বাবণ কববাব মানে? আমি বলেছি কিছু? যাতে তাতে আমাব বদনাম বাব কবাই কাজ তোমাব। কি বললে শুনি? 'ভাই আমাব তো খুবই ইচ্ছে ছিল আমাব স্ত্রীটিকেই বাজী কবানো কঠিন—জাহাবাজ মেয়েমানুষ—'

বিভূতি হঠাৎ হেসে ফেলে হ্যাঁ, বলেছি ওই সব!

—তা তুমি পাবো। নইলে বাবণ কবলে কি বলে? পোয়াতী বৌটা একলা গাছ-পালাব ছায়া দেখে আঁৎকে মরুক? তা মরুক না! পাপেব ভাগী তো বাধি বামনী, কি বল!

বিভূতি সোৎসাহে বলে—তবে আসতে বলে দিই?

—সে তো তুমি বলবেই, আমি বাবণ কবলেই শুনছো কিনা?

অতএব দিন কয়েক পবেই অমল দু'টো ট্রাঙ্ক একটা বালতি দেড়খানা হ্যাবিকেন একটা বেডিং আব একটি বৌ নিয়ে এসে হাজিব হ'ল বিভূতিব নীচেব তলাব ঘব দু'খানা দখল কবতে।

দু'খানা ঘব একটু দালান আব টিনেব ঘেব-দেওয়া সামান্য একটু বান্নাব জায়গা, এই অমল আব অরুণাব নতুন বাজ্য পাট।

অরুণা যখন তখন বলে—আপনি না থাকলে যে আমাব কি দশা হত দিদি, কোন কালে মবে ভূত হয়ে থাকতাম।

বাধাবাণী হেসে ওব টুসটুসে গালটা টিপে দেয়—ব্যাকবণ ভুল কবিস না, বল 'মবে পেত্নী হয়ে থাকতাম'।

—তা' যা বলেন—সত্যি এক এক দিন এমন ভয় কবতো! আব যা বাগ হ'ত আপনাব দেওবেব ওপব উঃ! অথচ ওবই বা দোষ কি, বাড়ী খুঁজতে তো আব কসুব কবেনি, সত্যি আপনাব দয়া না পেলে—

—আচ্ছা খুব পাকামী হয়েছে—এখন আয় দিকিনি চুলটা বেঁধে দিই। মাথা কবে বেখেছে দেখ না!...

প্রকাণ্ড চুল অরুণাব, সত্যি ছেলেমানুষেব পক্ষে সামলানোও দায়।

এই চুলেব কাঁড়ি নিয়ে নেড়ে-চেড়ে মনেব মতো খোঁপা বেঁধে দিতে ভাবী সুন্দব লাগে বাধাবাণীব, দীর্ঘ অবসবেব কিছুটা শূন্যতা যেন ভবে।

মাথা-সমান প্রকাণ্ড খোঁপাটি বেঁধে দিযে কাঁটা বিঁধতে বিঁধতে বাধাবাণী মুচকে হেসে বলে —'পদ্মফুলে ভোমবা ভোলে খোঁপায ভোলে বব'— আজ আব অমল ঠাকুবপোব বক্ষে নেই—এসেই মূর্চ্ছা।

—য্যাঃ! বলে উঠে পালায অকণা।

বেশ লাগে বাধাবাণীব এই মিষ্ট লজ্জাটুক্

বিভূতি মাঝে মাঝে অবাক হযে যায

ভেবেছিল বাধাবাণীব বাক্যিব চোটে দ'দিনেই অমলকে পাততাড়ি গুটোতে হবে— কিন্তু এ আবাব কি উল্টো ব্যাপাব? বাধাবাণীব স্বভাবটাই যে বদলে যেতে বসেছে, বিভূতিব সঙ্গেও আজকাল সোজা ভাষায় কথা কয! সব সমযই বেশ হাসি খুসি ভাব।

মেযেদেব বোঝা ভাব।

বাধাবাণীব গড়ে দেওযা ছোট্ট উনুনটিতে বান্না চাপিযে ব্যস্তহাতে এটা সেটা কাজ কবতে কবতে অকণা গলাব সুব সামান্য খাটো কবে ডাকে -দিদি, আপনাব দেওব কি বলছে শুনুন?

বাধাবাণী খুন্তি নাড়া স্থগিত বেখে হেসে বলে —কি বলছে?

—বলছে আপনাব বান্নাঘবেব গন্ধ নাকি ওব মন উতলা কবে তুলছে।

—হবেকেষ্ট! অমি তো বাঁধছি এখন নিম বেগুন

অমল ওদিক্ থেকে মহোৎসাহে বলে— ওই - ওই তো আমবা পাড়াগাঁযেব ছেলে, ওই সব বিশুদ্ধ স্বদেশী বান্নাব গন্ধে আকুল হযে উঠি! আব আপনাব আধুনিকা জা'টি কি বলে জানেন বৌদি —'নিম বেগুন আবাব মানুযে খায?'

বাধাবাণী হাসতে হাসতে একটা বেকাবিতে খানকট' নিম বেগুন ভাজা আব ঝালেব মাছ এনে অমলেব জন্য পাতা আসনেব সামনে নামিযে বেখে বলে —'তা'হলে এই পৌবাণিকাব হাতেব নিমই খাও।'

—আব ওটা কি? ইলিশেব ঝাল? সর্ষে বাটা দিযেছেন তো?.. ..আড়-চোখে একবাব অকণাব দিকে তাকিযে গম্ভীব গলায বলে— আমাব ভাত ক'টা এই বেলা দিযে দেওযা হোক, নইলে ও ইলিশ মাছ—বুঝলেন বৌদি, আপনি পিছন ফিবলেই একদম হাওযা। একে ইলিশ, তায সর্ষে বাটা—আঃ, ও আব দেখতে হবে না!

-হ্যাঁ — সব জিনিয অমনি তোমাব হাওযা হযে উড়ে যায। দিদি, দেখছেন তো বদনাম দেওযা?

— দেখছি তো।

বাধাবাণী হাসে—দিন-বাত পিঠোপিঠিব মত ঝগড়া কবিস কেন বল তো দু'জনে? বিযেব সময বুঝি কুষ্ঠী মেলানো হযনি?

অমল চক্ষু বিস্ফাবিত কবে বলে—হযনি আবাব! ও বাবা! তা হলে শুনুন বৌদি, বিযেব আগে—দুই বব-কনেব কুষ্ঠী নিযে গার্জ্জেনদেব কী দুশ্চিন্তা, ওব বাক্ষসগণ আমাব বাক্ষসগণ, ওব কর্কট বাশি আমাব বৃশ্চিক বাশি, ওব ক্ষত্রিয বর্ণ আমাব—

ওদিকে বঁটি কাৎ কবে বেখে অকণা হেসে কুটিকুটি হয—এত মিথ্যে কথাও বানাতে পাবে উঃ! সব বাজে কথা দিদি, মা-বাপ-মবা মেযে আমি—কুষ্ঠীই ছিল না আমাব।

—হতে পাবে। কিন্তু বাক্ষসগণ আব কর্কট বাশি ছাড়া ওব আব কিছু হওযা সম্ভব? বলুন তো বৌদি?

দুপুবেলা অরুণার সামনে পাথরবাটিটা নামিয়ে দিয়ে রাধারাণী সস্নেহে অরুণার ঈষৎ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে কোমল ভাবে বলে—এই আচাবটুকু খা দিকিন অরুণা, অরুচিব মুখে ভালো লাগবে অখন! ওবেলা তো ভাত ক'টা মোটে খেতে পারিসনি।

অরুণা সোৎসাহে পাথরবাটিটা তুলে নিযে চেখে চেখে খায় আব বলে—আর জন্মে তুমি আমার সত্যি দিদি ছিলে, নইলে মনের কথাটি কি কবে টের পাও? ঠিক একখুনি মুখটা এমন করছিল—

রাধারাণী হেসে বলে—পাতানো সম্পর্ক কি মিথ্যে? অমল ঠাকুরপোর সঙ্গেও তো তোর পাতানো সম্পর্ক।

—বাবা, দিদির এত কথাও যোগায়। সত্যি দিদি, আমার নিজের মাব পেটের বোনই তো রয়েছে এই কলকাতায়, শ্যামবাজারে বুঝি—তা মবে গেলে কি খোঁজ নেয়? দিদির কথা বলছি—সেই যে সে-দিন জামাইবাবু এসেছিলেন?

তা' দিদিকে এক দিন আনতে বললি না কেন?

—বলিনি আবার? ওঁদের হ'চ্ছে বনেদী চাল—বাসে-ট্রামে চড়তে দেন না, এদিকে গাড়ীভাড়াও সাংঘাতিক, দিতে নাবাজ।

—অমন বনেদী চালেব কাঁথায় আগুন।

রাধারাণী বিবক্ত ভাবে বলে—এক-একটা বাড়ীতে ওই বাতিক আছে! আবে বাবু, গাড়ী-জুড়ি থাকলে তবেই বনেদী চাল মানায়! নইলে মব মেয়েমানুষরা দম আটকে। জীবনান্তে একবাব আত্মীয়স্বজনের মুখ দেখতে পাবে না। ....নিবি আর একটু? বেশী দিতে ভয় কবে, অম্বল-টম্বল না হয়।

স্নেহ করবার আদর করবার একটা সুযোগ পেযে বাধাবাণী যেন বেঁচেছে। শুধুই কি স্নেহ পবিতৃপ্তি? আত্মতৃপ্তিই কি কিছু নেই? নিজে সে বন্ধ্যা, তবু আসন্ন মাতৃত্বের কোনো রহস্যই তাব অজ্ঞাত নয়, এটুকু জানানোর মধ্যে কিছু সুখ আছে বৈ কি।

তাই উঠতে-বসতে খেতে-শুতে অরুণাকে সাবধান করতে থাকে, উপদেশেরও অন্ত নেই।

অমল বলে—হয়েছে হয়েছে—বৌদির জাটি কি যেন এক বাজ্যপদ পেয়েছে—বলি আমি ব্যাটা কি একেবারেই গৌণ? বাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূলে কি এ হতভাগ্যের কোনো পার্টই ছিল না?

অরুণা আরক্ত মুখে চাপা গলায—অসভ্য—বলে উঠে যায়।

কিন্তু অমল ঐ রকমই। তাব হাসি-ঠাট্টাব চোটে অস্থিব হ'তে হয তবু ভাবী ভালো লাগে। ও যে রাধারাণীর সত্যি কেউ নয়, এ কথা এখন নিজেই আর বিশ্বাস কবতে পারে না রাধারাণী। তার না ছিল ছোটো ভাই, না আছে দেওর, ছেলে-পুলেও হয়নি! সূক্ষ্ম বুদ্ধিহীন ভালো মানুষ স্বামীটিকে নিয়ে একলা সংসার করতে করতে অনুভূতির ধারগুলো হয়ে গিয়েছিল ভোঁতা, প্রকৃতিতে এসে গিয়েছিল কঠোর রুক্ষতা, এত দিনে শুকনো গাছে যেন জল পড়েছে!

বিভূতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিহীন। তবু এ পরিবর্তন তারও চোখ এড়ায় না। রাধারাণীকে যে এখন সর্বদা ভয় করে চলতে হয় না এটা কি আর চোখ এড়িয়ে যাবার জিনিষ? সেও ঠাট্টা করবার চেষ্টা করে, বলে—ব্যাপার কি বল তো? তোমার যে আবার নব-যৌবন ফিরে এলো দেখছি! বলি আপ-টু-ডেট দেওরটির প্রেমে পড়ে যাওনি তো?

রাধারাণী দমবার মেয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে বলে—আশ্চর্য্য কি? পড়তে কতক্ষণ? বরং না পড়াই আশ্চর্য্য, গুণ কত তার হিসেব রাখো? তুমি পারো—হপ্তায় হপ্তায় বায়োস্কোপ দেখাতে? বাজারে যা নেই তাই যোগাড় করতে? ব্ল্যাকমার্কেটের চিনি এনে দিতে? এগারো হাত মিলের শাড়ী খুঁজে

বার করতে?

—থাক থাক, আর শুনিও না, ওর কিছুই আমি পারি না স্বীকার করছি, কিন্তু একটা জিনিষ—যা অমল পারেনি—আমি পারি---

—কি?

—এই, বাড়ী যোগাড় করতে।

—ইঃ। সে যাই আমি দিলাম তাই।

এখন চারটি মানুষের সংসার-চক্র আবর্ত্তিত হচ্ছে একটি ভাবী মানুষকে কেন্দ্র করে। ....রান্না-বান্না করতে কষ্ট হয় বলে অরুণাকে রাধারাণী ছুটি দিয়েছে। অমলের টিনের ঘরের মধ্যে হাঁড়ি-কুঁড়ি নিষ্কর্মা, রাধারাণীর রান্নাঘরে ঘটা।

বিভূতির লক্ষ্য কম, তবু একদিন বলে, আচ্ছা এ-ভাবে যে চালাচ্ছো, হিসেবপত্র কি রকম হচ্ছে?

রাধারাণী বিরক্ত হয়ে বলে - সে তুমি কষো গে বসে, আমি অত হিসেব-নিকেশের ধার ধারি না। আপনার লোকের সঙ্গে আবার হিসেব! মাসী-পিসীর পেট থেকে না পড়লে সে আর আপনার হয় না, কেমন?....

আসল কথা— অমলের দেওয়া টাকাটা সে জমাচ্ছে অরুণাকে সাধের সময় চুড়ি গড়িয়ে দেবে বলে।

চুড়িতে অরুণার আপত্তি নেই, কিন্তু পরের কাছে এতটা নিতে সে প্রস্তুত নয়, ঘরের ভিতর অমলের ওপর তম্বি করে। বলে —ও আবার কি, উনি দিচ্ছেন বলেই নিতে হবে? নিজেদের একটা মানসম্ভ্রম নেই?

অমল স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে বলে—সম্ভ্রম আছে বলেই তো 'খাই-খরচা' দিয়ে খেতে পারি না।

—তা বলে এমনি করে পরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে চালাতে হবে?

—পর ভাবলেই পর।

—কিন্তু উনি না হয় খামখেয়ালি, বিভূতিবাবু কি মনে করবেন?

—সে ওঁরা কর্ত্তা-গিন্নী বুঝবেন, কিন্তু দাদাকে তুমি বিভূতি বাবু বল কেন অরুণা? তোমাদের সেই 'বটঠাকুরপো' না কি যে বলতে হয় ভাসুরকে—

অরুণা ঈষৎ অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে বলে—দিদির সামনে তাই বলি, সত্যি তো আর ভাসুর নয় যে নাম করতে নেই?

—তোমাদের সত্যি-মিথ্যের জ্ঞানটা কি প্রখর তাই ভাবি।

দোতলা থেকে রাধারাণী ডাকে—ও ঠাকুরপো, একবার ওপরে এসো।

অমল দাড়ি কামাচ্ছে, বলে—কি বলছো?

—এসোই না একবার, অত কৈফিয়েৎ দিতে পারি না।

অমল সাজ-সরঞ্জামগুলো গুটিয়ে তুলতে তুলতে বেশ নিরীহ ভাবে বলে— কি করে যাই বলো তো? এদিকে একজন কিছুতেই ছাড়ছে না—

এইগুলো অরুণা দেখতে পারে না, রেগে আগুন হয়ে ওঠে। 'অসভ্য' 'ফাজিল কোথাকার' প্রভৃতি অশ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন করতেও ছাড়ে না স্বামীকে। অমল আর রাধারাণী যে এক-বয়সী, মুখের আট-ঘাট যে ওদের কম, এইটাই ওর দু'চক্ষের বিষ।

রাধারাণী তবু নাছোড়, বলে—ভালো চাও তো এসো বলছি ঠাকুরপো, নইলে দেখাবো মজা।

—দেখার পক্ষে ওব চাইতে ভালো জিনিষ আর কি আছে?

অমল গালে স্নো ঘষতে ঘষতে এসে দাঁড়ায়।

রাধারাণী তখন একখানা ঘর সম্পূর্ণ খালি করবার সাধনায় লেগেছে, একটা ভারী ট্রাঙ্ক নিয়েই দুর্ভাবনা তাই অমলকে ডাকাডাকি।

—এ আবার কি? হঠাৎ এ জিনিষগুলো কি দোষ করলো?

—দোষ আবার কি, ঘরটা খালি করতে হবে না?

—কেন বল তো?

—জানো না, ন্যাকা! এই বর্ষাকালে ওই আঁতুড়ে পোয়াতীকে কি আমি নীচের ঘরে ফেলে রাখবো নাকি?

—এই ঘরটাকে তুমি আঁতুড় করবে?

অমল সত্যিই একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, বাড়ীর মধ্যে এইটাই সবচেয়ে ভালো ঘর।

রাধারাণী কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলে—গেঁয়োমী করে আঁতুড় বললেই আঁতুড়, আমি বলবো এটি অনাগত শিশুদেবতার ভাবী জন্মাগার।

—কবিত্বর চূড়ান্ত! কিন্তু এটা সত্যি বড্ড অন্যায় হচ্ছে বৌদি, দাদার ওপর বড্ড বেশী অত্যাচার করা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক নির্ঝঞ্ঝাটে একপাশে পড়ে আছেন— তাঁকে কোণঠাসা করে কানের কাছে এ-সব কি ভূতের নেত্য! না, বৌদি না, এত ঝামেলা পোহাতে হলে দাদা আর আমার মুখ দেখবেন না।

—ওই ভয়ে পিঁপড়ের গর্তে সেঁধোও। দাদার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি হয় কখন লক্ষ্মণ ব্রাদারের, তা ও তো দেখি না।

অমল সেই ভারী ট্রাঙ্কটার উপর বসে পড়ে হাসতে হাসতে বলে—সত্যি বৌদি, দাদাকে দেখলেই আমি পাশ কাটাই, সামনে পড়তে চাই না। আমার কেমন ভয় করে। হাজার হোক অফিসের ওপরওলা কিনা।

কথায় কথায় অফিসের গল্প জমে ওঠে—হাতের কাজ কারোরই এগোয় না....এক সময় ভাবী শরীর নিয়েও অরুণা পা টিপে-টিপে উপরে উঠে এসে উঁকি মেরে চলে যায়।

যায় বটে তবে যাবার খবরটা গোপন রাখতে পারে না। সিঁড়ির ধাপে ধাপে তার চিহ্ন ধরা পড়ে।

—এই রে—ছুঁড়ি রেগে মরছে! আহা, ওকে খেতে দিয়ে আসিনি—পোয়াতী মানুষ, ক্ষিদে পেয়েছে, ট্রাঙ্কটা আর বড় সেলফ্‌টা ঠাকুরপো সরাও তুমি, আমি আসছি—ওকে ভাত দিয়ে আসি।

কিন্তু অরুণার সে-দিন আদৌ ক্ষিদেই নেই, ভাতই খায় না।

নির্মল আকাশের কোথায় যেন একটু মেঘ জমে। ......

কিন্তু চাঁদও যে উঠলো আকাশে।

সত্যি, অরুণার ছেলেটি যেন পূর্ণিমার চাঁদের টুকরো।

এত সুখ রাখবে কোথায় রাধারাণী, এত রূপ দেখাবে কাকে। বিভূতিকে বলে—খবরদার বলছি অমনি হাতে মাণিক দেখতে পাবে না, গিনি বার করো। জেঠা হওয়া অমনি নয়।.......ঠাকুরপো, তোমার একখানা গিনিতে চলবে না—গিনির মালা চাই।

বিভূতি রাধারাণীর এ-রকম বেয়াড়া আবদারে মনে মনে একটু অসন্তুষ্টই হয়—খপ্ করে বলে—আর নিজে তো বেশ অমনি অমনি জেঠি হয়ে বসলে—

—ইস্ তাই বই কি, খোকনের জন্যে আমি অমৃতি পাকের বালা গড়িয়ে রাখিনি যেন!

মেঘটা যেন উড়েছে.......আকাশের মুখ পরিষ্কার ....অরুণার মুখে 'দিদি' ছাড়া কথা নেই। সংসার সামলে চব্বিশ ঘণ্টা ওর ফরমাস খাটতে রাধারাণী নাজেহাল।

তবু ওই ওর সুখ।

খবর পেয়ে এক দিন অরুণার নিজের দিদি এলেন ছেলে দেখতে।.....

আঁতুড়ের দোরে চেপে বসে দু'টো টাকা ছুঁড়ে দিয়ে এক নজরে ছেলে দেখে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—ওই বুঝি সেই বাড়িওলী মাগী?

অরুণা অপ্রতিভ ভাবে বলে—'মাগী' আবার কি? ছিঃ!

—মাগী না তো 'মিনসে' নাকি, তোর এক কথা! বলি লোক কেমন?

অরুণা উচ্ছ্বসিত সুরে বলে—চমৎকার। সত্যি পৃথিবীতে যে এমন মানুষ থাকে এ আমাদের ধারণা ছিল না, মাকে মনে পড়ে না, মা থাকলেও এমন যত্ন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

বোনের কথা আর তোলে না।

তোলে না কিন্তু বোনের গায়ে লাগে। নীরস স্বরে বলে—তিন কুলে কেউ নেই, বাঁজা মাগী-যা করছে শোভা পাচ্ছে! আমার মতন শ্বশুর ভাসুর শাশুড়ী ননদ নিয়ে রাবণের পুরীতে ঘর করতে হলে বুঝতো। তবে যাই বলিস বাবু, মাগী বড় বেহায়া।......ওই তো দেখে এলাম নীচে....অমলকে খেতে দিয়েছে—আর মাথার কাপড় খুলে বসে কী হাসি-গল্পর ঘটা। বাবা, আমার নিজের দেওরদের সঙ্গে আমি এখনো হাসি-গল্প দূরের কথা, কথাই কই না।

—কেন বলো তো?

অরুণার স্বরে কৌতূহল।

—তোর ভগিনীপতি ভালোবাসেন না—বলেন—'কী দরকার অত হুল্লোড় করবার, মানুষের মন না মতিভ্রম, যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।'

এত ভালোটা অরুণা ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না, তবু নীচের দালানের একটি ছবি কেবলই তার মনের মধ্যে ছায়া ফেলতে থাকে।

কিসের সেই হাসি-গল্প?

অত হাসির কী ব্যাপার হয়েছে আজ?

হয়তো খোকার কথা নিয়েই—কিন্তু—

যোগের হিসেবে ফলটা বসলো শূন্য, 'কিন্তু' রইল হাতে।

আনমনা ভাবে বলে—তুমি কার সঙ্গে এলে? কই জামাইবাবুকে দেখছি না?

—দূর, সে থাকলে কি আর আসা হ'ত? অফিসের কাজে পাটনা গেছে, ভাসুর গিয়েছেন শাশুড়ীকে নিয়ে পুরী, তাই না এত সাহস! ভাগ্নের সঙ্গে এলাম ট্রামে। তাই তো বলছিলাম—ক'আনা পয়সাই বা খরচ, আর গাড়ীতে আসতে আট-দশ টাকা। মনে করছি, যে দু'মাস ওরা না আসে, আসবো মাঝে মাঝে। চোখের আড়ালে থাকলেই পর, নইলে এখন পাতানো দিদি হ'ল মস্ত আপনার।

তা' তিনি কথা রাখেন, মাঝে মাঝে আসতে থাকেন।....

এর মধ্যে একটা যা ঘটনা ঘটলো অপ্রত্যাশিত।

বিকেল বেলা....অরুণা বাদলা হাওয়ায় নীচে না নেমে ছেলে নিয়ে উপরের ঘরে বসে আছে, রাধারাণী রান্নায় ব্যস্ত। অরুণা এখনো ছুটিতে আছে, হাঁড়ি আর আলাদা হয়নি। অমল একগঙ্গা ভিজে এসে চীৎকার করতে করতে ঢোকে—বৌদি বৌদি, সাংঘাতিক সুখবর।

—তার মানে ভিজে রসগোল্লা হয়েছো, এই তো? শিগ্‌গীর ছেড়ে ফেলো কাপড়-জামা।

বলে রাধারাণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

গায়ের গেঞ্জিটা খুলে মাথা মুছতে মুছতে অমল তার-স্বরে বলে—আরে দূর, এখন নিমোনিয়া হয়ে মলেও ক্ষতি নেই।

—আহা, কথার ছিরি দেখ।

—সত্যি বৌদি, তোমার জায়ের ভবিষ্যৎ সংস্থান এক রকম হয়ে থাকলো—লটারীব টিকিটে নাম উঠেছে।

রাধাবাণী অবশ্য বিশ্বাস করে না, অমলের পরিহাস-প্রবণতাব পরিচয় তো সে দণ্ডে-দণ্ডেই পাচ্ছে! হেসে বলে—এত ইয়ার্কিও জানো, রোজ এক-একটা নতুন ধুয়ো নিয়ে বাড়ী ঢোকা চাই, বাবাঃ! ভিজে এসে একটু জব্দ নেই, নাও নাও শিগ্‌গির ছাড়ো ও-সব, দু'পেয়ালা চা পাবে আজ।

অমল উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে—বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যি সত্যি সত্যি, এই তিন সত্যি করলাম। অবিশ্যি এ হতভাগ্যের ভাগ্যে নয়, বারে বারে নিজের নামে ফেলিওব হয়ে ওব নামে কবেছিলাম বৌদি, বুঝলে? ব্যাস্, এক-দম কেল্লা ফতে।

রাধারাণী সন্দিগ্ধ ভাবে বলে—টিকিটে নাম উঠলেই যে দেদাব টাকা পাওয়া যায় তারও কোনো মানে নেই কিন্তু। আমার এক পিসেমশাই, একবার টিকিটে নাম উঠেছে বলে "পঞ্চাশ হাজার পাবো চল্লিশ হাজার পাবো" খুব হৈ-হৈ কবলেন—কালীঘাটে পূজো দেওয়া—সত্যনারায়ণের সিন্নি মানা—সে সব কত কাণ্ড, ও-মা, তার পরে সব ফরসা! কুল্লে হাজার দেড়েক টাকা পেলেন বুঝি শেষটা।

অমল বুকের ওপর হাত চাপড়ে গম্ভীর ভাবে বলে—এ শর্ম্মাকে তেমন বেকুব পাওনি, বুঝলে মহাশয়া! নগদ করকরে ষোলটি হাজাব টাকা গুণে নিয়ে—একটি লোভার্ত্ত মাড়োয়ারী-পুঙ্গবের হাতে টিকিটখানি সমর্পণ কবলাম।

—সে টিকিটটা কিনে নিল?

—নেবে না? ওই তো পেশা ওদের।

—আচ্ছা, আর যদি ফার্ষ্ট প্রাইজ পেতে—কত টাকা হ'ত তোমার?

—সে হয় তো অনেক হ'ত, কিন্তু বেশী আশা করতে নেই, বেড়ালের ভাগ্যে ক'বাব শিকে ছেঁড়ে? এ বাবা দিব্যি নগদ টাকাটি এনে ঘরে তুললাম, ব্যস!!

অবিশ্বাসের যখন সত্যই কিছু থাকে না, তখন রাধাবাণী ছুটে উপরে যায় অরুণাকে খবরটা দিতে—কিন্তু অরুণা বোধ করি বাদলা হাওয়ার প্রভাবে অসময়ে পড়েছে ঘুমিয়ে, আপাদ-মস্তক একটা মোটা চাদরে ঢাকা।

বার বার ডেকেও সাড়া আদায় করতে পারে না রাধারাণী।

অমল এসে মুখের চাদরটা খুলে দিয়ে অবাক্ হয়ে বলে—বৌদি এত ডাকলেন—উত্তুর দিলে না যে?

—আমার খুসি—বলে অরুণা পাশ ফিরে শোয়।

—তোমার খুসির বহরটা মন্দ নয়। দেরী দেখে রাগ হয়েছে বুঝি? কিন্তু এমন একটি খবর শোনাতে পারি, মহারাণীর মেজাজটি সপ্তম থেকে একেবারে খাদে নেবে আসবে।.....আচ্ছা বল দিকিনি কি হ'তে পারে?

অরুণা নিরুত্তর।

—বল না, দেখি তোমার অনুমানশক্তির বাহাদুরী। সে একেবারে আশাতীত কল্পনাতীত স্বপ্নাতীত বললেও চলে.....পারলে না তো? বলি...বলি তা'হলে?

—ঝাঁটা মারি আমি অমন সুখবরের মুখে, যেখানে বলে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়েছে, আগে-ভাগে সেখানে বলেছ তো? তা'হলেই হ'ল—বলে আবার একবার চাদরখানা টেনে মুখে ঢাকা দেয় অরুণা।

কিন্তু এত কথা রাধারাণীর জানার কথা নয়।

সে নিত্যকার মতই নীচের কাজ সেরে ছুটে এসে খোকনকে দুধ খাওয়াতে বসে, ছেলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলে—ঠাকুরপোর কাছে শুনেছিস্ তো সব? খোকন আমাদের ভারী পয়মন্ত, কি বলিস? খোকনের পয় না হলে—কই এত দিন কি কিছু হয়েছিল? সত্যি এমন আশ্চর্য্যি লাগছে—বিশ্বাসই হচ্ছে না যেন! সত্যি যে আবার লটারীতে টাকা পাওয়া যায়—এমনি নিজের লোকেদের নামে প্রাইজ ওঠে, কক্খনো শুনিনি কিন্তু! তুমি কখনো কাউকে পেতে দেখেছ ঠাকুরপো? অরুণা শুনেছিস্?

অরুণা বিরক্ত স্বরে বলে—শোনাশুনির আবার কি আছে? মানুষে পায় না তো কি আর ভূত-পেত্নীতে পায়?

রাধারাণী মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বলে—তোর আজ কি হ'ল বল দিকিন? টাকার নামেই মেজাজ বিগড়োল—হাতে পেলে কি করবি? ভূতে পায় না, মানুষেই পায় মানলাম, কিন্তু পেয়ে যদি মানুষ ভূত বনে যায় সে-ও তো আচ্ছা বিপদ—কি বল ঠাকুরপো?

—এর মধ্যে আর ঠাকুরপোকে টেনো না বৌদি, ও তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। মোটের মাথায় উনি আমার সঙ্গেও যা ব্যবহার করছেন দুর্ব্বোধ্য।

অরুণার আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে।

এই সব ন্যাকামী ওর অসহ্য।

রোসো, এই বাড়ী ছেড়ে তবে আব কাজ।....ইচ্ছে করলে কি আর আস্ত একখানা বাড়ী তারা এখন ভাড়া করতে পারে না?.... রোসো, দিদিকে একটা চিঠি লিখে দেখবে—সেদিন বলছিল যেন একটা বাড়ীর কথা। .....সুখববটাও দেওয়া হবে।

স্বামী-পুত্র সবই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়—অরুণার তবে রইল কি? দিদি তো ঠিকই বলে—'মাগী মন্তর জানে', নইলে আর অমলকে—নিশ্চয় তাই, অরুণা নিজেই কি প্রথম প্রথম কম বশ হয়েছিল? নেহাৎ দিদি এসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলেই না চৈতন্য হল?

কিন্তু চৈতন্য শুধু একা অরুণার হলেই তো চলবে না? অমলের না হলে? দিনরাত্রির সাধনায় অমলের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা চলে। কিন্তু চৈতন্য কি ওর কোনো দিন হবে?

এই যে সর্ব্বদা অরুণার ছেলেকে আগলে রাখে রাধারাণী, সে কি ভালো মতলবে? বন্ধ্যার ক্ষুধার্ত্ত স্নেহ যে শিশুর পক্ষে কত অনিষ্টকর সে কথা কি অমল জানে?

নিজের ভ্যাবা গঙ্গারাম স্বামীটিকে 'থো' করে রেখে অমলকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ির অর্থ কি? অমল কি কচি খোকা? ঘরে কি ওর বৌ নেই? অসুখ করলে সেবা করতে জানে না, না ক্ষিদে পেলে খেতে দিতে শেখেনি?

অমলকে বলা মিথ্যে—সব কথা হেসে ওড়াবে....বলে কি না— স্বামী আর কার তুখোড় হয়? প্রেয়সীর কাছে সবাই ভ্যাবা গঙ্গারাম, এই আমার কথাই ধর না?......রান্নার কথা? ওকথা আর তুলো না অরুণাময়ী, তবু দুটো খেয়ে-দেয়ে বাঁচছি। তোমার রান্না—প্রেমের মহিমাতেও—গলাধঃকরণ করা শক্ত.....রোগের সেবা? ঈশ্বর করুণাময় তাই আজ পর্য্যন্ত ওই জিনিষটির আস্বাদ পেতে হয়নি,

হলে যে কি হ'ত ঈশ্বরই জানেন।

বাড়ী খোঁজার কথা তুললে এমন হাসবে, যেন অরুণা পাগল, কী বুঝি পাগলামীই করেছে। বলে কি না—অফিসেব বড়বাবুকে এবার পাকড়ে দেখি যদি নীচের তলার দু'টো ঘরটর—

আস্ত একখানা বাড়ী কি এতই দুর্লভ?

কিন্তু অরুণার কি সাধও যায় না মনের মত কবে সংসার করতে?—ভগবান যদি দিন দিয়েছেন, সেই দুটো রং-চটা ট্রাঙ্ক আর দেড়খানা এনামেলেব বাসন নিয়ে চিরদিন সংসার কববে সে?

—বাড়ী তুমি দেখবে কি না তাই বলো—

ছেলেটাকে বিছানায় শুইয়ে প্রবল ভাবে চাপড়াতে চাপড়াতে অরুণা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—বাড়ী যদি না দেখো ছেলে নিয়ে আমি দিদির কাছে গিয়ে থাকবো তা' বলে দিচ্ছি।

—বরং ছেলেটাকেই রেখে যেও, নইলে দাদা-বৌদিদির ঢেঁকো ভার হবে। বলে অম্লানবদনে চিরুনি নিয়ে চুল ফেবাতে থাকে অমল।

—তোমাব দাদা-বৌদিব ঢেঁকোর ভাবনায় তো ঘুম হচ্ছে না আমার, ছেলেটাকে এমন বশ করে নিয়েছে যে হতচ্ছাড়া ছেলে একবারও আমার কাছে দুধ খায় না, ঘুমোয় না!

—ভালোই তো, বেশ একটি বিনি-মাইনের ধাইমা পেয়েছো ছেলের।

—এমন নইলে বুদ্ধি! আমাবও যেমন গলায় দেবার দড়ি জোটে না!

হঠাৎ ধারা-শ্রাবণ নামে।

আর এই জিনিষটিকেই অমলেব বিষম ভয।

শ্যালিকাও এক দিন এসে অমলেব বুদ্ধির বালাই নিযে মর্মাহত হয়ে কেবলমাত্র মরবাব ইচ্ছে প্রকাশ করেন।.....ছেলে হওয়া অবধি অরুণাদের আব নীচের ঘরে নামতে হয়নি, দোতলার ঘরে কায়েমী বাসা বেঁধেছে, পাশেই বিভূতির ঘর। ক'দিন ধরে কি জানি কেন বিভূতি ঘরেই আছে।

অমল অসন্তুষ্ট সুরে বলে—কথা একটু সাবধানে বলবেন দিদি, ও-ঘরে দাদা রয়েছেন।

মুখের একটি বিশেষ ভঙ্গী করে অরুণার দিদি বলেন—"তোমার দাদার ভয়ে তুমি পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকোও গে ভাই, আমি কারো কেয়ার করি না। তবে এও বলি—অরুণাকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না তোমার? ভগবান্ যখন দিন দিয়েছেন ওকে, ও কেন পরের এক্তারে পাশতলানিতে লোকের মুখ-ঝামটা খেয়ে পড়ে থাকবে?

—মুখ-ঝামটা আবার কে দিল?

—কেন এ-বাড়ীর খোদ গিন্নী! ওর ছেলের যত্ন ও বুঝবে না, বুঝবে পাড়ার লোকে—দেখে-শুনে মরি!.....অমলের পিত্যেস করিস নে অরু, তোর ভগ্নীপতিকে বলবো বাড়ী দেখতে। ....এ বাড়ীতে কত ভাড়া দিতে হয়?

অমল মুচকে হেসে বলে—আপনার বোনকেই জিগ্যেস করুন, কত দিতে হয় অরুণা?

অরুণা মুখও তোলে না, কথাও বলে না।

কিন্তু অধ্যবসায়ের ফল কিছু আছে বৈ কি।

অরুণার দিদি বাড়ী যোগাড় করেন। মাস মাস আশী টাকা ভাড়া,—তা' হোক—বাড়ীখানি কেমন! একশো টাকা হলেও নিন্দে করা যায় না।

আসবাব-পত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে সংসার কেমন করে করতে হয়, একবার দেখিয়ে দেবেন তিনি। অরুণা শুধু টাকা ফেলে খালাস।

অরুণা আজ-কাল প্রায়ই ছেলের কাজগুলো নিজের হাতে এনে ফেলেছে, আজও ছেলেকে তেল মাখাচ্ছিল, অমল গম্ভীর ভাবে এসে বলে—তোমার দিদি তো আচ্ছা ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন দেখি, কে ওঁকে সর্দারী করতে ডাকে?

—যার দরদ থাকে তাকে ডাকতে হয় না, কেন কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছেন তিনি?

—সে তুমি বুঝবে না, কিন্তু দাদাকে ছেড়ে যাওয়া এখন সম্ভব নয়, সে তো জানো?

—জানি বই কি—অরুণা জ্বলে ওঠে—উনি বুড়ো বয়সে সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরী খুইয়ে বসে আছেন, এখন তুমি ওঁব সংসার পোষো, আর কি? সেই জন্যেই আরো যাওয়া দরকার, আমার ওই টাকা ক'টা দিয়ে আমি ভূত-ভোজন কবাতে পাববো না!

—অনেক নতুন নতুন কথা শিখেছ তো—বলে অমল চলে যায়।

কিন্তু অরুণাব মতলবে বাধা দেবাব চেষ্টা আব কবে না।

একসঙ্গে দরজায় অরুণার ভগিনীপতি ও ঠ্যালা গাড়ীর আবির্ভাব দেখে রাধারাণী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন কবে—গাডীতে কি হবে রে অরুণা?

—দেখতেই তো পাচ্ছেন বাড়ী উঠছি—বলে অরুণা একটি ঝুড়িব ভিতর বাসনপত্র চাপাতে থাকে।

—বাড়ী উঠছিস?

রাধারাণী মিনিট খানেক স্তব্ধ থেকে ধীরে ধীবে প্রশ্ন করে—আগে তো কিছু বলিস্ নি?

—আমার বলাব অপেক্ষা কি, আর এক জন তো চব্বিশ ঘন্টাই সব খবর দিচ্ছেন!

নতুন বাডীতে অরুণাব দিদি সব গোছ-গাছ করছিলেন, ব্যস্তভাবে অভ্যর্থনা কবেন—আয় অরু, এসো খোকনবাবু, কিন্তু অমল কই?

—অফিস গেছে।

—আজকের দিনেও অফিস? অফিস এবং অফিসের বাবু সম্বন্ধে অনেক বাক্যবাণ প্রয়োগ করে দিদি বলেন—অফিস ফেরত এখানেই আসতে বলে দিয়েছিস্ তো? না কি ভুলে—

—অত ভুল আর হবে না। কি চমৎকার বাড়ীখানি ভাই!

—এই তো তোর ভগ্নীপতির একজোড়া জুতোই ক্ষয়ে গেল— হ্যাঁ রে, আসবার সময় ওরা কি বললে টললে?

—সে আবার আচ্ছা জ্বালা, তোমার বোনাইটি যে আবার কিছুই বলেননি তা' কেমন করে জানবো? কর্ত্তা তো শুনে অবাক, শেষে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কী কান্না, এমন অস্বস্তি হচ্ছিল!

—আর গিন্নী?

—তাঁব কথা আর বোলো না, খোকনকে একবার কোলে নেওয়া নেই, চোখে এক ফোঁটা জল নেই—কাঠ। ঘটা করে আমাকে এদিকে চুল বেঁধে আলতা পরিয়ে সিঁদুর ছুঁইয়ে দেওয়া হল!

এ-বেলাটা দিদিই রান্না করলেন, অরুণা সন্ধ্যাবেলা গা ধুয়ে একখানা ছাপা ছিটের শাড়ী পরে ছেলে কোলে নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসলো। পথ-চলতি লোকের মাঝখান থেকে কখন আবির্ভাব হবে তার প্রিয় পরিচিত মানুষটির!

রাধারাণীর আওতা থেকে দূরে এসে নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে সে, স্বামীকে সম্পূর্ণ করে পাবে এত দিনে।.....কিন্তু আসবে তো? ঈস্ আসবে না বই কি? এই এত যে ঝগড়া, কই অরুণাকে ছেড়ে একটা রাতও? মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে মুখে.....পুরুষ মানুষের দুর্ব্বলতা কোথায়, সে কথা তার জানা আছে!

কিন্তু কই অমল?

ঘড়িব কাঁটা যে যত ইচ্ছে সবে যাচ্ছে।

ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল—আস্তে তাকে তুলে শুইয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ শুনলো নীচে অমলেব গলা। ধড়মড় কবে উঠে দাঁড়িয়ে কেশোবেশে আনলো একটু নূতন সংস্কাব, ঠোঁটে কৃত্রিম অভিমানেব ভঙ্গিমা....এতক্ষণ অকণা পথেব ওপব চোখ পেতে বসে বইল— আসা হ'ল না, আব এখুনি—অমনি বাঃ।

ও নীচে নামবাব আগেই অমল উঠে এসেছে।

—বাঃ, ইতিমধ্যেই বাড়ী-টাড়ী গোছানো কম্পপ্লীট? কাজেব মেয়ে তো! খোকন ঘুমোচ্ছে? এ ঘবটা কাব, তোমাব বুঝি?

অকণা মুচকি হেসে বলে—হ্যাঁ আমাদেব, কিন্তু আজকে গুড়ে বালি। দিদি বাতটা থেকে যাবেন—দুই বোনেব এক জাযগায় ব্যবস্থা, তোমাব বিছানা ওই পাশেব ঘবে পেতে বেখেছি।

—আমাব বিছানা?

অমল যেন আকাশ থেকে পড়ে—আমাব বিছানাটাও এখানে এনে তুলেছ নাকি? কী আশ্চর্য্য! এই বাত্রে আবাব বিছানা বওয়াবে? আমাব কাপড-জামাগুলোও এনে বসে থাকোনি তো? এনেছ? কী সর্ব্বনাশ! তা' হলে তো দেখছি নিজেব ঘাড়ে কুলোবে না, গাড়ী ডাকতে হবে। এত কাজ বাড়াতেও পাবো, আঃ!

—তুমি তা'হলে এ বাড়ীতে থাকবে না?

—আমি? পাগল হযেছো? সত্তব টাকাব কেবানী, আশী টাকাব বাডীতে বাস কবলে গাযে ধুলো দেবে যে লোকে!... .দাও দাও আমাব বিছানাটা আব ট্রাঙ্কটা ঠিক কবে। . .এই যে দিদি, আপনি বইলেন তো? সাবধানে থাকবেন।

—আবাব কোথায চললে এখন? একেই তো বাত দুপুব কবলে— খাবে এসো।

—খাবো? খাবো কি বলুন? ক'বাব খাবো? বাড়ী গিয়ে খেযে তবে তো আসছি।

[১৩৫৩]

অঙ্গার

সীতাহাট।

তাবেব বেড়াব গায়ে বংচটা কাঠেব বোর্ড সাঁটা। অনেকদিনেব বোদ বৃষ্টি ঝড়, আব কর্তৃপক্ষেব অবহেলাব সাক্ষ্য দিচ্ছে—ঝাপসা হয়ে আসা অক্ষবগুলো। দীর্ঘ ঈকাবেব মাথাটা এমন পবিষ্কাব মুছে গেছে যে, চলন্ত ট্রেনেব আবোহীবা 'সাতাহাট' বলে ভুল কবে অর্থবোধে অক্ষম হয়ে পড়ে।

মেল ট্রেনের এখানে থামাব কথা নয়।

দৃকপাতও কবে না, নাক তুলে বীব-বিক্রমে এগিয়ে যায় বংচটা কাঠেব বোর্ডেব মিনতি-দৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে। অনাথেব নাথ প্যাসেঞ্জাবখানা মিনিটখানেকের জন্যে একবাব দাঁড়িয়ে যায়।

এখনে যারা ওঠানামা কবে—প্রায়ই গ্রাম্য চাষী ক্লাসের লোক, দু'চারখানা গ্রামের মধ্যেই তাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ। ভদ্রলোকের দেখা কদাচ মেলে।

সুকান্তব মতো—চকচকে সুটপবা, ঝকঝকে সুটকেস হাতে, এমন ভবিয্যুক্ত আবোহী দৈবাতেব ঘটনা। হাল্কা বেডিং আব সুটকেসটা নিয়ে নিজেই এগিয়ে চললো সুকান্ত, শুধু কুলি খোঁজা বিড়ম্বনা বলেই নয়, দেশেব মাটিতে নেমে কোথায় যেন বেজেছে একটু বৈবাগ্যেব সুব।

সীতাহাটেব মাটিতে—ঝোপ-ঝাড় খানা খন্দ ডিঙিয়ে শ্যাওলাধবা মজা পুকুবেব পাড় ধ'বে খালি গায়ে আব খালি পায়ে যে ছেলেটা ঘুবে বেড়াতো —যাব নাম ছিল 'কানু', তাকে যেন ওব মনে পড়ে গেছে।

বামচন্দ্র নাকি চৌদ্দ বছব নির্বাসনে ছিলেন ....কিন্তু সুকান্তবই বা কমটা কি? তেবশো উনচল্লিশ সালে ও সীতাহাট স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপেছিল— যখন 'সাতাহাট' বলে ভুল কবতে হত না লোককে—সেই ট্রেন থেকে নামলো এই তেবশো তিপ্পান্নয।

মনে মনে একবাব হিসেব কবে নিয়ে হেসে উঠলো সুকান্ত। . চোদ্দ বছব বটে, তবে বামচন্দ্রেব মতো অমন গৌববময় নির্বাসন নয। না ছিল সঙ্গ না ছিল সঙ্গিনী, নেহাৎ দুঃখীব মতো নিঃস্ব সেই যাত্রা।

থাক্ সে সব দিনেব কথা। বিস্মৃত অতীত হাতড়ে দুঃখেব স্মৃতিকে ফেনিযে তুলে উদাস হযে ওঠবাব মত ভাববিলাসী সুকান্ত নয়। ......হঠাৎ যেটুকু মনে পড়ে যায় যাক।

ভাগ্যচক্রেব অনেক চক্র ভেদ কবে দাঁড়াবাব জাযগা কবে নিতে হয়েছে তাকে।....স্বপ্ন দেখাব সময় কোথা?

দেশে এসেছে—উপেক্ষাকাবীদেব নাকেব সামনে হঠাৎ বড়মানুষী দেখাতে নয়, নিতান্তই কর্তব্যেব খাতিবে। ....লাভ লোকসান খতিযে মেজেঘষে হিসেব ক'বে মোট কিছু নিযে এসেছে পবিত্যক্ত পিতৃভিটাব সংস্কাব কবতে। ... .ইচ্ছে কবলে—পাঁচজনেব চোখ ধাঁধিযে দেবাব মতো অট্টালিকা ফাঁদাও হযতো অসম্ভব ছিল না সুকান্তব পক্ষে, কিন্তু সে বকম বাজে সখ তাব নেই। নেহাৎ যেটুকু না কবলে নয তাই কবা।

একাধাবে সর্বগুণসম্পন্ন যে ভৃত্যটিকে সঙ্গে আনবাব কথা, আসবাব আগেই সে হতভাগা পড়লো জ্ববে। একলাই তাই চলে এসেছে।.....দু'চাব দিন অবিশ্যি ভাত জুটবেই কোথাও না কোথাও।....মনে ভাবলে পাপ নেই—দিয়ে কৃতার্থই হয়ে যাবে হযতো—চকচকে সুট পবে আব সুটকেস ভর্তি নোটেব গোছা সঙ্গে কবে এনেছে যখন।

একটা মিস্ত্রী ডেকে কন্ট্রাক্ট গোছেব কবিয়ে নিয়ে কাজটা লাগিয়ে দেবাব জন্যে যে ক'দিন লাগে। তাবপব তো সুবোধই এসে দেখাশোনা কবতে পাববে। সর্বত্র যে সুকান্তব ডানহাত।

নিজেব বাড়ি ঢোকাব আগেই মেজজ্যাঠাব সদব।

সবিকেব বাড়ি, এক চৌহদ্দিব মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি কবে বাস কবছে জেঠতুতো আব খুড়তুতোব দল। কাকা জেঠা পিসি ঠাকুমাব সংখ্যা কম নয.....অবশ্য এই চৌদ্দ বছব ধবে যদি সকলে একযোগে বেঁচে থাকে।....কে জানে কাকে দেখতে পাবে আব কাকে পাবে না!

এতদিন ধবে ওব ঠিকানাটা এত অনিশ্চিত আব পবিবর্তনশীল ছিল যে—অবস্থাব এতটা পবিবর্তন সত্ত্বেও জ্ঞাতিগোষ্ঠীব দল থেকে ছিটকে গিয়ে কেউ না পেতেছে হাত না দিতে পেবেছে কোনো মৃত্যুসংবাদ, যাব জন্যে বুকটা খালি হয়ে না যাক পা দুটোকে খালি কবতে হবে! বৃক্ষচ্যুত শাখাব মত ওকে সবাই ভুলেই ছিল, কে যে তাকে তুলে নিয়ে করেছে কলমের চাবা, যোগান দিয়েছে প্রাণবসের, কে হিসেব বেখেছে? এতদিন পরে সুকান্ত নিজেই তার হিসেব দিতে এলো না কি?

মেজজ্যাঠার দবজার কাছে একবাব থমকে দাঁড়ালো.....ঢুকবে নাকি? না সবাসরি নিজের বাড়ীতেই

উঠবে আগে? কিন্তু উঠবেই বা কেমন করে? আগাছাব জঙ্গলে ভরে গেছে সদরবৈঠক, দরজায় লাগানো তালাচাবিতে মবচের 'জং' ধবে গেছে কিনা দেখতে হলেও আগে মজুর চাই। ....আগাছার বাড় এমনিই বটে!

মেজজ্যাঠার বাড়িই ঢুকে পড়া ছাড়া উপায় কি?

শুধুই কি নিরুপায়? ভিতর থেকে বিশেষ একটা তাগিদ পাচ্ছে না? ছোটবেলায় যার আকর্ষণে মেজজ্যাঠার বাড়িটা ছিল লোভনীয়! ...কিন্তু নতুনবৌদি কি এখনো 'নতুন' আছে .....আছে সেই বিদ্যুৎ-দীপ্তি? নাকি এবাড়ি-ওবাড়ির আবো দশটা বৌযেব মতো গণ্ডা গণ্ডা কুচোকাচার আমদানী করে ঠাণ্ডা মেবে গেছে?

দূরছাই, ঢুকে পডলেই তো সব সমস্যাব সমাধান হয।

অনন্তদা অবশ্য এ সময় বাডি নেই, জমিদাবেব নাযেবী, উদয়াস্ত সেখানেই বাস। তিন ক্রোশ পথ ভেঙে ক'বার আসবে যাবে? তবু নামধরে ডাকতে হ'লে তাকেই ডাকতে হয়!....ছেলেবেলার মতো মৃদু-কুণ্ঠিত গলায় নয়, চাঁচাছোলা চড়াসুরে—

—অনন্তদা!

—কে রে? কে?

ঘরের ভিতর থেকে একটা ভীত স্বর ভেসে এলো—কে ডাকছে আমার নাম করে?....কে? কে? সুস্থ মানুষের সহজ প্রশ্ন নয, রোগীর আর্তনাদেব মতো।....তবু অনন্তেরই মতো।

হঠাৎ ভারী ভয় ধবলো সুকান্তব, ভাবলে পালাই....কিন্তু সত্যি তো আর পালানো যায় না! আবার গলা তুলে ডাক দিলে—অনন্তদা! আমি—আমি সুকান্ত। মেজজেঠিমা! জেঠামশাই! বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

এবাবে বেবিয়ে এলেন মহামায়া।

দৃষ্টি যতটা দুর্বল, চাহনিব ভঙ্গীতে তাব চাইতে ঢের বেশি দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলে থতমত ভাবে বললেন—কে বাবা তুমি? চিনতে তো পাচ্ছি না!

—আমায় চিনতে পার্চ্ছেন না জেঠিমা? আমি কানু!

—কানু! আমাদের কানু? সেজ ঠাকুরপোর ছেলে?

সুটকেসটা আর বেডিংটা উঠোনের মাঝখানে নামিয়ে রেখে ততক্ষণে সুকান্ত উঠে এসেছে দালানে.....আলগোছে একটা প্রণামের মত করে হেসে উঠলো—আপনি যে দেখছি বেজায় বুড়ো হয়ে গেছেন জেঠিমা! তারপর—সব ভালো তো?

—ভালো? হা ভগবান! 'ভালো' যে কী জিনিষ, সে কথা ভুলে গেছি বাবা। যাবার তো পথ নেই, তাই দেখছি বসে বসে।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন মহামায়া।

সুকান্ত অবশ্য খানিকটা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল —আলাপের সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু বিলাপ হজম করবার জন্যে।....তবু বাড়ি ঢুকতেই এমন প্রচণ্ড বিলাপের মুখোমুখি হয়ে দমে গেল বেচারা।

অথচ তাকিয়ে দেখছে—বিলাপের সবচেয়ে যা বড় কারণ মেয়েদের জীবনে, এখনো পর্যন্ত তার হাত এড়িয়ে এসেছেন মহামায়া। দুগাছা মোটা শাঁখের শাঁখা, একটা বিবর্ণ-পাড় শাড়ি ও চওড়া টাকের উপর অনুজ্জ্বল সিন্দূর-রেখাটুকু মাত্র সম্বল হলেও সৌভাগ্যের প্রমাণপত্র তো বটেই।....তবে? .....ছেলেদের কেউ? বসন্ত? হেমন্ত? অনন্ত? ......কিন্তু অনন্তর গলা তো এইমাত্র শুনেছে সুকান্ত। সোজাসুজি প্রশ্ন করা কঠিন, অতএব হেঁট হয়ে জুতোর ফিতেটা খুলতে কিছু সময় নষ্ট

করা চলে।

মহামায়াও অবশ্য কান্নাকাটি সম্বরণ করে নিয়েছেন ততক্ষণে।

—তুমি ভালো আছো তো বাবা?

যদিও সুকান্তর পোষাকের পারিপাট্যে আর দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহের লাবণ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু কুশল প্রশ্নের প্রথা হিসেবেই এই প্রশ্ন মহামায়ার।

—ভালোই আছি জেঠিমা, কিন্তু কাউকে দেখছি না কেন বলুন তো?

—কাকেই বা দেখবে বাবা! যে যাব পথ দেখেছে। হেমন্ত বসন্ত দু'জনেই দেশছাড়া— 'অখদ্যে' 'অবদ্যে' 'নড়েভোলা' ক'টা পড়ে আছি এখানে। ....আছে—নতুনবৌমা আছে, সে আর কোন্ চুলোয় যাবে! তার ছেলেমেয়েগুলো কোথায় মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! কথা তো শোনে না কেউ, হাড়-বজ্জাত ছেলেমেয়ে সব....হঠাৎ কণ্ঠস্বব খাটো করে বলেন—হবে না কেন, যেমন মা তেমনি ছাঁ হবে তো?

ভারী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে সুকান্ত। কি বিশ্রী! পুরনো মানুষগুলোকে দেখতে পাবে বলে যে-আগ্রহ মনে ছিল, তার একছটাকও খুঁজে পাচ্ছে না যেন।

হয়তো না এলেই ভালো ছিল....আর কারো বাড়ি উঠলেও হ'ত। তবু চুপ ক'রে থাকা চলে না, তাই কথার পিঠেই কথা কয়—

—তা তিনি গেলেন কোথায়?—'মা'টি? তিনিও 'ছাঁয়েদের' সঙ্গে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাকি?

—জানি না। হযতো বা শুযেই আছে, নবাবজাদীব মন-মর্জি।...চাল বাড়ন্ত বলে গেরস্থঘরের বৌ বেলা দুপুর অবধি শুয়ে থাকে শুনেছ কখনো?

অনেক কথা একসঙ্গে কয়েই বোধ করি মহামায়া হাঁফাতে থাকেন।....

পরক্ষণেই ঘরের ভিতর থেকে অনন্তর নিরুপায় চীৎকার ভেসে আসে—কে কথা কইছে ওখানে? কে— কে?

সুকান্ত অভিভূতের মত চারিদিকে তাকায়..."চাল বাড়ন্ত" এ কোন্ ভাষা? সুকান্তর বাবা শ্রীকান্ত মারা গেলে এমনি একটা রূঢ় কর্কশ শব্দ মাঝে মাঝে মায়ের মুখে শুনতে পেতো না? কিন্তু মেজজ্যাঠার বাড়ি! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধানের গোলা দুটো তবে গেল কোথায়?.....'খামারবাড়ি' বোঝাই মুগকলাই ছোলা অড়রের বস্তা! জালাভর্তি গুড়! উঠানে এসে পড়া পেল্লায় পেল্লায় রুই কাতলা....চাষার ঘরের বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, ঘরে-তোলা সরের গাওয়া ঘি—কোথায় সদ্‌গতি লাভ করবে—নায়েবের পাদপদ্ম ছাড়া? 'নায়েব' হবার স্বপ্ন কবে ভুললো সুকান্ত? ...মা বলতো—"নায়েব হতে যাবি কি দুঃখে কানু, নিজে তুই জমিদার হবি—" মায়ের কথা পছন্দই হত না। মানুষ যদি হ'তে হয় মেজজ্যাঠার মতো!

অনন্ত তখনো বেকার....দোর্দণ্ডপ্রতাপ নায়েব হচ্ছেন মেজজ্যাঠা রাধাকান্ত দত্ত। জমিদারী যত সামান্য হোক, নায়েবের প্রতাপটা সামান্য ছিল না। কালীপূজো আর জগদ্ধাত্রী পূজো করতেন রাধাকান্ত, সমারোহ হ'ত প্রচুর।...তখনকার সমৃদ্ধির চেহারাটা স্মরণ করতে চেষ্টা করে সুকান্ত চারিদিকে তাকিয়ে।

কেমন যেন শ্রীহীন রিক্তভাব, তবু শুধু একমিনিট দালানে দাঁড়িয়ে সমস্ত সংসারের দৈন্যের ছবি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত না সুকান্তর চোখে, যদি দালানের মাঝখানে অমন নির্লজ্জভাবে মেলে দেওয়া না থাকতো হলুদের ছাপ-লাগা পাড়ের রং উঠে যাওয়া আধময়লা শাড়িখানা। যার সর্বাঙ্গে দড়া দড়া সেলাইগুলো ফুটে আছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো।

চকচকে সুটপরা সুকান্তকে কেমন অসহায় অপ্রতিভ দেখতে লাগে।

মহামায়া আবার এক পালা সুরু করবার উদ্যোগ করছিলেন—কিন্তু অনন্তর বীভৎস চীৎকারে থেমে যেতে হয়....অপরিচিত কণ্ঠের পরিচয় জানবার জন্যে উৎকণ্ঠার শেষ নেই তার। বারে বারে আর্তনাদের মত প্রশ্ন করছে....কে-কে-কে?

—এই দেখ বাবা, আমার কপালের জোর—ব'লে মহামায়া বার্ধক্যের ভারে ঝুঁকে পড়া দেহ নিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'ন। অগত্যা সুকান্তই বা করবে কি...পিছন পিছন না গিয়ে?

কিন্তু কী ভয়ানক! সুদীর্ঘকাল পরে এই বীভৎস দৃশ্য দেখবার জন্যেই সীতাহাটে ফিরে এলো নাকি সুকান্ত!

হাঁটুর নীচে থেকে দু'খানা পা-ই কাটা অনন্তর, আর সেই আধখানা দেহ নিয়ে বিছানা থেকে উঠবার জন্যে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা তার। দু'খানা হাতের উপর ভর দিয়ে এলোমেলো ঘষটাচ্ছে নিজেকে নিয়ে।

ওধারে জানলার গরাদে ধরে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে যে মানুষটা অবিচল নিশ্চিন্ততায় দাঁড়িয়ে আছে—নতুনবৌ ভিন্ন আর কে হ'তে পারে সে? ... কিন্তু জড় না বধির? না কি এই অক্ষম অসহায় জীবটার প্রাণান্ত কাকুতিতেও কর্ণপাত মাত্র করবে না, এই প্রতিজ্ঞা তার?

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সুকান্ত। ....দেশের কথা ভাবতে গেলেই যে হঠাৎ মনে পড়ে যেতো এই নতুনবৌকে। হাস্যে-লাস্যে উজ্জ্বল মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত বাচনভঙ্গী, কাজে আর অকাজে সমান তৎপর। ছেলেরা মুগ্ধ হতো... মেয়েরা হিংসা করতো। সে নতুনবৌ কোথায়? মারা যায়নি তো? অনন্তর মূর্খামির উদাহরণ দ্বিতীয়পক্ষ নয় তো এটি?

অনন্তর দুর্বার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই মহামায়া হতাশ ক্ষোভের সুরে বলে ওঠেন—নতুন বৌমা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো? আর বাছা আমার একটা কথার 'পিত্যেশে' প্রাণটা বার করে ফেলছে!

এতক্ষণে বোধ করি নতুনবৌমার টনক নড়ে; মুখ ফিরিয়ে সুকান্তর দিকে দৃক্‌পাত না করে মহামায়ার উদ্দেশ্যে মুচকে হেসে বলে—তবুও পোড়া প্রাণ আর বেরোতে চায় না ....এই বড়ো আশ্চর্য মা!

স্তম্ভিত সুকান্তর মুখে কথা ফোটে না। ও যে একটা পদস্থ লোক, একটা কোম্পানীর হাজার লোক ওর কথায় ওঠে বসে....শুধু কথার বাঁধুনিতেই যে ও সাহেব চরিয়ে খায়.... এ সব কথা বিস্মৃত হয়ে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নতুনবৌয়ের মুখের পানে—পনের-ষোলো বছর আগে একটি কিশোর বালক যেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো...তরুণী নববধূর দোদুল্যমান কর্ণভূষণমণ্ডিত হাস্যদীপ্ত মুখের পানে....

মহামায়া অবশ্য সুকান্তর মতো হতবাক হয়ে যান না। অভ্যস্ত কানে কথাটা হয়তো বিষ বর্ষণ করে কিন্তু রসনাকে পাথর করে দেয় না।....বয়সের আঘাতে জর্জরিত কুৎসিত মুখ ঘৃণায় আরো কুৎসিত ক'রে বলেন—মরণ যে তোমার কেন হয় না মা, এও এক মস্ত আশ্চর্য! ...কানু দেখলি তো বাবা? ও পাপিষ্ঠির নরকেও ঠাঁই হবে—তুই ভাবিস? ...কিসের তেজে এত মটমট কর্ছেন তাই ভাবি।...রূপ তো ওই...গুণেরও সীমে নেই।....যেদিন থেকে ঢুকেছে—সেদিন থেকেই যেন সব উড়েপুড়ে যাচ্ছে। মা-লক্ষ্মী কোন পথ দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন দেখতে দিলে না। নইলে এ সংসারের আজ এই দুর্দশা! উনি আজ পাঁচ বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, টাটকা ছেলেটার এই অবস্থা, গোয়ালভর্তি গরুগুলো সুদ্ধু পট্‌পট্ করে মরে গেল! ...এ সংসারের সুখ ঐশ্বয্যি তোরা তো দেখেছিস বাবা? ...আর এখন এই দেখ! লোহার অলক্ষ্মী ঘরে এনে—

অনন্ত এদের দেখেই নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়েছিল—মার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বিরক্তস্বরে

বললে—সব সময় ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরো না বাবু, ভাল লাগে না। গিয়েছে—বেশ হয়েছে। পাপের ধন 'প্রাচিত্তে' গেছে।...কানু এতদিন পরে এলো—কোথায় একটু বসতে বলবে, ওর খবর নেবে—তা নয়—নিজের কথাই সাতকাহন! ....কানু ভালো আছিস তো ভাই? এতদিন পরে দেশকে মনে পড়লো?....

—কিন্তু না পড়লেই যেন ভালো ছিল 'অনন্তদা'!

—কি, আমার জন্যে বলছিস? সবই অদৃষ্ট! নইলে—রেলে চড়লাম না--এক্সিডেন্ট হল না—লাইনটুকু পার হ'তে গিয়ে দু'খানা পা বিসর্জন দিয়ে এলাম!...মতিচ্ছন্ন! দেখছি ইঞ্জিনটা আসছে ছুটে—ভাবলাম ছুট্রে পার হয়ে যাবো—ব্যস!....

—তোমার এই বানানো কথাগুলো হাজার বার শুনতে শুনতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে...মাঝে মাঝে হঠাৎ সত্যি বলেই মনে হয়। প্রত্যেক শব্দটা মুখস্থ করে রেখেছ কি করে বলো তো? একবারো ভুল হয় না! ...ঘরসুদ্ধ লোককে নির্বাক করে দিয়ে নতুনবৌ ওদিকের দরজা দিয়ে উঠোনে নেমে যায়।

বাক্স্ফূর্তির অবস্থা ফিরলে —অনেক আলাপ আলোচনা....ঈর্ষা বিস্ময় ...সদয়-দরদের বিনিময়। শেষ করে সুকান্ত ওব নিজের বাড়ির চাবিটার খোঁজ করলে। মজুর না ডাকলে দোর খোলা যাবে না বোধ হয় জেঠিমা, কি বলেন?....কিন্তু চাবি যে কার কাছে আছে—কে জানে! জানেন নাকি আপনি?

—চাবি!

মহামায়া হতাশভাবে মাথা নাড়েন—চাবির খবর বলতে পারিনে বাবা। আজ একযুগ বন্ধ পড়ে আছে। ...তবে ....ইয়ে ....এদিক দিয়ে ঢুকতে তুমি পারো। মাঝখানের পাঁচিল ধসে এ-বাড়ির ও-বাড়ির উঠোন এক হয়ে গেছে কিনা।

শেষের কথাটা প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেই বলতে হয় মহামায়াকে।

এ-বাড়ির লোকের যে ও-বাড়িতে গতিবিধি আছে সে তো বাড়ি ঢুকলেই ধরা পড়বে। সুকান্তদের উঠোনে শ্রীকান্তর অনেক সাধ করে গাঁথানো প্রকাণ্ড ইঁদারাটা একটু লোভনীয় বৈ কি! ... এ-বাড়ি এবং আরও পাঁচটা বাড়িতে শুধু পাতকুয়া। ...তাই না মহামায়াদের প্রয়োজন পড়ে ভাঙা দেয়ালের সুযোগ নেবার!

অগত্যা সুকান্তও সেই সুযোগ নেয়।

কিন্তু ঠিক এই সময়টিই কি জল নেবার দরকার পড়লো নতুনবৌয়ের? চক্চকে দুটো পিতলের ঘড়া নিয়ে এসেছে ইঁদারার পাড়ে।

আশ্চর্য! হাসতে লজ্জাও করছে না?....

—কি গো, স্নানটান হবে নাকি? বলো তো দু'ঘড়া জল তুলে দিয়ে যাই?

কোটটা খুলে টাঙিয়ে রাখবার মতো একটা ধুলোজঞ্জালহীন জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল সুকান্ত। অবশেষে একটা পেয়ারাগাছের নীচু ডালের 'ফেঁকড়ি'তে আটকে দিয়ে সুটকেস খুলে সাবান তোয়ালে বার করতে করতে বলে—জল তুলে দেবার দরকার নেই, আমি নিজেই পারবো।

—বল কি ঠাকুরপো, জল তুলবে? তোমার ময়ূরপুচ্ছের সম্ভ্রমহানি হবে না তো? না ভাই না থাক্, আমরা থাকতে মিথ্যে কষ্ট করবে কেন? রসো, ওবাড়ি থেকে বড় বালতি এনে দিই একটা—

—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার কাজ সেরে নিয়ে যান, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।...আচ্ছা

মার কতকগুলো এই সব কলসী-টলসী ছিল না? সে কি আছে এখনো? ভাঁড়ার খুঁজলে পাবো?

—কি জানি, পেতেও পারো—

একটা ঘড়া উপুড় করে স্বচ্ছন্দে তার উপর বসে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে নতুনবৌ।...

কিন্তু হাসিটা এমন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গমিশ্রিত কেন?

নানা কারণে নতুনবৌয়ের উপর মনটা প্রসন্ন ছিল না...তা ছাড়া—এরকম জনমানব-বর্জিত পোড়ো জায়গায় একলা বসে গল্প করাটা অস্বস্তিকর। পল্লীগ্রামের মাটিতে গড়া সমস্ত সংস্কার...সহরের সভ্য হাওয়ায় চাপা থাকতে পারে—একেবারে উড়ে যাওয়া সম্ভব কি?

—কাজ হ'ল আপনার?

—কেন? তাড়াতে পারলেই বাঁচো বুঝি? যাচ্ছি গো যাচ্ছি, এখুনি হয়তো আমার দয়াময়ী শাশুড়ী, স্নেহময় শ্বশুর, আর প্রেমময় পতিদেবতা আমার অদর্শনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখবেন।... কিন্তু ঠাকুরপো, মিথ্যে জেদ করছো, জলটা আমি তুলে দিয়ে যাই, এতদিন পরে এসে কেনই বা কষ্ট করবে আমরা থাকতে—

হঠাৎ রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠে সুকান্ত বলে—আপনি ভুল করছেন বৌদি, আপনাদের অতিথি হয়ে আসিনি আমি, নিজের বাড়িতে নিজের কাজে এসেছি। অসুবিধে তো হবেই সইতে।

—বেশ তো, সইতে পারলেই ভালো— ব'লে ভারী ঘড়াটাকে টেনে টেনে তুলতে থাকে নতুনবৌ।

কিন্তু অসুবিধের চেহারাটা যে এত প্রখর হবে, সেইটাই ধারণা ছিল না বেচারার।...চৌদ্দ বছর কমদিন নয়। ঘরের মেজের অবিশ্বাস্য পুরু ধুলোর স্তর তার প্রমাণ দেবে।....তবু—জানলার গরাদগুলোর পর্যন্ত চিহ্ন থাকবে না? থাকবে না দরজার কপাটের? ....খাঁ খাঁ করবে শূন্য ঘরগুলো?...শ্রীকান্তর মৃত্যুর পর সুকান্ত আর তার মার ভাঁড়ারে 'চাল বাড়ন্ত' হ'ত সত্যি, কিন্তু সংসারের সমস্ত জিনিসগুলো? খেতে না পেয়েও তার মা প্রাণপণে যেগুলো আগলে রেখেছিল? ....কোথায় সেই পিতল কাঁসা লোহালক্কর আসবাবপত্র?.... জীবনযাত্রার অজস্র খুঁটিনাটি?...সেই বাড়িভর্তি জিনিষের চিহ্ন থাকে না চৌদ্দ বছর বাড়িছাড়া থাকলে? 'আড়ায়' তুলে রাখা বিছানাগুলোসুদ্ধ চোরে চুরি করে? ...শুধু অবিকল পড়ে থাকে একটা মাটির কুঁজো?...ধুলো আর মাকড়সার জালে যার সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ে গেছে ....যার থেকে—মারা যাবার আগে পর্যন্ত জল খেয়েছে সুকান্তর মা। ....গভীর রাত্রে যখন সমস্ত পাড়া নিশুতি হয়ে গিয়েছিল, গেলাস গেলাস জল খাচ্ছিল সুকান্ত নিজে, আর ফোঁটা ফোঁটা করে দিচ্ছিল মার মুখে। ...অদ্ভুত! এই কুঁজোটা তা'হলে কেউ নেয়নি? সুকান্তর মার শেষচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছে বুঝি? ....কপাটহীন গরাদে, 'হাঁ-হাঁ' করা খোলা ঘরের মেঝেয় বসে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কুঁজোটার দিকেই তাকিয়ে থাকে সুকান্ত।...

পাড়ার আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করে আর অনেকের বিষ-নিশ্বাস ফেলিয়ে বেশিরাত্রে সুকান্ত বাড়ি ফিরে দেখলো দোতলার একটা ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে তার বিছানাটা রয়েছে পাতা। শিয়রের কাছে একগ্লাস জল, আর আধখানা মোমবাতি।...কিছুক্ষণ থেকে জ্বলে যাওয়ার হিসাব দিচ্ছে।....

মহামায়ার উপরোধে সামান্য কিছু খেয়ে এসে শুয়ে পড়লো। ....জ্বলতে লাগলো বাতিটা।

কিন্তু মোমবাতি তো একসময় শেষ হয়!...

গাঢ় অন্ধকারে ধরা পড়বার ভয়টা কি? নিশ্বাসের শব্দটা শাসন করে বন্ধ করা যায় যদি? ভয় হয়তো থাকতো না—পোড়োবাড়ির নিশ্চিন্ত বাসিন্দা—ইঁদুর , বেজি, পায়রা, চামচিকেদের অবাধ সঞ্চরণের সুযোগে মিলিয়ে যেত সতর্ক পদধ্বনি, কিন্তু মাথার বালিশের তলায় টর্চ নিয়ে শুয়ে থাকবে

সুকান্ত, একথা কে ভেবেছিল?

বালিশের তলা হাতড়ে সংগ্রহ করা সুটকেসের চাবিটা সমেত হাতখানা চেপে ধরে আচমকা টর্চটা জ্বালবার কি দরকার ছিল সুকান্তর! .....আলো জ্বেলেই অবশ্য হাত ছেড়ে দিয়েছে সে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পথ কোথায়?....ঘুমন্ত মানুষকে ডিঙানো যায় ব'লে তো আর জাগন্ত মানুষকে যায় না?

—এই রকমই সন্দেহ করেছিলাম আমি।

বিছানায় উঠে বসে মিনিটখানেক চুপ করে গম্ভীর গলায় বলে সুকান্ত।

ধৃতব্যক্তি একটা কঠিন হাসি হেসে তীক্ষ্নসুরে উত্তর করে—তাই বুঝি ঘুমের ভাণ করে পাহারা দিচ্ছিলে?

—নাঃ, ভাণ করা আমার স্বভাব নয়, ভাগ্যক্রমে ভেঙ্গেই গেল ঘুমটা, কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবেন? ...এ রকম অদ্ভুত প্রবৃত্তি কেন? মুখের কথা খসালেই তো কাজ হতো। একবার চেয়ে দেখলে পারতেন।

—চেয়ে? ছিঃ! আমি কি ভিখিরী? চাইতে আমার ঘেন্না করে।

—আশ্চর্য আত্মসম্মান-জ্ঞান! চাইতে ঘেন্না করে....করে না চুরি করতে!

—চুরি!

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হাসির ধাক্কায় খান্ খান্ হয়ে যায় ঘরের অন্ধকার। টর্চটা কখন নিভিয়েছে—মনে ছিল না সুকান্তের, খেয়াল হ'ল হাসির শব্দে।

—চুরি কে না করছে? এই যে তুমি, একমুঠো ভাতের জন্যে দোরে দোরে ঘুরে দেশছাড়া হয়ে আজ এসেছো বড়মানুষী দেখাতে—এর মূলে চুবি নেই কে বিশ্বাস করবে?...চুরি? ...চুরি না করলে খাবো কি?

—বরং উপোস দিয়ে মরা ভালো।

রাগ লুকোবার চেষ্টা করে না সুকান্ত।...ধিক্কারে লজ্জায় সমস্ত শরীর জ্বলতে থাকে তা'র। অধঃপতন মানুষেরই হয় সত্যি কিন্তু মেয়েমানুষের এত অধঃপতন সহ্য করা শক্ত। তা'ছাড়া নিজের তুলনাটাও অসহ্য লাগে। কিন্তু আরও সহ্য করতে হয়...

নতুন বৌ হেসে উঠে বলে—ওসব ধর্মকথাগুলো বড় সেকেলে হয়ে গেছে ঠাকুরপো, লোক-ঠকানো ছেঁদো কথা মাত্র।...একজন খেয়ে ফুরোতে পারে না, রাখবার জায়গা পায় না, আর একজন না খেয়ে মরে, এর বিরুদ্ধেই না শুনছি আজকাল লড়ালড়ি চলেছে তোমাদের?

—সে সব হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় কথা—বুঝলেন? অন্যের ঘরের ঘটিবাটি চুরির সপক্ষে কোন নীতিই নেই।

—আছে শুধু উপোস দিয়ে মরার উদার নীতি, কেমন? আচ্ছা কানু, আন্দাজ করতে পারো, তোমার জেঠির সাধের সংসারটি চলে কিসের জোরে?...বাগ্দীপাড়ার লোক এসে ঘরের মেয়ের অপমানের জবাব দিয়ে যায় তোমার দাদাকে পঙ্গু করে...তার আগে শ্বশুর বিছানা নিয়েছেন।...আচ্ছা ঠাকুরপো, পক্ষাঘাত কেন হয় জানো?

বিরক্তি-বিরস কণ্ঠে সুকান্ত উত্তর করে—থাক্ বৌদি, গুরুজনের কথা নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

—প্রবৃত্তি আমারও নেই ঠাকুরপো, শুধু কথার কথা জানতে চাইছিলাম। স্বামীও কম গুরু নয়, তাঁর কথাও থাক্ কিন্তু উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল, রইল শুধু খাওয়ার মুখ! এর কি ওষুধ জোটাই

আমি তাই বলো তো ?... অথচ যোগান দিয়ে দিয়ে জীইয়ে রাখতে হবে মাংসপিণ্ডের ভেতর ধুকধুক-করা সেই প্রাণটুকু। ...অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবার জো নেই, চিরকাল ভালো খেয়েছেন— তার ব্যতিক্রম সহ্য হয় না। আমি অলক্ষ্মী, আমার নিশ্বাসে নাকি সব উড়েপুড়ে যাচ্ছে..পৃথিবীতে বাধলো লড়াই, বাজারে লাগলো আগুন, সেও বোধ করি আমার অপরাধ। ..এই চার বছর ধরে—তিলতিল করে সব গেছে। অবশেষে যেতে বসেছে নীতি-ধর্ম, সভ্যতা, ভব্যতা।

—কিন্তু হেমন্তদা—বসন্তদা ? তাঁরা কি কিছুই দেন না ?

—দিতেন হয়তো সামান্য কিছু, কিন্তু শ্বশুর আমার মানী লোক, বেইমান ছেলেদের একপয়সা নেন না। তাদের অপরাধ—তারা সক্ষম। অহরহ দু'টো জ্যান্তমরা পঙ্গুর কাতরানি শুনতে শুনতে নিজেদের জীবনটা পঙ্গু করে ফেলতে চায় নি, স্ত্রীপুত্র নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

—কিন্তু এভাবে ক'দিন চলবে ?

—দেখি তো—হয়তো শেষ পর্যন্ত ধরতেই হবে—মেয়েমানুষের সেই আদি ও অকৃত্রিম পথ।.....বাঁধা রাস্তার বাইরে গিয়েই না এত বিড়ম্বনা ? কিন্তু রুচিতে যে বড্ড বাধে, করি কি ! যাকগে ওসব কথা। আজ যখন হেরে গেলাম তোমার কাছে, তখন দয়াভিক্ষা ছাড়া উপায় কি ? দয়া করে পথ দাও, আমি যাই।

—পথ আপনার আটকাই নি আমি—সুকান্ত অভিভূতের মতো বলে—শুধু ভাবছি, ধন্য আপনার সাহস ! হঠাৎ যদি এ অবস্থায় কেউ দেখে, দুর্নামের কিছু বাকী থাকবে কি ?

আবার খান খান হয়ে যায় অন্ধকার। কাঁচের বাসন ভেঙ্গে যাওয়ার মত তীক্ষ্ণ শব্দ ওর তীক্ষ্ণ হাসির।

—বাকী থাকবে না বলেই তো রাতদুপুরে আসা গো—দুর্নামই যে আড়াল। দুপুররাতে একলা তোমার ঘরে মনচুরি করতে না এসে—বাক্স ভেঙ্গে তুচ্ছ টাকা চুরি করতে এসেছি, সুস্থ মানুষে কখনো বিশ্বাস করে এ কথা ? ...চরিত্রের অপবাদ তো বাঙ্গালীর মেয়ের অঙ্গের ভূষণ। তোমার সঙ্গে একবার হেসে কথা কইলেই তো জাত যাবে—কিন্তু জেল তো হবে না ? দত্তবাড়ির বৌকে হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে—দত্তবাড়ির এত বড় অপমান কি করে ঘটাই বলো ? দুর্নামের আড়ালে তাই আত্মরক্ষা করছি।

—তাই বলে ইচ্ছে করে মিথ্যে দুর্নামের বোঝা বইবেন ? ...সুকান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে...বলে, আপনি কি পাগল ?

—পাগল ! বলো কি, অসম্ভব ঠাণ্ডা মাথা, নিজেই অবাক হয়ে যাই মাঝে মাঝে। আর একটু কম ঠাণ্ডা হলে—সংসারের আর পাঁচজনের মতো হয়তো একটা খেলোমী করে বসতাম কোনোদিন—জল, আগুন, বিষ, দড়ি, এ তো আর কেড়ে নেয়নি কেউ ? কিন্তু জো কি তার ? বংশে বাতি দিতে অপোগণ্ডের সংখ্যাও তো কম নয় ?—এতোগুলো মাংসপিণ্ডের পিণ্ডির যোগাড় করে কে তবে ?

আচ্ছা, ভাঙাবাড়ি মেরামত করবার কি এত দরকার সুকান্ত ? এ যাত্রায় নাই বা হ'ল ? একেবারে না হলেই বা ক্ষতি কি ? সুকান্তর মায়ের সমস্ত চিহ্নই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যখন ! আরো চৌদ্দ বছরের ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্পে ধসে পড়ে যাক না ফাটধরা নোনা-লাগা পচা দেওয়ালগুলো। এই নোটের তাড়াগুলো বাসি খবরের কাগজ মনে করলেই বা কি এসে যায় ? তুচ্ছ এই টাকা ক'টার বিনিময়ে কিছুটা সংস্কার যদি হয় তো হোক না—ধ্বংসোন্মুখ একটা জীবনের .....ঝড়ঝাপট আর ভূমিকম্পে

যার চারিদিকের দেওয়ালে ধরেছে ফাটল.....লেগেছে লোনা।

টাকা তো সুকান্তর কাছে খোলামকুচি....আজ অজস্র আসছে—হয়তো একদিন কিছুই আসবে না, খুব বেশি তফাৎ কোথায়?

টর্চের আলোয় সবগুলো উল্‌টে দেখে নিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো নতুনবৌ—সত্যি নোট তো ঠাকুরপো? জাল-টাল নয় তো?

—নাঃ, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। খাঁটিই।

—কতো আছে এতে?

—হাজার পাঁচেক আছে হয় তো।

—বড়ো আনন্দ হ'ল ঠাকুরপো, ইচ্ছে করলেই পাঁচ-দশ হাজার নষ্ট করবার মতো অবস্থা তোমার হয়েছে দেখে .....এই নাও!

—কি আশ্চর্য! ফিরিয়ে নেবার জন্যে দিলাম নাকি? ....যান যান পালান! চলুন, আলোটা ধরি আপনাকে। ....নিন, পাগলামী করবেন না।

—ছিঃ ঠাকুরপো, অবশেষে হাত পেতে তোমার কাছে নেবো টাকা? ....বরং একটু যদি ভালবাস' দিতে পারো, দেখো চেষ্টা করে—

মুচকি হেসে নোটের গোছাটা ঘরের মেঝেয় ফেলে দিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায় নতুনবৌ।

—নেওয়া কি কিছুতেই চলে না?

—না গো মশাই, না। টের পেলে রাক্ষসেব খিদে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করতে চাইবে, তা জানো? ....মজা কি জানো? আমার রোজগারের অন্ন খেতে ওঁদের গলায় বাধে। নিরুপায় অপমানের বিকারটা হয়তো এমনিই হয়।

—কিন্তু জেঠিমা—অনন্তদা, এঁরাও কি সন্দেহ করেন যে—আপনি...

সঙ্কোচে চুপ করে যায় সুকান্ত।

হাসি নতুনবৌয়ের স্বভাব, হেসে উঠে বলে—এই এক আচ্ছা ছেলেমানুষ! সন্দেহ কি গো? দৃঢ় বিশ্বাস বলো। ওঁরা তো আর সংসার ছাড়া মানুষ নয়?—কিন্তু কতদিন আর যুদ্ধ করি বলো তো?

রংচটা কাঠের বোর্ডটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে...ট্রেন ছেড়ে চলে গেল সীতাহাট স্টেশন। ...হয়তো এই শেষ। অন্য কোন দিন ...বহু বহু দিন পরে বৃষ্টিতে সমস্ত লেখাটা একেবারে মুছে ঝাপসা হয়ে গেল কি না, দেখতে আসবে কি সুকান্ত আর কোনদিন?

বাইরে থেকে ছোট্ট গ্রামটাকে একটা আগাছার জঙ্গল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না....আগাছা—তবু সবুজ পাতার সমারোহের অভাব নেই!...কে বলবে ওই শীতল আবেষ্টনের ভেতর লুকিয়ে আছে জ্বলন্ত খানিকটা আগুন!

আগুন না অঙ্গার? জ্বলে জ্বলে নিজেকেই কখন একদিন নিঃশেষে ভস্ম করে ফেলবে কে জানে!

দুই হাত জোড় করে সীতাহাটের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলো সুকান্ত। হয়তো জন্মভূমি বলেই।

[১৩৫৩]

ট্যাক্সি থেকে নামতে না নামতেই সাড়ম্বর অভ্যর্থনার ধুম পড়ে গেল। ...অবশ্য ধুম পড়ে যাবে তা বিকাশের জানা, অপ্রত্যাশিত নয় ব্যাপারটা। কলকাতায় তাকে আসতেই হয় মাঝে মাঝে আর এলে এদের বাড়িতে ওঠাই সুবিধে। নানা দিক দিয়েই সুবিধে। ...কাজ পড়ে প্রায়ই এই অঞ্চলে, তা ছাড়া ট্রাম বাস কাছে, দু'চারজন বন্ধুর বাড়িও এই দিকে, বলতে গেলে অনেক বলা যায়।

তা যখনই আসে—আদর-আপ্যায়নের ক্রটি হয় না।

এদের সঙ্গে বিকাশের কি সম্পর্ক, কিম্বা আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আর এখন কারও মনে নেই। বিকাশ এলেই 'তটস্থ' হয়ে উঠবে সকলে, এই নিয়ম।

বাড়ির গিন্নী সত্যবতী বিগলিত স্নেহের স্বরে বলে ওঠেন—কি বাবা, এতদিনে মনে পড়ল? এবারে কিন্তু তুমি বড্ড দেরী করলে বাছা।

সুট-পরা আড়ষ্ট শরীরটাকে নিচু করা কষ্ট হলেও পায়ের ধুলোটি নেওয়াই চাই, কসরৎ সেরে হাস্যোজ্জ্বল মুখে উত্তর দেয় বিকাশ—হ্যাঁ কাকীমা, এবারে অনেক দিন পরেই বটে, কি করি বলুন, কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম ত? মন কেমন করলেই বা করছি কি? ...ইয়ে—হ্যাঁ, এই যে কি নাম তোর? রতন বুঝি? ট্যাক্সি থেকে সব জিনিস কটা নামিয়েছিলি ত? না কি দু'চারটে ছেড়ে দিয়েছিস? তা তোরা সব পারিস, তোদের বিশ্বাস নেই বাবা! ...ফলের টুকরিটা কোথায় রাখলি? ...এই যে—কাকীমা, এই আপনার ঠাকুরের জন্যে দুটো কলা-মূলো, নির্ভয়ে ভাঁড়ারে তুলতে পারেন, ভীষণ পবিত্রভাবে এসেছে।...

সত্যবতী ক্রোধপ্রকাশের ভঙ্গী করেন—এই দেখ, আবার ওই সব কাণ্ড করেছ? নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না বাছা, যখনই আসবে তখনই একগঙ্গা টাকা খরচ করবে একি অন্যায় বাপু! ওমা—হরি হরি! এর নাম কলা-মূলো! এই অসময়ের আম, আনারস, আপেল, বেদানা, মিশ্রী-মেওয়ার গাদা—সোজা দাম এ-সবের? ছি ছি, তুমি বাছা বড্ড উড়ন-চণ্ডে! ...

—আশ্চর্য কি? লক্ষ্মীছাড়ারা তো উড়নচণ্ডেই হয় কাকীমা! ...টাকা তো খরচ করবার জন্যেই, তাই না? জমানো টাকা আর রাস্তার ঢিলে তফাৎ কি? সামান্য ফল, তার জন্য আবার—এ কিন্তু আপনার একলার, বুঝলেন? ভাগ দেবেন না কাউকে—

সত্যবতী হাসেন—এই একঝুড়ি ফল একলা খাব আমি?

—কেন খাবেন না? ওদের জন্যে অন্য জিনিস নেই? ...কই রে রতন, বড় সুটকেস্‌টা কি করলি? দোতলায় তুলে দিয়েছিস? ওস্তাদ! রতন নইলে আর এমন বুদ্ধি! ...এই বাচ্চু, বীণা, পুঁটি, নমিতা, মনু, রাখাল—চল্ সবাই। তোদের নৈবিদ্যি বার করি। ...

ছোট ছেলেরা মহোৎসাহে চাপা হাসির সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে ওঠে।

বিকাশ-কাকার মত মহানুভব লোক তারা দেখেনি আজ পর্য্যন্ত। ঠিক জানে সুটকেস্ থেকে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা বেরোবে দামী বিস্কুটের টিন, প্যাকেট প্যাকেট চকোলেট, নতুন নতুন খেলার সরঞ্জাম। মেয়েদের জন্যে নিশ্চয়ই আছে...প্রসাধনের এটা-ওটা টুকিটাকি, পাথরের মালা কি পুঁতির দুল, প্লাস্টিকের চুড়ি কি জরির ট্যাসেল। ...

নিখুঁৎ পছন্দ! অদ্ভুত হুঁশ! বাড়ির কারুর কথা ভোলে না, কাউকে বঞ্চিত করে না!

চমৎকার লোক বিকাশ-কাকা।

অপূর্ব্ব ভাল। বিকাশ-কাকা এলে হৈ চৈ পড়ে যাবে এ আর বিচিত্র কি?

ভাল বইকি, এত ভাল দেখা যায় না।...সুট না ছেড়েই সুটকেস্ খুলেছে সে।

—এই যে কাকীমা, আপনার জন্য মটকাব থানধুতি একখানা। দোহাই কাকীমা, বকুনি দেবার জন্য চোখ পাকাবেন না। বহরমপুরের দিকে যেতে হল সেবার, সস্তা পেলাম, নিয়ে রাখলাম একখানা আপনার জন্য। পূজোটুজো করেন আপনি, কাজে লাগবে।...আর এই ভাগলপুরী থান একটা, গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাবি হয়। শ্রীকান্তবাবুর কাজে লাগবে।...মেজদা, আপনার জন্যে কিন্তু ভারি চমৎকার একটা জিনিস আছে, বিরাট কিছু নয় অবশ্য, কিন্তু ডি-সেন্ট। এই যে-নিন।...

চমৎকার একটি সিগার-কেস!

বিকাশ কল্পতরু।...

ওর সুটকেস্, এ্যাটাচিকেস্, হোল্ডঅল মায় বেডিং থেকে উপহারের বস্তু ঝরতে থাকে।...কি নয়? বাড়ির বৌদের জন্যে কটকী শাড়ি, তরুণী মেয়েদের জন্যে ব্লাউসের সিল্ক।

কোম্পানির কাজে সর্ব্বত্র ঘুরতে হয় বিকাশকে...আর যেখানে যা সৌখিন জিনিস চোখে পড়ে সব জমা করতে থাকে।...কবে আসবে কলকাতায়, কবে উঠবে এ বাড়িতে, এই আশায়।...

ওর আড়ালে মন্তব্য চলে-

—অসাধারণ ছেলে এই বিকাশ।

—টাকা থাকলেই হয় না শুধু, দেবার মন থাকা চাই। থাকা চাই রুচি পছন্দ।...বিনয়ও থাকা চাই বৈ কি, ওর উপহারের মধ্যে অহঙ্কারের খাদ মেশানো থাকলে কে নিতে পারতো এমন অনায়াসে?

কী মায়াবী ছেলে! নইলে রতনের কথাও ভোলেনি! ওর জন্যে এনেছে দিব্যি একখানি নিকষ-নীল হাওয়াই শার্ট। গায়ের রঙের সঙ্গে কাছাকাছি হলেও ক্ষতি নেই রতনের, কাকাবাবুর পায়ের ধুলো না নিয়ে ছাড়বে না সে।

বিকাশকে অবহেলা করবে কে?

বিকাশের জন্যে সারা বাড়ি অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠবে না তো কি? সাজানো অনুযোগ আর আদুরে অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে চলে বিকাশের জন্যে ব্যস্ততা।...

বিকাশের একটু সুখ-সুবিধের জন্যে মরতে পারে বাঁচতে পারে এরা।

এদের বাড়িতে উঠবে না তো কোথায় তবে উঠবে বিকাশ? কলকাতায় যখন আসতেই হয় তাকে মাঝে মাঝে!

এ বাড়ির বড়বৌ কল্পনাই শুধু ছুটে আসেনি ব্যস্ত হয়ে, ছাদে বসে বড়ি দিচ্ছিল নাকি কে জানে। একজনকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধু সকলের মাতামাতি তার দু'চক্ষের বিষ।...অথচ হিসেব মত তারই যাওয়া উচিত আগে। বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক কিছু যদি বার করতেই হয় তো কল্পনার বাপের বাড়ির দিকটাই হাতড়াতে হবে।

নীচের গোলমাল তার কানে এসেছে, আলসে থেকে ঝুঁকে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার পর আর নীচে নামবার গা নেই তার। হাতের কাজ সারা হলেও বসেই আছে দিব্যি শীতের রোদে পা ছড়িয়ে।

—বৌমা, তুমি এখানে?...

হাঁফাতে হাঁফাতে সত্যবতী ছুটে এসেছেন ছাতে—বিকাশ এসেছে যে!

যেন বিকাশ আসার পর আর কারুর রোদে পা ছড়িয়ে বসে থাকবার আইন নেই। কি যেন বে-আইনী কাণ্ড করে বসেছে কল্পনা।

অবশ্য শাশুড়ীর এই উত্তেজিত অভিযোগে খুব বেশি বিচলিত হয় না কল্পনা, নিশ্চিন্ত ভাবেই বলে—তাই বুঝি? ও—তাই ছেলেমেয়েগুলোর হৈ চৈ কানে আসছিল।

—টের পেয়েছো? তা যাও এবাব নীচে!

—যাচ্ছি। হাতমুখ ধুয়েছেন তো?

—কোথায়? সত্যবতী আবও হাঁসফাঁস করতে থাকেন—সেই অবধি ত বাক্স পেঁটরা খোলাখুলি করছে, তুমি যাও এবার? তেল সাবান গামছা তোয়ালে, কি লাগে না লাগে—

সত্যবতীর কথার সুরে যেন একটা বিশেষ জোর—যেন কল্পনা ব্যবস্থা না করে দিলে আজ আর স্নানই হবে না বিকাশেব।

কল্পনা এবারও গায়ে মাখে না।

—হ্যাঁ বিকাশদাব আবার কি লাগে না লাগে! নিজের সব কিছু গোছানো থাকে ওঁর!

সত্যবতী বিরক্ত হন—নিজেব আছে বলে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে হবে? কি যে বল বৌমা! যাও, শ্রীকান্ত খুঁজছে তোমাকে।

—বাবাঃ, বাড়িতে এত লোক থাকতে --

রাগ করেই নেমে যায় কল্পনা।

আব কেমন একটা জ্বালা মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সত্যবতী।...

ডালবাটার কাঁসি গামলা সব কিছু ফেলেই চলে গেল কল্পনা। এই সব আবার বয়ে নিয়ে যেতে হবে সত্যবতীকেই।

—কত ঢং! দেখান যেন—কতই—

অস্ফুট মন্তব্যটার শেষাংশ আর শোনা যায় না।

—কোথায় ছিলে তুমি?

শ্রীকান্তর ব্যস্ত স্বরে ফিরে তাকায কল্পনা।...

—বড়ি দিচ্ছিলাম ছাতে, বোদটা বেশ লাগছিল—

—চমৎকার! এদিকে তোমাব বিকাশদা এসে বসে আছেন—কখন তার ঠিক নেই।

—বসে আছেন মানে? আমি গেলেই দাঁড়িয়ে উঠবেন?

হাসবার চেষ্টা করে কল্পনা।

—বাজে বোকো না, তুমি একবার না গেলে মনে করবেন কি?

—কি আশ্চয্যি! আমার যে এখন রান্নাঘরের কাজ অনেক বাকী। যে 'গল্পে' মানুষ, গেলে আর রক্ষে আছে? ততক্ষণ বরং তোমরা—

শ্রীকান্তর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে—আমরা আবার কি করব! রান্নাঘরের কাজ করবার আরও লোক আছে। এতক্ষণের মধ্যে তুমি একবারও গেলে না—ভাববেন কি?

—নাঃ বাপু, তোমরা জ্বালালে আমায়। মেজ বৌয়ের শরীর ভালো নেই, আবার ওর ঘাড়ে কতকগুলো কাজ চাপবে। বিকাশদার কবলে পড়লে তো আর সহজে—

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই এগোয় কল্পনা।

—ন্যাকামি!

শ্রীকান্তর মন্তব্যটা প্রায় অনুচ্চারিত।

—কটকী শাড়ি পেয়ে বর্ত্তে গেলে?

মেজবাবু মেজগিন্নীর হাতের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে দেখেন।...

হাতের শাড়িখানার আঁচলার দিকটা খুলে খাটের উপর বিছিয়ে দিয়ে মেজগিন্নী মুখ টিপে হাসে—মন্দ কি! "ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।" শাড়িখানা কিন্তু চমৎকার! টেস্ট আছে তোমাদের বিকাশবাবুর।

—সব সময় নয়।...কি বলব, বাড়ীসুদ্ধু সকলে একেবারে গদগদ তাই কিছু বলিনে, নইলে—দেখিয়ে দিতাম। আমাকে পর্য্যন্ত ঘুষ দিতে আসে, ইচ্ছে হচ্ছিল সিগার-কেসটা মুখের ওপর ছুঁড়ে মারি।

—ইচ্ছে হচ্ছিল? মারোনি তো?

—ওই যে বললাম, সকলের ভয়ে।...আশ্চর্য্য যে, দাদা সুদ্ধু গাধা ব'নে বসে আছেন! আমি হলে—

—থাক্, তুমি হলে কি হত সে কথা জাহির করতে হবে না, পুলিশ কেসে পড়বে। এখন যাও একবার রতনকে নিয়ে বাজারে, মা বললেন।

—আমি পারব না।

—ওমা, সে কি গো? অতিথি-সৎকারে ত্রুটি হবে যে! মালাইকারি ভালোবাসেন উনি, নতুন এঁচড় দিয়ে গলদাচিংড়ির ডালনা—

—ভালোবাসেন তো কৃতার্থ করেছেন। মাকে বলোগে সময় হবে না আমার।

—ওরে বাবা! মাকে বলতে-টলতে পারব না আমি।

—বোলো না, আমি বলছি গিয়ে।

—আঃ, থাক্ না বীরপুরুষত্ব! ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে কেন? বেশ ত চলছে, মন্দ কি? মাঝে মাঝে তবু মুখটা বদলায়।...

হেসে গড়িয়ে পড়ে লতিকা।

ছোট বৌ শ্যামলী হেসে গড়াতে গড়াতেই আসে। —কি হলো তোমার?

ছোটবাবু সুকান্ত হাতের খবরের কাগজখানা ফেলে দিয়ে তাকায়।

—আমার আবার কি হবে? শত্রুর হোক।...''আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে, ওগো ললিতে—"

আবার গড়িয়ে পড়ে শ্যামলী।

—কই গো ছোট বৌদিদি, কুটনো কুটে দেবে বললে যে?...

বামুন ঠাকরুণ এসে হাঁক পাড়ে।

—এই যে যাই।...শ্যামলী উঠে দাঁড়ায়। গম্ভীর হয়ে ছোটবাবুকে বলে—তোমার আর কী—বসে বসে চা খাও। আমিই মরব 'আতান্তরে'। রান্নার ফিরিস্তিটি তো কম নয়। বড় বৌদির দাদা এসেছেন তো? তাঁর তো হয়ে গেল আজকের মত।

—তুমি কি আমাকে বাঁচতে দেবে না?—চাপা গর্জ্জনে আগুন হয়ে ওঠে কল্পনা—আমার ইহকাল পরকাল সব খাবে তুমি?

—তা আর পারলাম কই? বিকাশ গলা ছেড়ে হেসে ওঠে—পারলে এ উঞ্ছবৃত্তির দরকার কি ছিল?

—তোমার পায়ে পড়ছি বিকাশ, আর আমার সর্ব্বনাশ কোরো না তুমি!

—তোমার সর্ব্বনাশ? মাই গড্। "পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী; কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি"—। তোমাব সর্ব্বনাশ করব—আমি! সাধ্য কি?

—আঃ বিকাশ, হাত ছাড়ো। লজ্জা করে না বেহায়া হতভাগা কোথাকার? দেয়ালেরও চোখ আছে, তা জানো?—বিহ্বল হয়ে বলে কল্পনা।

—জানি বইকি—বিকাশ বিছানায় এলিয়ে পড়ে সিগারেট ধরায়, চোখেই তো পড়ল এক আধটা চোখ।...তবে সুখের বিষয় জিভ নেই, ওটা চিনির রসে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

—তাই বলে চিরদিন তুমি এইভাবে অপদস্থ করবে আমায়?...কেন আসো তুমি? কে আসতে বলে?

—তুমি বাদে সবাই বলে।...দেখ না কাকীমাকে? কী অসীম স্নেহ আমার ওপর!

—গলায় দড়ি! তুমি কি ভাবো কিছু সন্দেহ করেন না ওঁরা? কেউ বোঝে না কিছু?

—সন্দেহ? বল কি কল্পনা! সন্দেহের অবকাশ আছে নাকি কিছু? সবাই সব বোঝে। চার আনার ওপর বারো আনা রং চড়িয়ে নিয়ে বোঝে।...দেখতে পাও না, হঠাৎ কেমন একটি নিভৃত পরিবেশ উপহার দেওয়া হয আমাদেব।...ছোট ছেলেমেয়েগুলোব সুদ্ধু পাত্তা নেই।

—ছি ছি, কী লজ্জা! জানো কী ছোট হয়ে যাই আমি! কেউ কিচ্ছু বলে না, তবু—তুমি চলে যাওয়ার পরেও পাঁচ সাত দিন মুখ তুলে কথা কইতে পারিনে আমি।

—মোটে পাঁচ সাত দিন। তার পরে পারো তো? পুরোনো বন্ধুর জন্যে এটুকু ত্যাগস্বীকাব করতে পাববে না?...ছিঃ, অত দুবে কেন? কী ভীষণ নিষ্ঠুর তুমি কল্পনা! শুধু একটু সান্নিধ্য, একটু স্নেহস্পর্শ, এইটুকুর লোভে চারশো মাইল দূর থেকে ছুটে আসি, সেটুকু দাক্ষিণ্যও নেই?...

—না না, তোমার ওপর কোনো দয়া দাক্ষিণ্য নেই আমার।...তুমি আমাব সৌভাগ্যেব শনি, আমার জীবনের রাহু।

—তা রাহু ব্যক্তিটিও তো খ্যাতনামা প্রেমিক।

—হাসতে লজ্জা করে না তোমাব?

—কিছু না। লজ্জা করে বোকাদের, লজ্জা কবে চাষা-ভূষোব। বুদ্ধিমান্ ভদ্রলোকেব আবার লজ্জা কি? তুমি যে হাসালে কল্পনা!

—কিন্তু এতে তোমার কী লাভ বিকাশ?...

—লাভ? সত্যি তাও ভাবি মাঝে মাঝে। পকেটে পয়সার বালাই নেই, ধাব করে প্রিয়া-সন্দর্শনে আসা!

—আবার ধার করেছ? ধার করে করেছ এই সব কান্ড?

—তা ছাড়া?

—কেন? সামর্থ্য নেই, তবু কেন তুমি এই সব বাজে খরচা কর?

—নাঃ, বড্ড হাসাচ্ছ কল্পনা।...তোমার ঘরের চৌকাঠ ডিঙোতে পাবার সৌভাগ্যের দাম নেই?...কোলটা পাতো, অনেকদিন শুইনি কোলে মাথা রেখে।...অনেকদিন হাত বুলোওনি কপালে গালে...দেখি এখনও তেমনি ঠাণ্ডা আছে কি না—

—বাড়াবাড়ি কোরো না বিকাশ, ছাড়ো ছাড়ো বলছি হাত...আঃ বিকাশ...চেঁচিয়ে লোক

জড়ো করব আমি বলে দিচ্ছি—

—হাঃ হাঃ হাঃ! ওইটি পারবে না কল্পনা।...ওইখানেই তো ভরসা আমার। হাজার হোক তোমার তো একটা মান-মর্য্যাদা আছে। বাড়ীব বড়বৌ, উকিলবাবুর গিন্নী।...আচ্ছা থাক্‌ দেশলাইটা কোথায় গেল? একটু এগিয়ে দাও না?...দেবে না?...ছিঃ কল্পনা, পুরো আঠারোটি মাস বিরহযন্ত্রণা ভোগ করেও মন-কেমন করে না তোমার?

—না না, করে না। তুমি আব কোনদিন না আসো, জন্মের শোধ বিদেয় হও এই চাই আমি। তুমি মরে গেলেই বাঁচি আমি।

—আ ছি ছি, মনকে চোখ ঠেরো না কল্পনা, আমি মরে গেলে পাগল হয়ে যাবে তুমি।...

—কখনও নয়।...তাড়িয়ে দিলাম সেবাব, দিব্যি দিলাম, আবার এলে বেহায়ার মতো। শযতান রাক্ষস!...কদিন থাকতে এসেছো? আজই চলে যাও—

—চলে যাব? বল কি কল্পনা! এতো তোডজোড করে আজই চলে যাব? আমি তো পাগল নয।...অনেক কিছু, বেশি কিছু তো চাই না তোমাব কাছে, অগাধ সমুদ্রের দ্বারে হাত পেতে এক গণ্ডূষ জল মিলবে না—এও কি সম্ভব?

—তুমি কি চাও?

—কিছু না কল্পনা, কিছু না। শুধু দুটোদিন তোমাব একটু সান্নিধ্য...আর কিছু টাকা। বে আন্দাজী ধার করে ফেললাম।

—আব পারব না আমি তোমার এই খেযালেব খেসাবত যোগাতে। জানো—গয়নাগুলোব জন্যে কত সময় কত মিথ্যে কথা বলতে হয় আমাকে?

—সামান্য একটু মিছে কথা? ছোঃ, ওর জন্যে আবার ভাবনা! এস একটু কাছে, অত দূরে বসে থাকলে চুলের গোড়ায় হাত বুলোবে কি কবে?

—না, এইখানেই বেশ বসে আছি।

—বাজে মেজাজ দেখিয়ে এই অমূল্য সময়টুকু নষ্ট কোবো না কল্পনা। একটু কোলে মাথা রাখতেও না দেবে যদি, ওরাই বা তোমায় পাঠাল কেন কাজেব সময় ছুটি দিয়ে?...শ্রীকান্তবাবুর যেটুকু দয়া আছে, তোমার তাও নেই? হ্যাঁ এই তো—আঃ!...তোমার মেজাজটা এত কড়া হয়ে গেছে, কিন্তু কোলটা ঠিক তেমনি নবম আছে—ভারি আশ্চর্য্য নয়? নাঃ, তুমি বড্ড বুড়ো হয়ে যাচ্ছ কল্পনা।—

—বিকাশ, সত্যি বলছি, বাড়াবাড়ি করলে চেঁচাব আমি—

—লাভ হবে না কিছু, বড়জোড় শ্রীকান্তবাবু এসে মাথায় ঠাণ্ডা জল ছিটোবেন।...কেলেঙ্কারি বাড়বে বই কমবে না। থাক্‌ গে—তার চেয়ে বরং দুটো সুখদুঃখের গল্পই করা যাক্‌।...সেবারে তো তুমি মাথাব দিব্যি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে—বুঝলে কল্পনা, মনে ভা-রি ধিক্কার এলো। বীরপুরুষের মত আমিও প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, 'আর আসব না'। উঃ তারপর সে কী যন্ত্রণা...খেয়ে শুয়ে স্বস্তি নেই...মনে হত তুমি বুঝি আর নেই, মরেই গেছ বুঝি।...আঃ কী চমৎকার ঠাণ্ডা হাতটা, তোমার...হ্যাঁ, কপালে ঠাণ্ডা হাত আমার সব সময় ভাল লাগে, শীতকালেও।...কী বলছিলাম—কিছুদিন সে কী যন্ত্রণা! তারপর প্রত্যেক দিন একটু করে শিথিল হচ্ছে প্রতিজ্ঞার মূল।...আঠারো মাস সময়টা কি কম কল্পনা? প্রতিদিন একটু করে গোড়া খুঁড়লে পাহাড়ও ধ্বসে যায়।...ও কি, ও কি অমন ছিটকে উঠলে কেন?

—কেন?...দেখতে পেলে না ওই জানালার পর্দার ওদিকে ছোটবৌকে? হেসে সরে গেল।

বিকাশ বিকাশ, আবার দিব্যি দিচ্ছি তোমায়—আর এসো না তুমি...জন্মের শোধ বিদেয় হও তুমি আমার জীবন থেকে। তোমার ওই লক্ষ্মীছাড়া জীবনের কালোছায়া ফেলো না আমার সুখের ঘরে।...অনেকদিন যখন না আসো, আস্তে আস্তে...ভুলে যায় সবাই, আমিও ভুলি। যেমন করে দুঃস্বপ্নকে ভোলে লোক।...আবার মুখ তুলে চাই, সংসারের ওপর প্রভুত্ব করি বড়র মত... ফের তুমি আসো ধূমকেতুর মত, ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় সব।...এর কি শেষ হবে না?

—সত্যিই তবে শেষ চাও কল্পনা?

—চাই চাই। কতবার আর বলব।...আমাকে বাঁচতে দাও তুমি। রেহাই দাও। জীবনে যেন তোমার মুখ আর দেখতে না হয় আমায়।

—আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু—কি হয় জানো কল্পনা? তোমার মুখের কথায় আর চোখের দৃষ্টিতে কখনও মিল খুঁজে পাই না, তাই বারে বারে এই ধৃষ্টতা ঘটে।...হয ত—কিছুই নয়, হয় ত ওটা আমারই দৃষ্টির ভ্রম।...আচ্ছা, কিন্তু আমার জিনিসপত্রগুলো একটু দেখেশুনে নিতে হবে যে! তোমাদের রতনবাবু তাদের কোথায় প্রতিষ্ঠিত করেছে কে জানে!

—আজই যাবে নাকি?

—আজই মানে? এখুনি—এই তো সাড়ে বারোটায় ট্রেন রয়েছে।

—কেউ কিছু মনে করবে না তো?

—পাগল! ছন্নছাড়া একটা লোক, তার আসা-যাওয়ার স্থিরতা থাকবেই এমন কি কথা!

—আমি তো এমন কথা তোমায় বলিনি বিকাশ, 'এই দণ্ডে দূর হও'!

—পাগল, তাই কখনও বলতে পারো? আমার কাজ রয়েছে সত্যিই। লোভে পড়ে ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম।...আচ্ছা তোমার সঙ্গে বোধ হয় এই শেষ। গুড্‌বাই।...কই হে রতনবাবু, আমার বিছানা বাক্স কোথায় পাচার করলে বাপু, এখুনি যেতে হবে আমায়।...

যেতে হবে!

শুনে আপত্তি আর উপরোধে মুখর হয়ে ওঠে সারা বাড়ি।...

সে কি কথা! তাও কি হয়! পাগল নাকি! ছাড়ছে কে? কিন্তু উপায় কি, বিকাশের যে ভীষণ জরুরী কাজ।...

সে কথা বিশ্বাস করছে কে?...নিশ্চয় কিছু হয়েছে। রাগ...অপছন্দ...কলহ...কে জানে কি? অগত্যা...আবার কল্পনা।

—তুমি একবার ভাল করে বলে দেখ না বড়বৌমা, হঠাৎ কি হল—

—ওমা কী আশ্চয্যি, হবে আবার কি? বললেন যে ভীষণ জরুবী কাজ!

—উঁহ্।...সকালে এসে কিচ্ছুটি বলল না! —তুমি একবার বলোই না ভাল করে।

—নাঃ, মার এক কথা! আপিসের কাজের ওপর আবার অনুরোধ উপরোধ চলে নাকি?—আমি দেখিগে বামুন-দিদি ভাত বাড়বার কি কতদূর করল।...

ছুটে এল শ্রীকান্ত—মার কথা শুনলে না কেন? তোমার বিকাশদাকে ভাল করে বলোগেনা একটু—

—কি মুস্কিল! শুনছ কাজ রয়েছে!

—আঃ তবু বলোগে-না একবার।

—কি যন্ত্রণা! তোমরা বলো না যত পারো।...

—আমাদের বলা হয়েছে। তোমার একবার বলা উচিত।...

—বাবা রে বাবা! একদা আমার বাপের বাড়ির পাড়ায় বাস করতো বলে কী যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছি আমি।...শুনবে না কিছু না, শুধু শুধু—

—রাগ দেখিয়ে আজই চলে না গেলে পারতে।...সবাই বলছে, আর একটা দিন অন্তত—

—সবাই বলছে? তুমি নয় তো?

—না। যাকগে—শোনো, কত ধার হয়েছে তোমার এবারে? কথার স্বর নয়, ফিসফিস একটা আওয়াজ শুধু।...

. —সাড়ে তিনশো।...কেন? পারবে নাকি কিছু দিতে?...

—উপায় কি!...এই নাও, ভরি তিনেক আছে বোধ হয় মফচেনটায়, যা হয়। আর কিছু নেই আমার।

—বাঁচালে কল্পনা।...কিন্তু...কি করে চালাচ্ছ? ধবা পড়ো না?

—এখনো ত পড়িনি।...

—যাক এই শেষ। ধন্যবাদ দাও তোমার ঈশ্বরকে।...চললাম।

—মাঝে মাঝে চিঠি দিলে পারো... না না আমাকে নয়, খবরদার। বাড়িতে আর কাউকে।

—শ্রীকান্তবাবুকে নাকি?

—তুমি সবই পাবো।... দাঁড়াও একটু—

বাতাসে পাতা নড়ার মত...মৃদু ফিসফিস শব্দ।

—কি?...আরে আরে, আবার নমস্কার কেন?...কি...কি বললে?

—কিছু বলিনি।...চলে যাচ্ছ?...হ্যাঁ বলছি... আবার কবে আসবে?

[১৩৫৩]

পদ্মলতার স্বপ্ন

স্বামীর ঘর হইতে এক-আধ বার বাপের বাড়ী আসিবার ইচ্ছাটা অস্বাভাবিক নয়, একাদিক্রমে এক জায়গায় থাকিতে থাকিতে হাঁপাইয়া ওঠে বলিয়াই বাপের বাড়ী আসিতে চায় মেয়েরা।

মুখ বদলাইতে বা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে।

বাপ না থাকিলে ভাইয়ের বাড়ীও আসে। কিন্তু বাপ ভাই কিছুই নাই বলিয়া কি পদ্মলতা জীবনে একবারও আর সোনাপলাশী গাঁয়ের মাটিতে পা দিবে না?. বাল্যকৈশোরের সমস্তটাই যার এইখানে কাটিয়াছে!

সেই কাটানো সুখে শান্তিতে গৌরবে না হোক, দুঃখে অপমানেই স্মৃতিরও একটা আকর্ষণ আছে বৈ কি! সেই কাটানো হয়তো নিজেকে একবার প্রতিষ্ঠা করিবার গোপন ইচ্ছা সাত বছর পরে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে পদ্মলতার।

যদু লাহিড়ীর বাড়ীর রাঁধুনী বামনীর মেয়ে 'পদি'কে হঠাৎ পদ্মলতার বেশে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াই সোনাপলাশীর বাসিন্দারা কতখানি অবাক হইবে, সেইটা দেখিবার একটা দুরন্ত ইচ্ছা। দশ বছর ধরিয়া দিনে রাত্রে তিলে তিলে এই ইচ্ছাটিকে লালন করিয়া আসিয়াছে পদ্মলতা, খুশির খেয়ালে প্রশ্রয় দিয়াছে। রঙে-রসে উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছে কয়েকটা দিনের ছবি।

যেন জীবনে এছাড়া আর কোথাও কিছুতেই সার্থকতা নাই পদ্মলতার; তাই অনেক চেষ্টায় আর অনেক সাধ্যসাধনায় স্বামীর কাছে এই ক'দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়া একবার সোনাপলাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছে।

তা আসাটা অসার্থক হয় নাই তাহার... অবাক্ হইতে আর বাকী নাই কাহারও।...এতদিন পরে হঠাৎ—আসার জন্য নয়, অবাক হইতেছে পদ্মলতার চালচলনে। অবাক কেন—একেবারে অভিভূত হইবার মত।

'পাতা-চাপা কপাল' বলিয়া যে প্রচলিত প্রবাদটা আছে, সেটা তবে পদ্মলতাব উপরই ফলিয়াছে? সন্দেহ করিবারও কিছু নাই, এটা যে যুদ্ধের বাজার! এ যুগের অভিধানে অসম্ভব বলিয়া কোন শব্দ নাই, সবই সম্ভব।...এ যুদ্ধের ঝোড়ো হাওয়ায় অনেকের কপালেবই পাতাব আবরণটুকু উড়িয়া গিয়াছে যে!

রাতারাতির মধ্যে ঘুঁটে-কুড়ানীকে রাজরানী হইতে দেখিলে নিশ্বাস ফেলিতে পারি; বিশ্বাস করিতে বাধে না। কাজেই যদু লাহিড়ীর রাঁধুনী বামনীর মেয়ে 'পদি' যে হঠাৎ 'সোন চিবাইয়া' খাইতে সুরু করিবে, এতেই বা আশ্চর্য্যের কি আছে?

এখন শুধু গদ্‌গদ স্নেহে অভিভূত হওয়ার দরকার।

পদ্মলতার গোবেচারা স্কুলমাস্টার ববটি যদি 'মিলিটারী কন্ট্রাক্টে'র সুবর্ণ-সিঁড়ি বাহিয়া পাকা স্বর্গ গড়িয়া তুলিতে পারে—তবে গ্রামের কয়টা অকালকুষ্মাণ্ড বখাটে ছেলের চাকরি যোগাড় করিয়া দিতে পারে না? না কী পদ্মলতা পারে না দু-একটা অনাথা অবীরার কন্যাদায় উদ্ধার করিয়া দিতে? যে পদ্মলতা স্টেশনে নামিতে না নামিতে দুই হাতে পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে আসিতেছে! দুই দিন আসিয়াছে—ইতিমধ্যে রতন গাড়োয়ান হইতে সুরু করিয়া কালীবাড়ীর ভটচায্যি পর্য্যন্ত পদ্মলতার গুণকীর্ত্তনে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।...এমন উঁচু নজর নাকি সংসারে দুর্লভ।

পদ্মলতার হাসিটি চমৎকার, কথাবার্তাগুলি মিষ্ট, ব্যবহার অতুলনীয়। ছেলেবেলা হইতেই যে গুণের তুলনা নাই তাহার, এ কথা কে না জানে?......রূপে গুণে আলো-করা এই মেয়েটিকে তখন গ্রামসুদ্ধ লোক তাই না অত ভালবাসিত? সেই পদ্মলতাকে লইয়া এখন যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে, এ আর বিচিত্র কি?

চার দিনের কড়ারে আসিয়া কোন বেলায় কাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে এই তো এক মস্ত সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে পদ্মলতার।......অনেক দিন পরে লাহিড়ী-বাড়ীটাও জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে। লোক-সমাগমের আর বিরাম নাই। অমায়িক হাস্যে এবং সারালো আর শাঁসালো আতিথ্যে পদ্মলতা তাহাদের আপ্যায়িত করিতেছে, যেন সে-ই এ বাড়ীর কর্ত্রী।

যদু লাহিড়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর 'বোলবোলাও' ঘুচিয়াছিল। পদ্মলতা আসিয়া বোল ফুটাইয়াছে।

আজও অনেক লোক উঠিয়া গেলে—প্রণামী বাবদ টাকা পাঁচটি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে সত্যবালা কণ্ঠে মধু ঢালিয়া হৃদ্যতায়-গলা ভঙ্গীতে পদ্মলতাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, কাল আমার ওখানেই দুটো মাছ-ভাত মুখে দিতে হবে মা পদ্মরাণী, ওজর শুনবো না।

—রায়-জেঠিমা যে আগে থেকে বলে গেছেন সতু পিসি—পদ্মলতার কণ্ঠস্বরও বিনয়ে ভাঙিয়া পড়ে—না গেলে, তিনি যে বড় দুঃখিত হবেন—

—ও মা আমার কে রে — রায় জেঠি! মুকুন্দ রায়ের ভাজটা বুঝি? ও সব নেমন্তন্নর

ছলে তোষামোদ করা বই তো নয়! যা বলবো হক্ কথা, হ্যাঁ!

—সতু পিসিমা যে কি বলেন, আমি আবার একটা মানুষ, তাই আবার খোসামোদ! ছি ছি। অনেক করে বলে গিয়েছেন, তাই বলছি—

—আর 'অনেক করে' বলতে বুঝি আমরা পারি না বাছা? আর তাও বলি, অনেক করেই বা বলতে হবে কেন মা, তুই কি আমাদের পর? সকলের আগে আমার জোর তা বলে রাখছি। তোর হয়তো মনে নেই—কিন্তু তোর মা আমায় কম ছেদ্দা-ভক্তি করতো? 'সতু ঠাকুরঝি বলতে অজ্ঞান হ'ত একেবারে। সে সব ভালোবাসার সম্বন্ধ কি আর বলে বোঝাবার মা?

কিন্তু বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতাই বা কি?

ষোলো বছর অবধি যে এ গাঁয়ের অন্নজল ভোগ করিয়া গিয়াছে পদ্মলতা।

অনেক অপমান অনেক লাঞ্ছনার অন্ন।

ভুলিয়া যাইবে কেন; সত্যবালার রসনার বিষকে কতটা 'ছেদ্দাভক্তি' করিয়া চলিত তাহার মা। এত শীঘ্র সে কথা ভুলিয়া যাইবার মত অত দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি কি তাহার?

মায়ের জন্য দুঃখ হয় না পদ্মলতার; শুধু মার কথা মনে পড়িলেই স্মৃতির সমুদ্র যেন তোলপাড় করিয়া ওঠে। হ্যাঁ...লাহিড়ীদের এই দালানেই...প্রচন্ড শীতের রাত—কনকনে হিমের হাওয়া যেন হাড়ের মধ্যে ছুঁচের মত বিঁধিতেছে...রোগা পাতলা একটি বিধবা...বারো মাস তাহার কাসি সারে না...খাটো একখানি থানের আঁচল গায়ে টানিয়া টানিয়া শীত নিবারণের ব্যর্থ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের আগামী দিনের নৈবেদ্য সাজাইবার গোছ করে, আর অনবরত কাসে।...খক খক সেই কাসির শব্দ এখনো যেন দালানের কার্নিশে কার্নিশে লাগিয়া আছে, শীতের রাত্রি গভীর হইয়া উঠিলেই বুঝি শোনা যাইবে সে শব্দ।...তাহারই পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ছোট্ট একটি মেয়ে...শীতবস্ত্র তাহারও পর্য্যাপ্ত নয়, যদু লাহিড়ীর নাতনীদের কারুর ফেলিয়া দেওয়া ছেঁড়া কুটি কুটি সেলাই-কন্টকিত একটি মোটা কাপড়ের ঘাগরা তাহার পরনে।

বুকটা যদি বা মায়ের পিঠ ঘেঁষিয়া বসার দরুণ একটু গরম হয়, ঘাড়ের কাছে যেন ছুরির ফলা ধারালো হইয়া আছে—বিঁধিতে বিঁধিতে এক সময় অসাড় করিয়া দেয়।...তখন আর শীত বোধ থাকে না, শুধু খানিকটা জায়গা জুড়িয়া চিন চিন করার মত একটা অস্বস্তির অনুভূতি।...বেশী কষ্ট হাত দুইখানা লইয়া...বরফের টুক্‌রার মত ছোট্ট হাত দুইখানা দিয়া মায়ের কাজের সাহায্য করিবার সাধ্যাতীত সাধনায় জল নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ আঙুলগুলো বাঁকিয়া আড়ষ্ট হইয়া যায়...তখন মায়েরই আবার ডবল খাটুনি। হ্যারিকেন লণ্ঠনের মাথায় আঁচল চাপিয়া চাপিয়া হাত-পা সেঁকিয়া দেয় মেয়ের...কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মৃদু ভর্ৎসনা করে।...বলে—কেন যে ছেলেমানুষ ঠান্ডায় ঘুরিয়া বেড়াস্। কত কাজ তাহার বাকি...রাঁধুনী বলিয়া শুধুই তো আর রান্নার কাজ সারিলেই ছুটি হয় না, অপোগণ্ড একটা মেয়েকে যে ভাত দিয়া পোষা হইতেছে সে কি অমনি? পরিচারিকার কাজও কতকটা না করিয়া দিলে?

...তাই মেয়েকে সে তাগিদ দেয় বিছানায় আশ্রয় লইতে। কিন্তু অন্ধকার ঘরের সেই বাহুল্যবর্জ্জিত নিরাবরণ শয্যাটুকু মনে করিলে হৃৎকম্প হয় বেচারার...তেলচিটে বালিশটায় কে যেন জল ঢালিয়া রাখিয়াছে...মার বুকের উত্তাপ ছাড়া সেখানে টিকিবে কেমন করিয়া?...তাছাড়া পৃথিবীর সমস্ত ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব কি দল বাঁধিয়া জমাট হইয়া নাই—সেই বালির আস্তরণ খসা হাড়পাঁজরা বার করা ঘরখানার ছম্‌ছমে কোণে কোণে?

যদু লাহিড়ীর রুগণা স্ত্রী নড়িয়া বসিতে পারে না, কিন্তু সারা সংসারের খবর যে কেমন

করিয়া তাহার নখদর্পণে থাকে, এই এক মজা।...প্রদীপের লোভ দেখাইয়া এক-আধ দিন মেয়েকে বিছানায় শোওয়াইয়া আসিলেই দোতলার জানলা হইতে লাহিড়ী-গিন্নীর ভাঙা-ভাঙা বিরক্ত কণ্ঠের আওয়াজ আসে! —ওগো নবাবের মেয়ে, মেয়েব সোহাগটা একটু কম কোরো। পিদ্দিপের তেল অমনি আসে না।...নিজেদের আক্কেল থাকলে আর আমাব বলে মুখনষ্ট করতে হয় না।...দুটো-দুটো মানুষকে ভাত-কাপড় দিয়ে পোষা বড় সহজ কিনা! ভাবি তো সংসারের কাজ, তাই বাত দুপুর অবধি মায়ে-ঝিয়ে ঘুরঘুর। এই যে তুমি আপনার সুবিধের খাতিরে রাত দুপুরে কাজ গোছাও—বামুন মেয়ে, এতে মাস গেলে কতটা কেবোসিন পোড়ে আমার—সে হিসেব কোনদিন করেছ বাছা? পরের পয়সায় দরদ হবে কেন? সেই যে বলে না— 'বামুনের ভাতে আছি, বালামেব দর জানি না', তোমাদেব হয়েছে তাই।...আমিও যেমন অক্ষম হয়েছি, তাই তোমার মতন বেইমানকে পুষছি।...

বলিতে আরম্ভ করিলে আব থামিতে চায না।

প্রদীপ ততক্ষণে নির্ব্বাণ লাভ কবিযাছে। ভূত-প্রেতের ভয় যতই দুর্ব্বার হোক, লাহিডী-গিন্নির কাছে নয়।...আবার বর্ষাব দিনে জল ছপছপ করিতে করিতে হাঁটু-ভোর কাদা মাখিয়া মাযের সঙ্গে দীঘির ঘাটে আনাগোনার স্মৃতিটা কেমন যেন সুখ-দুঃখ জড়ানো। এক এক দিন ভারি মজা লাগিত, কিন্তু মায়ের কাসিটা বাড়িলেই মুস্কিল, সেদিন মনে হয় সেই ছেঁড়া বিছানাটাতে মায়ে-ঝিয়ে সারা দিনবাত্রি শুইযা কাটায়, ভাত খাইবাব প্রয়োজন নাই তাহার, নাই বা খাইল দুই-চারি দিন?...কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিলেই প্রযোজন মেটে না— অতটুকু মেয়েকেও সে কথা বুঝাইয়া ছাড়ে।...

এমনি আবেষ্টনের মাঝখানে আবার একটা দৃশ্য মনে পড়ে...এই বাড়ী এই দালান...কিন্তু মানুষ দুইটা যেন আব কেউ...তামাটে বং, সরু সরু হাত-পা, ছেঁড়া ফ্রক পবা সেই মেয়েটার বদলে একটি নবযৌবনা স্বাস্থ্যবতী কিশোরী...একখানা শাড়িতে লজ্জা নিবারণ হয় না...শীত নিবারণের চাইতে যেন অধিক কষ্টকর হাতে বহরে ছোট সেই শাড়িখানা লইয়া লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টাটা। তবু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে সমস্ত সংসারেব কাজ সে-ই করে। শীর্ণা বিধবাটির উপর সস্নেহ অনুযোগের আর অন্ত নাই। মাকে সকাল সকাল ঘুম পাড়াইবার জন্য বকুনি...হাসে আর বলে—একলা শুতে যেতে চাও না কেন শুনি? ভয় করে? ভূতে খেয়ে ফেলবে?...

মা কেমন করিয়া বুঝায় এই নবযৌবনা মেয়েকে তাহার ভূতের চাইতেও ভয় বেশী।...এমনিতেই তো অনাথা বিধবার মেয়ের বয়স বাড়া বেয়াদবি, তার উপর আবার রূপ! মেয়ে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় আর মা মুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া দেখে—হ্যাঁ, পদ্ম নাম রাখা সার্থক বটে, দুইখানি পায়েই তো ফুটিয়া আছে একজোড়া পদ্ম। কিন্তু এত বাড়ন্ত গড়ন কেন? অবহেলার অন্নে এত পুষ্টি?

যদু লাহিড়ীর স্ত্রী রাগ করে আর না করে! তাহার নাতনী দুইটা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার, কালো চামচিকের মত, আর চৌদ্দ বছর বয়স না হইতেই এ মেয়ের দিকে তাকানো যায় না। শুনিতে কটু হোক তবু সে ভাল পরামর্শই দেয় বৈ কি, বলে—ওলো পদি, ভাত একটু কম খাস দিকিন। পরের মাল বলে যত ইচ্ছে খাসনি। দিন দিন যে হাতি হচ্ছিস, দেখতে দেখতে তোর মা মাগীর গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে!

সমস্ত অপমান হজম করিয়া 'পদি' কষ্টে হাসিয়া বলে—রক্ত কি আর মার গায়ে আছে দিদিমা? সবই জল। অতঃপর এত বড় মুখরা মেয়ের বুকের পাটা ও আসপদ্দার নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া না উঠিলে লাহিড়ী-গিন্নীকেই বরং দোষ দেওয়া যাইত।

কিন্তু শুধু তো লাহিড়ী-গিন্নীই নয়, পাড়াসুদ্ধ সকলেই মুখের সুখ করিয়া লইতে ছাড়ে না।

...'পদি'র রূপটা চক্ষুঃশূল, গুণটা বিরক্তিকর, বয়সটা গাত্রদাহী।

..'পদি'র চাল-চলন সন্দেহজনক—স্বভাবটাই বা ..কিন্তু থাক্ সে কথা—'পদি'র মৃত্যু ঘটিয়াছে। 'পদ্মলতা'র গুণগ্রাহী হইতে কাহারও আপত্তি নাই।

যদু লাহিড়ীর স্ত্রী ছানি-পড়া চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি মেলিয়া হাঁকিয়া বলে—মেয়ে তো নয়, লক্ষ্মীপিরতিমে ছোট্টবেলা থেকে তো দেখছি, গুণেব সীমা নেই। আহা মা মাগীর কপাল, দেখতে পেলো না। মা নেই, কিন্তু আমবা তো মরিনি দিদি, বছর বছর আসিস একবার করে, একেবাবে ভুলে থাকিস নি। আমার কম্‌লি বিম্‌লির সঙ্গে তুই কি তফাৎ?

মনে জানে কিছুটা তফাৎ আছে। কমলা বিমলা কখনো 'পোড়া মুড়ি' দিয়া উদ্দেশ করে দিদিমার, আর পাতানো দিদিমার তীর্থ-খরচ বাবদ এই মাত্র নগদ তিনশো টাকা গণিয়া দিয়াছে পদ্মলতা।

রায়-বাড়ী নিমন্ত্রণ আসা একটা স্মরণীয় ঘটনা।

আজকেব নয়, পূর্ব্ব-ইতিহাসের পাতায়। মুকুন্দ বায়ের মার ব্রত উদ্‌যাপন, কি ওই রকম একটা ব্যাপার। লাহিড়ী-বাড়ীর সকলে নিমন্ত্রণে আসিয়াছে...তাই 'পদি'র মা-ও আসিয়াছে খাটিতে; ইহারই মধ্যে বোধ করি ব্রাহ্মণকন্যা হিসাবেই পরিবেশনকারী একটা ছেলে পদিকেও নিমন্ত্রিতাদের দলে বসাইয়া দিয়াছিল। ছেলেটা আর কেউ নয়, সান্যাল-বাড়ীর মুরারি। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই পাড়ার লোকে ঠারেঠোবে ইসারায় ইঙ্গিতে অনেক অপবাদ দিয়াছে পদিকে—স্পষ্টভাষিণী সত্যবালা তো একদিন পদির মাকে চোখের জলে নাকের জলে করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। ...ঘাটে পথে দেখা হইয়া গেলেই যদি দুইটা কাঁচা বয়সের ছেলে-মেয়ে হাসি-গল্প সুরু করে, তাহাদের তবে আর বাকি কি আছে?

নেহাৎ সত্যবালার চোখে পড়িয়াছে তাই রক্ষে, অপর কারো চোখে পড়িলে ও মেয়ের বিয়ে দেওয়া দায় হইত কি না বলুক সকলে!

...তা নেহাৎ দায় হয় নাই! সেই মাসেই অনেক হিতৈষীদের সাহায্যে 'পদি'র বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। ম্যাট্রিক পাশ ছেলে...কোন্ এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে মাইনার স্কুলে মাস্টারী করে, গোটা তিরিশ মাহিনা পায়, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু যাক্ সে কথা, 'পদি'র বিয়ের কথা এখানে অবান্তর। রায়-বাড়ীর নিমন্ত্রণের স্মৃতিটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে... পংক্তিভোজনে বসিতে দেওয়া হয় নাই তাহাকে, হাত ধরিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল...ইসারা ইঙ্গিত হাসাহাসির চাপা ঝড় বহিতে বহিতে মুকুন্দ রায়ের বড় মেয়ে নিভাননী হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল।...তা' যুক্তিটা সে মন্দ দেয় নাই। সত্যই তো, রাঁধুনী বামনীর মেয়ে যদি ব্রাহ্মণকন্যার সম্মান পাইতে পারে—তবে আরশোলার 'পক্ষী' খেতাব গৌরব পাইতে বাধা কি?

সিঁড়ি দিয়ে দোতলার দালানে উঠিতে উঠিতে বছর দশেক আগের সেই ছবিটা মনে পড়িতেছিল...চমক ভাঙিল মুকুন্দ রায়ের পুত্রবধূর সহাস্য আপ্যায়নে,—"এসো ঠাকুরঝি, তবু যা হোক ভাজ বলে মনে পড়েছে—এসে পর্য্যন্ত তো একবারও এলে না!"

—কি করি বৌদি, এই তো তিন দিন এসেছি, খালি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কারুর সঙ্গেই তো ভাল করে দেখা হ'ল না, অথচ মোটে চারটি দিনের ছুটি।

—বোকো না বাপু, এত দিন পরে এসে চার দিন মোটে থাকা কি? কর্ত্তাটিকে লিখে

পাঠাও, তিনি একলা অনেক দিন ভোগ করেছেন এবার আমরা কিছু দিন করি। তাছাড়া তিনি ব্যবসাদার মানুষ, নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত, অত 'বৌ বৌ' বাতিক কেন?

—দেখ না, ওই জ্বালাতেই তো আসতে পাই না। ওই এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ।

স্মিত একটু হাসির রেখা পদ্মর অধরের কোণে আঁকাই থাকে, ঐশ্বর্য্য আর প্রাচুর্য্যের ক্ষীণ একটু ইসারার মত—

কিছুক্ষণ উসখুস করার পরই আসল কথাটা পাড়ে বৌ, বলে—গয়না বুঝি গায়ে বেশী রাখতে পারো না ঠাকুরঝি?

প্রশ্নটা জটিলই বটে, পদ্মলতার অলঙ্কারের স্বল্পতা ঠিক পদমর্য্যাদার অনুরূপ নয়। কথাটা যে এই তিনদিনে কেন ওঠে নাই এই আশ্চর্য্য! রৌপ্যের উজ্জ্বল আভায় সোনার অভাবটা বোধ করি তেমন চোখে পড়ে নাই লোকের—রূপার ওজনকে লঘু করিয়া আনিয়া ফেলিলেই যে সোনায় দাঁড় করানো যায়, এ কথা আর জানে না কে?

পদ্মলতা পরিতৃপ্তির একটু স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলে—এই দেখ না, তোমার নন্দাই গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে দুর করে দিয়েছে।

—মরণ আর কি, দুর্গা! দুর্গা! কথার শ্রী দেখ।

—তা কি আর বলবো ভাই, কর্ত্তার ধারণা, পাড়াগাঁয়ে শুধু চোর ডাকাত বদমায়েসের আড্ডা, গায়ে গয়না দেখলেই বৌটিকে কেউ চুরি করে পালাবে। বলেন—"টাকা তুমি যত খুশি নাও, কিন্তু গায়ে গয়না? একখানিও না—" নেহাৎ সেই এয়োত রক্ষে হিসাবে হাতে গলায় কানে একটু রাখা। হ্যাঁ কি বলছিলাম, গিরি তাঁতিনী এখনো আছে বৌদি?

—আছে বৈ কি, কাপড়ের দাম চড়ে যেতে ফেঁপে উঠলো একেবারে।

—দাম চড়ুকগে যাক্, ভাল পাড়েব খান পনের-কুড়ি শাড়ি পাবো?

—খান প-নে-র-কুড়ি? কত পরবে একসঙ্গে?

বৌ চক্ষু বিস্ফারিত করে।

—মানে আর কি, নিজের জন্যে নয়। এলাম তোমাদের কাছে এত দিন পরে, একখানা করে নমস্কারী দেব না?

—এই দেশসুদ্ধ সক্কলকে!

—তোমাদের আশীর্ব্বাদে বৌদি!

ইহার পর আর অলঙ্কারের স্বল্পতায় সন্দিহান হইবার কিছু থাকিতে পারে নাকি? মুকুন্দ রায়ের বড় ভাজ কাছে বসাইয়া অনেক যত্নে খাওয়ান ও এত সামান্য সময়ের কড়ারে বাপের বাড়ীর দেশে বেড়াইতে আসার জন্য অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

যাক্ পদ্মলতার আর ক্ষোভ নাই।

যদু লাহিড়ীর রাঁধুনীর মেয়ে 'পদি'র মৃত্যু ঘটাইয়া সোনাপলাশী গ্রামে পদ্মলতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গেল সে। শুধু—মুরারি।

একটু যেন খোঁচ্ থাকিয়া যায় না?

যে মুরারি একদিন উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল—'তোর কি ধারণা আমি তোকে বিয়ে করবো? ওই আনন্দেই থাক্। আমার মা তাহলে আর কুলো নিয়ে বরণ করতে আসবে না, আমাকে সুদ্ধু কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করে দেবে।'

কথায় কথায় মুরারির খোঁজটা লইতে এখন আর লজ্জা নাই।

পাড়ার আর পাঁচটা খবরের মতই প্রশ্ন করা যায়। —হ্যাঁগো রায়-জেঠিমা, মুরারিদার কি খবর? দেশেই আছে তো, না কি?

রায়-জেঠি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন—হায় হায়, সে ছোঁড়ার কথা আর বলিসনে মা! রোগে ভুগে ভুগে তন্নাস্তি, এক পয়সা উপায় করবার ক্ষ্যামতা নেই, বাড়ীখানা সুদ্ধু বাঁধা দিয়ে বসে আছে। খালি লম্বা লম্বা বুলি। বৌ-ছেলেগুলোর হাড়ির হাল একেবারে।

লম্বা বুলি তবে এখনো আছে? বুলি বন্ধ করিবার ঔষধটা একবার প্রয়োগ করিয়া দেখিবে নাকি পদ্মলতা?

বার্লির বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া বিকৃত মুখে মুরারি স্ত্রীর কাছে একটা লবঙ্গের আবেদন জানাইতে যাইবে, উঠানের আগড় ঠেলিয়া ঢুকিল পদ্মলতা। মুরারি বিকৃত মুখে হাসি ফুটাইবার পূর্বেই পদ্মলতা সবিস্ময়ে কহিল—কি ব্যাপার, খাচ্ছিলে কি? সাবু?

মুরারি দুই হাত উল্টাইয়া পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল—হা গোবিন্দ! সাবু! সে তো অতীতের স্বপ্ন। বার্লি—বিশুদ্ধ 'মণ্ডলেব বার্লি'।

—অসুখ কি?

—অসুখ? অসুখ কি একটা? দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা মহাজনভীতি, দাম্পত্যকলহ, পিলে-লিভার, জ্বর, ডিসপেপ্‌সিয়া।

পদ্মলতা একটু ধমকের স্বরে বলিয়া ওঠে, থাক হয়েছে, আর তালিকা বাড়িয়ে কাজ নেই, বৌ কোথা?

—আছে কোথাও কাছেপিঠে—

—বড়দা, বড় বৌদি?

—তাঁরা? তাঁরা তো অনেক দিন দেশ ছাড়া, মা মারা যাওয়ার পর থেকেই।

—সেই থেকেই বুঝি তোমার এই হাল!

মুরারি একবার নিজের অস্থিসার দেহের পানে তাকাইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলে, কেন, হালটা কি মন্দ? সবাই তো আর আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় না?

পদ্মলতা তীব্র স্বরে কহিল—কলাগাছ হয় না বটে, বেতগাছ হয় দেখছি।

—দুঃখের বিষয়, বড়লোকের মোটা চামড়ায় বেতের ঘা বসে না! বলিয়া আর একবার হাসিয়া ওঠে মুরারি।

পরিহাসটা গায়ে না মাখিয়া পদ্মলতা বসিয়া পড়িয়া কহিল, যাক্, বসতে তো আর বলবে না—মানী লোক, নিজেই বসি।-কই গো বাড়ীর গিন্নী, সাড়া নেই কেন?

বাড়ীর গিন্নী তখন আপনার হতশ্রী বেশভূষা সামলাইতে ব্যস্ত। সত্যই হাড়ির হালই বটে, চট্ করিয়া মানুষের সামনে বেরোনো দায়। ছেলেমেয়ে দুইটিও বাবা আদমের শিষ্য হইয়া আছে, কিছু ব্যবস্থার দরকার।

ব্যাপারটা পদ্মলতাও বুঝিতে পারে, তাই আর ডাকাডাকি না করিয়া মুরারির সঙ্গেই গল্প চালায়।

—বলি কথাগুলি তো আগের মতনই লম্বা লম্বা আছে দেখছি, কিন্তু সংসারের এ কি অবস্থা করে রেখেছ? বাড়ীর চেহারা দেখলে হয়ে আসছে যে—

—বাড়ী? ওঃ, পরের বাড়ীর ওপর দরদ করে কি হবে?

পদ্মলতা অজ্ঞতার ভান করিয়া বলে—পরের বাড়ী! পরের বাড়ী মানে? মানে অতি সোজা। আকণ্ঠ ঋণ, ভিটেমাটি বন্ধক। কেন, এমন মুখরোচক খবরটা এখনো পর্য্যন্ত শুনিসনি?

—কী সর্ব্বনাশ, বাড়ী বাঁধা দিয়েছ? বল কি! ছিঃ ছিঃ, পূর্ব্বপুরুষের নামটা ডোবালে।

পদ্মলতা যেন দুঃখে শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।

মুরারি ঈষৎ হাসিয়া বলে—যাই ভাগ্যি ডুবিয়েছি তাই না একটু মুরুব্বিয়ানা করে নেবার সুযোগ পেলি? কিন্তু তোর ভারিক্কী চাল-চলন দেখে ভাবি হাসি পাচ্ছে পদি! কি যেন বলেছিল মুকুন্দ রায়ের মেয়ে "আরশোলাও পাখী হল"। বেশ তুলনাটা, না?

পদ্মলতা বুঝিতে পারে এটা ইচ্ছাকৃত অপমান, করা বোধ করি তাহারই অপমানের পাল্টা জবাব। হয়তো এমনিই হয়, মধুর সম্বন্ধ তেতো হইয়া উঠিলে বুঝি এতটাই তেতো হয়। উভয় পক্ষ শুধু অপর পক্ষকে অপদস্থ করিবার নেশায় মাতিয়া উঠে।

কিন্তু না, পদ্মলতার রাগিলে চলিবে না।

হাসিয়া বলে—তোমার স্মৃতিশক্তিটা তো বেশ ধারালো মুরারিদা, তবু ভাল যে দেশের একজনও 'পদি'কে মনে রেখেছে। এসে অবধি দেখছি কি না 'পদ্ম' 'পদ্ম' করে সবাই অস্থির। যাক্ তোমাদের সব খবর বল।

—আমাদের আবার খবর! হায় মধুসুধন! বলে, ভুতের আবার জন্মদিন! বরং তোদেরই খবর শোনবার জিনিস। শুনলাম নাকি খুব বড়লোক হয়েছিস, দু'হাতে টাকাবৃষ্টি করছিস? ভাল! ভাল!

—এখনো তো আমার মুখ দেখনি, খবর জানলে কি করে?

—ও বাবা! এই তিনদিন ধরে তো তোমার মহিমার কীর্ত্তনে কান, ক্ষয়ে গেল। বারোয়ারী পূজোর চাঁদা, ইস্কুলের চাঁদা, টিউবওয়েলের চাঁদা, কালীর দালান সাবানোর চাঁদা, চাঁদার হরির লুঠ একেবারে। তোর বোকামি দেখে দুঃখ হচ্ছে। যাক্, নামটাও দামী জিনিস।

পদ্মলতা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলে—পোড়া কপাল! ভারি তো দিতে পেরেছি তার আবার নাম। মনের সাধ তো কিছুই মিটলো না, তাড়াতাড়িতে তো বেশী কিছু আনতে পারিনি, নিজের কাছে হাজারকয়েক ছিল সেইটে নিলাম-আর কর্ত্তা আটশো না কত টাকা হাত-খরচ করতে দিয়েছিলেন, এই! আর খুচরো দু'একশো যদি থাকে। এর আবার নাম-ধাম। ভূতি পিসিমার নাতনীটার টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না শুনে অবধি হাতটা যেন নিসপিস করছে, গিয়েই পাঠাতে হবে আর কি।

—ক'লাখ করেছে রে অবিনাশ? কিসের কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল? চাল? গম? গরু-ছাগল? —না মেয়েমানুষ?

মুরারির শীর্ণ নাকের আগাটা যেন ঘৃণায় ব্যাঙ্গে আর বাঁকিয়া যায়, ঠোঁটের কোণে ধারালো হইয়া ওঠে তীক্ষ্ণ হাসি।

কিন্তু পদ্মলতা তো পরাজিত হইতে আসে নাই, আসিয়াছে জয় করিতে। তাই সরলতার ভান করিয়া বলে, কে জানে মশাই! তুমিও যেমন, কিসের ব্যবসা করছে, ও-সব জানবার কি দরকার আমার? ইচ্ছে মতন টাকা পেলেই হ'ল। কিন্তু তোমার জন্য তো মরেও স্বস্তি হবে না। বাড়ীখানা সুদ্ধু বাঁধা দিয়ে খেয়েছ, এর পর উদ্ধার করতে না পারলে? কত টাকায় বাঁধা আছে?

—পাঁচশো। কেন, তুই দিবি না কি?

—দেবই তো, এই সামান্য টাকা ক'টার জন্যে ভদ্রাসনটুকু যাবে?

পদ্মলতা কোল-আঁচলের গিঁট খুলিতে প্রবৃত্ত হয়।

—পদি কি আজকাল পাঁচ-সাতশো হাজার পকেটে করেই বেড়াস্ নাকি?

—কি করি মুরারিদা, লাহিড়ী দিদিমা এই ক'টার দায়িত্ব নিতেও নারাজ। যা এনেছি আঁচলেই আছে। যাকগে, টাকা তো খরচ করবার জন্যেই! যাবার ভাড়াটা থাকলেই হ'ল।

গণিয়া গণিয়া পাঁচখানি বড নোট মাটিতে নামাইয়া রাখিতেই মুরারি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ওঠে। ভরাট গলা বলে- -দেখ্ 'পদি', আবশোলা পাখী হওয়া ভাল, তবে একেবারে গরুড পাখী হতে চেষ্টা করিস্নি।

—সে তুমি আমায যত অপমানই করো, টাকা তোমায নিতেই হবে বাপু। এই সামান্য কটা টাকাব জন্য তোমায ভিটে ছাডা হতে দেব না আমি।

—কিন্তু তোর টাকা আমি নেব কেন? খুব টাকাব মানুষ হয়েছিস্ তুই। টাকার গুমোব দেখিয়ে ওই ভুতি পিসিদের মাথাগুলো কিনে রাখ্‌গে যা। আমার কাছে চাল ফলাতে আসিস্নি।

বলিয়া নোট কয়খানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিযা মুরারি হঠাং অনুপস্থিতা স্ত্রীর উদ্দেশে খিঁচাইয়া ওঠে, সেই থেকে লবঙ্গ চাইছি তাব কি হ'ল? মবে গিয়েছো নাকি?

মুরারির বৌ বোধ করি এতক্ষণে বেশবাসে যথাসম্ভব ভদ্রতা আনিয়া বাহির হইতেছিল— -মাঝখানে টাকার ব্যাপার উঠিতেই নেপথ্যে আশ্রয লইযা ছিল। স্বামীব আহ্বানে সহসা রঙ্গমঞ্চে উদয হইয়া বিবক্ত কণ্ঠে কহিল, মরে গেলে তো হাড জুডোত, তোমাব হাত থেকে বেহাই পেতাম। এমন ভাগ্যি কি হবে আমার। ঠাকুবঝি, আপনি এসেছেন অবধি দেখছেন তো কথাবার্ত্তাব শ্রী?

—দেখছি বৈ কি। মাথা খাবাপ হযে গেছে লোকটাব। এই নোট ক'খানা তোলো তো বৌদি, বসত-বাডীখানা তো ছাডাতে হবে।

বৌ অবশ্য আগাগোডাই শুনিযাছে, তবু লুব্ধদৃষ্টিতে একবাব চাহিয়া বিবস কণ্ঠে কহিল—ওকে আবার মানুষে টাকা ধার দেয ঠাকুরঝি? ইহ জীবনে আর শোধ দিতে পারবে?

পাগল। শোধের কথা কিসের? তোমার বিয়েতে তো আমি যৌতুক দিইনি? তাই ধরো সেটা না হয় দিলাম নাও তোলো। কই ছেলেমেয়েদেব কোন লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছ? একবার দেখলাম না।

বৌ ছোঁ মারিয়া নোট কয়খানা তুলিয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে উৎফুল্ল স্বরে ডাক দেয়—ওরে পুষ্প, খোকা তোদের পিসিমাকে প্রণাম কর্ এসে।

মুরারি জ্বলন্ত চাহনির সঙ্গে স্ত্রীব সহিত ইসাবা ইঙ্গিতেব চেষ্টায় ব্যথা হইয়া রুক্ষ-কণ্ঠে কহিল—টাকা ফিরিযে দাও ছোট বৌ, ও আমি নিতে পাববো না।

কিন্তু আঁচলে-বাঁধা জিনিস আবার আঁচলছাড়া করিবে, এত বড় মুর্খ ছোট বৌ নয়। তাই আহ্লাদের ভঙ্গীতে বলে—হ্যাঁ দেব বই কি, আজ বাদে কাল যখন ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে? ফিরিয়ে দেব! কেন ঠাকুরঝি কি আমাদের পর না কি? বলুন না ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি ততক্ষণে পুষ্পের দুই হাতে দুইটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া ছোট খোকাব হাতের মুঠা খুঁজিতেছে।

না, সত্য সত্য আর কোন ক্ষোভ, কোন অশান্তি নাই পদ্মলতার। সারা জীবনে আর কোন কিছু কামনা করিবার নাই। চবম সার্থকতার পরম সুখকে দুই হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়াছে সে!

ঠিক এই সময়—স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার পায়রার খোপের মত ছোট্ট ঘরখানায় নড়বড়ে তক্তপোশের উপর উপুড় হইয়া অবিনাশ চিঠি লিখিতেছিল! ...চারদিনের বিরহেই এত দীর্ঘপত্র?...কিন্তু দীর্ঘপত্র না হইলে মনের সমস্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া বেচারা? পরদিনই বৌ আসিবে জানিয়াও চিঠি না লিখিয়া পারে না।

লিখিতেছিল—পদ্ম, আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। পাটনায় যে চাকরীটার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম—এ জীবনে আর সেটা হইবার সম্ভাবনা নাই।...ভাবিয়াছিলাম, ওই চাকরীটা জোগাড় করিতে পারিলে বাকী জীবনটা এক রকম শান্তিতে কাটাইতে পারিব, কিন্তু বিধাতা বিরূপ।...সিকিউরিটি দিবার জন্য ভিটেমাটি জমিজমা যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া যে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সে টাকা খোয়া গিয়াছে।...তুমি জানো, চোর প্রভৃতির সন্দেহের ভয়ে বাক্সে না রাখিয়া লেপের থলির ভিতর টাকার থলিটা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও যে চোরের দৃষ্টি পড়িল কিরূপে এই আশ্চর্য্য!

...আমার বিশ্বাস, এ জ্ঞাতি-শত্রুর কাজ...কাহাকে কি বলিব...আমি আজ সর্ব্বস্বান্ত। ভবিষ্যতে আর আশার আলো মাত্র দেখিতেছি না কি জানি এ বোধ করি ভদ্রাসন নষ্ট করবার দণ্ড।...অনুতাপ হইতেছে, কেন এ সময় তোমাকে পাঠাইতে রাজী হইলাম। তুমি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকিলে আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। যাই হোক, পত্রপাঠ চলিয়া আসার ব্যবস্থা করো। আমার আর যাইবার সামর্থ্য নাই...তোমার কাছে মুখ দেখাইতেও লজ্জা বোধ হইতেছে।......

[১৩৫৩]

নিরুপমা

সুদীর্ঘ টেলিগ্রামখানা এই লইয়া তিনবার পড়িতে পড়িতে শিবনাথ বাড়ির ভেতর আসিয়া অমিয়াকে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, মা কোথায়?

অমিয়া বাঁকা হাসি চাপিয়া উত্তর দিল—মা আর এসময় কোথায় থাকেন পূজোর ঘর ছাড়া?

কথাটা মিথ্যা নয়, এখন বেলা আটটা মাত্র—দশটা সাড়ে দশটার আগে নিরুপমা পূজার ঘর হইতে বাহির হন না...শিবনাথ পত্নীর চাপা হাসিটা লক্ষ্য করে না, তেমনি ব্যস্তভাবে বলে—ও, পূজোর ঘরে? মুস্কিল হ'ল তো—ভয়ানক দরকার ছিল যে। এখন নামাবেন না বুঝি?

অমিয়া ঠোঁটের কোণে তেমনি হাসি বজায় রাখিয়া বলে—ডেকে দেখতে পারো। তবে দরকারটা এমন কি ভয়ানক? ঈশ্বর চিন্তার চেয়ে বড়ো নয় নিশ্চয়ই?

শিবনাথ এবার টেলিগ্রামখানা হইতে চোখ তুলিয়া এক সেকেণ্ড অমিয়ার মুখের পানে তাকাইয়া দেখে, এক সেকেণ্ডের বেশি নয়, পরক্ষণেই পাশ কাটাইয়া তিনতলায় উঠিয়া যায়। মাকেই যে ডাকিতে যাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, কারণ তিনতলায় পূজার ঘর ভিন্ন আর কিছুই নাই।

অমিয়া একটু অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে। স্বামীর এরকম ব্যবহারটা নূতন। এই নীরব তিরস্কারের ভঙ্গীটা।

তা'ছাড়া নিরুপমার পূজার ঘরে গিয়া হানা দিবার দুঃসাহস তো কখনো কাহারও হয় না। অন্তত মনে পড়ে না।

আশ্চর্য! টেলিগ্রামের কথাটা জানাই হইল না, কে দিল এতো বড়ো টেলিগ্রাম? 'ভয়ানক দরকারি' কথাটা বোধ করি ওর মধ্যেই আছে। তা'—শিবনাথের কি মাকে জানাইবার আগে তথ্যটা স্ত্রীকে জানাইয়া ফেলিলে জাত যাইত? অমিয়া কি জানে বাবু চটিয়া মটিয়া লাল হইবেন? তবে নয় আগেই আশঙ্কার ভাণ দেখাইয়া তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিত।..

শোকসংবাদ নিশ্চয়ই নয়।

এমন প্রিয় আত্মীয়ই বা শিবনাথেব কে আছে যার মৃত্যুসংবাদ আসিবে 'তার' বাহিয়া। চিঠির মতো এতো দীর্ঘই বা হইবে কেন সে 'তাব?' নিজের বাপের বাড়ির দিক হইতে অবশ্য নিশ্চিন্ত আছে অমিয়া। তার পিতৃগৃহের দূরত্বটা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, ডাকবিভাগের শরণ লইবার প্রয়োজন হয় না।

কোন্ সংবাদ? কাহার সংবাদ? যার জন্য অসময়ে নিরুপমাব ধ্যানভঙ্গ করানোর মতো অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়!

অমিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, শিবনাথ উঠিয়া যায় তিনতলায়, কিন্তু উঠিয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়া ছাড়া গতি থাকে না তার। অমিয়ার প্রচ্ছন্ন হাসিটাই একরকম ঠেলিয়া আনিযাছে তাহাকে। বর্তমান মনের অবস্থায বড়ো কটু ঠেকিল হাসিটা। কিন্তু এখন এই বন্ধ দরজাব কপাট খোলাইবার সাহস জোগাইবে কে!

অথচ এমন বোকার মতো দাঁডাইযা থাকাব অর্থও হয না, সময়ও নাই।

শিবনাথ একটি খ্যাতনামা কলেজের ইংরাজীব অধ্যাপক, রাশভারি বলিয়া অখ্যাতিও আছে ছাত্রমহলে, কিন্তু মাযের কাছে সে বালকমাত্র।

পনের বছর বয়সে 'মা' বলিতে যে ভয়ভক্তি ছিল, পঁয়ত্রিশের কোঠায় আসিয়া তার একতিলও কমে নাই। ...হয়তো অমিয়ার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গর মূল উৎস এইখানেই।

মিনিট তিন চার চুপচাপ কাটে, টেলিগ্রামখানা আরো বার দুই চোখ বুলানো হয়, অবশেষে নিতান্তই মরীয়া হইয়া ডাক দিতে হয় শিবনাথকে! মা শুনছো? মা—একটা বিশেষ দরকাব ছিল।

ঘরের ভিতর নিরুপমা বোধ করি প্রথমবারটা নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, কিন্তু দ্বিতীয়বারের ডাকটা স্পষ্ট নির্ভুল। ...ঠাকুরের কাছে ক্ষমা-টমা চাহিয়া আরো মিনিটকতক পরে নিরুপমা দরজা খুলিয়া বাহির হন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—ব্যাপার কি শিবনাথ?

—ব্যাপারটা—মানে ব্যাপারটা ইয়ে—একটু ভাববার হচ্ছে। বাবা 'তার' করেছেন—এখানে আসছেন।

একনিশ্বাসে বলিয়া লয় শিবনাথ। বলিয়া বাঁচে।

নিরুপমা কি কানে কমই শুনিতেছেন আজকাল? তাই তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করিয়া ওঠেন—কে আসছে?

ভীষণ একটা অবিশ্বাস্য কিছু শুনিলে যেমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে মানুষ, তেমনি তীক্ষ্ণ শোনায় নিরুপমার কণ্ঠস্বর।

কিন্তু শিবনাথ এতোক্ষণে ভিতরে ভিতরে বল সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে, তাই মায়ের কথার উত্তরে একটু দৃঢ়স্বরে বলে—বললাম যে বাবা আসছেন। এই যে 'তার' করেছেন। 'শরীর'

ভাল নয়—সকলকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে' —এই সব আর কি।

নিরুপমা এবার শান্তকণ্ঠে বলেন, ওঃ পাগলের খেয়াল! তা তুমিও 'তারে'ই জবাব দিয়ে দাও বাবা—সেটা সম্ভব নয়।

—জবাব দিয়ে দেব? জবাব দেবার আর সময় কোথা? স্টেশনে গাড়ি পাঠাবার সময় হলো যে। পরশুর তারিখ রয়েছে টেলিগ্রামে, অথচ আজ এসে পৌঁছাল,—যা অবস্থা হয়েছে আজকাল পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের।

ডাকবিভাগের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আলোচনার ধারাটা সহজ করিয়া লইবার চেষ্টা করে শিবনাথ। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, যেন হামেশাই আসিয়া থাকেন শক্তিনাথ, শুধু এবার টেলিগ্রামটা বিলম্বে আসার দরুণই যা কিছু অসুবিধা।

কিন্তু নিরুপমা সহজ হইবেন কোন্ শক্তিতে?

বত্রিশ বছরের অদেখা স্বামীকে বিনা দ্বিধায় সহজভাবে গ্রহণ করিয়া লওয়া এতো সহজ নয়। শিবনাথ পারিবে না কেন? শিবনাথের কাছে শক্তিনাথ বাহিরের মানুষ ছাড়া আর কি? ভদ্রতার প্রশ্ন ভিন্ন আর কোনো প্রশ্নই নাই তার। দূরাগত কোনো আত্মীয় যদি সামান্য সম্বন্ধ-সূত্রের জের টানিয়া আসিতে চাহিত, নিরুপমা কি নিষেধ করিয়া পাঠাইতেন?

কিন্তু শক্তিনাথ আসিতে চাহিয়াছেন!

কোন্ হিসাবে আসিতে চাহিয়াছেন ভাবিয়া অবাক লাগে নিরুপমার। বত্রিশ বছর ধরিয়া যেটুকু যোগসূত্র রাখিতে চাহিয়াছেন শক্তিনাথ, সমস্তই তো অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন নিরুপমা।

বালক শিবনাথের জন্মদিন উপলক্ষে বৎসরে বৎসরে যে অজ্ঞাতনামা-ব্যক্তি-প্রেরিত মূল্যবান উপহার রাশি রাশি আসিয়াছে—প্রত্যেকটিই কি "লইতে অনিচ্ছুক" মার্কা লইয়া প্রেরকের নিকট ফিরিয়া যায় নাই?

শেষ পর্যন্ত উপহার পাঠাইবার সখ তাঁহার মিটিয়াছে।

তবু শিবনাথ বড়ো হওয়ার পর সরাসরি ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন শক্তিনাথ কুশলপ্রশ্নসহ পোষ্টকার্ডের মারফৎ। "লইতে অনিচ্ছুক" বলিয়া ফেরত দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই পোস্টকার্ডগুলো থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু কবে তার উত্তর মিলিয়াছে?

ছেলের উপর কড়া নিষেধ ছিল নিরুপমার।

অবশেষে শিবনাথ এম-এ পাশ করিয়া বাহির হইবার পর লজ্জা-সরমহীন লোকটা দুঃসাহসের চরম প্রমাণ দিতে কি না শিবনাথের নামে পাঠাইয়া বসিল এক মোটা অঙ্কের চেক! বোঝা গেল লোকটার আর্থিক অবস্থা ধারণাতীত রকমের ভালো, চেকের অঙ্কটা রীতিমতই মোটা, ছেলের ভবিষ্যৎ পথ সুগম করিয়া তুলিতে বেশ কিছু পাথেয়।

কিন্তু জগতে তো অর্থবান ব্যক্তির অভাব নাই, নিরুপমা কি তাহাদের কাছে ভিক্ষামুষ্টি লইতে দিবেন শিবনাথকে?

হয়তো—নিরুপমার ব্যবহারটা একটু রূঢ়, একটু বেশি কঠোর, কিন্তু—শক্তিনাথেরই বা ধৃষ্টতার সীমা থাকিবে না কেন?...

যে রাজ্যে নিরুপমা রাজেন্দ্রাণীর মতই অনায়াসে অবহেলায় ত্যাগ করিয়াছেন—আজ তাহার একমুঠি শস্যকণার লোভ করিবেন—এমন উঞ্ছমনোবৃত্তি নিরুপমার নয়—এটা যদি এতোদিনেও না বুঝিয়া থাকেন শক্তিনাথ, বুঝাইয়া দিতে হইবে বৈ কি।

চেক ফেরৎ দিবার পর হইতে আর কোন সাড়া আসে নাই। যেন শেষ আঘাতে স্তব্ধ

হইয়া গেছে মানুষটা। নিরুপমাও স্বস্তি পাইয়া বাঁচিয়াছেন। অন্তত সেইটাই ন্যায্য।...তবু মনের অগোচরে পাপ নাই, তাই মাঝে মাঝে মনে হয় অমিয়াকে কিছুটা দেখাইতে পারিলে যেন ভালো হইত। নিরুপমা যে কতো সহজে ঐশ্বর্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার—আগ্রহকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন, সে গৌরবটা অমিয়াকে না দেখাইতে পারার মধ্যে খানিকটা ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। এ সংসারের সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিয়া, আচারনিষ্টার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে, আর গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের সাধনে—দেবত্বের মহিমায় নিজেকে উর্ধ্বলোকে প্রতিষ্টিত রাখিয়াও, কোথায় যেন লুকাইয়া থাকে পরাজয়ের গ্লানি। আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী কাহারও কাছে নয়, শিবনাথের কাছেও নয়, কেবলমাত্র শিবনাথের বৌয়ের কাছে।

কিন্তু কেন?

নিরুপমা নিজেও জানেন না কেন এই অতি গোপনে বিঁধিয়া-থাকা সুতীক্ষ্ণ কাঁটাটা কিছুতেই উপড়াইয়া ফেলা যায় না, অহরহ পীড়া দেয়।

নিজের গৌরবময় ত্যাগের ছবি অমিয়াকে দেখাইবার সুযোগ কখনো ঘটিল না। অমিয়ার বিবাহের সময়ও নয়। কারণ ছেলের বিবাহের সংবাদ শক্তিনাথকে দেন নাই নিরুপমা।

নিষ্প্রয়োজন বোধেই দেন নাই।

কিন্তু অমিয়া শাশুড়িকে ভাবে কি?

পতি-পরিত্যক্তা দুর্ভাগিনী নারী ছাড়া আর কিছুই ভাবে না হয়তো।

অতীত কাহিনী গল্প করিয়া গৌরব করিবার মেয়ে নিরুপমা নয়—শুধু অতীতের অন্ধকার যবনিকাখানা তুলিয়া ধরিয়া বত্রিশ বছর আগের দৃশ্যটা যদি দেখানো যাইত!...

পলাতক পুত্র ঘরে ফিরিয়াছে...একদিন নয়, দুইদিন নয়, দীর্ঘ তিন বৎসর নিরুদ্দেশ জীবন যাপনের পর বাড়ি আসিয়াছে শক্তিনাথ। ...কঠোর আচারপরায়ণ পিতার কাছে অনুমতি পাওয়ার আশা দুরাশা বোধে পলাইয়া সাগর পাড়ি দিয়া আসিয়াছে।...অর্জন করিয়া আনিয়াছে—কর্মজীবনের সাফল্য। অনবদ্য স্বাস্থ্য, অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য। যে-চাঞ্চল্য ভক্তিনাথের সংস্কারাচ্ছন্ন সংসারে বেমানান।

দৃশ্যটা যেমন ছবির মতো স্পষ্ট হইয়া আছে—তেমনি স্পষ্ট হইয়া আজো কানে বাজে প্রত্যেকটি কথা।...প্রথম খবর আনিল বাড়ির রাখাল ছেলেটা। গরুগুলা মাঠে ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো মাঠান, বড়দাদাবাবু এয়েছে! হেইমা পেত্যয় করো, নিজের চোক্ষে দেখে এনু। কি যে রূপ হয়েছে মাঠান, যেন সায়েবকে ঝক দিচ্ছে। কোট পেন্টুল পরে—একেবারে সদ্য সায়েব।

শাশুড়ি অবিশ্বাসের সুরে উত্তর করিয়াছিলেন—কে বললে বড়দাদাবাবু? তুই সায়েবই দেখে এসেছিস কোথাও।...

অবশ্য ছেলের খবরটা ইদানীং কানাঘুসোয় পাওয়া গিয়াছিল—"ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব" বলিয়া ফটোও ছাপা হইয়াছিল কোথায় যেন, কিন্তু বিনা সংবাদে হঠাৎ বাড়ি আসিবে, এটা অবিশ্বাস্য।

—ওই তো মাঠান তুমি পেত্যয় করছো না? এস্টেশন থে আসছে—কোট পেন্টুল দেখে আমি তো ভয়ে ভয়ে ছুট দেবার মতলব করছি, আমাদের বড়দাদাবাবু আমাকে ডাক দে বললো—'কিরে মাধো, ভালো আছিস তো?'

শক্তিনাথ-জননী সন্দিগ্ধভাবে বলিয়াছিলেন—তুই কি বললি?

—আমি? আমি বলনু—বড়দাবাবু তুমি পেলিয়ে গেলে—মাঠান কেঁদে কেঁদে মরতে পড়লো। আর বলনু তোমার পোষাকটার যে কি বাহার—বলিতে বলিতে দম লয় ছেলেটা।

—তবে তো খুব বলেছিস। তা কই এলো না?

—আসছে—পাযে হেঁটে আসবে তো?

—তুই বুঝি উড়ে এলি?

—কও কথা। আমাব সঙ্গে তুলনা? আমি তো ওই ষষ্ঠীতলা দে, ধোপা পুকুরের পাড় দে ছুটতে ছুটতে এনু। আচ্ছা, রওনা দু-দণ্ড, ঝুটমুট বলছি কিনা দেখো।

না, ঝুট কথা সে বলে নাই, মিনিটকয়েক পরেই শক্তিনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন উঠানের মাঝখানে।...দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ, স্বাভাবিক ফর্সা রং আবো টকটক করিতেছে...অভিনব বেশভূষা। ভক্তিনাথের সংসারে ইতিপূর্বে ম্লেচ্ছের পোষাক প্রবেশ করে নাই।

বত্রিশ বছব আগে সেই শেষ দেখিয়াছিলেন নিরুপমা।

মুহূর্তমাত্র। পরমুহূর্তেই ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন...কিন্তু কেন? ভয়ে? লজ্জায়? রাগে? অভিমানে?...সেই কথাটাই শুধু স্পষ্ট মনে পড়ে না আর।...

বহুদিন বহুভাবে ভাবিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু রাগ হওয়াই কি অসঙ্গত ছিল নিরুপমাব পক্ষে? শক্তিনাথের এই নিষ্ঠুর পলায়ন কি নিরুপমার ললাটে পরাজয়ের কালি লেপিয়া দেয় নাই?...

বধূজীবনের কথা মনে কবিতে গেলেই তো সব ছাপাইয়া, জাগিয়া ওঠে ভয়েব স্মৃতি। স্বামিসান্নিধ্যের মধুব রোমাঞ্চেব গা ঘেঁসিয়া—উদ্যত শাসনেব ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে গুরুজনেব ভ্রূকুটি। শুধু সবে যখন ভয ভাঙিতে সুরু কবিয়াছে, আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় কেমন কবিয়া যেন ধরা পড়িয়া গেছে নিজের মূল্য, সংসাবে আসিয়াছে প্রতিষ্ঠার আভাষ, সেই স্বপ্নময় দিনরাত্রিগুলির উপর তীক্ষ্ণ বিদারণ রেখা টানিযা দিয়া কী অনায়াসেই চলিয়া গেলেন শক্তিনাথ!

সমস্ত গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া নিরুপমার জন্য রহিল শুধু ধিক্কার।

সেই পলাতক স্বামীর বিরুদ্ধে যদি সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া থাকে, সে কি নিরুপমার অন্যায় ঔদ্ধত্য?...ভাবিতে বসিলে অনেক কিছু ভাবা যায়, শুধু ভাবিয়া কূলকিনারা পাওয়া যায় না—ঠিক সেই মুহূর্তে নিরুপমা অমন প্রেতাহতের মতো ছুটিয়া পলাইয়াছিল কেন?...আর একবার তাকাইয়া দেখে নাই কেন?

পবেব দৃশ্যটা মর্মান্তিক।

সারদাময়ী ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা লইযা 'কাঠ' হইয়া বসিয়া আছেন, পুত্রকে সম্ভাষণ করিবার পর্যন্ত সাহস নাই।...বিচারকের আসনে ভক্তিনাথ।

ধর্মের উপর পুত্রস্নেহ নয়। পিতৃহৃদয় চূর্ণ হইয়া যাক, বিধর্মী পুত্রকে ঘরে স্থান দিবার সাধ্য তাঁহার নাই।

শক্তিনাথ কম্পিত গলায় বলিয়াছিলেন—আপনি ভুল শুনেছেন বাবা, ধর্মান্তর গ্রহণ করিনি আমি, হিন্দু ছিলাম, হিন্দুই আছি।

ভক্তিনাথের কণ্ঠস্বর স্থির, হিন্দুর আচার—খাদ্যাখাদ্যের বিচার—সমস্ত মেনে এসেছো এই তিন বছর?...উত্তর দাও।

—বিদেশে—ওসব জায়গায় সম্পূর্ণ আচার মেনে চলা সম্ভব নয় বাবা।

—ইচ্ছা থাকলে, নিষ্ঠা থাকলে, কিছুই অসম্ভব নয় শক্তিনাথ। বেশ, তোমার উপবীতের ধর্ম রক্ষা করেছিলে? গায়ত্রী করেছ দু'বেলা? মাথা হেঁট করছো যে? উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই—কেমন? উপবীতটাও ত্যাগ করনি কি? ভক্তিনাথ মুখুয্যে ভুল শুনে কিছু সিদ্ধান্ত করে না শক্তিনাথ।...আমার ধর্মের সংসারে উপবীতত্যাগী ম্লেচ্ছের স্থান নেই।

শক্তিনাথ তখনো মাথা হেঁট করিয়া ছিলেন না কি?...

না আর নয়। ঘরের ভিতর হইতে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন নিরুপমা সেই অকুণ্ঠ ভঙ্গী।...

—মা, তোমারও বোধ করি একই মত? তোমাদের কাছে স্থান পেলাম না এর জন্যে দুঃখিত, তবু আশা করছি পৃথিবীর কোনোখানে একটু স্থান পাবোই।...কিন্তু...আমার সঙ্গে আরও তো কিছু ছাড়তে হবে তোমাদের। এ সংসারে আমারও কিছু দাবীর জিনিস রয়েছে যে—

ঘরের ভিতর থাকিয়া ঘৃণায় লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন নিরুপমা এই স্পষ্ট নির্লজ্জ উক্তিতে।

ভক্তিনাথ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—ও, তোমার স্ত্রী-পুত্র? বেশ তো নিয়ে যাও। ওরে কে আছিস, বৌমাকে তৈরি হয়ে নিতে বল্ খোকাকে নিয়ে—

সারদাময়ী হাহাকার করিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—ওগো তুমি কি পাষাণ? প্রাণ বলে কি কিছু নেই তোমার? খোকাকে ছেড়ে—

ভক্তিনাথ তেমনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—প্রাণের কথা তো হচ্ছে না বড়বৌ; কথা হচ্ছে অধিকারের। আর প্রাণের কথাই যদি বলো—নিজের ছেলেকে ছাড়তে পারবো আর পরের ছেলেকে পারবো না? সব ছাড়তে পারবো—শুধু ছাড়তে পারবো না ধর্ম।

তাঁহার ধর্ম তিনি রাখিয়াছিলেন...কিন্তু নিরুপমা স্বামী ছাড়িলেন কোন্ ধর্মে? ভক্তিনাথ তো পুত্রবধূকে আটক করেন নাই!...অথচ কী অপরিসীম মর্যাদায়, কী সহজ অবহেলায় নিরুপমা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন শক্তিনাথের আহ্বান!...

সারদাময়ীর তীব্র ভর্ৎসনা আজও মনে পড়ে—"শ্বশুরের সুয়ো হয়ে জীবন কাটবে না বৌমা, আখের মাটি কোরো না, নিজেব পায়ে কুড়ুল মেরো না! ম্লেচ্ছ হোক যবন হোক, ওই তোমার দেবতা—ইহকাল পরকাল।...শক্তির সঙ্গে চলে যাও তুমি।"

নিরুপমা উপহাসের হাসি হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন সেই উপদেশ।..ঠিকই করিয়াছিলেন। কেন নয়? শক্তিনাথের ধৃষ্টতার উপযুক্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছিল।

অবশেষে—শক্তিনাথের শেষ অনুরোধ, একবার দেখা করিবার—শক্তিনাথের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নিজমুখে শেষকথা জানাইবার অনুরোধ—তা'ও রক্ষা করেন নাই নিরুপমা।

হ্যাঁ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—দেখা করার প্রয়োজন নাই, ধর্মচ্যুত স্বামীর সঙ্গে নিরুপমার সম্পর্ক কি?

শ্বশুরের স্নেহচ্ছায়ায় সামান্য কয়টা দিন কাটিয়াছিল...তারপর আসিল উত্তপ্ত মরুভূমি। আশ্রয়হীন ভরসাহীন নিঃসঙ্গ জীবন। একা নিরুপমা সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন।...

মানুষের মতো মানুষ।

—অমিয়া কি জানে সেই যুদ্ধের ইতিহাস? অমিয়া কি বুঝিবে নিরুপমার দৃপ্ত মহিমা?

কিন্তু ছেলেকে শক্তিনাথ দেখিলেন কবে? এইটুকুর জন্য তুচ্ছ মাধোর উপর কিছু কৃতজ্ঞতা আছে নিরুপমার। চাঁদের মত ছেলে, দেখাইবার মত ছেলে, এ ছেলেকে না দেখাইতে পাইলে নিরুপমার বিজয় গৌরব সম্পূর্ণ হইত না যে।

শক্তিনাথ চলিয়া যাওয়ার পর সমস্ত বাড়িটা যখন মৃত্যুর মতো স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে—মাধো কোথা হইতে খোকনকে কোলে লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাজির—"মাঠান, এই দেখো শিবুবাবু আমাদের রোজগার করতে শিখে গেছে। দেখাও তো শিবুবাবু ঠাকুমাকে।"

আড়াই বছরের ছেলে চকচকে দুই চোখ তুলিয়া মুখে আঙুল পুরিয়া গম্ভীব মুখে দাঁড়াইয়া থাকে আর উচ্ছ্বসিত মাধো তার জামার পকেট হইতে বাহিব করিতে থাকে নবলব্ধ ঐশ্বর্য।

এই দেখ আংটি, একটা সোনার—একটা পাথরের—এই দেখ একটা ইংরিজি ঘড়ি—হাতে বেঁধে দেব শিবুবাবুর। আর এই দেখ—ইয়া পেটমোটা এক মণিবেগ, কতো লোট্ কতো ট্যাকা গোনসে' মাঠা'ন।

সারদাময়ী শোক ভুলিয়া অবাকসুরে বলেন—এসব কিরে মাধো?

—কি আবার? খোকনের মুখ-দেখানি। তোমরা তো ইদিকে বড়দাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করতে লেগে গেলে—খোকনকে দেখিয়ে মুখদেখানি আদায করবাবও খেয়াল নেই—আমি বলি ভালো রে ভালো। ছুটনু খোকনকে নিয়ে ইস্টিশানের রাস্তায়। বলা যায় না—বাবু যা ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই। লাগ ঝমাঝম বেধে গিয়ে বাগ করে চলেই যাবে হয়তো বড়দাবাবু।...ঠিক তাই—দেখি গটগট্ করে চলে যাচ্ছে, ধবনু গিয়ে। বলি—খোকনকে একবার দেখেও গেলে না? ধন্যি রাগ তো? বড়দাবাবু বললে—'রাগ করে তো যাচ্ছিনা রে, আমাকে সবাই তাড়িয়ে দিলো—' 'শোন কথা?' তারপর না খোকনকে কোলে নে, সে কী আদব, হাতেব গোড়ায় যা পাচ্ছে সব দিচ্ছে। আমি তবু বলনু—ছেলেকে আদর করে সবছিষ্টি ওজোর কবে দিলে যে—তা যাবে কি করে? বিন্‌টিকিটে?...কে শোনে কার কথা?...আচ্ছা মাঠান, গাজনের দিন জন্মালো না শিবু? 'শিবনাথ' নাম তো ওরির নেগেই রাখা? তাই বলনু দাদাবাবুকে—

প্রত্যেকটি কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে নিরুপমাব।

কিন্তু বিতাড়িত ব্যক্তি আবার ফিরিয়া আসিয়া মুখ দেখাইতে চায় কোন্ মুখে?

ছেলের কাছে?

কিন্তু ছেলেকেও তো নিরুপমা পদে পদে শিখাইয়া আসিয়াছেন তেজের মন্ত্র! তার জীবনেই কি পিতার স্থান আছে?

তাই বিপন্ন পুত্রকে আশ্বাস দিবার ভঙ্গীতে বলেন—অত ভাবনার কি আছে শিবনাথ? পাগলেব খেয়ালে তো আর সহজ মানুষ চলবে না? এসে পড়ে থাকেন ভালো কথা, কলকাতা সহরে কিছু আর হোটেলের অভাব নেই।

কিন্তু শিবনাথ হঠাৎ বাল্যকৈশোর কাটাইয়া যুবকেব দৃঢ়তা পাইল কোথায়? মাতৃভয ভুলিয়া নিরুপমার কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়া স্বচ্ছন্দে বলিয়া বসিল—সে হয না মা। বাবা আমাকে স্টেশনে থাকতে বলেছেন। বাড়ি তো চেনেন না।

—তুমি কি মনে করেছ এই বাড়িতে এনে তুলবে?

—তা' ছাড়া?

—তবে তো আমার আর একদম একদণ্ডও থাকা হয় না বাবা, আমার ব্যবস্থা আগে করে—

—কোনো ব্যবস্থাই আর করবার সময় নেই মা, মাদ্রাজ মেল এসে গেলো এতক্ষণ। যাচ্ছি আমি। তা' ছাড়া—তোমারই বা এতো ভাববার কি আছে?

শিবনাথের হিসাবে ভাবিবার কিছু না থাকিলেও শিবনাথ বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো অজস্র ভাবনা ভাবিতে থাকেন নিরুপমা। সম্ভব অসম্ভব কতো জায়গার কথাই চিন্তা করেন...কিন্তু

পলাইয়া আশ্রয় লওয়ার ঠাঁই এ জগতে কোথায় আছে নিরুপমার?...তাছাড়া লোক-দেখানো নাটুকেপনা একটা করিয়া বসা যে আরো লজ্জাকর।

কিছুই ঠিক হয় না।

শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত পূজাটা সমাপ্ত করিতেই বোধ করি ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দেন। কিন্তু পূজার মন্ত্র কি নির্ভুল হয়? সমস্ত ইন্দ্রিয় কি শ্রবণশক্তির সীমানায় আসিয়া উন্মুখ হইয়া থাকে না বিশেষ একখানি গাড়ির শব্দের প্রতীক্ষায়?

না, নিরুপমা অত কাঁচা নয়, সুদীর্ঘ সাধনায় মজবুত বনেদ।

ধ্যানের মূর্তি যদি বা ঝাপ্‌সা ঠেকে, গুরুস্তোত্র তো আছে?...

বাহিরের দরজায় কার গাড়ি আসিয়া থামিল, সে-হিসাব রাখিবার জন্য মাথাব্যথা নাই তাঁহার।

তবু একসময় বাহির হইতেই হয়।

ঘরে খিল লাগাইয়া বসিয়া থাকিবার মধ্যে যে হাস্যকর দিকটা আছে, সেটা না বুঝিবার মতো অল্পবুদ্ধি মেয়েমানুষ নিরুপমা নন...সত্যই তো আতঙ্কের কি আছে? নিজের সংসারে নিজের পদমর্যাদায়-প্রতিষ্টিত-নিরুপমার, বাহিরের একটা লোকের উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে কি আসিয়া যায়?

বিতৃষ্ণা?

তা' ঠিক। কিন্তু তা'তেই বা আসিয়া যায় কি? জগতের কতো বস্তুর উপরই তো বিতৃষ্ণা আছে নিরুপমার।...বাহিরে আসিলেন বটে তবে নিজের চারিপাশের গাম্ভীর্যের বর্মটা আরো সুদৃঢ় করিয়া লইলেন।

এদিকে শক্তিনাথ'কে লইয়া অমিয়ার ঘটার আর অন্ত নাই।

এতো আশা শক্তিনাথ করেন নাই।

মায়ের অজ্ঞাতসারে শিবনাথ ইদানীং চিঠিপত্রের সূত্রে কিছুটা যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল বটে, তবু এতোটা সশ্রদ্ধ ভালোবাসা পাইবার আশা সত্যই ছিল না। তার উপর আবার অমিয়া।

বৈচিত্র্যহীন নিশ্ছিদ্র কর্মজীবনের মাঝখানে স্নেহ-ভালোবাসার আস্বাদ কবে পাইয়াছেন শক্তিনাথ?...বন্ধু প্রতিবেশী, অনুগত ভৃত্য, এদের কাছে যতোটুকু পাওয়া সম্ভব, তার বেশী নয়। স্বভাবটা মিশুকে, হাতটা অকৃপণ, অবস্থাটা স্বচ্ছল, কাজেই বন্ধুবান্ধবের অভাব ঘটে না, এই পর্যন্ত।

'বাবা' ডাকটা কি মিষ্ট! 'বাবা' বলিয়া একেবারে মেয়ের মতো কাছ ঘেঁসিয়া বসিবার ভঙ্গীটা অমিয়ার কি স্নিগ্ধ!...শক্তিনাথকে মাঝখানে রাখিয়া শিবনাথ আর অমিয়ার কলহের ছলনাটুকু কি উপভোগ্য!...দীর্ঘ মরুভূমির শেষপ্রান্তে এমন শীতল সরোবর রচিত ছিল শক্তিনাথের জন্য, এতো আশা থাকিবে কেন? এ যে অপ্রত্যাশিত।

সাহস করিয়া আসিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। শুধু—

কিন্তু নিরুপমা কি এ বাড়িতে আছে?

কি কাজে শিবনাথ ঘরে আসিয়াই মৃদু হাসিয়া বলে, বাবার স্নানাহারের ব্যবস্থা না করে শুধু আদর কাড়ানো হচ্ছে! তা' মন্দ নয়।

বলা বাহুল্য কথাটা অমিয়ার উদ্দেশে বলা হয়।

অমিয়া ছেলেমানুষের মতো মাথা নাড়িয়া বলে—দেখছেন বাবা, আমার ওপর কী হিংসে? আমি একটু আপনার কাছে বসেছি বলে হিংসেয় অস্থির একবারে। আপনাকে স্নানের তাগিদ দিতেই যেন আসিনি আমি! আপনার খাওয়ার সময় অসময়ের হিসেব যেন আর কেউ রাখে!

শক্তিনাথ হাসিয়া বলেন—সত্যিই তো শিবনাথ, ভারী অন্যায় তোমার, মার ওপর সর্দারী কেন? এই তো মা আমাকে স্নানের তাগিদ দিতে এসে বললেন—'না বাবা আপনার এখনো খিদে পায় নি মনে হচ্ছে'—তবেই না টের পেলুম সত্যিই খিদে পায় নি।

শিবনাথ হাসির সঙ্গে ঈষৎ উদ্বিগ্নস্বরে বলে—কিন্তু খিদে পাচ্ছে না কেন বলুন তো? শরীর কি ভালো থাকছে না এখানে?

না না সে কি কথা, শরীর ভালো থাকবে না, এ কি হতে পারে? মার অখ্যাতি হবে যে সেটা। শরীর ঠিক আছে, শুধু মার হাতের ব্রেকফাস্টটা এতো জবরদস্ত হয়ে পড়ে যে আবার ঘণ্টা তিন চার না যেতেই খিদে পাওয়া শক্ত।

—হ্যাঁ অমনি আপনি বাজে কথা সুরু করছেন বাবা—অমিয়া আবদারে গলা সুরে বলে—কতো কি ভালো ভালো রান্না জানি আমি, তার কিছু তো খাওয়ালাম না এখনো।...ভালো ভালো রান্না শিখেই রেখেছি শুধু, রাঁধতে তো পাই না, খাবে কে? আপনার ছেলেটি তো পরম বৈষ্ণব, এ বাড়িতে অসাত্ত্বিক জিনিসের প্রবেশ নিষেধ বললেই চলে। ভালো রান্না রাঁধবো কি নিয়ে?

শক্তিনাথ যেন থতমত খান। ...বৈষ্ণব! শিবনাথও পরম বৈষ্ণব! ভক্তিনাথের সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখিয়াছে তবে সে? কই, এই তিন-চার দিনে এমন সন্দেহ তো মনে আসে নাই। ...ও, তাই বুঝি শিবনাথ কোনোদিন একত্রে আহারে বসে না, সকালের চা পর্যন্ত না। কাজের অজুহাতে কখন কোন্ ফাঁকে খায়, টেরও পান না শক্তিনাথ। ...কিন্তু অমিয়া তো কাছে বসে ছোট মেয়ের মতো আবদার করিয়া খাওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে খাইতে লজ্জা করে না।...তবে? শুধু শক্তিনাথের মর্যাদা রাখিতে?

বিপন্ন-বিহ্বল মুখে বলেন—সে কি? তা'হলে—তবে? মা অমিয়া, তোমার তো এটা খুব অন্যায়! এ বাড়িতে যখন ও সব চলে না—তখন আমার জন্যে কেন শুধু শুধু—ছি ছি কী অসঙ্গত বলো তো? ...না, না, দেশী রান্নাও আমার খুব ভালো লাগবে। তুমি আমার জন্যে বরং মোচার ঘণ্ট-টণ্ট—

দায় পড়েছে আমার মোচার ঘণ্ট রাঁধতে—অমিয়া একবার স্বামীর দিকে গোপন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলে—তার জন্যে তো পাঁড়েজী মশাই আছেন—আমি বাপু আপনার দৌলতে তবু মুখ বদলে বাঁচছি।

তবু শক্তিনাথ নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারেন না, বার বার বলিতে থাকেন—এটা অমিয়ার উচিত হয় না—বাড়িতে আর কারো আপত্তি থাকতে পারে।

নিরুপমাকে অবশ্য আসিয়া পর্যন্ত চোখে দেখেন নাই তিনি, তবু উপস্থিতির আভাষটা যে বাড়ির সর্বত্র ছড়াইয়া আছে, সেটা আর বুঝিতে ভুল হয় না।

অপরাধের ভারে কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন বেচারা।

শিবনাথ স্ত্রীর এতোটা আদিখ্যেতা সত্যই পছন্দ করে না, কিন্তু শাসন করিলে অমিয়া আরো বাড়ায়।...গোপনে একবার ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে তাকায়—অর্থাৎ কি লাভ হইল মানুষটাকে অপ্রতিভ করিয়া—মুখে হাসি বজায় রাখিয়া বলে, আপনি ওই সব বাজেলোকের কথা বিশ্বাস করছেন

বাবা? মোটেও করবেন না। পয়লা নম্বর কুঁড়ে, কিচ্ছুটি করতে নারাজ, এখন আপনার জন্যে যা একটু নড়তে দেখছি।...সেটাও পলিসি, পাছে আপনি আমাকে বেশী ভালোবাসেন, বুঝলেন?

সরলচিত্ত শক্তিনাথ হাসিয়া ওঠেন।

—আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে শিবনাথ, তোমার চেয়ে মাকেই যেন বেশি ভালোবেসে ফেলছি—

—বাসুন না, আমার কি? ক্রমশ যখন গুণ জানতে পারবেন, টের পাবেন মজা।

ভালোমানুষ মানুষটিকে আনন্দ দিতে স্বভাববহির্ভূত চাপল্য প্রকাশ পায় শিবনাথের কথায়। ...হয়তো কিছুটা নিরুপমার ব্যবহারের ত্রুটিপূরণ।...

বাপকে দেখিয়া পর্যন্ত মায়ের উপর তার রাগও হয় না, ভক্তিও হয় না, হয় শুধু করুণা মমতা। বেচারা মা! কি শোচনীয় হিসাবের ভুলে কি অমূল্য সম্পদ হইতেই না বঞ্চিত রহিলেন চিরদিন!

শক্তিনাথ স্নানের উদ্যোগ করিতে ওঠেন, মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে শিবনাথ। ...দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ বার্ধক্যের ভারে ভারাক্রান্ত শক্তিনাথের আহারে বিহারে পোষাকের পারিপাট্যে শক্তিনাথের এখনো যে প্রাচুর্য, যুবক শিবনাথের যদি তার অর্ধেকও থাকিত!

প্রত্যহ তিন মাইল পথ হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসেন শক্তিনাথ, অথচ কাছেই এই কলেজটুকু যাইতে গাড়ির সাহায্য লইতে হয় শিবনাথের। ...ওই বিশাল শরীরের মধ্যে আছে একটি নির্মল শিশুর বিশ্বস্ত হৃদয়।

এমন হৃদয়ের আবেদন নিরুপমার কাছে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে? মাকে তাই আর মহীয়সী ভাবিয়া অভিভূত হইতে পারে না শিবনাথ, দুঃখিনী বলিয়া বেদনা বোধ করিতে থাকে।

শিবনাথ যাই ভাবুক, নিরুপমা আপন মর্যাদা হারান নাই। শিবনাথকে আপন এলাকায় ডাকিয়া তিনি সেই কথাই সমঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন।

—"ক'দিন আমি চুপ করেছিলাম শিবনাথ, কিন্তু আর নয়। ওঁকে নিজের পথ দেখতে বলো এবার।"

—কি আশ্চর্য! কথাটা তুমি কি করে বলছো বলো তো মা? আমি বলবো—আপনি এবার পথ দেখুন?

—কেন বলবে না—তা'ও তো বুঝছি না। অবশ্য তোমার খেয়ালে আর বাধা দেওয়া উচিত নয় আমার, বড় হয়েছো, ভালমন্দ বুঝতে শিখেছো, কিন্তু তবুও আমি যতক্ষণ থাকবো, আমার মতেই সংসার চলবে, এই আমার শেষ কথা।

শিবনাথ ম্লানভাবে বলে—কিন্তু তুমিই যে কেন এতো অসন্তুষ্ট হচ্ছো মা, বুঝছি না। তোমাকে তো কোনো সংস্রব রাখতে হচ্ছে না?

—না হোক, তবু অসঙ্গত বাড়াবাড়ি সহ্য করবো না আমি। শেষ পর্যন্ত এ বাড়িতে কিনা মুরগী রান্না চলছে! ছি ছি!

মুখ দেখিয়া মনে হয় এইমাত্র বুঝি উক্ত অমেধ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়া গেছে নিরুপমার। শিবনাথ নিরুপায়ভাবে বলে—আচ্ছা আমি নয় বারণ করে দেব—

কথা সমাপ্ত হয় না, পিছন হইতে অমিয়ার কথা শোনা যায়—বারণ করলেই হ'ল আর কি, বা রে! বাবার ও সব নইলে খাওয়াই হয় না।

নিরুপমা বিরক্তভাবে বলেন—তোমার মতামত নেবার জন্যে তো ডাকা হয় নি বৌমা।

—না হতে পারে। কিন্তু আপনারা মায়েছেলে যুক্তি করে যে আমার বাবাটিকে তাড়াবার

ফিকির খুঁজবেন, সেটি হচ্ছে না।

—বাড়ি তোমার নয় বৌমা।

—সে যদি আপনি ভেবে সুখ পান, ভাবুন, কিন্তু আমিও বলছি—বাবা এখানেই থাকবেন এবার থেকে।

নিরুপমা শিবনাথ দু'জনেই অমিয়ার এই স্পষ্ট স্পর্ধায় অবাক হইয়া যান। বাঁকা হাসিকে তবু না বোঝার ভাণে পরিহাস করিয়া চলা যায় কিন্তু এ যে প্রায় কলহ।...এতো স্পর্ধা কে জোগাইল অমিয়াকে? শক্তিনাথ ছাড়া কে হইবে? কই আগে তো কোনোদিন অমিয়ার এতো স্পর্ধা দেখা যায় নাই?

কথাটা মিথ্যা নয়।

শক্তিনাথের প্ররোচনা না হোক, উপস্থিতি।

শ্বশুরকে লইয়া এতো বাড়াবাড়ি অমিয়ার, শাশুড়ির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলা যায়। ...শিবনাথও অবশ্য চায় শেষ জীবনটা অন্তত শক্তিনাথ একটা সংসারের আশ্রয়ে শান্তিতে থাকুন, তবে সেটা মার সঙ্গে কলহ করিয়া নয়, আপোষ করিয়া। কিন্তু অমিয়ার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে। ...এমন যা-তা বলিয়া বসে!

নিরুপমা একমিনিট গুম্ হইয়া থাকিয়া সহসা তীক্ষ্ণ হাসির সঙ্গে বলেন—শ্বশুরের ব্যাঙ্কের হিসেবটা স্মরণ করেই বোধ করি বৌমার আমার এতো ভক্তির আধিক্য? তা ভালো—কিন্তু একজনকে তো তোমার ছাড়তেই হয় শিবনাথ। হয় আমায় তাড়াও নয় তো—

টাকার উল্লেখে অমিয়ার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া ওঠে।

—বেশ, তা'হলে তাড়াবার ভারটা আপনিই নেবেন! অভ্যাস তো আছে, অসুবিধে হবে না।...বলিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক হানিয়া সরিয়া যায়।

অমিয়ার সেবার হাতটি বাস্তবিকই চমৎকার নিপুণ।

প্রতিপদে এই নিপুণতার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া যান শক্তিনাথ। একজনের খুঁটিনাটি সুবিধা অসুবিধার দিকে যে আর একজনের সতর্কদৃষ্টি এমন সতত সজাগ হইয়া থাকিতে পারে, এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

রাত্রে ঘুমাইবার আগে কিছু পড়াশোনা করা শক্তিনাথের বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু লেখা আর পড়ার সরঞ্জামটি বিছানার পাশে গোছানো থাকিবে—হাতের গোড়ায় থাকিবে সিগারেটকেস আর এ্যাশট্রে, খাবার জলটা থাকিবে নিতান্ত আয়ত্তের সীমানায়—চটি জোড়া উন্মুখ হৃদয়ে খাটের নীচে পড়িয়া থাকিবে চরণযুগলের প্রত্যাশায়—এ অভ্যাস তো ছিল না! এ সব কি অসম্ভব ঘটনা!

স্নিগ্ধতৃপ্তিতে যেন মন জুড়াইয়া আসে।

বিছানার উপর গুছাইয়া বসেন শক্তিনাথ...কয়েকখানা দরকারি চিঠি লিখিবার আছে...আছে আকর্ষণীয় খানকয়েক বই, অনেক যত্নে বাছিয়া বাছিয়া আনিয়া দিয়াছে শিবনাথ।

চিঠি লেখা শেষ হয়...বই পড়া আর শেষ হইতে চাহে না।

রাত্রি গভীর হইতে থাকে...বইয়ের ঝোঁকে হুঁস থাকে না।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া যায়।

পড়া? না কি তন্দ্রা আসিয়াছিল।

রাত্রি দুইটা বাজিয়া যাইবে, খেয়াল থাকিবে না—এটা কি সম্ভব? কিন্তু তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ার

পর...স্বপ্ন দেখা যায়, বহুবাব বহুরূপে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন শক্তিনাথ। নিরুপমা...কিন্তু—

স্বপ্নের নিরুপমা কি এমন শীর্ণ শুষ্ক শ্রীহীন?...ষোলো বছরেব নিরুপমাকে চিনিয়া বাহির করিতে হইবে এই ছায়ামূর্তির ভিতর হইতে?

ভীতত্রস্ত শক্তিনাথ অস্থির হইয়া ওঠেন...আর কিছুব জন্য নয়, কোথায় বসিতে দিবেন নিরুপমাকে এই ভাবিয়া।

—যাক আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না, বসছি আমি।

ধর্মভ্রষ্ট আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ শক্তিনাথের শয্যাব একাংশে বসিয়া পড়েন নিরুপমা।...

এতো রাত্রে কি আর জাগিয়া পাহাবা দিবে অমিয়া?

—তুমি আর কতোদিন এখানে থাকবে?

অস্বস্তিকর ফিসফিস্ গলায় প্রশ্ন করেন নিরুপমা। কিন্তু প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ। শক্তিনাথ বিব্রতভাবে বলেন—আমি তো ইয়ে—এতদিনে চলেই যেতাম—শুধু শিবনাথ বৌমা এরা যে কিছুতেই—

—ওদের কথা থাক, এখানে থাকবার আব কোন কারণ নেই তোমার? নিজের ইচ্ছে নেই কিছু?

ইচ্ছা! কারণ!

শক্তিনাথ বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকেন, নিরুপমার দিকে। কি বলিতে চান নিরুপমা? কি বলিতে আসিয়াছেন?...প্রেম নিবেদন করিতে নয় নিশ্চয়ই?

পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে লাবণ্যময়ী তরুণীর শয্যাপার্শ্ব হইতে চুপিচুপি পলায়ন করিয়াছিলেন শক্তিনাথ, এতদিন পরে তার প্রেতমূর্তি শক্তিনাথের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল কি ব্যঙ্গ করিতে? না প্রতিশোধ লইতে? শক্তিনাথের পাপেব প্রায়শ্চিত্ত এখনো কি শেষ হয় নাই?

কিন্তু প্রতিশোধের মূর্তি কি এতো করুণ? প্রতিশোধেব ভাষা কি এতো দীন?

—তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলো—

কে উচ্চারণ করিল একথা? নিরুপমার কণ্ঠ?

—আমার সঙ্গে? নিয়ে যাবো?

হতবুদ্ধি শক্তিনাথ আর কোনো ভাষা খুঁজিয়া পান না, নিরুপমার কথারই পুনরাবৃত্তি করেন।

—হ্যাঁ তোমার সঙ্গে—পায়ে পড়ছি, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে। চিরদিন তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি—তার শোধ নিতে তুমিও যেন আজ ফিরিয়ে দিও না আমায়।

মুখ দেখা যায় না—পায়ের কাছে বালিশের উপর চাপিয়াধরা মুখ হইতে গলার স্বরটা শোনা যায় শুধু।...ছেলেবেলাতেও এমনি পায়ের দিকে উপুড় হইয়া কাঁদিত না নিরুপমা?...

কি আশ্চর্য! অদ্ভুত!

নিরুপমা এখনো কাঁদিতে পারে?

—নিরু ওঠো,মুখ তোলো, ওঠো।

পা গুটাইয়া কুণ্ঠিত হইয়া বসেন শক্তিনাথ।

—উঠবো না, তুমি আগে বলো—

—কি বলবো? কিসের কথা? বুঝতে পারছি না আমি।

এমন অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, এ কথা তো কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবা ছিল না।

—আমায় নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে? বলো—

—এ সৌভাগ্য যে আমার স্বপ্নের অতীত নিরু। কিন্তু তুমি কি পারবে?

—পারবো, পারবো, এখানে আর একমুহূর্ত টিকতে পারছি না আমি। বলো নিয়ে যাবে?

—সৌভাগ্যটা বিশ্বাস কবতে পাবছি না নিরু।

—বিশ্বাস কবো। আব ক্ষমা কবো আমাকে—আব পাবছি না আমি।

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন শক্তিনাথ, কতোক্ষণ? কতো যুগ? কতো যুগ এমনভাবে পাযেব কাছে পড়িয়া থাকিবে নিরুপমা?

—নিরু ওঠো, সব ঠিক হযে যাবে।..

ধীবে ধীবে নিরুপমাব মাথাব উপব একখানা হাত বাখেন শক্তিনাথ।

হাঁ, ঠিক হইয়া যাইবে বৈ কি।

বেঠিক মানুষটা নিজেব ঠিকানায ফিবিযা গেলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।...সুদূব প্রবাসে যে শূন্যঘবখানা অপেক্ষা কবিতেছে তাহাব জন্য .এলোমেলো বিশৃঙ্খল সেই ঠিকানায়। শক্তিনাথেব সঙ্গে কোথায যেন মিল আছে না ঘবটাব।

সে ঘবে শুধু শক্তিনাথকেই মানায . শুধু স্বপ্নেব নিরুপমাকেই স্থান দেওয়া চলে...কিন্তু বক্তমাংসেব নিরুপমা? .নাঃ, শক্তিনাথ নির্বোধ হইতে পাবেন, কিন্তু পাগল নন!

সব ঠিক হইয়া যাইবে. .শুধু কাঁচেব গ্লাসেব জলটা পড়িয়া থাকিবে নিথব...শুধু বিছানাটা পড়িযা থাকিবে শূন্য...অমিযা বই দেখিযা দেখিযা যে নতুন বান্নাটা শিখিয়াছে, সেটা আব কাল বাঁধিতে হইবে না তাকে। অনেক যত্নে যে অমূল্য বইগুলি সংগ্রহ কবিয়া আনিয়াছে শিবনাথ...সেগুলি খোলা হইবে না...ত'ছাড়া আব কিছু নয়।...

জগতেব সকলেব জন্য ঘব আছে, নাই শুধু শক্তিনাথেব জন্য।

শিবনাথ কি ভাববে—অমিযা কি ভাবিবে?

অকৃতজ্ঞ? . হযতো তাই।

নিরুপমা! নিরুপমা ভাবিতে পাবে প্রতিশোধ। ভাবিবে—তিন যুগ পবে প্রতিশোধ লইলেন শক্তিনাথ, প্রত্যাখ্যানেব অসম্মান ফিবাইয়া দিয়া। .

কিন্তু নিরুপমা মত পবিবর্তন কবিলেন কেন?

[১৩৫৩]

দুই নারী

পড়িতে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গেই জলেব কুঁজোটা ভাঙিয়া ফেলাব অপবাধে সেই অবধি মুখখানা হাঁড়িব মতো কবিয়া বসিয়া আছে সুনন্দা। তিবস্কাব তো দূবেব কথা দ্বিরুক্তিমাত্র কবি নাই, তবু মুখ দেখিযা মনে হয, কে যেন চাঁটি মাবিয়া গিয়াছে তাঁকে।

স্বভাবটা জানা। অপবাধ যতই অকিঞ্চিৎকব হউক, অগ্রাহ্য কবিয়া উড়াইয়া দিবাব উপায় নাই, সেটা নাকি তাঁব পক্ষে অপমান। আমাব সামান্য পবিমাণ অভিযোগের উত্তবে তিনি তর্ক কবিবেন, বিতর্ক কবিবেন, শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া বিজয়গৌরব অর্জন কবিবেন, এইটাই প্রথা!

একটা উদাহবণ দিই—একদা সন্ধ্যায় বাড়ি আসিয়া দেখিলাম মহিলা অনুপস্থিত। মাসতুতো দিদি না পিসতুতো বৌদিব সঙ্গে থিয়েটার গিয়াছেন। এহেন বিনা নোটিশের অনুপস্থিতি কিছুটা

বিরক্তি উৎপাদন করিবে—এটা অন্যায় নয় নিশ্চয়ই? ফিরিলে—এ রকম বাড়ী আলগা রাখিয়া হঠাৎ চলিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই বোমার মতো ফাটিয়া পড়িয়া যা উত্তর দিলেন বা প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, তার সারমর্ম এই...তিনি আমার বন্দিনী কিনা, মাহিনা দিয়া আমি তাঁহাকে দারোয়ান রাখিয়াছি কিনা এবং বড মুখ করিয়া যাহাবা লইতে আসিয়াছিল, তাহাদের ফিরাইয়া দিলে আমার মুখটা বড় হইত কিনা ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য তর্কে হার স্বীকার করিতেই হইল।

কয়েকদিন পরে আসিয়া দেখি, প্রায় পূর্ব ঘটনার পুনবাবৃত্তি। থিয়েটার নয় সিনেমা, মাসতুতো দিদি নয় পাড়ার নতুন জামাই। পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মবণ করিয়া কথাটি কহিলাম না। উত্তবে তিনি গোটা দুইটি দিন বিনাবাক্যে হাঙ্গারস্ট্রাইক করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

পরে শুনিলাম-এমন কি গর্হিত কাজ তিনি করিযছিলেন যে, মুখের কথাটি পর্যন্ত শুধাইতে 'ছেদ্দা' হয় নাই আমার?...জানি সবই, কিন্তু এক গাড়ী লোকের সামনে সামান্য একটা মাটির কুঁজোর ক্ষতিতে কিছু আর স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে পারি না? বরং এক্ষেত্রে হাঁড়িমুখই শ্রেয়।

কথা কহিবার চেষ্টা বৃথা, সম্মুখবর্তী জংশন স্টেশনটাব অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকি জল এবং জলাধার সংগ্রহের আশায়। মুখভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে বারকয়েক আড়ে আডে তাকাইতে তাকাইতেই হঠাৎ নজর পড়িয়া গেল সুনন্দার পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি।...বিশ্বাস করুন আর নাই করুন নজরটা প্রথমটা ইচ্ছাকৃত ছিল না, কিন্তু সত্য গোপন করিব না, পরবর্তী নজরগুলা ইচ্ছাকৃত। কিম্বা আমার উপর যদি ভালো ধারণা রাখিতে চান—ভাবিতে পাবেন অসাবধানতাপ্রসূত।

কিন্তু না তাকাইয়া উপায়ও ছিল না! এমন একখানি মুখ সচবাচর চোখে পড়ে না।

'সুন্দর' কথাটা ছাড়া বিশেষ কোন বিশেষণ জানা নাই বলিযাই আমরা মুগ্ধ হইলে বলি 'সুন্দর'।

আজ হঠাৎ মনে হইল—অপূর্ব!

হ্যাঁ, ওই একটিমাত্র বিশেষণই ব্যবহার করা চলে। সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্নটা অবান্তর। উগ্র-আধুনিক না হইলেও সাজসজ্জায় আধুনিকতার ছাপ, সঙ্গে ট্রাঙ্ক সুটকেস, বেডিং টিফিন-ক্যারিয়ার ইত্যাদির বহরটাও সাধারণ এবং এতগুলি যাত্রীর মধ্যে কে যে তাঁহার যাত্রাসঙ্গী, বুঝিবার উপায় না থাকিলেও সেটিও যে অসাধারণ নয়, সেকথা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি।

সুনন্দার শ্যেনদৃষ্টি উপেক্ষা করিয়াও আর একবার চাহিলাম।

দ্বিতীয়বার মনে মনে উচ্চারণ করিলাম—অপূর্ব!

সকল কাজেরই প্রতিক্রিয়া আছে। মিনিট কয়েক পরেই সুনন্দা উঠিয়া আসিল এবং মৌনব্রত ভাঙিয়া চাপা তর্জনে প্রশ্ন করিল—তুমি ওর দিকে অমন বার বার তাকাচ্ছো কিসের জন্যে অসভ্যের মতো? ও মনে করবে কি?

এসব ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত হওয়া অপরাধ স্বীকারের নামান্তর, তাই গম্ভীর চালে বলি, যাই মনে করুক তেড়ে এসে কৈফিয়ৎ তলব করবে না নিশ্চয়ই?

—তাই বলে তুমি তাকাবে? লজ্জা করে না? ও যখন জানতে পারবে তুমি আমারই বর, আমার যে তখন লজ্জায় মাথা কাটা যাবে!

আরো গম্ভীর এবং মৃদুস্বরে বলি—ওর জানবার সম্ভাবনাটা কোথায়? তোমার গায়ে তো লেখা নেই?

—ন্যাকামী কোর না। আলাপ-পরিচয় হ'লে জানতে পারবে না?

—থাক না, আলাপ পরিচয়ের দরকার কি? একটা রাতের মামলা বৈ তো নয়?

—তা' দরকার থাকবে কেন? যতো দরকার 'চোরা চাউনিতে' না? সারারাত্তির পাশাপাশি বসে যাবো, চেনা পরিচয় করবো না?

ভাবিলাম বলি—সুনন্দা সারাজীবন পাশাপাশি চলিয়াও কি চেনা পরিচয় হয়?....বলিলাম না, স্মরণ হইল এটা গাড়ী এবং সুনন্দার সদ্য রাগমুক্ত মেজাজ।

বলিলাম—তাহ'লে যথার্থ পরিচয়টা দিও না, বোলো বাড়ির সরকার কিম্বা—পাড়ার লোক।

—থাক তোমার আর কথা বানাতে শেখাতে হবে না, পদ্য বানাতে পারেন বলে একেবারে—খবরদার বলছি, অমন অসভ্যের মতো তাকাবে না।...বলিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিল সুনন্দা।

অগত্যা সুসভ্যের মতো জানলা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকি।

তবু মিথ্যা বলিব না, উৎকর্ণ হইয়া থাকি 'আলাপ' আরম্ভের আশায়, কিন্তু ট্রেনের শব্দ ও সহযাত্রীবর্গের কোলাহল ছাপাইয়া দুটি তরুণীর কণ্ঠস্বর, অনেক চেষ্টায় কানে যদি বা আসে, অর্থবোধ হয় না।

*　　　　*　　　　*　　　　*

জংশন স্টেশনেব কাছাকাছি আসিতেই চমক ভাঙে।

অনেক আলো, অনেক কোলাহল। মনে পড়িল খাবাব জল সংগ্রহ করিতে হইবে। নামিযা গেলাম।

সামান্য চেষ্টাতেই সোবাই পাওয়া গেল। ঝাঁকা-মুটে ফেরি করিযা বেডাইতেছে।...টিউবওয়েলের পরিষ্কার জল ভরিযা ফিরিয়া আসিলাম এবং কেন জানি না, বেশ স্পষ্ট গলায় শুনাইয়া দেওয়ার ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিলাম—এই এক শুধু শুধু কষ্ট! সোরাই জোগাড় করতে কম হায়রাণ হতে হলো! বাপস্।

কেন বলিলাম? প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—পিপাসায়? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সুনন্দাকে অবহিত করা গেল না। তবে উত্তরের পরিবর্তে নালিশ শোনা গেল,—দেখলেন তো ভাই প্রমাণ? সামান্য একটা মাটির সোরাই—তার জন্য কতো কথা শোনানো?

অর্থাৎ পরিচয়টা ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে, শুধু অপেক্ষা ছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণের। যেন কত বেচারী, যেন কত নির্যাতিতা!...কি জানি—বান্ধবী-মহলের মজলিশে হযতো এমনি করুণ হইয়া ওঠে সুনন্দা। বোধ করি, এও একপ্রকার চিন্তার বিলাস। মহারাণীর পান্তাভাত খাইবার সখের মতো এক অভিনব সখ।

রাত্রি গভীর হইতে থাকে। গাড়ীর আরোহীরা অনেকেই ঘুমের শরণ লইয়াছে—বসা, দাঁড়ানো, আধবসা, আর আধ-দাঁড়ানো অবস্থায় যে যেমনে পারিয়াছে। গাড়ীটা মধ্যম শ্রেণী, তাই উত্তম, মধ্যম, অধম—তিন শ্রেণীর লোকেই আসিয়া ভীড় করিয়াছে।

আমারই মতন যাদের গাড়ীতে ঘুম আসে না, খুব সম্ভব তেমনি দু'একজন বই বা সিগারেটের সাহায্যে জাগিয়া আছে। লৌহচক্রের কর্কশ শব্দটা অনেকক্ষণের অভ্যাসে ক্রমশ সহনীয় হইয়া আসে, তাই রমণী-কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন আর অস্পষ্ট মনে হয় না। সব কথাই স্পষ্ট শোনা যায়। পূর্বে কি আলোচনা হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই, মাঝামাঝি শুনিতে পাই।

*   *   *   *

—ওই যে বললাম—আমরা ছিলাম দুই বোন! সে আর আমি—সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির দুজনে। সে এক অদ্ভুত, কল্পনাবিলাসী ভাবপ্রবণ মেয়ে। পৃথিবীর কোন জিনিসই সে চাইত না, আপনার মনে আপনি কোন্ স্বর্গলোকের স্বপ্ন দেখতো সে-ই জানে।...তাই সে যখন প্রেমে পড়লো—

—দু'জনের মধ্যে বড়ো কে? সে না তুমি?

কথার মাঝখানে ছেদ পড়ে সুনন্দার অনাবশ্যক প্রশ্নে।

'তুমি' শব্দটা কানে এতো বিসদৃশ ঠেকে। ভদ্রমহিলা সুনন্দার চাইতে বড় যদি বা না হইতে পারেন, ছোট নিশ্চয়ই নয়, কিম্বা সাল তারিখ মিলাইয়া যদি সাব্যস্ত হইয়া থাকে ছোটই, তবু এতো স্বল্প পরিচয়ে 'তুমি'!

ভাবিতেই পারি না আমরা।

আধুনিকা হইবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুইটি জিনিস আজ পর্যন্ত অভ্যাস করিতে পারিল না সুনন্দা। ছাড়িতে পারিল না পান, আর শিখিতে পারিল না 'আপনি'।

ভদ্রমহিলা এক মিনিট চুপচাপ থাকিয়া উত্তর দিলেন—বড? ও, সে-ই বড় ছিল!......

—হ্যাঁ, সে যখন প্রেমে পড়লো, একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলো। কিন্তু হলে হবে কি, তার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া সাধারণ সংসারী জীবের কর্ম নয়। সে যখন প্রাণভরা আবেগ নিয়ে যেতো, উত্তরে পেতো উপহাস। মন তার ভেঙে পড়তো প্রেমাস্পদের নিষ্ঠুরতায়। আমি ছিলাম ঠিক তার বিপরীত স্বভাবের, প্রতিদিন তার এই অপমান আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলতো। বলেছি তো, আমার স্বভাব ঠিক তার বিপরীত। সে যেমন পৃথিবীর কিছুই চায় না, আমি তেমনি সব চাই—ঘরসংসার, অর্থসম্পদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, সব কিছু চাই আমার। বাঁচার মতো করে বাঁচতে চাই। তাই অহরহ আমার সেই বড়বোনের সঙ্গে হ'ত ঠোকাঠুকি। তা'কে আমি ক্রমাগত বোঝাতে চাইতাম—তোমার এ পথ বাঁচবার পথ নয়, এরকম ভঙ্গুর মন নিয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকা যায় না।...সে ম্লানমুখে বসে বসে শুনতো আমার কথা, প্রতিবাদ করতে পারতো না, কিন্তু ভারী মন-মরা হয়ে পড়তো। মজা এই হল—যতক্ষণ আমি থাকতাম আমার মতবাদ শানিয়ে, দিদির স্বামী প্রভৃতি থাকতেন খোসমেজাজে, কারণ আমি তাঁর কাছে সহজবোধ্য।.....আর দিদি একলা থাকলেই তার ম্লানমুখ আর ছলছল হৃদয়ের করুণ আবেদনে তিনি উঠতেন বিব্রত হয়ে, উঠতেন উপহাস করে। দোষ নেই তাঁরও—সবাই সবাইয়ের জন্যে সৃষ্টি হয় না। সবাই সবাইকে বুঝতে পারে না।

—তবে ও রকম লোকের প্রেমে পড়লো কী করে? বিয়ে করলো কেন তোমার দিদি?

—কেন?

তাকাইতে সাহস করি না, অনুচ্চ একটু হাসির আওয়াজ পাই।

—কেন করলো সে প্রশ্নের উত্তর আমাদের দেশে নেই। কিংবা কোন দেশেই নেই হয়তো। আসল কথা কি জানেন, পৃথিবীটা যে মাটির, এটার মতো খাঁটি সত্যি কথা আর নেই। যারা স্বপ্নের দেশের লোক, তাদের এখানে মানাবে কেন?

ভাষা এবং ভাব দুইটাই যে বেশ একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সে কথা স্বীকার করিতে হয়। আশ্চর্য হই না। সেই অপূর্ব মুখের অধিকারিণীর মুখ হইতে শাড়ি-ব্লাউস আর যুদ্ধের বাজারের গল্প শুনিলে শক খাইতাম সন্দেহ নাই! কিন্তু বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো কেন? সুনন্দা কোন্ গভীর

তত্ত্বের তথ্য রাখে? বরং উদীয়মান কোনো সিনেমা-স্টারের গল্প করিলে জমিত ভালো।

—তাই বলছিলাম ওদের জন্যে পৃথিবী নয় বা পৃথিবীর জন্যে ওরা নয়, আস্তে আস্তে মরতে হয় ওদের। সেও তেমনি করে ধীরে ধীরে মরে গেল।

—মারা গেল? বল কি?

—গেল বৈ কি। আর বলতে গেলে আমিই তাকে খুন কবলাম।

—খুন!

—খুন ছাড়া আর কি! তার মতো অপদার্থ জীবের বেঁচে থাকবার দরকারটা কি অসম্মান সয়ে সয়ে? হ্যাঁ, বিপরীত স্বভাব সত্ত্বেও ভয়ঙ্কর ভালোবাসতাম আমি তাকে, সে যেন আমারই 'আমি',—হ্যাঁ কি বলছিলাম—ভালোবাসতাম বলেই আমি তাকে খুন করে ফেললাম, আস্তে আস্তে গলা টিপে।.....কই, চমকে উঠলে না? বিশ্বাস করছো না? ঘটনাটা কিন্তু সত্যি। তারপর থেকে শুরু হ'ল আমাব প্রতিষ্ঠার। অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেললাম লোকটাকে।

—দিদির বরের সঙ্গেই বিয়ে হল নাকি তোমার?

সুনন্দাব প্রশ্নগুলো এমন গ্রাম্য কেন? সুনন্দার ভাষাটা এতো অমার্জিত কেন?

ভদ্রমহিলা প্রশ্নটা এড়াইয়া হাসিয়া ওঠেন—এখন অবশ্য আমার বর বলেই সমাজে পরিচয়।

—তোমার সঙ্গে তাহলে বনে?

—ভয়ঙ্কর। বনবে বৈ কি, বনতেই হবে যে। হ্যাঁ, এখন আমি খুব সুখী। যা চাইতাম, সবই পেয়েছি, পাচ্ছি, আদায় করে নিচ্ছি। হাওয়ার মতো হাল্কা হয়ে ভেসে যাচ্ছি। শুধু যেদিন শ্রাবণের দুপুরে বৃষ্টি পড়ে না, খালি মেঘ করে থাকে.....শুধু যেদিন চলন্ত ট্রেনে সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়ে, বাইবে ওঠে জ্যোৎস্না, সেদিন তাকে মনে পড়ে যায়। সেই আমার অভিমানিনী বড় বোনকে। ভযানক মন খারাপ হয়ে যায়, অস্থির লাগে। মনে হয় সে যদি বেঁচে থাকতো, সে যদি এমন করে মুছে না যেত! মনে হয়, হয়তো আমার এই সুখের ছদ্মবেশ মনকে ছলনা, হয়তো নিজের মতো করে সে—ই সুখী ছিল। কিন্তু আমিই তাকে খুন করেছি.....আস্তে আস্তে গলা টিপে.......

এতক্ষণে বুঝিতে পারি।

অপ্রকৃতিস্থ।

সুনন্দাকে সরিয়া আসিতে বলিব নাকি? ও অমন গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছে কেন? সুনন্দার কি সন্দেহ হইতেছে না?...হইবে কি, মগজে এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকিলে তো? কিন্তু ডাকিই বা কিভাবে? জল চাহিব? সে তো আমারই কাছে। থাক, খুব বেশী পাগল কি? না বোধ হয়। তা'ছাড়া আমার দৃষ্টি এড়াইয়া কি আর করিবে?

বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না।

পরবর্তী স্টেশনটার কাছাকাছি আসিতেই এক ভদ্রলোক বাঙ্কের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া সম্মুখবর্তিনীর প্রতি বাঁকা কটাক্ষে—আশা করি ভুলে যাওনি—এখানে চেঞ্জ করতে হবে? বলিয়া বেডিং-সুটকেস প্রভৃতি লইয়া বীরবিক্রম সুরু করিয়া দেন।

পরণে চড়ারঙের খাঁকি সুট। মুখে-চোখে, আর ছাঁটা গোঁফে কড়া মিলিটারি ছাপ।

—ওগুলো নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছো কেন? স্টেশন আসুক, কুলিরাই তো—

অসামান্যা উঠিয়া দাঁড়ান।

—ড্যাম কুলি। এক মিনিট মাত্র স্টপেজ তা জানো? উঃ, কী দুর্ভোগ! গরমে একেবারে ফেন্ট হবার যোগাড় হচ্ছিল। সেকেন্ড ক্লাস টিকিট কিনে এভাবে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করা—কেবলমাত্র রিজার্ভেশানের অভাবে এইটি হল। দেখি, বাকী সময়টুকু যদি একটু ভদ্রভাবে যাওয়া যায়।

অর্থাৎ গাড়ীর এতোগুলি আরোহীর মধ্যে ভদ্রভাবে যাইবার যোগ্যতা যে কেবলমাত্র তাঁহারই আছে, সেটুকু সকলকে জানাইয়া দেওয়া। কি কারণে কি দুর্ভোগ, সে তথ্যটুকু তো তাঁহার সহচরিণীর না জানার কথা নয়।

ভদ্রমহিলা আর উত্তর দেন না। জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়ান।

—সবসুদ্ধ কটা ছিল—সাতটা না? টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে?—...না কি ওটা বাদে?...কি, তুমি যে একেবারে স্ট্যাচু বনে গেলে! এতক্ষণ তো গ্র্যান্ড চালাচ্ছিলে? যাক্ তোমার আর একটা বিদ্যার পরিচয় পাওয়া গেল—এমন মার্ভেলাস গল্প বানাতে পারো, সেটা জানা ছিল না।...এই কোলি! কোলি! এই কোলি, ইধার আও।...তিনঠো কাহে? দোনো আদমীকো মাল...এই এই হুঁসিয়ারসে...ব্যস ব্যস—। শালা 'গিধ্যোর'।...কি তুমি নামবে, না—থেকেই যাবে? আশ্চর্য!

ট্রেন ছাড়িয়া দেয়।...

থাকিয়া যান নাই, শেষ পর্যন্ত নামিয়াছেন।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা শোনার পর পূর্ব—ধারণাটা আর পোষণ করা চলে না, আর যাই হোক পাগলিনী নয়। সঙ্গদোষ কথাটা মিথ্যা নয়, খাকি সুটের পিছন পিছন নামিয়া যাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গেই যেন মুগ্ধভাবটা লুপ্ত হইয়া যায়।—জুৎ করিয়া বসি, সুনন্দার পাশেই বসি এবার।

—বোকা পেয়ে তোমায় খুব ধাপ্পা দিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা!

—কে বললে ধাপ্পা?

আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ, জোৎস্নার ছায়া ম্লান। মুখ দেখা যায় না সুনন্দার, শুধু উত্তরটাই শোনা যায়।

—ধাপ্পা—সে তো প্রমাণ হয়ে গেল পতিদেবতাটির কথায়।...বোধহয় ভেবেছিলেন—লোকটা তো ঘুমোচ্ছে—বসা যাক এক আরব্য উপন্যাসের গল্প ফেঁদে—সময়টা কাটবে ভালো।

—ভুল করছো—শাহারজাদীরা আরব্য উপন্যাসের গল্প ফাঁদে, স্বামীরা ঘুমিয়ে পড়লে নয়, জেগে থাকলেই। ভুলিয়ে রেখে মৃত্যুকে এড়াতে। পড়নি আরব্য উপন্যাস?

আরব্য উপন্যাস অবশ্য পড়িয়াছি—কিন্তু সুনন্দার মুখে এমন রূপক-ঘেঁষা কথা কখনো শুনিয়াছি কিনা মনে করিতে পারি না।...সহজ ভাবে প্রশ্ন করি—তুমি কি বিশ্বাস করো ভদ্রমহিলা যা বলে গেলেন সব সত্যি?

—সব, শুধু একটা বাদে।

—কি, ওই খুনটা?

—না, ওই পরিচয়টা। দু'বোন নয়—দু'জন। একজনের ভিতরে থেকে অহরহ যারা দ্বন্দ্ব করে। যাদের মধ্যে একজনকে অবশেষে বেছে নিতে হয় মৃত্যু।

অবাক হইয়া তাকাই।

সুনন্দার কথার মধ্যে আর যতো দোষ থাক, দুর্বোধ্যতা—দোষের পরিচয় তো কখনো পাই নাই। ব্যাপার কি ?...

খণ্ড মেঘের দল কিছুক্ষণের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছে জ্যোৎস্নাকে, অবাধ স্বাধীনতায় মর্ত্যলোকে ছড়াইয়া পড়িতে তাই দ্বিধা নাই তাদের। চাঁদের আলোয় সুনন্দার মুখ কি নূতন দেখিলাম ?

বিস্মৃত অতীতে কোনোদিন কি দেখিয়াছিলাম ?...

নিত্য পরিচয়ের গণ্ডী ভাঙিয়া অপরিচয়ের মোহময় লোকে কে পৌঁছাইয়া দিয়াছে ওকে? জ্যোৎস্না ?...আমাদের জীবনে জ্যোৎস্নার কিছু দাম আছে? প্রকৃতির অনুশাসনেই মাত্র নির্দিষ্ট নিয়মে আসা-যাওয়া করে না কি ?

হয়তো তাই।

শুধু যেদিন চলন্ত ট্রেনে জ্যোৎস্না নামে, সহযাত্রীরা পড়ে ঘুমাইয়া...সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া ওঠে ভিতরের ঘুমন্ত নারী।...পৃথিবীর লোকের অসম্মানের ভয়ে আপনার চারিপাশে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া তুলিয়া যে গড়িয়া রাখিয়াছে নিজের কবর।...হঠাৎ দেখিলে যাকে চিনিতে দেরী হয়।...

[১৩৫৩]

স্বপ্নভঙ্গ

নেহাৎ যে ভাতের অভাব ঘটিয়াছিল এমন নয়, তবু বেকারত্বের যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠিবার পূর্বেই উপার্জনের চেষ্টায় একদিন মগের মুলুকে আসিয়া হাজির হইলাম।

বলা বাহুল্য আমার এই বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টায় বাড়িতে কাহারও তিলমাত্রও সহানুভূতি ছিল না। একে তো মায়ের 'কোলের ছেলে' হইয়া জন্মানোর অপরাধে চিরকাল সকলে আমার বয়সটাকে হাসিয়া উড়ায়, আজ পর্যন্ত সাবালক বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার উপর একেবারে মুলুক ছাড়া হওয়া।

সম্মতি থাকার কথা নয়।

আমি কিন্তু উপার্জনের জন্য যত না হোক, নিজের নাবালকত্ব ঘুচানোর জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলাম। বন্ধু সুরেশ থাকে বর্মায়—বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র বছর দুই আগে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"র অনুপ্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, ঈশ্বর জানেন কি করে! চিঠিপত্রের আচে মনে হয় যেন 'লাল' হইতে সুরু করিয়াছে। লুকাইয়া তাহাকেই অনুরোধ করিয়াছিলাম আমার 'আখেরে'র চিন্তা করিতে। সে ঢালা হুকুম দিয়াছে, "চলে আয়—যা হয় একটা হবেই।"

অতএব 'কোন বাধা আমি মানি না' গোছের মনোভাব লইয়া জাহাজে চড়িয়া বসিলাম।

মার অশ্রুসজল অভিযোগ, দাদাদের অভিমানব্যঞ্জক গম্ভীর মুখ এবং বৌদিদিদের সস্নেহ অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়াও অটল ছিলাম, টলিলাম জাহাজে উঠিয়া। প্রথমে মাথা টলিল, তাহার পর পা, অতঃপর সর্বাঙ্গ এবং অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে হৃদয় সেও রীতিমত টলিতে লাগিল।

প্রথমে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হইল কি? পরে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হয় নাই, শেষ

পর্যন্ত ভাবিলাম—কাজটা গর্হিত হইয়াছে। মিথ্যা বলিব না—ফেরত ডাকেই ফিরিয়া আসিব, এমন সাধু সঙ্কল্পেরও উদয় হইয়াছিল।

তবে কথায় বলে 'জলে পড়া'। সেই জলে পড়া অবস্থায় মনের ভাব যতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, ডাঙ্গায় পা ফেলিতে তার অনেকটা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের হাস্যোজ্জ্বল মুখ চোখে পড়ায় সমুদ্রপীড়ার গভীর পীড়া ভুলিয়া মুখে হাসি ফুটিল।

—কি রে, এমন 'ডাইনে খাওয়া' চেহারা কেন? সুরেশ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—খুব বুঝি ভুগেছিস 'সী-সিক্‌নেসে'?

—আর বলিস কেন—পাঁচ দিন জল নেই পেটে। তুই এসেছিস তা' হলে? এমন ভাবনা ধরেছিল—

—আসব না মানে? কথার ভূমিকাস্বরূপ চিরপরিচিত থাপ্পড়টির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সুরেশ উত্তর দেয়—জ্যান্ত থেকেও আসব না? মরে গেলে প্রেতাত্মা হয়েও আসতাম তোকে রিসিভ করতে!

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ততদূর করতে হ'ল না তোমায়, এখন দেখ আমার জিনিসপত্রগুলো—

—সব ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্যে ভাবনা নেই, তোর অনারে কাজে গেলাম না আজ। আয় দেখি—

দেখিলাম সুরেশ ইতিমধ্যে বেশ লায়েক হইয়া উঠিয়াছে। না হইবে কেন! মায়ের 'কোলের ছেলে' তো নয়!

বাসায় যাইবার পথেই সুরেশ জানাইল, এসে পড়েছিস ভালোই হয়েছে—আমাদের বড় সাহেবের আলাপী একটা সাহেব—বার্মিজ সাহেব অবশ্য, খোঁজ করছিল একটা লোকের। ইনসিয়োর আফিস! মাইনেটা মনে হয় খুব খারাপ নয়, কালই একবার 'ইনটারভিউ' দিয়ে আয় না।

আসিতে আসিতেই যাই হোক একটা চাকরির বার্তা পাইয়া মনটা কিঞ্চিৎ খুসী হইল। জ্ঞাতব্য বিষয় দুই চারিটা জানিয়া লইতে লইতে বলি—তুই সঙ্গে যাবি তো?

—আমি? আমি—আমার কি করে যাওয়া সম্ভব হয়? আজ কামাই করলাম! কেন, ভয় খাচ্ছিস নাকি? তুই দেখছি সেই রকম নার্ভাস আছিস এখনো। কিছু ভাববার নেই, এখান থেকে বড়সাহেব ফোন্ করবে অখন! সব ঠিক হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে যাস বরং, কাজের ভিড় কম থাকে, কথাবার্তার সুবিধে করতে পারবি। সার্টিফিকেটগুলো এনেছিস তো? হ্যাঁ, জায়গাটা একটু ঘিঞ্জিগোছের বটে, তা' ছাড়া পথঘাট তোর অজানা। আমি বলি কি একটা ট্যাক্সিই নিস, ঠিকানা বলে দিলে ঠিক পৌঁছে দেবে। বুকে বল আনো 'নওজোয়ান'।

পেটেন্ট থাপ্পড়ের জোরে সুরেশ আমায় চাঙ্গা করিয়া তোলে।

পরদিন সুরেশের উপদেশ ও বরাভয় সম্বল করিয়া বাহির হই—মংফু টুংফু কি গ্যাং-কো—ঈশ্বর জানেন কাহার উদ্দেশে—একেই তো অজানায় আমার বড় ভয়, তার উপর সারাদিন মেঘ করিয়া থাকার দরুণ মনটাও যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জায়গাটা সুরেশ নিতান্ত বিনয় করিয়া "একটু ঘিঞ্জিগোছের" বলিয়াছে। 'একটু' নয়, যৎপরোনাস্তি। 'রাজরাস্তা' বলিতে সরল একটা পথই নাই, মনে হয়—যে যেখানে পাইয়াছে, যথেচ্ছভাবে দোকান গাড়িয়া বসিয়া আছে, রাস্তাই তাহাদের মর্যাদা বজায় রাখিতে ঘুরিয়া বাঁকিয়া যেন-তেন-প্রকারে নিজের একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। সেই সঙ্কীর্ণ গলি সঙ্কীর্ণতর হইবার মুখে একটা মোড়ের মাথায় গাড়ি থামাইয়া চালক মহাপ্রভু সসম্ভ্রমে জানাইলেন গাড়ির আর অগ্রসর হইবার

ক্ষমতা নাই, অতএব নামা দরকার। বেশি হাঁটিতে হইবে না—ডানহাতি গলিটা পার হইয়া বাঁহাতি আর একটা ধরিলেই খানচারেক বাড়ির পরেই দোতলা বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সটান উপবে উঠিয়া গেলেই গন্তব্যস্থান মিলিবে। লোকটা ইংরাজি জানে, ভদ্রগোছের চেহারা, ভাড়া মিটাইয়া দিয়াও তাহাকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া দুরু দুরু হৃদয়ে অগ্রসর হইলাম। কি জানি বাবা, গাড়িটা ছাড়িয়া দিলে ফিরিতে পারিব কিনা।

পরবর্তী ঘটনার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে—নিজে নিজেই স্বীকাব করিলাম যে সাবালক হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে আমার। পূর্ব দক্ষিণ ঈশান নৈঋত কোন পথেই অভীষ্ট স্থান খুঁজিয়া পাই নাই শেষ পর্যন্ত—একই পথে পাঁচবার ঘোরাঘুরি করিযা অন্যেব সন্দেহভাজন হইবার ভয়ে পূর্বপবিচিত মোড়ে ফিরিয়া আসিলাম, দেখি ট্যাক্সির কোনো চিহ্ন নাই।—কোথায় গেল সেই জানে। অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকিবেই বা কেন সেটা আর মনে পড়িল না। তবে এটা যে সেই মোড়টাই কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া গেল। সব দোকানগুলাই এক ধরণের, সব মুখগুলাই এক ছাঁচের।

ঠিক এই সময—সারাদিনেব বর্ষাণোন্মুখ আকাশ বর্ষণমুখর হইয়া উঠিল। কথাটা শুনিতে কবিত্বের মত, কিন্তু সত্য বলিতে কি, আসলে মনেব অবস্থা যা দাঁড়াইল, তাহাকে ঠিক কবিত্বের কোঠায় ফেলা চলে না।

কোনোবকমে মাথাটা বাঁচাইয়া একটা জুতার দোকানের শেডের নীচে দাঁড়াইলাম...—বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নাই। পডন্তবেলা মেঘেব ছুতায় অসময়ে নোটিশ দিয়া গেল, কাজেই সন্ধ্যাদেবী আসিযা চার্জ বুঝিয়া লইলেন। আমি দাঁডাইযা দাঁডাইয়া ভিজিতেই লাগিলাম।

দোকানদাবটাব সঙ্গে ইংবাজীতে একটু আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিযা ব্যর্থ হই, লোকটা নীরেট ব্রহ্ম।

পাশেই একটা রুমালেব দোকান হইতে—ওযালা নয—ওয়ালী বোধ হয় আমার দুরবস্থায় দযাপববশ হইযা ভিতরে গিয়া বসিতে অনুবোধ জানাইতেছিল,ভাষা না বুঝিলেও ভাবে বুঝি। কিন্তু মাব সনির্বন্ধ সাবধান-বাণী মনে পডিল। কাজেই সবিনয়ে তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া ভিজিতেই থাকি।

একেই বলে সুখে থাকিতে ভূতেব কিল খাওয়া! কি এত প্রয়োজন পড়িয়াছিল সুখের কলিকাতা ছাড়িযা এই ভাগাড়ে আসিয়া মবিতে? ভদ্রলোকের জায়গা নাকি? সুরেশ চিরকেলে ডাকাবুকো, ওব এসব হতচ্ছাডা জাযগা পোষায। কিন্তু আমার? নমস্কার বাবা! আপাত-দৃষ্টিতে এই জলে জলময নোংবা ঘিঞ্জি পাডাটাকেই সারা ব্রহ্মদেশেব প্রতীক বলিযা মনে হয়।

বৃষ্টি যখন ধরিল তখন রীতিমত অন্ধকার। অনেক অনুসন্ধানে একখানা অশ্বযান সংগ্রহ করিয়া চডিযা বসি, গাডোযানটাব মুখে দুই-একটা বোধগম্য হিন্দি শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। সুরেশের ঠিকানাটা বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গাডির জানালা বন্ধ কবিয়া গুছাইয়া বসিলাম। তখনো টিপি টিপি বৃষ্টির বিবাম নাই, ভিজে পোষাকের উপর জোলো হাওয়া লাগায় দস্তুরমত শীত কবিতেছিল।

গাড়ি চলিতেছে...আমি ঢুলিতেছি...পথ ফুরাইবার লক্ষণমাত্র নাই। প্রথমে ভাবি—হাজার হোক ঘোড়ার গাড়ি, চল্লিশ মাইল স্পীড্ আশা করাই অন্যায়, ন্যায্য সময়ে পৌঁছাইয়া দিবেই। গাড়োয়ানী করিয়া খায়, ঠিকানা দিলে পথ চিনিবে না?

হায় মূঢ় হৃদয়! কি ভুলই করিয়াছি! এই বিশাল জগতে কোটি কোটি লোক পথভ্রান্ত হইয়া

ঘুরিয়া মরিতেছে, আর এ তো তুচ্ছ একটা ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান।

ভুল যখন ভাঙিল তখন রাত্রি দশটা, হঠাৎ চমক-ভাঙা হইয়া মনে হইল সারারাত বুঝি চলিতেছি...হয়তো বা ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গদেশেই আসিয়া পড়িলাম! অগত্যা গাড়ির জানালা খুলিয়া তারস্বরে চেঁচাই। বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি আমায় হয়তো মাতাল ঠাওরাইয়া যথেচ্ছ চরিয়া বেড়াইতেছিল, সাড়া পাইয়া গাড়ি থামাইল এবং নামিয়া ভাড়া চাহিল।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সুরেশের বাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নাই।

কাতর আমি দীন ভাষায় করুণ ভঙ্গিতে বার বার নিজের গন্তব্যস্থানের বিষয় প্রশ্ন করি...উত্তরে হতাভাগা যাহা জানাইল তাহার তাৎপর্য এই—ভুলক্রমে উল্টাপথে আসা হইয়া গিয়াছে। অতএব এই রাত্রে—এই দুর্যোগেব রাত্রে ফিরিয়া সে পথ খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। অসঙ্গত বলিলেও নাকি অন্যায় হয় না। ঘোড়া রীতিমত 'টায়ার্ড' হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সে বাধ্য হইয়া আমাকে এই অনাথ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নিজের আস্তানায় যাইতে চায়, শুধু তার আগে চায় তাহার প্রাপ্য ভাড়া—নগদ তিন টাকা বারো আনা মাত্র।

সেই অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থাতেও ধৈর্য অবলম্বন করি, চুপ করিয়া থাকি, গালাগাল দিয়া গাত্রদাহ মিটাইব সে সাহস নাই। সরু গলির ঝাপ্‌সা মিটমিটে আলোয় সেই বাঘমুখো মগ গুণ্ডাটার পানে চাহিয়া আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হইবার যোগাড়। গালমন্দ তো দূরের কথা।

আহাম্মুকির উপর আহাম্মুকি—পকেটে বাড়তি কতকগুলো টাকা।—খরচের সুবিধা করিতে গোটা পঁচিশটা এক টাকার নোটে চেঞ্জ করিয়া লইয়াছিলাম, সেটা পকেটেই রহিয়া গিয়াছে। যদিও কোটের ইন্‌সাইড্ পকেটে লুকানো আছে, তবু ভরসা বলিতে কিছুই নাই। লোকটা যদি একবার আমার হাতটা চাপিয়া ধরে, টাকা তো টাকা, হাতে বাঁধা ঘড়িটা হইতে চোখের চশমাখানা পর্যন্ত খুলিয়া উহার অপর হাতে তুলিয়া দিবো নিজের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস রাখি।

অতএব তাহার বোকামির জন্য কৈফিয়ত চাহিবার পরিবর্তে নিজের বোকামির খেসারত ধরিয়া দিই। পার্স খুলিয়া নগদ করকরে আস্ত টাকাই চারটে দিই। চার আনা কাটিয়া লইবার কথা মুখেও আনি না।

গুণ্ডাকৃতি হইলেও বোধ হয় নেহাৎ গুণ্ডা নয় লোকটা, আমার বদান্যতায় খুসীই হইল। বাঘমুখে নেকড়ের হাসি হাসিয়া দিব্য আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে সেলাম ঠুকিয়া জানাইল—ভাবনার কারণ কিছুই নাই, যৎসামান্য মূল্যের বিনিময়ে রাত্রিটুকুর মত আশ্রয় এখানে নাকি বিস্তর মেলে, চাই কি আহারও জুটিতে পারে।

অনির্দিষ্ট ভাবে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া লোকটা খোসমেজাজে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। মিথ্যা বলিব না—চারিদিক চাহিয়া হঠাৎ মনে হইল সারা পৃথিবী কেবলমাত্র সরিষার ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে।

নোংরা অপরিসর গলি, দু'ধারে ইতর বস্তি, বাঁকাচোরা জোড়াতালি দেওয়া কুশ্রী ঘরগুলা যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িতে চায়। গাড়ি ইহার ভিতর আসিল কেমন করিয়া, এই এক আশ্চর্য ব্যাপার।

এখন উপায়?

ও তো বলিয়া গেল রাত্রির মত আহার ও আশ্রয় মেলে—কোথায় সে? কেমন আশ্রম? নিশ্চয়ই হোটেল—সস্তার হোটেল। আহার চুলায় যাক্, আশ্রয় একটা অবশ্যই চাই। এই তো—আবার বৃষ্টি নামিল, সারারাত দাঁড়াইয়া কিছু আর ভেজা চলে না। তবে হ্যাঁ, তেমন সন্দেহজনক ভাবে

পথের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিলে রীতিমত আশ্রয় মিলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়—রাজার অতিথিশালা, সরকারী আশ্রয়। কিন্তু আপাতত তাহাতে তেমন উৎসাহ বোধ করি না।

'যা থাকে কপালে' গোছ ভাবে সামনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকি। দুর্যোগের রাত—তাই ইতিমধ্যেই পাড়াটা নিঝুম মরিয়া গিয়াছে, ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। আমি? মনে মনে কল্পনা করি...আমি একা এই মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া একটা কুৎসিত পল্লীর গোপন পথে বেড়াইয়া বেড়াইতেছি! অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে পারে সহজে, কল্পনা করাই শক্ত।

কিন্তু এই অনির্দিষ্ট যাত্রার সমাপ্তি ঘটে...সাহস অনুভব করি, পথ অনির্দিষ্ট হইতে পারে, অসীম নয়। বিনা নোটিশে এক জায়গায় থামিয়া বসিয়াছে। ব্লাইণ্ড গলি।

হতভাগা গাড়োয়ানটা যে ইচ্ছা করিয়াই এখানে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, সে বিষয় আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ভূতগ্রস্তের মত আবার উল্টামুখ ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে সুরু করিয়াছি, সহসা পিছনে—নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না—পরিষ্কার বাঙলায় প্রশ্ন হয়—আপনি কি বাঙালী?

কণ্ঠস্বর মধুর কিনা তলাইয়া দেখি নাই, কিন্তু পথভ্রান্ত নবকুমারের কানে—"পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো?" এর চাইতে বেশি মধু বর্ষণ করিয়াছিল কি?

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই যেন ধাক্কা খাইলাম।...অথচ এ ছাড়া এর চাইতে ভালো কি আশা করিবার ছিল—এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে?

তবে হ্যাঁ, সত্যই আশা করিবার মত নয়। বাঙ্গালীর মেয়ে—সমুদ্র ডিঙাইয়া এই শত শত মাইল দূরে আসিয়া, চোখে কাজল আর মুখে খড়ি মাখিয়া কুৎসিত জীবনযাপন করিতেছে—এ দৃশ্য যে কতটা অসহ্য, সে বোধ কবি চোখে না দেখিলে বোধগম্য হয় না।

বয়স হয়ত বেশি নয়—হযতো বেশি, মুখ দেখিযা সহসা অনুমান করা শক্ত, লালিত্যবর্জিত মুখে অনেক অনাচারের ছাপ সুস্পষ্ট। একটা মোমবাতি উঁচু করিয়া ধরিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।...

গা'টা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ করিয়া ওঠে...তবু—বাঙলা কথার মোহ, আর এই বিশ্রী বেঘোর বেপোট অবস্থা। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করি—এখানে হোটেল আছে কোথাও?

—হোটেল? কেমন বিমূঢ়ভাবে উত্তর করে—হোটেল এখানে তো নেই, খানিক দূরে আছে কিন্তু সেখানে কি আপনি থাকতে পারবেন? ভদ্রলোক বাঙালী।

—উপায় কি—রাস্তায় দাঁডিয়ে তো সারারাত কাটাতে পারি না! আবার তো জোরে বৃষ্টি আসছে

যে রকম বীর-বিক্রমে কথাটা উচ্চারণ করি, যেন আমার এই নিবতিশয় দুরবস্থা এবং আসন্ন বৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সেই।

সে কিন্তু নিজের দোষই স্বীকার করিয়া লয় যেন। কুণ্ঠিত ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলে—সত্যি বড্ড বিষ্টি আসছে যে—কি হবে বলুন তো? সে তো ঠিক হোটেল নয়—বরং ভাঁটিখানা বলতে পারেন, খালি মাতাল গুণ্ডা আর ছোটলোকের আড্ডা—গেলে হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—

বিরক্তভাবে বলি—এই বা কি সম্পদে পড়োছি? দুর্ভোগ যখন রয়েছে কপালে—

—তাই তো—কিন্তু আপনি—আপনি এদিকে এ সময় কেনই বা এলেন?

—ইচ্ছে করে মোটেই আসিনি, হতভাগা গাড়োয়ানটা পথ ভুল করে এখানে ছেড়ে দিয়ে

চলে গেল। রাস্তা-ফাস্তা কিছুই চিনি না—সবে কাল নেমেছি জাহাজ থেকে—

—কাল এসেছেন? কলকাতা থেকে?

বাতির আলোয় ওর খড়িমাখা পাণ্ডাশ মুখখনা যেন উজ্জ্বল দেখায় হঠাৎ।

—হ্যাঁ।

বিরক্ত ভাব বজায় রাখিয়াই উত্তর দিই। দাঁড়াইয়া ইহার সঙ্গে কথা কহিতেছি—মনে করিতেই প্রেস্টিজে রীতিমত আঘাত লাগে।

—কলকাতায়—কোথায়? কোন্ রাস্তায় বাড়ি আপনার? শ্যামবাজারের দিকে?

কথাটা উচ্চারণ করে কেমন বোকা-বোকা সরল মেয়ের মত। রাগ করিবার কথা নয়, তবু এই গায়ে-পড়া আলাপে গা জ্বালা করিয়া ওঠে। ভাবি যে পা চালাইয়া চলি—আর কথার উত্তর দিব না।

কিন্তু মধুসূদন নাকি দর্পহারী। ঠিক এই সময় এমন মুষলধারে বৃষ্টি নামে যে চোখে কানে দেখিতে দেয় না, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ঘৃণ্য জীবটার পিছন পিছন তাহারই কোটরে গিয়া ঢুকি।

হ্যাঁ, কোটর ছাড়া তাহার আর বিশেষণ নাই। ঘর বলিলে ঘর কথাটার অবমাননা করা হয়।

জীবনে কোনদিন—জীবনে কেন—ক্ষণপূর্বেও কি ভাবিয়াছি—এরকম আস্তানায় রাত্রি কাটানো তো দূরের কথা, পা দিব?

মেয়েটা হয়তো তা' বোঝে, আমি যে ভদ্রলোক এবং ওর ঘরটা যে নিতান্তই ভদ্রলোকের অনুপযুক্ত, সে জ্ঞানটা ওর আছে।

অথচ এই দূর-নির্বাসনে অপ্রত্যাশিতভাবে বাঙালীকে—কলিকাতার লোককে—কাছে পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পায়। কোথায় বসাইবে, কি করিবে ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া ওঠে।

খাতির জিনিষটার এমনই গুণ, অতি বিরূপ চিত্তকেও ঈষৎ নরম করিয়া আনে, কাজেই অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে বলি—থাক্ থাক্, ব্যস্ত হতে হবে না। এই যে এই চেয়ারটায় বসছি।

গৌরব করিয়া অথবা অন্য নামের অভাবে চেয়ারই বলি, হয়তো একসময় ছিলই তাই, এখন টুল বলিলেও অন্যায় হয় না।

তাহার উপরই বসি, তা' ছাড়া আছেই বা কি ঘরে? আসবাবের মধ্যে তো এই ময়ূর-সিংহাসন, আর তিনপদবিশিষ্ট একখানি চৌকি, যাহার চতুর্থ চরণের স্থান অধিকার করিয়াছে একটা উপুড়-করা প্যাকিং কেস্।

চৌকির উপর বিছানা পাতা, তাকাইলে ঘৃণা হয় যেমন ময়লা, তেমনি ছেঁড়া। মেয়েটার শরীরে সাধারণ জ্ঞান কিছু আছে, আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাড়াতাড়ি সেই দৃষ্টিকটু জিনিষটা গুটাইয়া চৌকির পিছনে ফেলিয়া দেয়, চৌকির তলা হইতে টানিয়া বাহির করে একখানা ক্যাম্প চেয়ার। ধূলায় ভর্তি হইলেও জিনিষটা আস্ত। আঁচল দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া সেটা পাতিয়া বসিতে' অনুরোধ করে।

ওরই যেন মাথাব্যথা...এই ভাবেই গিয়া বসি। অথচ না বসিয়াও উপায় ছিল না। পিঠ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। একে গত ক'দিনের সমুদ্রপীড়ার দুর্বলতা, তাহার উপর এই দুর্ভোগ।

মেয়েটা নিরুপায় ম্লানমুখে প্রশ্ন করে—আপনার তো খাবার দরকার ছিল?

এখানে খাওয়া! ভাবতেই গা কেমন করিয়া আসে, তাড়াতাড়ি বলি—না না, খাবার দরকার

কিছুমাত্র নেই।

—থাকলেই বা কি করতাম। কণ্ঠস্বরে করুণ একটা হতাশ ভাব ফুটিয়া ওঠে—এখানে এক গ্লাস জল খাবারও প্রবৃত্তি হ'বে না আপনার। কোনো ভদ্রলোকেরই হবে না।

হঠাৎ একটু করুণার সঞ্চার হয়। আহা বেচারা, নামিয়াছে বটে—জাহান্নমের তলায় তলাইয়া গিয়াছে তবু কতোখানি নামিয়াছে সে জ্ঞানটা এখনো হারায় নাই।

একটু লঘুভাবে বলি—ভিজে পোষাক গায়ে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জলের দবকার কিন্তু সত্যিই হয় না।

ও মলিনভাবে একটু হাসে—কিন্তু চা পেলে তো ভালো হ'ত! কোনো ভালো জায়গায় যদি উঠতেন, ভিজে পোষাকও বদলাতে পেতেন, গরম খাবারও খেতে পেতেন।

—কি আর করা যাবে, ভাগ্যে নেই যখন?...বলিয়া হাসি।

অগত্যাই একটু হাসিতে হয়।

বাতিটা আমারই মুখের সামনে বসানো আছে। ওর মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট। মুখের সেই কুশ্রী লালিত্যহীনতা, খড়ি কাজলের বিকৃতি, কিছুই আর চোখে পড়ে না।

হয়তো কথা কওয়া সহজ হইয়া আসে সেই জন্যই।

নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই বা কেমন লাগে! ঘুম আসিবে না—আসা সম্ভব নয়, সারারাত্রি এই অদ্ভুত অস্বস্তিকর অবস্থায় প্রায়ান্ধকার ঘবে এক অস্পষ্ট নারীমূর্তির মুখোমখি বসিয়া থাকাই বা সম্ভব হয় কেমন করিয়া—চুপচাপ! কথা কওয়াই সহজ বরং। অরুচিকর হইলেও অশান্তিকর নয়, মন্দের ভালো।

নিজেই কথা পাড়ি—আমি যে বাঙালী, জানলে কি কবে?

কথা শুনে।

—কথা শুনে? অবাক হইতে হয়—কথা আবার কখন কইলাম? কার সঙ্গে?

—নিজের সঙ্গেই, সেই যে যখন পথ বন্ধ দেখে ফিরলেন? বললেন—"কি সর্বনাশ"!

অসম্ভব নয়, অজ্ঞাতসারেই বলিয়া থাকিব। বলি—রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলে নাকি?

—রাস্তায় নয় জানালায়। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম—বিষ্টি দেখছিলাম, দেখলাম আপনি যাচ্ছেন। এপাড়ায় এরকম সুট্-পরা ভালো ভদ্রলোকের তো আনাগোনা বিশেষ দেখি না, বর্মি গুন্ডা আর মুসলমান খালাসীর আড্ডা। কৌতূহল হ'ল, বাতি জ্বেলে দরজাটা খুলেছি—দেখি ফিরে আসছেন তাড়াতাড়ি। থাকতে পারলাম না—ডেকে ফেললাম। আপনার গলা শুনে—বাঙলা কথা শুনে ইচ্ছে হ'ল পূজো করি।

হাসিয়া ফেলি—কেন, বাঙলা কথাব এত দুর্ভিক্ষ নাকি? বাঙালী তো এখানে অজস্র আছে!

—আছে তো, কিন্তু এদিকে আসবে কেন তারা? মানুষে কি আসে এখানে? পিশাচপুরী। কারা আসে জানেন? শয়তান আর রাক্ষসের দল। নরকের কীট আর আমাদের মত আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা!

ওর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শেষের দিকটা হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কেমন যেন একটু মমতা জন্মায় মেয়েটার ওপর। ঈষৎ কোমল সুরে প্রশ্ন করি—তা' তুমি এখানে আছ কেন? এত দূরে এসে পড়লেই বা কি করে?

—সে অনেক ইতিহাস। শুনলে হয়তো আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আজ সাত বছর ধরে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি, তা' মনে করলে নিজেই শিউরে উঠি, আশ্চর্য হয়ে

যাই যে এত লাঞ্ছনাতেও বেঁচে আছি কি করে! তবু বেঁচেও রয়েছি। আশা হয়, হয়তো আবার কখনো মানুষের মতন করে বাঁচবো! এই হীন জঘন্য জীবনই যে আমার একমাত্র জীবন এ আমি এখনো ভাবতে পারিনে।

আহা বেচারা! হয়তো ভাল ঘরেরই মেয়ে ছিল। কে জানে কি ওর ইতিহাস!

—শ্যামবাজারে তোমার কেউ আছে বুঝি? প্রশ্ন করি।

—কেউ? সব—সব—সবাই আছে আমার সেখানে। আমাদেরই বাড়ি যে! দেখেন নি আপনি? বাজারের দিকে যেতে ডানহাতি গোলাপী রঙের বাড়ি? পাশের দিকে দেওয়াল—একটু একটু শ্যাওলা পড়া? রঙচটা সবুজ জানালা দরজা। মেরামত করা আর হয়ে ওঠে না—দেখেছেন তো সে বাড়ি?

সারা কলিকাতা সহরে নিত্য পথের দুই ধারে ও-রকম বাড়ি অসংখ্য আছে, অজস্র দেখিয়াছি, আলাদা করিয়া মনে রাখার কথা নয়, তবু ওর আগ্রহব্যাকুল ভাবটা দমাইতে ইচ্ছা হয় না, অল্প চিন্তার ভান করিয়া বলি—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে যেন—দেওয়ালের বালিটালিও কতক খসে গেছে, শ্যাওলা তো বিলক্ষণ।

—ঠিক, ঠিক ধরেছেন আপনি—উৎসাহে আর উত্তেজনায় ওর গলার স্বর যেন বুজিয়া আসে,—সেই বাড়ি। হ্যাঁ, খারাপ হয়ে তো যাবেই আরো, তারপর থেকে সাত বছর হয়ে গেল। বাবার কি আর বাড়ি মেরামত করবার সখ আছে? মুখে চুনকালি পড়ে গেছে। উঃ, আমারই জন্যে!

আচ্ছা জ্ঞানপাপী বটে! অপেক্ষাকৃত কঠিন সুরে প্রশ্ন করি—যাতে চুনকালি পড়ে এমন কাজ করছিলে কেন?

—নিয়তি আমার। বয়স ছিল কম, বুদ্ধি বিবেচনা আরো কম। চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া মানেই যে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, এ যদি জানতাম তখন!

গভীর একটা নিশ্বাস ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে আরো মন্থর করিয়া তোলে।

নিস্তব্ধতা ভাঙ্গে ও-ই আগে, আপনি রাগ করছেন, কিন্তু যদি শুনতেন আমার জীবনের কাহিনী, বুঝতেন কত অসহায় আমরা। ভেবে দেখুন দিকিন, মাত্র পনের-ষোলো বছরের একটা মেয়ে—জ্ঞান বুদ্ধিহীন, বিদ্যে যার ইস্কুলের সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত—

—ইস্কুলে পড়েছিলে নাকি? কোন ইস্কুলে? বাধা দিয়া প্রশ্ন করি।

—পড়েছি বীণাপানি স্কুলে। আমার নিজের নামটাও আবার বীণাপানি ছিল—মেয়েরা এত ক্ষেপাতো—

আমার বড় ভাইঝিটাও বীণাপানিতে পড়ে, ক্লাস নাইনেই পড়ে। মনে পড়িতেই বিদ্বেষবিমুখ চিত্ত অজ্ঞাতসারেই কেমন যেন স্নেহকোমল হইয়া আসে।...

আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া যাই।...

মমতার সঙ্গে শুনিতে থাকি ওর উৎপীড়িত জীবনের শোচনীয় ইতিবৃত্ত।...ক্ষুধিত বর্বরতার নৃশংস কাহিনী হয়তো এমনিই হয়, হামেসাই এমনিই ঘটে, এ কাহিনীতে মৌলিকত্ব কিছুই নাই। তবু বড় ভয়ঙ্কর, বড় করুণ।

প্রচ্ছন্ন প্রেমের বেদনায় মধুর সুন্দর যে হৃদয় অম্লান ফুলের মত পাতার অন্তরালে নিঃশব্দে ফুটিয়া থাকিতে পারিত, পশুর দুর্দান্ত লালসা তাহাকে ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিয়াছে ধূলিধূসর রাজপথে, টানিয়া লইয়া গিয়াছে কঙ্করাকীর্ণ কঠিন প্রান্তরে, ঠেলিয়া দিয়াছে কাঁটার জঙ্গলে। সেখানে কত

সংগ্রাম, কত ঝড়!

ঝড়ের ঝাপটে তুচ্ছ তৃণখণ্ড কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া পড়ে, কে তাহার হিসাব রাখে?

একদা যাহার নাম ছিলো বীণাপানি, অতি সাধারণ এক গৃহস্থঘরের চারিখানি দেওয়ালের অন্তরালে কল্যাণী-মূর্তিতে বেড়াইত, আজ আর তাহাকে মনে রাখিবাব দায়িত্ব কাহারও নাই।

জানিতে চাহিলে হয়তো বলিবে—'বীণাপানি বলিয়া কেহ ছিল না। বীণাপানি বলিয়া যে ছিল—মরিয়াছে'।

পুরুষমানুষ হইলেও ঘরের বাহিরের যথার্থ পরিচয়টা কি, ছদ্মবেশী দুনিয়াখানাব আসল চেহাবা কত ভীষণ, সে সম্বন্ধে সত্যই কোনো বোধ ছিল না। মানুষেব মুখে উপন্যাসের ঘটনা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়ি। উপন্যাস বটে,. কিন্তু অক্ষম লেখকের কুলিখিত উপন্যাস। আজ আর ফিরাইয়া লেখা চলে না? ফিরাইয়া দেওয়া যায় না ওকে—সুন্দর না হোক—সরল একটি জীবন—নিশ্চিন্ত জীবন?

আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করি—তুমি পালাতে চেষ্টা করো না কেন?

—পালাতে? কি ক্ষমতা আমার? এরা যদি জানতে পারে—কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে না? এদের তো জানেন না আপনি! কথায় কথায় ছোরা দেখিয়ে শাসায়, এতটুকু অবাধ্য হলে লোহা তাতিয়ে ছ্যাঁকা দেয়। মানুষের চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে ঘুবে বেড়ায় পিশাচ, বাক্ষস, শয়তান, নবকের কীট। এখন যাব অধীনে আছি আমি—বুড়ো চীনেম্যান একটা, ও বকম জঘন্য প্রকৃতিব লোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা ঈশ্বর বলতে পারেন। শুধু অর্ধেক দিন নেশায বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে এই সুবিধে। একটা মগ গুন্ডার কাছে তিরিশ টাকা দিযে কিনে নিয়েছিল আমায়। সে লোকটাই কি কম সাংঘাতিক ছিল। তিনটে খুন কবেছিল সে! এই যে আপনি বসে আছেন, তা'দেব চোখে পড়লে আস্ত রাখতো?

অজ্ঞাতসাবে কাঁপিয়া উঠি...সভয়ে পিছনেব অন্ধকারপানে তাকাই...কি জানি কেহ ছোরা উঁচাইয়া নাই তো?

বীণাপানি আমার অবস্থা বুঝিয়া অল্প হাসে, বলে—নাঃ, আজ আর ভয়ের কিছু নেই। আজ ওরা ডাকাতি করতে যাবে এক জায়গায়, কাল সন্ধের আগে আসবে বলে মনে হয় না।

আশ্বাসের কথা শুনিয়া হাতে-পায়ে খিল ধরিয়া আসে।...কি সব ভয়ঙ্কর কথাবার্তা! দুই হাত ব্যবধানের মধ্যে সচ্ছন্দে সহজ ভাষায যাহার সঙ্গে গল্প কবিতেছি, সেই মেয়ে ডাকাতের ঘব করে! ঘরের যাহারা বাসিন্দা, হয়তো এই ঘরে বসিয়া ছোবা শানাইয়াছে মানুযের বুকে বসাইতে। এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ভিতরটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া ওঠে। কিন্তু সকালের এখনো অনেক বাকী, তবু তো ঘরে আছি, পথে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে কেহ এক-ঘা লাঠি বসাইয়া দিবে কি না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি!

হতাশভাবে বলি—তা'হলে তোমার দেখছি কোন আশাই নেই!

ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া বীণাপানি চুপিচুপি বলে বসে—চুপ, দেওয়ালের কান আছে জানেন তো? আশা ছিল না—একটু হয়েছে। আপনার কাছে অবশ্য বলতে বাধা নেই—বাঙালী, ভদ্রলোক, একরকম বন্ধুই আমার। উপায়টা কি জানেন—স্কুলে যখন পড়তাম, সেলাই শেখাতেন মিশনারি মেম একজন, মিসেস উড্‌। বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধার করা বা তাদের সৎপথে চলবার সুযোগ দেওয়াই তাঁর জীবনের ব্রত। অনেক চেষ্টায় তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে একটা চিঠি দিয়েছিলাম।

সব কথা অবশ্য খুলে বলতে পারি নি, মানুষে পারেও না—বলেছি বিধবা, নিরাশ্রয়। তিনি আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছেন, লিখেছেন—তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলেই আমার ভার নেবেন। তা পৌঁছতে হ'লে চাই টাকা আর সুযোগ। পালাবার সুযোগ। মনে করেছি শেষ চেষ্টা একদিন করবোই—প্রাণপণ করে করবো। কথায় বলে—"মরার বাড়া গাল নেই"—তা' মরেই তো আছি একরকম। মনে করেছি সরে পড়বো, বাঁচি বাঁচবো, মরি মরবো। চীনে বুড়োকে জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিয়ে—দিনেবেলাই পালাতে হবে, বুঝলেন? রাত্রে বেরোলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। এখানকার লোকগুলো নিশাচর কিনা। আঃ, একবার যদি যেতে পারি মিসেস উডের আশ্রয়ে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যেখানে অন্তত পুরুষমানুষ নেই। পৃথিবীর বাইরেও যদি এমন কোনো দেশ থাকতো—যেখানে পুরুষের মুখ দেখতে হয় না!

ঈষৎ আহত ভাবে বলি—সব পুরুষমানুষই কি সমান?

—বেশির ভাগ। বিষাদম্লান কণ্ঠে উত্তর দেয় বীণা—আপনার মতন মহৎ আর ক'জন আছে, বলুন?

—মহত্ব তো কত! বিনয় করিয়া বলি।

—আছে, আপনি বুঝবেন না। বয়সে বড় হ'লেও অনেক ছেলেমানুষ আছেন এখনো। সে যাক্, কিন্তু একটুও ঘুম হ'লো না আপনার, অসুখ করবে।

হঠাৎ খেয়াল হয়, সত্যিই ভারী ঘুম পাইতেছে। কিন্তু ঘুমানো চলে না, তবে শুধু ক্লান্তি দূর করিতে চোখের পাতা দুইটা বুজিয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলেও একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু একে কিছু সাহায্য করিতেই হয়, টাকা সঙ্গে যখন আছেও কিছু।

একটু চুপ করিয়া বলি যাবার জন্যে টাকার কি করেছ?

—টাকা?

হঠাৎ ও চৌকি হইতে উঠিয়া আমার একান্ত কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, অস্বাভাবিক ভীতকণ্ঠে প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে—আপনাকে যখন সবই বললাম তখন বলি, টাকার যোগাড় কতকটা হয়েছে। দু' আনা এক আনা করে আস্তে আস্তে কিছু জমিয়ে ফেলেছি। বস্তির কারো কারো জামা-টামা সেলাই ক'রে দিয়ে, ছেঁড়া রিফু ক'রে, মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা পাই— ওখানে একটা নুলো মেয়েমানুষ আছে, কিছু করতে পারে না তার রান্না করে দিয়ে আসি লুকিয়ে, সেও মাসে মাসে কিছু দেয়, তা' ছাড়া চীনেটার যেদিন মন ভালো থাকে—

একটু ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া যায়।

আবার কিছুক্ষণ পরে পূর্ব কথার জের টানিয়া বলে—তবু এখনও আরও পাঁচ-সাত টাকা হ'লে ভালো হয়, পরে যাবার মত একটা ভদ্র কাপড়-জামাও নেই। কিন্তু কতদিনে যে হবে ভগবানই জানেন। যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে ওরা টাকার কথা, ঠিক কেড়ে নেবে, খুন করে কেড়ে নেবে। এক একটি পয়সা আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এও তবু একরকম আছি—চীনেটা কি বলে জানেন? একটা খালাসির কাছে নাকি বেচে দেবে! জাহাজের খালাসি—চাটগেঁয়ে মুসলমান। কী ভয়ঙ্কর চেহারা, দেখলে আপনি পুরুষমানুষ—হয়তো তাও মূর্চ্ছা যেতেন। এসেছিল একদিন—দরে বনল না। ওর হাতে পড়ে গেলে আর কোনো ভরসা দেখি না। আগেই যাতে পালাতে পারি, এই দিন-রাত্তিরের প্রার্থনা। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না? যখন ভাবি—আবার কলকাতায় যেতে পাবো, ভদ্রলোকের মতন দিন কাটাতে পাবো, এত যন্ত্রণাও যেন সহ্য হয়ে আসে। স্বর্গের আশায় নরকযন্ত্রণা ভোলা আর কি! আচ্ছা এততেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নি আমার?

উত্তর দিবার কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, বাকী টাকাটাই আমিই রাখিয়া যাইব—কাছেই তো আছে। ওর ব্যাকুলতা ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া মনে হয়, এখনি এই দণ্ডেই যদি উহাকে এই ক্লেদাক্ত সংস্রব হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে পারিতাম!

নিতান্তই অসম্ভব কি? মনকে প্রশ্ন করি— উত্তব পাই না। আমাব নাবালকত্বই বিবেককে মূক করিয়া রাখে।

সাহস কোথায়? সমাজের ভয়—সুনামের ভয়—সংস্কারের ভয়—নামহীন অজানা ভয়!

চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখি রীতিমত সূর্যালোক। মেঘমুক্ত আকাশ যেন গতরাত্রের সমস্ত দুর্যোগকে ব্যঙ্গ করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে। হঠাৎ ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

দিনের আলোয় চারিদিকে চাহিয়া ঘৃণায় সর্ব শরীর সঙ্কুচিত হইয়া আসে। ময়লা দুর্গন্ধ জামা-কাপড়ের বাণ্ডিল, ছেঁড়া জুতার পাটি, ভাঙ্গা সোরাই, ফুটা এনামেলের গ্লাস, ধূমপানের সরঞ্জাম ইতস্তত ছড়ানো। মেঝের ধূলা যে কতদিন ঝাড়া হয় নাই, ঈশ্বর জানেন। পোড়া দেশলাই কাঠির স্তূপ তাহার নীরব সাক্ষী।

একটা ইতর ব্যক্তির বাত্রিবাসের চিহ্নসম্বলিত এই কুৎসিত ঘরখানায় রাত্রিযাপন করিয়াছি, মনে করিতেই যেন বমি আসে।

বীণাপানি ঘরে নাই।

না বলিয়া চলিয়া যাওয়া যায় না, অথচ তিলার্ধ সময় এখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে রুচি হয় না। অধৈর্যভাবে মিনিট দুই পায়চারি করি। ডাকিবারই বা সুবিধা কই? কোথাও পাত্তাই নাই!

দূব ছাই, টাকাটা এইখানে রাখিয়া সবিয়া পড়ি। আসিলেই যাহাতে চোখে পড়ে এমনভাবে রাখিতে হইবে। গোটা দশ? না আরো কিছু বেশি?

ভিজা কোটটা খুলিয়া চেয়ারের পিঠে রাখিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি গায়ে দিয়া ভিতরের পকেটে হাত দিই।......

টাকা নাই।.....

পঁচিশখানা নোট—একখানাও নাই, চিহ্নমাত্র নাই। অথচ পাশের পকেটে পার্সটি ঠিক আছে। ইহাকেই বলে ধূর্তামি! সহজে যাহাতে ধরা পড়িতে না হয় !.....

প্রভাত-সূর্যের নির্মল আলো যেন নিবিড় অন্ধকারে পরিণত হয়... মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে...মনে হয় পড়িয়া যাইব বুঝি!

ভাবি—বীণাপানি! মানুষ যে কত শয়তান হইতে পারে, সে কথা শুধু গল্প করিয়াও ক্ষান্ত হও নাই, প্রকৃষ্ট উদাহরণও দেখাইলে!

আর একবার নিজের নাবালকত্বে ধিক্কার দিই। কত সহজেই অভিভূত হইয়া পড়ি! দুইটা করুণ কথা—দুই বিন্দু চোখের জল!

অথচ আজীবন শুনিয়া আসিতেছি—উহারা ছলনাময়ীর অভিনেত্রী জাত।

কিন্তু এমনি একটা বাজে মেয়ে—অনায়াসে জিতিয়া যাইবে?

টাকাটা এমন কিছু অগাধ নয়। পকেট মারা গেলে সহিত, কিন্তু এ ক্ষতিটা যেন অসহ্য।

নাঃ, টাকা আমি বাহির করিবই—করিতে হইবেই। দেখি চোরের উপর বাটপাড়ি চলে কি

না। ঘৃণা বিসর্জন দিয়া ঘরের জিনিষপত্র ওলট-পালট করিয়া খুঁজি। রাখিবে কোথায়—বাক্স-ফাক্সর বালাই তো ঘরে নাই।

অবিশ্বাস্য কথা সত্য হইলেও নাকি গোপন রাখাই রীতি, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের তাই মত, তবু না বলিয়া পারি না, হারানিধি ফিরিয়া পাইলাম। সহসা যেন দৈব-নির্দেশেই চোখে পড়িয়া যায়।

দেওয়ালের গায়ে মহাত্মা গান্ধীর একখানা ধূলিধূসরিত বিবর্ণ ছবি টাঙানো—তাহারই পিছনে পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া একটা ছোট বান্ডিল উঁকি মারিতেছে।

সন্দেহ থাকে না—পাড়িয়া লই। দ্বিধা করিবার আছেই বা কি? একটি একটি করিয়া গণিয়া লই পঁচিশখানি নোট। এক টাকার।

নাঃ, একটা কম—বোধ করি এখনি খরচ করিতে লইয়া গিয়াছে। এইবার আসিয়া বুঝিও হে বীণাপানি, বুদ্ধি তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়!

বিনাবাক্যে চুলগুলা হাত চালাইয়া পাট করিয়া টুপিটা মাথায় চাপাই, ট্রাউজারের পা দুইটা টানিয়া চোস্ত করি, রুমাল ঘষিযা মুখের যতটা উন্নতিসাধন সম্ভব সারিয়া গম্ভীর চালে বাহির হইয়া পড়ি।

ভগবানের কাছে একমাত্র কামনা, যেন পরিচিত কাহারও চোখে পড়িতে না হয়।

কিন্তু পড়িতে হয়—ক্ষণকাল পূর্বে যাহার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম—সেই বীণাপানিরই চোখে। দুই হাতে দুইটা জলভরা বালতি কোন্ চুলা হইতে ভরিয়া আনিয়াছে কে জানে!

আমাকে দেখিয়া রীতিমত থতমত খাইয়া যায়। যাইবারই কথা! বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন? মুখ ধোবার জন্যে ভাল জল আনলাম!

—যাক্, যথেষ্ট হয়েছে—ব্যঙ্গহাস্যে ঠোঁট বাঁকাই—এরপর বোধ হয় চায়ের লোভ দেখাবে? কিন্তু নিজেকে সব সময় অত চালাক ভাবতে নেই, বুঝলে বীণাপানি! হ্যাঁ ভালো কথা, তোমাদের ঘরে রাত্তির কাটালে দাম দিতে হয়, না? এই নাও—

পার্স খুলিয়া দুইটা টাকা অবহেলাভরে ফেলিয়া দিয়া 'গট্ গট্' করিয়া পথ চলিতে থাকি।

পিছনে চাহিবার প্রয়োজন অনুভব করি না।.....

কোন পথ দিয়া কত পথ ঘুরিয়া কেমন ভাবে যে সুরেশের বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইলাম, স্মরণ করিবার ক্ষমতা নাই। শুধু মনে আছে, মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, বোধ হয় জ্বর আসিতেছে।

আসা বিচিত্র নয়। স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত শরীর!

সুরেশ বোধ করি আমারই প্রতীক্ষায় চিন্তিত মুখে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। আমাকে পায়ে হাঁটিয়া সশরীরে আসিতে দেখিয়া বিদ্রূপ বিরক্তির স্বরে বলিয়া ওঠে—কি হে ছোকরা, রাত বেড়ানো অভ্যাস-টভ্যাস্ ছিল নাকি? না এখানে এসেই হঠাৎ—

ব্যস্তভাবে বলি—ভেতরে চলো সুরেশ, বোধ হয় জ্বর আসছে।

—জ্বর আসছে? বলিস্ কি? চল—চল্—

মুহূর্তে ওর মুখের চেহারার পরিবর্তন ঘটে, উদ্বিগ্ন স্বরে বলে—ব্যাপার কি বল্ তো? কাল সারারাত ভোগান্তির একশেষ, খুঁজে হয়রান। চেহারা দেখে যে ভয় করছে—হ'ল কি?

বলছি ভাই সব, আগে জল খাবো এক গ্লাস।

সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া গতরাত্রের কতকটা বিবরণ দিই সুরেশকে। বীণাপানির কথা অবশ্য

বাদ দিই, দিতেই হয়—মুখে আট্‌কায়।

সুরেশ আমাব বিছানার ব্যবস্থা করিতে করিতে মৃদুহাস্যে বলে—ওহে বালক, মায়ের আঁচলটি ছেড়ে চলে আসা উচিত হয়নি তোমার। এই সহরে আজ ছ'বছর কাটালাম—গুণ্ডার টিকিও দেখলাম না, তুমি বাবা দেশে পা দিয়েছ আর তাব কবলে পড়ে গেছ? হোপলেস্‌। তাছাড়া—এত কেয়ারলেস্‌ তুই? এতগুলো টাকাসুদ্ধু কোটটা আলনায় ফেলে চলে গেছিস?

টাকাসুদ্ধু কোট!

বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকি।

—কি, এখনো হুঁস হচ্ছে না বাবুর? যাই ভাগ্যিস্‌ চাকরটার চোখে পড়ে নি, পয়লা নম্বরের চোর ওটা। দেখে আবার সরিয়ে রাখি— এই নে—

বিছানা উল্টাইয়া গদির তলা হইতে একগোছা নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দেয় সুরেশ।

পঁচিশখানি নোট। এক টাকার। খরচের সুবিধার জন্য কাল যেগুলো ভাঙাইয়া বাখিয়াছিলাম।...এতক্ষণে খেয়ালে আসে কাল বাহির হইবার আগে গত দুই দিনেব ব্যবহৃত কোটটা বদলাইয়া একটা টাট্‌কা ইস্ত্রিকবা কোট গায়ে দিযাছিলাম। নূতন সাহেব! নূতন চাকরি!

সুরেশ আমার তদারকের জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। হইবে বৈ কি—ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বিদেশ-বিভূঁইয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। আসন্ন জ্বরেব আচ্ছন্নতায হঠাৎ একসময় মনে হয়...অন্ধকার গহ্বরের মুখে দাঁড়াইয়া কাহাকে যেন ঠেলিয়া দিলাম......

ভয়ার্ত একখানা মুখ...বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি...মাথা তুলিয়া শ্বাস লইতে চেষ্টা করে—পারে না।

তলাইয়া যাইতে থাকে...নীচে—আরো নীচে জাহান্নমের অতল তলায় নিশ্চিত মৃত্যুব মুখে।

[১৩৫৩]

অভিশপ্ত

এগারটি সন্তানের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট কনিষ্ঠ পুত্রের মুখাগ্নি সেবে বৃদ্ধ পিনাকপানি যখন স্নান করে তীরে উঠলেন, পশ্চিমের আকাশ তখন সবে ম্লান হয়ে এসেছে। গোধূলি বেলায় সারা পৃথিবীর বুকে মুঠি মুঠি সোনা ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ যেন আকাশ চমকে উঠেছে অপরিমিত অপব্যয়ের অঙ্ক দেখে, তাই কুণ্ঠিত কৃপণতায় কুড়িয়ে নিতে চায় আপনারই অজস্র দানের সোনার ফসল।

গাছের মাথায় মাথায় তখনো ঐশ্বর্যের আভাস, নীচে নদীর জলে নেমেছে দারিদ্র্য।

পিনাকপানি সেই পশ্চিম আকাশের পানে মুখ করে একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, হাতজোড় করে নয়—বক্ষবদ্ধ হাতে সোজা সতেজ। বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের বিশাল বংশের শেষ বংশদণ্ড, পিনাকপানি চৌধুরী।

দীর্ঘ ঋজু দেহ, একতিল নুয়ে পড়ে নি। শোকের ভারে নয়, বার্ধক্যের ভারে নয়, অবস্থা বিপর্যয়ের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতে নয়।

বিধাতার স্পর্ধিত ধৃষ্টতাকে পিনাকপানি উপেক্ষার তীব্র ভ্রূকুটি হেনে এসেছেন আজীবন। আজও

বংশের শেষ প্রদীপ কমলপানির আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন না, শুধু যেন অবাক হয়ে গেলেন—বিধাতার অর্থহীন ধৃষ্টতার বহর দেখে।

শ্মশানসঙ্গীর দল যারা এসেছিল—তারা তখনো জলে নামে নি, খানিকটা তফাতে বসেছিল জটলা করে, পিনাকপানি চৌধুরীর সঙ্গে একসঙ্গে স্নানে নামবাব সাহস হয় নি হয়তো। তাদের মধ্যের একজন নদীর অপব পারে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললে—দেখেছো?

সচকিত দৃষ্টিতে অপর সকলে বলে উঠলো—কি?

ওপারে ঠিক সামনেই আকাশের মাঝখানে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাজপড়া তালগাছ বিধাতার অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মতন। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পিনাকপানির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শশাঙ্ক একটা নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বললো —আশ্চর্য মিল!....শশাঙ্কর মত দৃষ্টিভঙ্গি না থাক্, তবু বক্তব্যের গভীরতা অনুভব করে উপস্থিত সকলেই নিশ্বাস ফেলে চুপ করে বইল।

কিছুক্ষণ পরে পিনাকপানি নিজেই সরে এলেন। ধীর শান্ত গলায় বললেন—সন্ধ্যা হয়ে আসছে, স্নান সেরে নাও তোমরা।

এর মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কই তাঁর আত্মীয়—নিকট নয়, দূর-সম্পর্কের ভাগিনেয়, কিন্তু সম্পর্ক নিকটতম হয়ে উঠেছিল কমলপানির সঙ্গে আবাল্য সৌহার্দ্যে। চৌধুরী বংশের উগ্র আভিজাত্যবোধ যেন পিনাকপানির মধ্যেই জমাট হয়ে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ পায় নি বাপের প্রকৃতি, পেয়েছিল মায়ের স্বভাব। কমলপানির কোমল আর ভাবুক মন একাকী থাকতে পারে নি, চেয়েছিল সঙ্গ, চেয়েছিল বন্ধুত্ব।

যাক, এগারটি সন্তান তাদের রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা সাহস ভীরুতা দুর্বলতা সমস্ত মুছে দিয়ে একে একে চলে গছে. শেষে গেল কমলপানি। পিনাকপানিব উঁচু মাথা হেঁট করে দেবে এমন আর বইল না কেউ এ বংশে।

মাথার শিরা ছিঁড়ে অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে কমলপানির। শশাঙ্কর মনে হচ্ছিল, তারও মাথার ভিতরের শিরাগুলো রক্তে ফেটে ছিঁড়ে যাবে বুঝি।

"কমল নেই"—কি অদ্ভুত আর সৃষ্টিছাড়া কথা! তপ্তসোনার মত গৌর দেহ, উন্নত দীর্ঘ গঠন, বিশাল বুক, লম্বা ছাঁদের রক্তাভ আঙ্গুলগুলি, আর সেই তার সদা-প্রসন্ন মুখখানা, যা কাল সন্ধ্যায়ও ছিল, এইমাত্র সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে এল সবাই!

শশাঙ্ক নিজেই দিয়েছে জ্বলন্ত কাঠ ঠেলে।

আর এই হাত নিয়ে শশাঙ্ক ফিরে যাবে! মুখ দেখাবে উর্মিলাকে! কি বলবে উর্মিলা?

পিনাকপানি আর একবার ডাকলেন—শশাঙ্ক, ওঠ।

মুখ তুলে তাকালো না কেউ, মাথা হেঁট করে উঠে দাঁড়ালো সকলেই।

বৃদ্ধ বলে নয়, শোকগ্রস্থ বলে নয়, পিনাকপানি চৌধুরীকে সকলে সমীহ করে পিনাকপানি চৌধুরী বলেই। হৃতগৌরব বংশের বাইরের মর্যাদা সবই লুপ্ত হয়ে গেছে, লুপ্ত হয়নি শুধু অন্তরের আভিজাত্য। নীলরক্তের মর্যাদাবোধ নিয়ে পিনাকপানি এই বিশাল জগতে নির্বান্ধব একাকী। পুত্রশোকাতুরকে সান্ত্বনা দিতে আসবে এমন পাগলামির কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

ধ্বংসোন্মুখ বিরাট প্রাসাদের ভাঙা দেউড়ির সামনে এসে পিনাকপানি দাঁড়িয়ে পড়লেন,

বললেন—আচ্ছা তোমরা এবার যেতে পারো, অনেক পরিশ্রম করেছ সারাদিন।

আদেশ! ধন্যবাদ, সৌজন্য, সাধারণ লৌকিকতা কিছুই নয়।

মর্চেধরা লোহার কপাটটা ক্যাঁচ করে একটা আর্তনাদ করে উঠলো, ঠেলে খুলেছেন পিনাকপানি, ভেজানোই ছিল। লোহার যে খিলটা তুলে লাগাবার কথা সেটা তুলবার ক্ষমতা আর কারোর নেই এ বাড়িতে।

উর্মিলার না, বুড়ি নিস্তারেরও না।

শশাঙ্ক যায় নি। ঈষৎ ইতস্তত করে বললো—আমি আজ থাকতাম—

—থাকতে চাও? আচ্ছা এসো—দরকার ছিল না কিছু—

"দরকার ছিল না!"—শশাঙ্ক একবার এই নিবিড় অন্ধকারের স্তূপের দিকে চোখ তুলে চাইলো।......দক্ষিণের দোতলাটা সমস্ত ধ্বসে গিয়ে একতলার ছাদে জন্মেছে আগাছার জঙ্গল, আর নাটমন্দিরের জায়গায় খানিকটা জমাট অন্ধকার। দিনের বেলা দেখা যায়, দু'শতাব্দী আগের ছোট ছোট পাতলা ইঁট, গোল চৌকো অদ্ভুত সব আকারের—জমে পাহাড় হয়ে আছে।

দেউড়ির খিলানটার একটা স্তম্ভ কবে খসে পড়েছে—আর একটা স্তম্ভ অবিকৃত দাঁড়িয়ে আছে তার অসংখ্য কারুকার্য আর সিংহের থাবা নিয়ে।

আমলা কর্মচারীদের ছোট ছোট ঘরওয়ালা একতলা মহলটা এদিক ওদিক খোলা হাঁ হাঁ করছে, একটারও কপাট নেই। 'তোষাখানা' 'মালখানা' 'নজর ঘর' ইত্যাদি অসংখ্য মহল, বালির আস্তর ঘুচিয়ে কপাট হারিয়ে, ছাদ ভেঙে পড়ে আছে অনেক ঝড় বৃষ্টি শীত গ্রীষ্মের চিহ্ন বুকে নিয়ে মহাকালের নীরব সাক্ষীর মত।

শুধু 'অন্দর মহলের' খানকয়েক ঘর এখনো সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে নি। তারই একটাতে থাকেন পিনাকপানি, তাঁর ছ'খানা পায়া লাগানো তিনহাত উঁচু পালঙ্ক নিয়ে।

দূরত্ব বাঁচিয়ে ওদিকের একটা ঘরে কমলপানি থাকতো তার এস্রাজ বই আর বৌ নিয়ে। সেখানে ছিল শশাঙ্কর অবাধ গতি।

পিনাকপানি কোনদিন লক্ষ্য রাখেন নি তার গতিবিধির।

মামার পিছন পিছন শশাঙ্ক ঢুকলো ধীরে ধীরে সাবধানে। মর্চেধরা লোহার কপাটটা ঠেলে বন্ধ করতে গিয়ে দেখলো রীতিমত শক্তির প্রয়োজন।

এই কপাট খুলতে এ বাড়িতে আর কে আসবে? কোন্ শক্তিধর?

উর্মিলা আছে এখানে, এই বিরাট রাক্ষসপুরীর কোন্ অন্ধকার কোণে! পিনাকপানির প্রয়োজন না থাক—তার কি প্রয়োজন নেই সান্ত্বনার?

অনেক গোলকধাঁধা পার হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পিনাকপানি যেন প্রথম লক্ষ্য করলেন, শশাঙ্ক তাঁর অনুসরণ করছে।—আচ্ছা তুমি তা'হলে পাশের ঘরে শুয়ে পড়ো শশাঙ্ক, আজ রাত্রে তো আর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কিছু—বলে ছ'খানা পায়া লাগানো তিনহাত উঁচু পালঙ্কের উপর উঠে শুয়ে পড়লেন।

অস্ফুট ব্যাকুল কণ্ঠে শশাঙ্ক বললে—বৌদি?

—বৌমা? ওঃ, নিস্তার আছে তাঁর কাছে।

ব্যস। সদ্য স্বামীহারা অসহায়া তরুণী, তার জন্যে আর কিছু ভাববার নেই।

শশাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

এই ঔদাসীন্য, এই নির্বিকার নির্লিপ্ততা, এ কি সত্যই স্বাভাবিক? প্রলয়ের ঝড়েও চূর্ণ হয়ে যায় না এই পাষাণের বাঁধ?

হঠাৎ শশাঙ্ক মরীয়া হয়ে বলে উঠলো—তাঁর সম্বন্ধে একটু খোঁজ নেওয়া দরকার নয় কি?

—দরকার? ঈষৎ হাসলেন পিনাকপানি—কাউকে শোকে মারা পড়তে দেখেছ কখনো? চেঁচাবে, আছড়াবে, চুল ছিঁড়বে, বুক চাপড়াবে—আবার একসময় স্থির হয়ে যাবে।

কিন্তু উর্মিলা কি সেই প্রকৃতির মেয়ে? শশাঙ্কর মনে পড়লো তার সেই আর্ত অসহায় মুখ, যখন কমলপানিকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে এলো ওরা, মুহূর্তের জন্য একবার খসে পড়েছিল মুখের আবরণ, খসে পড়েছিল বনেদী ঘরের আব্রু।

বাণ খাওয়া পাখীর মত লুটিয়ে পড়ে একটিবার শুধু চেঁচিয়ে উঠেছিল—ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, নিয়ে যেও না—

সে অনুরোধ রাখে নি শশাঙ্ক, রাখবার নয় বলেই রাখতে পারে নি, কিন্তু এ কী নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার তাদের ? কী দুর্দশা ঘটলো উর্মিলার, একবার দেখবে না? নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যাবে?

তাই শেষ চেষ্টাব মত বললে—তবু দেখি একবার, নিস্তার হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে—

—নিস্তাব কমলকে মানুষ করেছিল শশাঙ্ক, মাতৃহীন শিশুকে। ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই। আজ থাক, সদ্য-বিধবার মুখ দেখতে নেই, শাস্ত্রে নিষেধ।

শশাঙ্ক জানে এর উপর প্রতিবাদ নেই, যুক্তি নেই। শাস্ত্রের নিষেধ না হোক, পিনাকপানির নিষেধ।

আশ্চর্য, না মেনে উপায় নেই! লঙ্ঘন করতে দেখেছে কেউ কখনো? কিন্তু কেন? বিধাতাব বজ্র ভেঙে পড়বে? কে জানে! তবু কেউ কখনো কই পারলোও না তো!...

সকালবেলা পিনাকপানি শশাঙ্ককে ডেকে পাঠালেন।

পরিশ্রম, অনাহার আর রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নিয়ে শশাঙ্ক এসে দাঁড়ালো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। পিনাকপানি পরিষ্কাব মার্জিত গলায় বললেন—শোন শশাঙ্ক, একটা কথা বলা দরকার। কমল তার স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা সম্বন্ধে তোমাকে কতখানি স্বাধীনতা দিয়েছিল আমার জানা নেই, এ বিষয়ে সন্ধান রাখা আমি অনধিকার চর্চা বলেই মনে করতাম, কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যক্রমে তাব দায়িত্ব এসে পড়লো আমার হাতে, আমার বিবেচনায় তোমাদের সাক্ষাৎ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শশাঙ্ক মূঢ়ের মত চেয়ে রইল, যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না কথাটা, তারপর নম্র গলায় ঈষৎ মিনতির সুরে বললে—বৌদির যে কথা বলবার দ্বিতীয় সঙ্গী নেই মামাবাবু!

—বিধিলিপি! যে যার কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য। তা'ছাড়া সঙ্গী হিসেবে তুমি তাঁর বিশেষ উপকারী হবে না বোধ হয়। যাক আশা করি দ্বিতীয়বার বলার কষ্টটা আমায় দেবে না তুমি।

—না। শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ভাঙা ইঁটের কারাগার থেকে। সমস্ত অনুভূতি ছাপিয়ে অপমানের একটা তীব্র অনুভূতি মাথার মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলতে লাগলো।

স্বামীর শেষ শয্যায় মুখ গুঁজে তখনো পড়েছিল উর্মিলা। ওঠেনি, মুখ তোলে নি, স্নান করেনি, বৈধব্যের বেশ গ্রহণ করেনি। নিজের হাতে করতে হবে, সেটা হয়তো ভাবতেও পারে নি।

পিনাকপানি বধূর টকটকে সিঁথির পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে ঈষৎ কোমল গলায় বললেন—সিঁদুরটা

ধুয়ে ফেলো বৌমা, ওটা রাখতে নেই।

উর্মিলা উঠে বসে মাথায় কাপড় তুলে দিলে। শ্বশুরকে সে বুঝতে পারে না, তার ভয় করে, তাই সাবধানে স্বামীর ছায়ায় কাটিয়ে এসেছে এতদিন, সহজে তাঁর কাছ ঘেঁষে নি। কিন্তু আজ ছায়ার ব্যবধান ঘুচে প্রখর সূর্যের নীচে এসে দাঁড়াতে হ'ল উর্মিলাকে।

পিনাকপানি বললেন—দেখ বৌমা, এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত কখনো চাকরে ঘরের মেয়ে বৌ হয়ে আসে নি। তোমায় এনেছিলাম—কোষ্ঠি দেখে। আয়তির জোরে যমকে পরাস্ত করবে, এমনি নাকি তোমার কোষ্ঠির ফল। কিন্তু চৌধুরী বংশের অভিশাপের কাছে হার মানল তোমার কোষ্ঠি। যাক, নিয়তি খণ্ডাবার সাধ্য কারোর নেই। এখন তুমি কি করতে চাও?

উর্মিলা বিস্ময়ব্যাকুল দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলে ধরলো, কি করবে সে? কি করতে চাইবে? তার জীবনে চাইবার আর কিছু বাকী রইলো নাকি?

—বলছি, তোমার বাবার কাছে ফিরে যেতে চাও?

—কেন? এতক্ষণে এইটুক মাত্র বলতে পারলো উর্মিলা।

—এই সঙ্গীহীন নির্বান্ধব পুরীতে চৌধুরীবাড়ির সম্মান রক্ষা করে চলতে পারবে? যাজীবন—আমরণ? মনে রেখো এখানে দয়া নেই মায়া নেই ক্ষমা নেই—আছে শুধু বংশমর্যাদা।

উর্মিলা একবার কেঁপে উঠলো।

—আর যদি চলে যেতে চাও, আপত্তি করব না! পিনাকপানি চৌধুরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বংশ আর বংশমর্যাদা দুইই লোপ পেয়ে যাবে। কিন্তু জেনো, চলে গেলে এ বাড়ির দেউড়ি চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে, চৌধুরীবাড়ির বৌরা কখনো দেউড়ির বাইরে রাত্রিবাস করে নি। এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া মানে সব সম্বন্ধ শেষ করে যাওয়া—

—আমাকে এ বাড়ি ছাড়তে বলবেন না, বাবা!

আহত পশুর মত আর্তনাদ করে উঠলো উর্মিলা।

—ভেবে দেখো—আমার মৃত্যুর পরে—একেবারে একলা---

—বাবা—

অধীর আবেগে কি যেন বলতে গেল উর্মিলা, স্বর ফুটল না, শুধু কচি কিশলয়ের মত দুটি ঠোঁট কেঁপে উঠলো থরথর করে।

চৌধুরীবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ করবে কি করে উর্মিলা? কমলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি তার সত্তা লুপ্ত হয়ে গেছে? উর্মিলার দেহের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নেই চৌধুরী বংশের রক্তধারা?

কিন্তু এ সংবাদ কে জানাবে পিনাকপানিকে?

কমল নেই, শশাঙ্ক আসে না, পাড়ার লোকের সাহস নেই এ বাড়িতে কুশল নিতে আসবার। বিশ্বজগৎ থেকে নিজেকে লুপ্ত করে নিয়ে উর্মিলা একটা অজানা আশা, একটা অননুভূত আশঙ্কায় দিন গোনে।

শ্বশুরের দিকে আসতে গেলেই ভয়ে ওর বুকের ভিতর হিম হয়ে আসে। ভাত বেড়ে দিয়ে সরে যায়, বলে—নিস্তার, ডেকে দাও।

নিস্তার মাঝে মাঝে বলে—বাবুকে এইবার বলি, বৌমা? একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে?

উর্মিলা ওর মুখ চেপে ধরে বলে—তোর পায়ে পড়ি নিস্তার, আমার বড় ভয় করে।

নিস্তার আঁচলে চোখ মোছে—কি কপাল নিয়েই এসেছিলে মা? মা রয়েছে বাপ রয়েছে—এই

দুর্দিনে কি আবার মানুষে এই রাক্ষসপুরিতে পড়ে থাকে? কি করবো মা, শ্বশুর তো নয় যেন যম। আজ তিরিশ বছর এ বাড়ির অন্নজল খাচ্ছি বৌমা, তবু আমারই এখনও দেখলে ভয় লাগে। তুমি তো কচি বাচ্চা!

ঊর্মিলা ভাবে শিশুর কলধ্বনি কি পাষাণে প্রাণসঞ্চার করতে পারে? এই মৃত্যুপুরীতে জাগবে জীবনের স্পন্দন?

কিন্তু ঊর্মিলার একমাত্র আশ্রয়স্থল নিস্তারও একদিন তিনদিনের জ্বরে গেল মরে।

জ্বরের ঘোরে কাঁদলো আর বললো—"তোমায় রেখে মরেও আমার সোয়াস্তি নেই বৌমা।"

স্বস্তি কমলেরই কি ছিল? তবু মরলো। ঊর্মিলার ভাগ্যলিপি!

নিস্তার মারা গেছে শুনে শশাঙ্ক আর স্থির থাকতে পারল না, কমলের মৃত আত্মা তাকে যে অবিরত তিরস্কার করছে। পিনাকপানির জেদই কি শুধু বড হয়ে থাকবে সকলের উপর? থাকবে না দয়া ধর্ম, বুদ্ধি বিচার?

নির্জন ঘরে প্রদীপের আলোয় দীর্ঘ ছাযা দেখে শিউরে উঠে মুখ তুলে তাকালো ঊর্মিলা—কে? কে?

শশাঙ্ক ত্রস্ত স্বরে বললে—বৌদি, রাগ কোরো না, গুছিয়ে সব কথা বলবার সময় নেই, শুধু একটা কথা তোমার কাছে জানতে এসেছি—তুমি কি মরতে চাও?

—মরতে?

ম্লান হেসে ঊর্মিলা উঠে এসে কপাট ধরে দাঁড়ালো। বললে—মরতে পেলে বেঁচে যেতাম ঠাকুরপো, কিন্তু মরবার আমার উপায় নেই ভাই।

আসন্ন মাতৃত্বের স্পষ্ট অভিব্যক্তি ঊর্মিলার নিরুপায়তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিলে।

শশাঙ্ক চমকে উঠলো—এতদিন এ সন্দেহ তার মনে আসে নি কেন? পরিহাসচ্ছলে এমনি একটা আভাস কমল একদিন জানিয়েছিল না? হায় দুর্ভাগিনী!

—অথচ এর পরেও তুমি এ বাড়ির ভাঙ্গা ইঁট কামড়ে পড়ে থাকবে? এ বাড়ির বাতাসে আছে বিষ, এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমানো আছে অভিশপ্ত আত্মার নিশ্বাস, এখানে থাকলে তুমি বাঁচবে না বৌদি—

—বাঃ শশাঙ্ক, চমৎকার! তোমার কথাগুলি শুনতে বেশ। কোনো ভাল নভেল থেকে পড়ে এলে বুঝি?

পিছন থেকে লোহার মত কঠিন আঙ্গুলগুলো শশাঙ্কর গলায় চেপে বসে ক্রমশ শ্বাসরোধ করে আনতে থাকে।.......

অন্ধকারে পিনাকপানির দীর্ঘ দেহটাকে মনে হচ্ছে প্রেতাত্মা। মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লো ঊর্মিলা, বোধ করি দাঁতে দাঁত চেপে চীৎকারকে রোধ করে রাখবার পরিশ্রমে।

এতদিনে পিনাকপানির নজরে পড়লো পুত্রবধূর দৈহিক পরিণতির দিকে।....এ কী! এতোদিন কি অন্ধ হয়ে ছিলেন তিনি?

কলঙ্ক পড়লো চৌধুরী বংশে পিনাকপানি বেঁচে থাকতে!

—পাপের শেষ হোক—বলে জীবিত ও মৃত দুটো দেহকেই ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলেন পিনাকপানি।

শুধু শিকল নয়, ভারি আর মজবুত তালার দরকার।

কেটে যায় রাত্রি আর দিন, দিন আর রাত্রি।

গরাদের উপর মুখ চেপে কাতর কান্নায় ভেঙে পরে ঊর্মিলা—ভুল বুঝে এতবড় সর্বনাশ কেন করছেন বাবা? একবার খুলে দিন! চৌধুরী বংশ লোপ হতে দেবেন না। —বিশ্বাস করুন এ বাড়ির অমর্যাদা হয় নি।

ঘরের ভিতরকার গলিত মৃতদেহের পচা গন্ধে টিকতে পারে না সে।

ক্রমশ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, গরাদে মাথা ছেঁচে আর উন্মাদের মত চেঁচায়—নিস্তার, দোর খোল্! নিস্তার, দোর খোল্!....

স্বর ভেঙে আসে—ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে, অবশেষে একদিন নীরব হয়ে যায়। অভিশপ্ত চৌধুরী বংশের অনাগত বংশধর পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে।

চৌধুরী বংশ! চৌধুরী বংশ! তবে কি পিনাকপানিরও ভুল হয়? দুই কান রোধ করে পিনাকপানি সেই বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে বেড়ান পাগলের মত।

মজবুত লোহার তালা শিকলে লাগিয়ে চাবিটা ফেলেছিলেন অন্ধকারে ছুঁড়ে, সে চাবি গ্রাস করেছে ভাঙা অট্টালিকার কোন্ ক্ষুধিত গহ্বর, কে তার সন্ধান দেবে পিনাকপানি চৌধুরীকে!

[১৩৫৩]

দুই আর দু'য়ে

অপরাধের গুরুত্বটা—বলিবার সময় বুঝি নাই, বুঝিলাম পরে। মাসের প্রথম দিকে—টাকা এবং দিনগুলা এলোমেলো করিয়া কোন্ ফাঁকে যে কাবাব হইয়া যায় টেরই পাই না, প্রত্যেক মাসের শেষেই ভাবি আগামী মাস হইতে আধলা পয়সাটির পর্য্যন্ত হিসাব রাখিয়া তবে আর কাজ। তা ছাড়া কড়া শাসনেরও দরকাব। সংসাবের সকলের মন রাখিতে গিয়া যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিতেছি। অতএব আর না।

কিন্তু পরের মাসে বাইশ তারিখের আগে আর হুঁসই হয় না। মানে আর কি, হুঁস্ করিবার অবসরটা ঠিক পাই না। অবসর পাই তখন, যখন বাক্সে নগদ এগারো আনা পয়সা উদ্বৃত্ত থাকে, এবং খরচের ব্যাপার বাকী থাকে টাকা পঞ্চাশের মত।

এই রকমই একটা দিনে—

পঞ্চাশ টাকা এবং এগারো আনা পয়সায় সামঞ্জস্য রাখিতে কতটা ব্যয়-সঙ্কোচের আবশ্যক তাহারই হিসাব-নিকাশে মাথাটা যখন নিতান্তই গরম হইয়া উঠিয়াছে, গৃহিণী আসিয়া অসঙ্কোচে হিসাবের খাতাখানা ঠেলিয়া দিয়া এক গাল হাসিয়া কহিলেন—শুনছো গো—আমাদের "নবতারা হাউসে" যে "প্রেমের সমাধি" এসে গেল!

"নবতারা হাউস" এবং "প্রেমের সমাধি" একত্রে দুইটা বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে মিনিটখানেক সময় লাগিল। তপ্ত খোলায় এক ফোঁটা জল দিলে যেমন 'চড়াৎ' করিয়া ওঠে, তপ্ত মস্তিষ্কে 'প্রেমের সমাধি'র অনুভূতিটা তেমনি 'চড়াৎ' করিয়া উঠিল। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বলিয়া বসিলাম—শুনে কেতাত্থ হ'লাম। তা' "প্রেমের সমাধি" দেখবার জন্যে পয়সা খরচ

করে বাইরে যাবার দরকার কি?

চড় খাইয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ার ভঙ্গীতে হাত-তিনেক দুরে সরিয়া গিয়া প্রিয়তমা অপমান, অভিমান এবং রোষমিশ্রিত ক্ষুব্ধ স্বরে প্রশ্ন করিলেন—কি বললে?

বলিলাম—যা বলেছি সে আর বেশী বোঝাতে হবে না, বোঝবার মত বুদ্ধির অভাব তোমার নেই।

—বুঝেছি!

বলিয়া ধীর-মন্থর গতিতে উঠিয়া গেলেন।

প্রথমটায়—সত্য বলিব, বেশ যেন একটু আত্মপ্রসাদ বোধ হইল। ঠিক হইয়াছে।....আমি হতভাগা দেনার দায়ে, অস্থির হইয়া উঠিয়াছি কিসে দুই পয়সা কম করা যায়—এই ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে হোঁচট খাই, ট্রামের টিকিট ভুলিয়া তিন মাইল হাঁটিযা মরি, ডান পায়ে বামপাটি আর বাম পায়ে ডানপাটি জুতা পরিয়া দুই পায়ে ফোস্কা পড়াইয়া বসি, সিগারেটের বদলে বিড়ি খাইলে মাসে কত লাভ হয় রোজ তার হিসাব করি....আর উনি একেবারে আহ্লাদী পুতুলটি। উপন্যাস, মাসিকপত্র, সিনেমা-থিয়েটার, শাড়ী-ব্লাউজ আর এ-বাড়ী ও-বাড়ী লইয়া মাতিয়া আছেন।....কাদের গিন্নী বাড়িতে দুই বেলা মিহি তাঁতের শাড়ী পরে, কাদের বৌ অভিনব কৌশলে কোন পাতানো ঠাকুরপোকে দিয়া এগারো হাত মিলের শাড়ী আনাইয়াছে, এবং কার আইডিয়াল পতিদেবতা আদরিণী পত্নীর সেমিজের জন্য মলমলের থান যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন, এই তথ্যগুলি আমার কর্ণগোচর করা ছাড়া যেন আর কাজ নাই তাঁহার।

গোদের উপর বিষফোড়া এই সিনেমার গল্প।

একটু দমাইয়া দেওয়াই উচিত। অভিমানের ভয়ে কত আর চুপ করিয়া থাকা যায়? আমার উপর যদি কেউ দরদ না করে আমিই বা কেন—ছেলেগুলিই কী সোজা শয়তান! মাতৃ-পক্ষচ্ছায়ার সাহসে আমাকে কেয়ার করিবার প্রযোজন মাত্র অনুভব করে না, অথচ আমার হাতবাক্সব উপর শ্যেন দৃষ্টিটি ষোল আনা।

বলা বাহুল্য হিসাবের খাতা আর কাজে লাগিল না।

মাদুরে চিৎ হইয়া কড়িকাঠ-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবীব হাল-চাল...লাভ-লোকশান....দেনা-পাওনা .....সংসার-সমাজ...সুখ-দুঃখ অনেক কিছু ভাবিতে থাকি। কূলকিনারা পাই না।

হঠাৎ মনে হইল—কথাটা একটু কঠিনই বলা হইয়াছে।...তার পর ভাবিলাম...বেফাঁস কথাটা পরিহাসের কোঠায় ফেলিয়া সামলানো অসম্ভব ছিল না। বরং উচিতই ছিল।....অবশেষে মনে করিলাম—সে পথ এখনো খোলা নাই এমন নয়।...হ্যাঁ, ঠাট্টা ছাড়া আর কি? নিজের স্ত্রীব সঙ্গে একটু ঠাট্টাও করিবে না মানুষ?

দ্বিধা ত্যাগ করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া গোঁসাঘরে গেলাম।

সরল হাস্যে কাছে আসিয়া বলিলাম—অমন চট্‌ করে চলে এলে যে? রাগ করলে নাকি?

গলার স্বরে যতটা সম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কহিলেন—রাগ কিসের?

—রাগ করোনি তা'হলে? বাঁচলাম। হঠাৎ যে ভাবে চলে এলে—মনে করলাম আমার ঠাট্টায় রেগেই গেলে বা।.... বৃষ্টি এসে শুকনো কাপড় ভিজে যাচ্ছিল বুঝি?

—ঢং! বলিয়া মুখ ফিরাইলেন।

অতঃপর নানাবিধ আলাপ-আলোচনার কৌশলে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিয়া সবিনয় নিবেদনে আসল কথাটি পাড়িলাম।.....কথাটি আর কিছুই নয়, শুধু একটা প্রশ্ন।.....চোরা-বাজার অথবা

কালো-বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাহার পক্ষে অসম্ভব, লালবাজারে যাইতে ক'দিন বাকী থাকে তাহার! যদি প্রত্যেক মাসেই ব্যয়ের মাত্রা আয়ের দুই কূল ছাপাইয়া উদ্দাম বেগে ছুটিতে থাকে!

ভারী মুখে কহিলেন—তার আর আমি কি করবো? জিনিষ-পত্তরের দাম চারগুণ করে বাড়িয়ে দেওয়ার কর্ত্তা তো আমি নই?

—তা' অবশ্য নয়। কিন্তু সংসার-খরচ কমানোর কর্ত্তা তো তুমি?

—কোন্ খরচটা কমাবো শুনি? ওই শুনতেই তিনশো টাকা, যে কষ্টে আমি চালাই! বল তো ছেলেদের উপোস দেওয়াই, ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিই, বামুনটাকে বিদেয় করি—খরচ কমবে অনেক।

যথাসম্ভব করুণ মুখে বলি—ওই তো রেগে যাচ্ছো। কিন্তু ভেবে দেখো, তুমি ছাড়া আমার মুখ চাইবার কে আছে? ধারে-কর্জ্জে যে ভাবে ডুবতে বসেছি—ভেবে ভেবে এক এক সময়—

স্তবে শনি দেবতাও প্রসন্ন হন শুনিয়াছি। স্ত্রীও সব সময় না হোক, এক-আধ বার হইবেন না? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—বেশ, এবার থেকে তোমাকে আর ভাবতে হবে না।

—কি করবে?

সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করি।

—ভয় নেই, রোজগার করতে যাবো না। ঐ থেকেই টেনে-টুনে দেখি। তুমি টাকাটা মাসের প্রথমেই আমার হাতে দিয়ে খালাস হবে, ব্যাস।

—ঠিক তো? ভরসা দিচ্ছ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দেখো—ঠিক হয়ে যাবে। খোকাতে আর আমাতে হিসেবপত্র করে—

খোকা জ্যেষ্ঠপুত্র।

শান্তির আনন্দে চোখে জল পড়-পড় হইল।

আহা! এমন প্রেমময়ী পত্নীকে কি না নির্দ্দরদ নিষ্ঠুর ভাবিয়া এত কষ্ট পাইতেছিলাম!

সত্য বলিতে কি—বাজে খরচের হাতটা তাঁহার এতই বেশী যে আজ পর্য্যন্ত সাহস করিয়া যথাসর্ব্বস্ব তুলিয়া দিই নাই।......কিন্তু আজ যখন অনুতপ্ত চিত্তে অভয় দিতেছেন...হয়তো নিজের হাতে পড়িলেই বোধবুদ্ধি আসিবে।

পরের মাসের প্রথমেই টাকাটা আনিয়া তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

সস্মিত বদনে তিরিশখানি নোট গণিয়া গণিয়া কণ্ঠে মধু ঢালিয়া কহিলেন—বেশ, সারা মাসে আর কিছুটি জ্বালাতন করবো না তোমায়।

—দেখ, চালাতে পারবে তো?

—খুব পারবো। ইচ্ছে করলে কি না পারি।

মনে ভাবিলাম, হায়, ইচ্ছাটি যদি কিছুদিন আগে করিতে—ধারের অঙ্কটা এত প্রকাণ্ড হইয়া উঠিত না।

অতঃপর নূতন রাজার (রাণীর) আমলে আছি।

অনেক দায়েই মুক্ত হইয়াছি।

বাজার করে খোকা, রেশন আনে খোকা, দোকান-পশারের মুখই দেখিতে হয় না।

লোক-লৌকিকতা, আচার-ব্যবহার কোনো কথাতেই থাকি না। হাওয়ার মত আছি। অথচ রান্নাঘরের সমারোহটা যেন রোজই বেশী বেশী লাগে।....জলখাবারের পাত্রে বেশ কিছু প্রাচুর্য্যের আভাস।.....প্রত্যেক সপ্তাহেই শুনিতে পাই সিনেমার টিকিট কেনা আছে।

মাঝে মাঝে সন্দেহযুক্ত চিত্তে বলি—হ্যাঁ গো, বেশ তো চালিয়ে যাচ্ছ— টাকা-ফাকা আছে তো? কই কিছুতেই তো টানাটানি দেখছি না?

—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, টানাটানি হবে কেন শুনি?

বিগলিত প্রেমে নিতান্ত কাছ ঘেঁষিয়া বসেন।

সন্ধ্যা বেলা বাড়ী আসিতেই—একখানি বিঘৎ দুই চওড়া পাড় ফরাসডাঙাব শাড়ী হাতে লইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন—শাড়ীখানা কেমন বলো তো?

বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, সামলাইয়া বলিলাম—বেশ কাপড, কার?

—আহা আদিখ্যেতা! হাতিপাড় শাড়ীখানি কার হবে শুনি? তোমার? না খোকার?

শুষ্ক মুখে হাসির আভাস টানিয়া আনা ছাড়া উপায় থাকে না।

—তোমার জন্যে কিনলে বুঝি? ফেরিওলার কাছে?

—ফেরিওলা? পাগল হয়েছ? আর কিনি ওদের কাছে! যা রাম-ঠকান ঠকিয়েছে সেদিন!

—কবে আবার কি ঠকলে?

আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া প্রশ্ন করি।

অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া ফেলেন।

—সে আর তোমায় বলিনি লজ্জায়। ব্যাপারটা কি জানো—ভাবলাম মোটা-সোটা তাঁতের শাডী আটপৌরের জন্যে কিনি, চব্বিশ টাকা দিয়ে এক জোড়া দিব্যি চওড়াপাড় শাড়ী কিনলাম, মনে হল খুব দাঁও মেরেছি, ওমা—হরি বল মন। সে কাপড় ধোপ খেয়ে এসে গামছা!.....পরবার জো নেই। ....এ আমি রেবা ঠাকুরঝির বরকে দিয়ে আনিয়েছি।

—কত নিলে?

গম্ভীর প্রশ্ন করি।

—বল না?

কৌতুকে চোখ নাচাইয়া প্রতি-প্রশ্ন করেন।

—আমার আন্দাজ নেই।

—যেমন কাঠখোট্টা তেমনি তো হবে? দাম হচ্ছে জিনিস বুঝে—আঠারো টাকা পীস্।

—তা' এত টাকাকড়ি পাচ্ছো কোথায়?

—আহা! এখুনি তো আর দিতে হচ্ছে না। অচিন্ত্যবাবু নিজেই দিয়ে দিয়েছেন, পরে যখন হোক দিতে বলেছেন। যাই বলো—অচিন্ত্যবাবুর পছন্দ আছে কিন্তু।

—ওইগুলো দেখতে পারি নে আমি।

বিরক্ত ভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাই, বিরক্তি গোপনের চেষ্টা করি না। বাস্তবিক দু'টি চক্ষের বিষ আমার, এই একে ওকে মুরুব্বি ধরিয়া সওদা করানো।

হয়তো দুই টাকার যে জিনিসটি কিনিতে গিয়া সাত বার চিন্তা করি—আট বার পিছাই, সেই জিনিসটিই তিন টাকায় আনিয়া দিয়া অপর কেহ যদি কেবলমাত্র পছন্দের বাহাদুরিতে বাহবা পায়, সে রাগ বরদাস্ত করা কঠিন নয় কি?

অথচ হামেসাই এ রকম ঘটে।

ওই টাকায় ওই শাড়ী আমি কিনিতে পারিতাম না! যেন শুধু পছন্দের অভাবেই এই অপূর্ব্ব শাড়ী-সৌন্দর্য্য হইতে এত দিন প্রিয়তমাকে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছি!

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর —(গৃহিণীকে সাহস হইল না) খোকাকে ডাকিয়া বলিলাম—কই, তোদের হিসেবের খাতা দেখি!

—খাতা?

খোকা মাথা চুলকাইয়া অত সাধের টেরিটাই খারাপ করিয়া ফেলিল।

—হ্যাঁ, তোরা হিসেব-পত্তর লিখছিস যাতে এই দু'মাস।

—লিখলাম আর কই?....খোকা সকরুণ মন্তব্য করে—মাকে তো রোজ বলি—দু'জনে মিলে বসে হিসেবগুলো একবার ঠিক করে ফেলি—করে কি কেনা হয় আমার কি অত মনে থাকে! তা' মার আর সময় হয় না।

—এই দু'মাসের হিসেব এক দিন বসে হবে?

খোকা সোৎসাহে আশ্বাস দেয়—কেন হবে না? মার তো আর তোমার মত ভুলো মন নয়? দু'মাস আগের কথাও ঠিক মনে আছে, শুধু খাতায় একটু মার্ক করে রাখা। তবে—ইয়ে লিখেই বা লাভ কি? কেউ তো আর চুরি করছে না?

হতাশভাবে নেপথ্যে চিন্তা করি....চুরি হয়তো করিতেছে না—কিন্তু ডাকাতি কি চুরির চাইতে কম হৃদয় বিদারক?

পরদিন সকালে অচিন্ত্যবাবুর ভাগ্নে মানিক আসিয়া কহিল—মামা বল্‌লেন—কাপড়ের দরুণ কি যেন টাকা বাকী আছে—কুড়ি টাকা বোধহয়.

সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া আসিল।

কিন্তু কুড়ি টাকা কেন? ......এক রাত্রে আঠারো টাকায় দুই টাকা সুদ হইলে—বছরে শতকরা কত হয় মনে মনে হিসাব করিতে চেষ্টা করি কিন্তু কেমন যেন খেই হারাইয়া যায়।.....মানিকের কথা বিস্মৃত হইয়াছি—মুখের সামনে খবরের কাগজটা তুলিয়া চিন্তা করিতেছি....কি চিন্তা করিতেছি? বোধ হয় ভারতের ভবিষ্যৎ।....

মানিক আর একবার 'ভাগ্নে জাতীয়' সুলভ কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে "গুঁই গুই" করিয়া উঠিল, মামা বলে দিলেন—অফিস যাবার আগে টাকাটা না দিলে অসুবিধে হবে। দরকার—

চড়াৎ করিয়া কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া গনগন করিয়া বাড়ির মধ্যে হানা দিলাম। এবং বিনা গৌরচন্দ্রিকায় কথাটা জানাইলাম।

গৃহিণী স্তম্ভিত বিস্ময়ে কহিলেন—আজই চেয়ে পাঠিয়েছে? আর তর সইল না? কাল কত সাউখুড়ি করলো! —"এখন দিতে হবে না—তাড়াতাড়ি কি—" রাত পোহাতেই দরকার পড়ে গেল?

—দরকারী জিনিস, দরকার পড়া বিচিত্র নয়, কিন্তু শুনেছিলাম না আঠারো টাকা?

—সেটুকুও ফাঁস করা হয়েছে। গলায় দড়ি আমার, তাই ওই সব লোককে বিশ্বাস করি।

অর্থাৎ বুঝিতে বাকি থাকিল না—কুড়ি টাকাকে আঠারো টাকায় নামাইয়া, দুই টাকার বাহাদুরি লইতেছিলেন।.......পাড়ার লোক সস্তায় আনিতে পারে বলিয়াই না পাড়ার লোকের ভরসা

করেন।

—সে যাই হোক টাকাটা দিয়ে দাও, মানুকে দাঁড়িয়ে আছে।

—টাকা?......

গৃহিণী চোখের সাহায্যে যতটা সম্ভব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—কোথায় পাবো? থাকলে তো কালই দিয়ে দিতাম!

—তবে উপায়?....কাপড় তা'হলে এখন ফেরৎ দাও, বোলো—"ও-মাসে নেব।"

—চমৎকার! বলতে মুখে আটকালো না? পাড়ার লোককে জানাতে হবে এই সামান্য টাকাটা আমার ঘরে নেই, কেমন? তাই টাকার অভাবে কেনা জিনিস ফেরৎ দেব! ছি ছি, কী মতিচ্ছন্ন হয়েছিল আমার, তাই সখ করে শাড়ী নিতে গিয়েছিলাম—বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করছে এখন।

সানুনাসিক স্বরকে কাবুলীওয়ালার চাইতেও ভয় কবি।.....ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—থাক বিষটা এখুনি খেয়ো না, এর পর হয়তো আরো উপযুক্ত কারণ পাবে....তাছাড়া সেও খরচের ব্যাপার, কুড়ির ওপর দিয়ে হবে না।

মানিককে দাঁড়াইতে বলিয়া দশ মিনিট হাঁটার পথে গেলাম অনিল বোসের বাড়ী। আমাদের মত হতভাগ্য বন্ধুদের অকূলে কূল দিতে অনিল কিছুদিন হইল এক লোন কোম্পানী খুলিযাছে।

মানিককে বিদায় করিয়া একটু বসিয়াছি। স্নান করিতে গেলেই হয়, ন'টা বাজে। বাড়ীওয়ালার বড় ছেলে—বিজয় না কি নামটা—আসিয়া কহিল—গেল মাসে আপনি কোথায় গিছলেন ললিতবাবু? বাইরে কোথাও?

—আমি? আমি কোথায় যাবো? দু'-এক বছরের মধ্যে তো ট্রেনে চড়িনি। .....অবাক হইয়া যাই।

তবু বাকশূন্য হইতে বাকী ছিল।

বিজয় বাড়িওয়ালার ভাগ্নে নয, বড ছেলে, গুঁই-গুঁই করে না, বেশ চাঁচা-ছোলা গলায় বলিয়া ওঠে—গেল মাসে এসেছিলাম—বাড়ীর মধ্যে থেকে বললেন—'আপনি নেই—ভাড়াটা এ মাসে দেওয়া হবে না'—এ মাসেও দশ তারিখে এসে ফিরে গেছি। খোকা বললে, 'কুড়ি তারিখে আসবেন', ব্যাপার কি বলুন তো? আপনার কাছ থেকে তো কখনো তারিখের নড়চড় হয় না?

যা হয় একটা বাজে কথায় স্তোক দিয়া কাল আসিতে বলিলাম।

এখন আবার অনিলের বাড়ি যাইবার টাইম নাই।......খোকাকে ডাকিয়া চড়া স্বরে প্রশ্ন করিলাম, যাহাতে নেপথ্য পর্য্যন্ত পৌঁছায়....নেপথ্য হইতে উত্তর আসিল—টাকায় না কুলোলে কোথা থেকে ভাড়া দেবো শুনি? বল তো গয়না বেচি—

পরদিন সকালে গোয়ালা আসিয়া দাম চাহিল, দোসরা তারিখ হইতে ফেরাফিরি করিতেছে—আজ আমাকে পাকড়াইবে প্রতিজ্ঞা করিয়াই ভোর বেলা—

বিল দিয়াছে তেত্রিশ টাকা দশ আনার।

কুড়ি টাকার উর্দ্ধে আগে কখনো উঠিয়াছে মনে পড়িল না।

নাঃ—আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে।

ছেলেবয়সে আক্কেল দাঁত ওঠে নাই—চল্লিশের পর উঠিবে নাকি কে জানে? হিসাবের

খাতা পাড়িয়া সার্চ্চ করিতে বসিলাম। সময় আছে রবিবার।

দেখি মাতাপুত্রের সম্মিলিত চেষ্টায় হিসাবটা ভালই কষা হইয়াছে; গোঁজামিল নামক আর্টটির সুষ্ঠু প্রয়োগে ত্রুটি কোনোখানে নাই। তাছাড়া ব্যবস্থাপনাও অনবদ্য।....ধোবা গয়লা বাড়ীভাড়া স্কুলের মাইনে ইলেকট্রীক ফী প্রভৃতি বাজে খরচগুলার সমাধান না হইলেও—কাজের খরচ হইয়াছে বিস্তর।

কই, আমার দ্বারা কি এতদিন এসব অভাব মিটিয়াছে? যেসব কাঁসি আর পিতলের গামলা ডেকচী এবং সস্প্যানের অভাবে সংসারযাত্রা অচল হইতে বসিয়াছিল সেসব এর আগে মাথা খুঁড়িয়া একটা কেনা হইয়াছে? .....এই যে মশারির অভাবে ম্যালেরিয়াই ধরিতে বসিয়াছিল, বিছানাগুলা লোকসমাজে বার করার অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল—চোখ মেলিয়া দেখিয়াছি কোনো দিন?.....ধরো ষ্টেশনরি জিনিস—পচিবার নয়, দু'চার মাসের মত কিনিয়া রাখায় ক্ষতি কি? ভালো জিনিস যখন সব সময় মেলে না।.....এ ছাড়া—যে গ্রামোফোনটা মেরামতের অভাবে খোঁড়া এবং নূতন রেকর্ডের অভাবে বোবা হইয়া হতাদরে পড়িয়াছিল, তাহাকে সচল মুখর করিয়া তোলা কি একটা কাজ নয়? খোকা যাই অনেক শিখিয়াছে তাই না....? বলি—কখনো কোনো সখ আমি মিটাইয়াছি? খান-দুই মাসিকের বার্ষিক গ্রাহক হইয়া বা দু'চারখানা গল্পের বই কিনিয়া খেদ যদি কিছু মিটাইয়াই থাকেন তিনি, আমার নজর দেওয়াই অভদ্রতা।.....তবু তো মনের মতো দু'পাঁচখানা শাড়ী কিনিবাব টাকা জীবনে জোটে না, ছেলেরা মাত্র এক জোড়া জুতা পায়ে দিয়া সারা বছর কাটায়। ...স্যাকরার সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধ!......

এই সব আলাপ-বিলাপের মাঝখানে ছোকরা রাঁধুনী বামুনটা ভগ্নদূতের মত আসিয়া বলিয়া উঠিল—মা, কেষ্টর মার সঙ্গে দেখা হ'ল না। বাসায় তালা দেওয়া, বাসার লোক বললে দেশে চলে গেছে, কবে আসবে জানে না।

প্রিয়তমা সমস্ত ভুলিয়া একটি আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িলেন—বলিস কি রে? পালিয়েছে? সে যে দু'মাসের মাইনে আগাম নিয়ে বসে আছে!

গতকল্য হইতে ঝিয়ের কামাই চলিতেছিল।.....অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চলিবে কিনা কে জানে।

বলিবার সময় অপরাধের গুরুত্বটা বুঝি নাই, পরে বুঝিলাম। বেফাঁস বলিয়া বসিলাম—আগেই জানতাম এ রকম বেহেড্ কাণ্ড হবে একটা।

—জানতে? ও! তা' দিয়েছিলে কেন বিশ্বাস করে?

—আমার মুখ্যুমি।

বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল ভূমিকম্প হইল নাকি?.....না ভূমিকম্প নয়, প্রিয়তমা ক্রোধভরে উঠিয়া গেলেন।.....পরমুহূর্ত্তে ঝড়?....না, প্রিয়তমা আবার ফিরিয়া আসিলেন।.....অতঃপর কি? বন্যা? ....বন্যাই বটে—বাণীর বন্যা।

সেই ঢল ঢল সুকোমল অধর-নিঃসৃত বাণীর বন্যা...আমি যে কতদূর হৃদয়হীন, চক্ষুলজ্জা বর্জ্জিত, সাধ-আহ্লাদলেশশূন্য, স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধে উদাসীন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণসহ এই দীর্ঘ আঠারো বৎসর কাল কী দুঃখে কী অপমানে দিনাতিপাত করিতেছেন তিনি তাহার হিসাব দাখিল করিয়া বাক্সের চাবি ও এ মাসের উদ্বৃত্ত রেস্ত আমার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শপথ করিলেন—জীবনে যদি আর কখনো আমার পয়সায় হাত দেন...ইত্যাদি ইত্যাদি....চলিয়া গেলেন।

খুব সম্ভব আজ আর 'গোঁসা'-ঘরে কুলাইবে না, পাড়ায় যে পিসতুতো দিদির বাড়ী আছে

সেইখানে যাইবেন।....আমার যাইবার ঠাঁই আজ আর কোথাও নাই, রবিবার! যাইবার জায়গা না থাকিলে বসিয়া থাকা ছাড়া গতি কি? বসিয়া আছি....সামনে ছড়ানো আছে বাক্সের চাবি আর—না, টাকা নয়...টাকার ভগ্নাংশ।.....দুইটি সিকি দুইটি আনি তিনটি হাফ্‌আনি। ....খুচরা ক'টা একত্রে যোগ করিলে—কত হয়, বার বার চেষ্টাতেও মাথায় ঢুকিতেছে না কেন? অঙ্কশাস্ত্র ভুলিয়া গেলাম না কি!

হতাশভাবে চারিদিকে তাকাই।

দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো বহুদিনের অবহেলায়—ধূমাচ্ছন্ন ঝাপসা ঠাণ্ডা।....শুধু টাটকা ক্যালেণ্ডারখানা বাতাসে দোল খাইয়া মরিতেছে। কত তারিখ আজ? লাল টুকটুকে মুখটা লইয়া তারিখটা যেন হাসিয়া উঠিল।

রবিবার! বাইশে সেপ্টেম্বর!

আচ্ছা, দুই আর দু'য়ে চার না হইয়া বাইশ হয় কেন?

[১৩৫৩]

কঙ্কণ

সব শুনিয়া অঞ্জলি রীতিমত বিরক্ত হইয়া ওঠে। সুধীরের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই! বিরক্তি গোপনের চেষ্টা না করিয়া বলে—তুমি অমনি মত দিয়ে এলে? এর কোনো মানে হয়? আমাকে একবার জিগ্যেস করা দরকার মনে করলে না?

সুধীর ভানটা করে সরলতার।

—বাঃ, নেমন্তন্ন করেছে—যাবে, এর আর মতামতের কি আছে?

—তোমার তা'হলে ধারণা, আমি যাবো সেখানে?

এবার যে চাপা হাসিটা ফুটিয়া ওঠে সুধীরের মুখে সেটাকে আর সরলতা বলিয়া ভুল করা চলে না। বলে—যাবে না কি বলো! আদর করে নেমন্তন্ন করেছেন—গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন—বড়মানুষের বাড়ীর ক্রিয়াকাণ্ড ব্যাপার দেখবে—এ তো ভাগ্যের কথা।

স্বামীর ঈর্ষাকুটিল মুখের পানে চাহিয়া অঞ্জলি গম্ভীর হইয়া বলে—ভাগ্যের হিসেব-নিকেশ করতে চাইনে তোমার সঙ্গে, মোটকথা আমি যাবো না।

সুধীর নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে—পাগল হয়েছ, তাই কখনো হয়? যেতে তো হবেই, যার স্বামী অফিসের 'বড় সাহেব', হুকুম করলেই ছুটে যেতে হতো, আর এ তো নেমন্তন্ন।

অঞ্জলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—হুকুম তামিল করতে ছুটে যাক তারা, যারা অফিসের চাকর। আমার সঙ্গে কী?

—তোমার সঙ্গে তো অনেক কিছুই গো, তা' নইলে অফিসে এত রুইকাতলা থাকতে সুধীর মুখুয্যের মতন চুনোপুঁটির স্ত্রীকে ছেলের পৈতেয় ঘটা করে নেমন্তন্ন করা কেন? এই তো দেখ না—নামটা অবশ্য আমারই, কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা তো তুমি।

'শুভ উপনয়ন' মোহরাঙ্কিত বৃহদাকার সুদৃশ্য খামখানা সুধীর অঞ্জলির সামনে ফেলিয়া দেয়।

—কার কি আসল উদ্দেশ্য তার জন্য আমি দায়ী নই। বলিয়া কাঁধের উপর জড়-করা

ভিজা কাপড়গুলো মেলিয়া দিতে উঠানের ওদিকে নামিয়া যায় অঞ্জলি।

সুধীর খোলা দালানে পায়চারি করিতে থাকে।

নাঃ, অঞ্জলির আপত্তি কোনো কাজের নয়। চাটুয্যে-সাহেব হইল তাহার অফিসের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, তাঁহার নিমন্ত্রণ অবহেলা করা কি সহজ কথা?

অবশ্য অঞ্জলির উপর একটা অহেতুক বিরাগ এবং 'বড়সাহেবে'র উপর বিদ্বেষে মনটা নিতান্তই তেতো হইয়া আছে, তবু পাঁচজনের কাছে—অফিসের আর সকলেব কাছে তো মুখটা কম বড় হইল না!

সাহেব যখন অকস্মাৎ খাশ কামবায় ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন তখন সে কী ভয়, বুকেব ধুকপুকুনি আর ঘোচে না। অবশ্য পবের ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত।

ঘুরিয়া আসার পর সহকর্ম্মীদেব উৎসুক প্রশ্নের উত্তবে নিতান্ত অবহেলার ভঙ্গিতে নিমন্ত্রণের খবরটা জানানোর মধ্যে কী অপরিসীম গৌরব। শুধুই কি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মতো। দায়সারা নিমন্ত্রণ? ছাব্বিশ মাইল পাড়ি দিয়া চাটুয্যে নিজে যাইবেন গাড়ী লইয়া সুধীরের স্ত্রীকে আনিতে!

একজনের অবিশ্বাসের দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া সুধীর আরো অগ্রাহ্যের সুরে বলে—এতে আর অবাক হ'বার কি আছে? বলেই তো দিলেন আমাকে—"ভালোই হ'ল এই উপলক্ষে বাইরের দিকে একটা লম্বা ট্রিপ দেওয়া হবে। শহরের গণ্ডী ছেড়ে সহজে তো বেরোনোই হয় না।"...বড়মানুষ আত্মীয়—ইচ্ছে করেই তেমন গা করি না, পরিচয় দিইনা, নইলে এই অফিসে এই মাইনেয় পড়ে আছি জানলে এতদিন—হুঁ:।

—আগে বুঝি জানতেন না উনি?

—না না, বললাম তো—

—আচ্ছা কি রকম আত্মীয হ'ন?

এক ছোকরার এই অভদ্র প্রশ্নে সুধীর কম চটে নাই।

আত্মীয়তা এত সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত যে চট করিয়া খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত, তাও সুধীরের দিক হইতে নয়, অঞ্জলির দিকে! গোঁজামিল দিয়া প্রশ্নটা না হয় এড়ানো গেল, কিন্তু অঞ্জলি এখন যাইব না বলিয়া গোঁ ধরিলে সব দিক মাটি।

হয়তো বিশ্বাসই করিবে না কেউ।

অন্তত শীতাংশু ছোকরা তো বটেই। হয়তো 'বক দেখাইয়া'ই বসিবে।

এবার রান্নাঘরের দোবে আসিয়া একখানা পিঁড়ি টানিয়া চাপিয়া বসে।...

অঞ্জলি কাঠের উনান জ্বালিয়া রান্না চাপাইয়াছে...রেল ধর্ম্মঘটের আশঙ্কায় কয়লা স্টক করিয়া—এ অঞ্চলের অধিকাংশ ঘরেই কাঠের ব্যবহার চলিতেছে...অঞ্জলির মুখের পানে চাহিয়া সুধীর একটু ইতস্তত করে, ঠিক যে-ভাবে বলিবে ভাবিয়াছিল—সেটা মনে পড়ে না।

কাঠের আঁচের লালচে আভা হ্যারিকেন লণ্ঠনের হলদে আলোয় মিশিয়া অঞ্জলির নিস্তব্ধ কঠিন মুখের রেখায় রেখায় স্থির হইয়া আছে। অঞ্জলির মুখটা এত নিখুঁত কেন?....ও যখন চুপ করিয়া থাকে, তাকাইলে যেন ভয় লাগে সুধীরের।....তুচ্ছ কথার শব্দতাড়নায় এই অবাঞ্ছিত নীরবতাটা ভাঙিতে পারিলেই যেন বাঁচে।

—রান্না হল নাকি?

অঞ্জলি মুখ তুলিয়া চায়, জানে এটা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র।

—বলছিলাম তোমার হাঁড়িকুঁড়িগুলো একটু চিনিয়ে দিয়ে যাও—দুদিন তো আমাকে নিজেই চালিয়ে নিতে হবে।

—কেন বকছো পাগলের মত, যা অসম্ভব তা নিয়ে বেশী কথা কওয়া ভালোবাসি না আমি, বাইরে হাওয়ায় বোসো গে—রান্না শেষ হলে ডাকবো।

অর্থাৎ একরকম তাড়াইয়া দেওয়াই।

অন্য সময় হইলে সুধীরও উল্টা রাগ দেখাইত, আজ রাগের বশে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাহিরে যাইতে দিলে চলিবে না বুঝিয়াই হাসিয়া বলে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ির কাজেকর্মে মানুষ যায় না?

—'আত্মীয়' আর 'স্বজন' কোন্ পর্যায়ে ফেলতে চাও তোমার অফিসের ওপরওয়ালাকে?.....তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে অঞ্জলি—'স্বজন' বলে ভুল নিশ্চয়ই করবে না? আর আত্মীয়? মামীর ভাইপো—এমন কিছু নিকট আত্মীয় নয় যে না গেলে অন্যায় হবে।

—আহা বুঝছো না—নেমন্তন্ন যখন করেছেন—আগ্রহ করে নিতে আসবেন— বলেছেন—বলেছেন অতবড় একটা মান্যগণ্য লোককে ফিরিয়ে দেওয়াই কি উচিত হবে? কাল বেলা চারটের সময় আসবেন বলে দিয়েছেন।

—কাল অফিসে গিয়েই তুমি নিষেধ করে দিও—বোলো অসুখ করেছে।

—কাল তো ছুটি—কিন্তু আশ্চর্য্য, কি যে অসঙ্গত জেদ তোমার!

সুধীর বিরস মুখে উঠিয়া দাঁড়ায়।

অঞ্জলিও উঠিয়া দাঁড়ায, রান্নাঘরের বাহিরে সামনের উঠানে যে সাদা টগর ফুলের গাছটা চাঁদের আলোর চাদর গায়ে জড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পানে মিনিটখানেক স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে বলে —আশ্চর্য্য, না? যাওয়াটা তুমি তা'হলে সঙ্গত বলেই মনে করো? এই বেশভূষায়—এই শাঁখের শাখা জোড়াটি মাত্র সার করে বড়লোকের বাড়ী গেলে তোমার প্রেস্টিজে বাধবে না?

'বাধিবে না'—এমন কথা অবশ্য সুধীর স্পষ্ট বলিতে পারে না—কিন্তু অঞ্জলি চাটুয্যে-সাহেবের বাড়ী দুইদিন সমাদর লাভ করিয়া আসিলে অফিসে যে প্রেস্টিজটি বাড়িবে সেটাও তো ভাবা দরকার!

চাই কি, সাহেবের নজরে পড়িয়া গিয়া পদোন্নতিও হইতে পারে—অন্তত হওয়া অসম্ভব নয়। তাই উড়াইয়া দিবার ভঙ্গিতে বলে—সে অন্য কোথাও হলে কথা ছিল, এ হল মনিব-বাড়ী, মান আর অপমান! আশী টাকাব কেরানীর বৌয়ের অঙ্গে সোনা-মুক্তো ঢাকাই বেনারসী দেখবার আশা করাই অন্যায়।.....কারবারে লাখ লাখ টাকা লাভ হচ্ছে—কর্ত্তার নিজের তো বাবা একাদশে বৃহস্পতি, আমাদের ভাগ্যে যে ঘাসজল সেই ঘাসজল। স্ত্রীপুত্রকে সাজাবার ভাগ্য কি আমাদের রেখেছে?

মনিব আমার নয়, তোমার! থাক বেশ, যাবো। ঈশ্বরকৃপায় পুত্র নেই এই বাঁচোয়া—

বলিয়া অঞ্জলি পুনর্বার উনানপাড়ে আসিয়া বসিয়া আরব্ধ কাজে মন দেয়।

সুধীর আর কোন সুবিধা না পাইয়া বাহিরে আসিয়া বসে। অঞ্জলি সম্মতি দিল বটে—কিন্তু যেন সুধীরের উপর আক্রোশ করিয়া। কিন্তু কেন?......সুধীরের ধারণাটা ছিল অন্যরকম—আশা করিয়াছিল—চাটুয্যে-সাহেব বা পাতানো সুবাদে 'মেজদা'র এমন সাদর আমন্ত্রণে খুশিই হইয়া

উঠিবে অঞ্জলি—তখন বরং সুধীরেরই সুবিধা হইত পুরনো সন্দেহ ঝালাইয়া তুলিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপে গায়ের ঝাল মিটাইতে।

কিন্তু এ্যা কেমন হইল?

এই ভাগ্যবান্ লোকটির উদ্দেশে অঞ্জলির মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে যে অপরিসীম শ্রদ্ধা আর প্রীতি, সে কি সুধীরের কাছে ধরা পড়িতে বাকি আছে? আকারহীন অভিব্যক্তিহীন সেই সশ্রদ্ধ প্রীতিকে ঠিক ভ্রাতৃস্নেহের কোঠায় ফেলা যায় কি না এই তীক্ষ্ণ সন্দেহ দীর্ঘ একযুগ ধরিয়া মনের কোণে পোষণ করিয়া আসিতেছে সুধীর। অকস্মাৎ এমন কি ঘটিল যে এত ভক্তি ভালোবাসা কর্পূরের মত উবিয়া গেল?

ম্যানেজার বদল হইয়া অফিসে যেদিন নতুন ম্যানেজাবরূপে এম. এন. চ্যাটার্জ্জীব আবির্ভাবের সংবাদ শুনিয়াছিল—সেইদিনই শুধু কেমন বিমনা দেখাইয়াছিল অঞ্জলিকে, মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়াছিল সুধীরকে সেই অনুল্লেখযোগ্য ক্ষীণ আত্মীয়তার খবরটুকু অফিসের পাঁচজনের কাছে বলিয়া বেড়াইতে।

তারপর কই একদিনের জন্যেও তো 'মেজদা'র উল্লেখমাত্র শোনা যায় নাই অঞ্জলির মুখে। অবশ্য সংবাদ চাহিলে সুধীরের পক্ষে মুস্কিল ছিল বৈ কি। নিজের পোস্টটা তাহার এতই নীচে যে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অবসরই ঘটে নাই এই আটমাসের মধ্যে।

হঠাৎ কেমন করিয়া পবিচয়-বহস্য ফাঁস হইল—আকাশেব চাঁদের সাধ হইল মাটির তৃণের সহিত মিতালি করিবার—সে সব কথা সুধীবেব অবোধগম্য।

যেমন বুঝিতে পারে না অঞ্জলির এই অহেতুক ক্রোধ।

কেবলমাত্র গহনা-কাপড়েব অভাব?

অঞ্জলি কি তেমন মেয়ে?.....একখানি একখানি করিয়া সমস্ত অলঙ্কার তো নিজেব হাতেই খুলিয়া দিয়াছে—বন্ধকী ভিটা ছাড়াইতে।

কিন্তু নয়ই বা কেন?

গহনা কাপড় তো সকল ক্ষেত্রে শুধু মেয়েলী শখ মাত্র নয়। পদমর্য্যাদার নিরিখ। সমাজ-জীবনের মানদণ্ড।.....জীবন-যুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষভাবে জয়ী হইয়াছে—লাভ করিয়াছে সাধনার পুরস্কার, তাদের স্ত্রীকন্যার হয়তো বসনভূষণের বাটখারা চাপাইয়া মানদণ্ডের ভারসাম্য রাখিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পরাজিত হতভাগ্যদের ওজনের কমতি ধরা পড়িবার ভয়েই না মধ্যবিত্তেব ঘরে আভরণের কম-বেশী লইয়া এত অশান্তি!

উৎসবে আনন্দে আত্মীয়বন্ধুর গৃহে ডাক পড়িলেই এদের নিস্তরঙ্গ স্তিমিত জীবন অভিযোগে মুখর হইয়া ওঠে।...কলহ বাধিয়া যায় স্বামী-স্ত্রীতে, চিড় খায় আত্মবিস্মৃত শান্তির গায়ে।

অঞ্জলি গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, কলহ করিতে তাহার প্রবৃত্তিতে বাধে, খোঁটা দিয়া স্বামীর অক্ষমতা প্রমাণ করিতে লজ্জা পায়, ঝোঁকের মাথায় একবার মাত্র একটা কথা বলিয়াই একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছে। পরদিন বেলা চারটে বাজিবার পূর্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুধীর আন্দাজ করিতেই পারে না অঞ্জলি শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিল কী।

কিন্তু একসময় চারটে বাজে।

প্রতীক্ষিত শব্দটা ধ্বনিত হইয়া ওঠে সদর দরজার বাহিরে। অগত্যা তদ্‌ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসা ছাড়া সুধীর করিতে পারে কী!...হউক সম্বন্ধী-সম্বন্ধীয়, উপরওয়ালা বড় সাংঘাতিক বস্তু!...কিন্তু আঃ, এই সময় একটাও লোক থাকিতে নাই পথে? সুধীরের দরজায় যখন বিরাটবপু "বুইক"-খানা

দাঁড়াইয়া? পাড়ার পরিচিত ভদ্রলোকেরা সকলেই কি আজ এই ছুটির দিনে জোট করিয়া অন্তঃপুরচারী হইয়াছেন? "ডেলিপ্যাসেঞ্জার" বা সাপ্তাহিকের দল সকলেই তো আজ দেশের মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছেন!...অথচ...সুধীর যেদিন তেল-গুড়-বাজার ইত্যাদির ভারে ভারাক্রান্ত দুইহাতে রবিবাসরীয় কর্ত্তব্য করিয়া বাড়ী ফেবে সেদিন দেশসুদ্ধ লোকের কুশলপ্রশ্নের মরশুম পড়িয়া যায় যেন!

—আসুন আসুন—আমার বাড়ীতে আপনার পায়েব ধুলো...কই গো, তোমার মেজদা এসেছেন যে...চলুন চলুন বাড়ীর মধ্যে।...কি মুস্কিল, আছো কোথায়? তোমার মেজদা এসেছেন বললাম যে—

অঞ্জলিকে হাজির করিতে পারিলেই যেন মস্ত দায় হইতে রেহাই পায় সুধীর।

মণীশ সহাস্যে বলে—থাক থাক, অত ব্যস্ত হ'বাব কি আছে? বসছি এখানে...সে তৈরী হয়ে আছে তো? এখুনি বেরোতে হবে কিন্তু—

'না হুঁ' গোছের কি একটা উত্তর দিয়া সরিয়া পড়ে সুধীর।

অঞ্জলি আসিয়া প্রণাম করিল।

হ্যাঁ, প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে, সাদাসিধে ফরসা শাড়ী ব্লাউস পরা, নিখুঁত সুন্দর মুখে সামান্য একটু প্রসাধনের ছাপ। তেমন কিছুই নয়, হয়তো চুলটা একটু বিশেষ যত্ন লইয়া বাঁধা, হয়তো ললাটের সিন্দূর-তিলকটা একটু বিশেষ উজ্জ্বল। শুধু এই।

—ভালো আছ তো মেজদা? মাসীমা ভালো আছেন? বৌদি? ছেলেমেয়েরা?

—আরে ভালো না থাকলে আর বাড়ীতে এইসব হাঙ্গামা বাধাই? সব ঠিক আছে। কিন্তু তোকে তো মোটে ভালো দেখছি না, বেজায় রোগা হয়ে গেছিস।

—কই, বেশ তো আছি। কিন্তু তোমার ছেলেটি ক'বছরের হ'ল মেজদা? পৈতেধারী পন্ডিত হবার উপযুক্ত হযেছে?

—তা হল বইকি, বছর নয়। বামুনের ছেলে—সূতোগাছটা যথাসময়ে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়াই ভালো—কি বলেন সুধীরবাবু?

দেঁতো-হাসি ছাড়া সুধীরের কাছ হইতে আর কোনো উত্তর আসে না।

—তাহলে অঞ্জু তুই ঠিক হয়ে নে—এখন আরম্ভ করলে—তবে যদি গোটা পাঁচ-ছয়ের সময় বেরোনো যায়, তোমাদের মেয়েদের সাজের ব্যাপার তো! ঘন্টা দুয়েকের কমে কি আর হয়ে উঠবে? জানি তো—

বলিয়া মণীশ আর এক দফা হাসিয়া ওঠে।

সুধীরকে অবাক করিয়া দিয়া অঞ্জলিও হাসিয়া ওঠে—কি যে বলো মেজদা, বুড়োবয়সে আবার সাজবো কি? এই তো বেশ আছি, চলো।

মণীশ অন্যমনস্ক হইতে পারে, নির্ব্বোধ নয়।

অঞ্জলির আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লয়। বাড়ীখানি নিতান্ত শ্রীহীন নয়, পল্লীগ্রামের সবুজ দাক্ষিণ্যে বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া চট্ করিয়া দারিদ্র্য ধরা পড়ে না।...কিন্তু অঞ্জলি এত নিরাভরণ কেন? মুহূর্ত্তমাত্র...পরক্ষণেই সহজ প্রসন্নতার সুরে বলিয়া ওঠে—তা'হলে আর বিলম্ব নেই তো? অবিলম্বে যাত্রা করা যাবে? বাঁচা গেল বাবা! আমার তো—মেয়েদের সেই সাজের ব্যাপার মনে করলেই হৃৎকম্প হয়!...আচ্ছা সুধীরবাবু, নমস্কার! কাল যাচ্ছেন

তো?...হ্যাঁ, অফিস ফেরতই চলে যাবেন সোজা, হোল্ স্টাফ্ যাচ্ছে, অসুবিধের কিছু নেই, সকাল সকাল ছেড়ে দেবো আটটার ট্রেন পেয়ে যাবেন। অঞ্জুকে কিন্তু দিন দুই তিন ছাড়ছি না, বুঝলেন? মঙ্গলবার আবার পিসীমার একটা ব্রত-উদ্‌যাপন গোছের ব্যাপার রয়েছে—আমায় বলে দিলেন বিশেষ করে।

পিসীমা অর্থে অঞ্জুরই মামী, স্বামী-পুত্র হারাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসারে আশ্রয় লইয়াছেন।

—বিলক্ষণ বিলক্ষণ, ওর আর কি, থাকবে থাকবে—

সুধীব বিনয়ে ভাঙিয়া পড়ে একেবারে!

গাড়ী চলিতে থাকে...উদ্দাম বেগে নয়, ধীরে ধীরে। বাঁকাচোরা সঙ্কীর্ণ ধূলিধূসর পথ, মাঝে মাঝে এক একটা বড় গাছের গুঁড়ি নিজেকে বিস্তৃত করিয়া পথকে আরো সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সাবধানে যাইতে হয়।

দুই পাশে বাংলার পল্লীর সাধারণ দৃশ্য...গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ভাঙাচোবা পলস্তাবা-খসা এক-একখানা বাড়ী, ভিতরে মানুষ বাস করে, অথবা 'পোড়ো' বাড়ী, সহজে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। সকালের দিকে জীবনের যে সাড়া মেলে, এবেলায় আব তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। পল্লীগ্রামেব জীবন যেন আধখানা! বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যহীন মন্থব গতিভঙ্গী স্তিমিত হইয়া আসে।

অঞ্জলি এইখানে বাস করে!...মণীশের কত ঐশ্বর্য্য কত প্রাচুর্য্য, অথচ অঞ্জলি এত রিক্ত! অঞ্জলিকে নিমন্ত্রণ করিয়া মণীশ কি বড বেশী ভুল করিয়া ফেলিল?...বেচারা কি পদে পদে কুণ্ঠিত হইবে না মণীশের বাড়ীতে?...'হঠাৎ-বড়মানুষের' ধনগৌরব-স্ফীত আড়ম্বরবহুল সংসারে উপযুক্ত শ্রদ্ধা-সম্মান পাইবে তো অঞ্জলি?...এই অকারণ খেয়ালটা মণীশেব না হইলেই হয়তো ভালো ছিল। কি লাভ? কতটুকু সঞ্চয়?...বাড়ী পৌঁছানোর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত!...চৌকাঠ ডিঙানোর সঙ্গে সঙ্গেই তো হারাইয়া যাইবে অঞ্জলি অন্তঃপুরের বিরাট নারীবাহিনীর মাঝখানে। এই উপলক্ষ্যে লোক তো বড় সোজা জড় হয় নাই, 'তিন কুলে'র বাকি নাই কেহ। হয়তো অঞ্জলিকে এসময় না আনিলেই ভালো ছিল...এখন আর ভাবিয়া লাভ নাই।...কিন্তু উপলক্ষ্য উপস্থিত না হইলেই বা মণীশের দাবী মানিত কে?...একযুগ ধরিয়া মণীশ অঞ্জলির ভাবনাই ভাবিয়াছে এমন নয়, তবু অফিসে হঠাৎ সুধীরের পরিচয় পাইয়া—মনটা কেমন যেন 'হায় হায়' করিয়া উঠিয়াছিল। উপলক্ষ্যও যখন পাওয়া গেল হাতের কাছে, একবার দেখিতে ইচ্ছার মধ্যে দোষের কি আছে?... তার নিজের দুই বোনও তো আসিবে শ্বশুরঘর হইতে! ছেলেবেলায়—অঞ্জলির সঙ্গে কত ভাব ছিল নীলা-লীলার।...সেই সুবাদেই না কখন্ একসময় মণীশ একদিন সার্ব্বজনীন 'মেজদা' হইয়া উঠিয়াছিল!...

ছেলেবেলার কথা যাক, বর্ত্তমানে অঞ্জলির মুখ দেখিয়া এত মায়া লাগে, নীলা-লীলার মতই সস্নেহ মমতায় কাছে বসাইয়া কুশলপ্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয়—কিন্তু এতদিন পরে এ উচ্ছ্বাস মানাইবে কেন? হয়তো অঞ্জলিই অদ্ভুতভাবে বদলাইয়া গিয়াছে!...

কথা আর হয় না।

সুরু করাটাই কঠিন।...অঞ্জলিও যেন বোবা হইয়া গেছে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়া নামিবার কাছাকাছি সময় হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে অঞ্জলিই, একটু হাসিয়া বলে—যাচ্ছি তো—ভয় করছে কিন্তু।

—ভয়?

মণীশের চমকটা সুস্পষ্ট।

—ভয় কি রে?

—কি জানি বাপু, ভীষণ নাকি বড়লোক হয়েছ তুমি আজকাল—

—তাই? তা আমিই তো বড়লোক হয়েছি—খুব ভয় লাগছে দেখে?

—উহুঁ তা কেন, 'বড়লোকের বাড়ী'টাই বড় বিপজ্জনক ঠাঁই।

—এই দেখো—কি পাগলামি! নীলা লীলা হাঁ করে আছে—কত খুশি হবে তোকে দেখে! তোর বৌদি তো দেখেই নি তোকে—সেও—

এটা অবশ্য মণীশের বানানো কথা, বৌদি দেখে নাই তা' ঠিক, কিন্তু দেখিবার জন্য যে খুব বেশী উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে এমন বদনাম দেওয়া যায় না তাহার নামে।...আর নীলা লীলা—সংবাদটা শুনিয়া নিতান্তই নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে সাধারণ প্রশ্ন করিয়াছিল—'অঞ্জুকেও আনছো বুঝি? তাই নাকি?'

অঞ্জুকেও তাহাদের সমান মর্য্যাদা দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম অপমান আছে, এমনি অপ্রসন্ন ভাব।...

—আমার কি হয়েছে জানো মেজদা, একপাশে পড়ে থাকি—সমাজ-সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই বললেও হয়—বেজায় কুণো হয়ে গেছি।

—আর ছেলেবেলায় কী ওস্তাদই ছিলি, উঃ!

—মনে আছে তোমার?

অঞ্জলি এবার সত্যকার হাসি হাসিয়া ওঠে।

—মনে? তা' একটু-আধটু আছে বৈ কি, যদিও তোরা আমার স্মৃতিশক্তির ব্যাখ্যা করে ছড়া তৈরি করতিস তখন। করতিস না? কি যেন সেই একটা—

—ও সেই যেটা সমীর আর আমি করেছিলাম?..."কাশী থেকে আসি এক মহাপন্ডিত—" বলিতে গিয়া থামিয়া যায়—ম্লানমুখে বলে—কোথায় চলে গেল সমীর!...ছোটমামী সেই থেকে তোমার কাছেই আছেন তা' হলে?

—হ্যাঁ, একরকম তাই—মাঝে মাঝে কমলার বাড়ী যান, কমলা আবার তেমন পছন্দ করে না মার জামাইবাড়ী গিয়ে থাকা! দু'চার দিন থেকে আসেন এই আর কি।

—অনেকদিন পরে দেখা হবে সকলের সঙ্গে।

মৃদু বিলম্বিত একটা নিশ্বাস গাঢ় হইয়া আসে।

কিন্তু না আসিলেই যে ভালো হইত সেকথা মণীশের চাইতে কি অনেক বেশী টের পাইতেছে না অঞ্জলি? কেবলমাত্র সুধীরের উপর বিরক্তির বশে এতটা না করিলেই হইত।

দারিদ্র্যের লজ্জা কী প্রখর!

ঐশ্বর্য্যের অহংকার কী নগ্ন!

অবশ্য আতিথ্যের ত্রুটি হইয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে। আসিবামাত্র একজন ঝি স্নানের ঘর দেখাইয়া দিয়াছিল, সাবান তোয়ালে লাগিবে কি না প্রশ্ন করিতেও ভোলে নাই।...হাত মুখ ধোওয়ার পর চা জলখাবার আসিয়া হাজির হইয়াছে, এবং বাড়ীর গৃহিণী আসিয়া মিষ্টহাস্যে কুশলবাদে কর্ত্রীর কর্ত্তব্যের ষোলো আনা পূরণ করিয়া গিয়াছেন।

নীলা অন্ধকার ঘরে ছেলে ঘুম পাড়াইতেছিল...সে ঘরে কাহারও প্রবেশ নিষেধ...লীলা আসিয়া অনেক গল্প করিয়াছে।..."অঞ্জলির চেহারা এমন 'ডাইনে খাওয়া' মত কেন—সে ছিরি-ছাঁদ কোথায় গেল, একটিও ছেলেপুলে না হইবার কারণ কি—সুধীর মেজদার অফিসে কি রকম চাকরী করে—কত টাকার গ্রেড্" ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া সে এইমাত্র বামুনঠাকুরেরা যেখানে মিষ্টির ভিয়ান বসাইয়াছে সেখানে গেল তদারক করিতে।...

চাহিয়া চাহিয়া অঞ্জলির ভারি হাসি পায়, বাবা, এত মোটাও হইতে পারে মানুষ! ক'গজ কাপড় লাগে ওর একটা ব্লাউসে?

ছোটমামী বিস্তর হা-হুতাশ কান্নাকাটি করিলেন...স্বামীশোক, পুত্রশোক...বহু পুরাতন হইলেও অঞ্জলির সঙ্গে নূতন দেখা হওয়ার অজুহাতে আর একবার জাগাইয়া তুলিলেন।...তাছাড়া—দিন বুঝিয়া এই সময় কমলা বসিয়া রহিল আঁতুড়ঘরে! এতবড় একটা কাজে আসিতে পাইল না—সেটাও কম শোকাবহ ব্যাপার নয়।...চুপি চুপি ভাইপো-বৌয়ের নিন্দা করিলেন প্রাণ খুলিয়া। পাঁজিতে আরো দিন ছিল...কমলা তখন কারাগার হইতে মুক্তি পাইত, বৌ গ্রাহ্যই করিল না!...ওর বাপের বাড়ীর লোকগুলি আসিলেই ব্যস!...মাছিটি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই...ইত্যাদি ইত্যাদি...

ব্যস্, অঞ্জলি সম্বন্ধে আর কাহারও কোনো কর্ত্তব্য নাই।...কিন্তু কৌতূহল আছে ঠিক।...আড়ালে আবডালে...চাপাহাসি...ইসারা ইঙ্গিত...ফিস্ফাস্ গুজগাজ...অঞ্জলির তীক্ষ্ণ অনুভূতির কাছে চাপা থাকে না।...

নীলার ছেলে বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমাইলো...এখনো চাক্ষুষ হইতে বাকি আছে, কিন্তু মন্তব্যটা শোনা যায় স্পষ্ট..."মরণ আর কি, লজ্জাও নেই ছাই! আমাকে তো বাবা কেটে টুকরো টুকরো করলেও অমন হাড়ির হাল করে লোকসমাজে আসতাম না।"

—"চেহারা হয়েছে, দেখেছিস"—এটা লীলার গলা—"গাল দুটো যেন চড়িয়ে ভেঙেছে। কথায় বলে—'মাংসই লক্ষ্মীছিরী'...মা লক্ষ্মীর হাওয়া গায়ে লাগলেই গায়ে মাস গজায়—

—"শুদ্ধু দুগাছ শাঁখের শাঁখা! জামাই-বাবুর এ কুটুম্বটি আবার কোন্ গোকুলে ছিলেন? কখনো তো দেখিনি...হ্যাঁ গা দিদিমণি, তোমার দুখানা কাপড় নয় বার করে দিও পরতে—পাঁচজনের সামনে ওই পোশাকে বেড়ালে যে তোমার গায়েই ধুলো দেবে লোকে"—মেজ বৌয়েব বাপের বাড়ির ঝি হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে কথার সঙ্গে সঙ্গে।

—আমার দায়! সাধ করে নেমন্তন্ন করতেও যাইনি—ঘটা করে আনতেও যাইনি! পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে বলেই 'আথ্কুটে'র মতন বাজে নষ্ট করতে হবে!...ভাব-ভালোবাসা যখন ছিল—ছিল, এখন যখন আপিসের ছোট কেরানীর বৌ, তখন তুমি আপিসের মাথা—তোমার আবার নিজে গিয়ে তাকে আনতে ছোটা কেন?

—'ছিল' বলে তো উড়িয়ে দিচ্ছ, বলি এখনো 'আছে' কি না খোঁজ নিয়েছ তো ঠাকুরঝি?

মণীশের ছোট শ্যালাজ টিপ্পনী কাটে।

—বকিসনে ছোটবৌদি, গা জ্বলে যায়।

—বিশ্বাস কি, যা 'গ্রীসিয়ান-কাটে'র মুখ! সত্যি ফাইন্ মুখখানা বাবা! রংও একদা ছিল বলে বোঝা যায়।

বাপের বাড়ীর ঝি হাসিতে হাসিতে বলে—আমাদের জামাইবাবু একদিকে, আর গঙ্গাজল একদিকে—ওসব কিছু নয়! স্পষ্ট কথা বলি শোনো ছোট বৌদি, 'কণ্ট্রোলে'র বাজার, ভালোমন্দ

খাওয়া তো উঠে গেছে মানুষের—তবু দু'দিন একটু খেয়ে মেখে নিতে পারলে সুবিধে।

—আমার তো দেখে সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়াচ্ছে।...পাড়ার লোকের দু'খানা গয়না কাপড় চেয়ে আনলেও পারতিস...এ যে আমাদের শুদ্ধু মুখ-পোড়ানো!

—ওগো দিদিমণি, এসব একপ্রকার চালাকি, বড়মানুষ ভাই, 'দাদা দাদা' করে গায়ে পড়ে কিছু আদায় না করেই কি আর যাবে?

—তাই কি একদিনে যাবে? পিসিমার ব্রত উদ্‌যাপন দেখে তবে নাকি নড়বেন।

—তাই নড়লেই বাঁচি, এখন তোমার সংসারের ঘি দুধের মায়া কাটিয়ে কবে নড়েন দেখো! আসতে মাত্তরই তো সন্দেশ রসগোল্লার ছড়াছড়ি।

—বাড়ীর কর্ত্তার হুকুম!...

অঞ্জলির কি হঠাৎ চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল নাকি? বারান্দার এই অন্ধকার কোণটা ছাড়িয়া নড়িতে পারে না কেন?

আচ্ছা কোথায় যেন গল্প শোনা ছিল না, সন্তানের লজ্জার দায়ে মা বসুমতী দ্বিধা হইয়া গিয়াছিলেন?...নেহাৎই গল্পকথা?...না বৃদ্ধা বসুন্ধরা আজ শ্রবণশক্তি হারাইয়া বধির হইয়া বসিয়া আছেন?

মিথ্যা কলঙ্কের চাইতে সত্য দারিদ্র্য কি কম লজ্জাকর?

পরদিন ভোজের ঘটা।

রাত্রি না পোহাইতেই আরম্ভ হইয়া গেছে হৈ-হুল্লোড়! ...অনেক লোকের ভীড়ে একটা সুবিধে যে, নিজেকে কিছু আড়াল করিয়া রাখা চলে।...কিন্তু একেবারে আড়াল করিলেই বা চলিবে কেন? মুখের হাসির ঠাট্টা বজায় না রাখিতে পারিলে পরাজয়টা যে বড় শোচনীয়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটিল চমৎকার!

মণীশ ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া নীলাকে ডাক দেয়—ওরে নীলি, দেখ্ তো অঞ্জু কোথায়! সুধীর অফিস থেকে এক ছোকরাকে দিয়ে এই জিনিসটা পাঠিয়ে দিয়েছে—স্যাকরাবাড়ী পড়েছিল নাকি, কালকের মধ্যে আর কিছুতেই দিযে উঠতে পারেনি—অনেকক্ষণ দিয়ে গেছে আমায়...ভাগ্যিস মনে পড়লো—আমার যা মন, কোথায় ফেলেই দিতাম হয়তো।

পাতলা সাদা কাগজের আবরণ খুলিয়া জিনিসটা দেখায় মণীশ।

অভিনব কারুকার্য্যে গড়া একজোড়া কঙ্কা কঙ্কণ!

ওজনে এবং গঠনের পারিপাট্যে লোভনীয় সন্দেহ নাই!

অঞ্জু আসিয়া দাঁড়াইতেই মণীশ আরো ব্যস্তভাবে গহনাটা প্রায় গুঁজিয়া দেয় তার হাতে। খুব যেন তাড়াতাড়ি এইভাবে বলে—এই নাও তোমার কর্ত্তার কান্ড! বাজে একটা লোককে দিয়ে এই দামী জিনিসটা পাঠানো হয়েছে বাবুর! একমাস আগে নাকি গড়তে দিয়েছিল? তা' তোদের পাড়াগাঁয়ের স্যাকরার কাজ তো নেহাৎ খারাপ নয়...নে হাতের ভিতর ঢুকিয়ে ফেল, গোলমালের বাড়ী—যেখানে সেখানে ফেলে রাখলেই বিপদ!

যেমন ব্যস্তভাবে আসিয়াছিল তেমনি ব্যস্তভাবে চলিয়া যায়।

রঙ্গমঞ্চের লোকগুলো একেবারে পাথর বনিয়া গেল কি না সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র করে না।

কিন্তু মুহূর্ত মাত্র!

নীলা ছোঁ মারিয়া জিনিসটা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর ফিরাইয়া দিয়া বলে—হ্যাঁ জিনিসটা গড়েছে ভালোই দেখছি—ক'ভরি হয়েছে?

—ভরি চারেক হবে—আপনাকে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে অঞ্জলি—চুড়িগুলো 'খয়ে চুন' হয়ে গিয়েছিল—ভাবলাম একটা কঙ্কণ পরার সাধ, তাই দিই। সোনা কিনে' দুটো জিনিস তো 'আর হয়ে উঠবে না ভাই।...ওখানের স্যাকরা না ছাই—বলে 'লোহা বাঁধানো'ই গড়তে পারে না। এখানেই কোথায় বুঝি গড়তে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মণীশ নির্বোধ বলিয়া তো আর বিশ্বসুদ্ধ লোক বোকা নয়!

মণীশের বৌ মণীশকে একহাটে বেচিয়া আর এক হাটে কিনিতে পারে । যত বড় অফিসারই হোক মণীশ, সাংসারিক বুদ্ধিতে পাকিতে দেরী আছে তার। তা' না হইলে পাঞ্জাবির পকেটে ক্যাশমেমো রাখিয়া 'পুকুর চুরি'র মত দুঃসাহস করিয়া বসে!

সমারোহের বাড়ী, নিমন্ত্রিতাদের গায়ে নূতন ঢংয়ের অলঙ্কারের অভাব নাই, তবু অঞ্জলির কঙ্কণ জোড়াটা যে বাড়ীসুদ্ধ লোকের কী এক কৌতূহলের খোরাক হইয়া উঠিয়াছে..."দেখি দেখি"..."ওমা তাই তো"..."নীলা তাই বলছিল"..."কোন্ স্যাকরাকে দিয়ে গড়ানো ভাই"..."বানী কত করে নিয়েছে"—"অবাক করলে, কিছুই জানো না? তোমার কর্তা বুঝি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই"...

উত্তর দিতে দিতে হয়রান হইয়া পড়িয়াছে অঞ্জলি।

রাত্রে যদি সুধীর সত্যই আসে নিমন্ত্রণ রাখিতে, কোনো উপায়ে কি পলাইতে পারে না অঞ্জলি? যে কোনো ছুতায়? কিন্তু সুধীর আসিবে না সেকথা অঞ্জলি জানে...আজ আর সারা বাড়ীতে এক ফোঁটা অন্ধকার কোণ খুঁজিয়া মেলা দায়। ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে এই হাজার বাতির শক্তিসম্পন্ন হাজারটা বিদ্যুৎ-বাতির নীচে...

ওরই মধ্যে মণীশের বৌ নিজে আসিয়া আহ্বান করিয়া গেছে—এসো ঠাকুরঝি, খাবে এসো। খিদে নেই? সে কি কথা, তা' বললে শুনছি না ভাই, ছাব্বিশ মাইল পথ ভেঙে নেমন্তন্ন খেতে এসেছো, 'খাবে না' বললে চলে? তোমার দাদা শুনলে রক্ষে রাখবেন! বাবা, এমনিতেই তো তাঁর ধারণা এ বাড়ীতে নাকি তোমার উপযুক্ত আদরযত্ন হচ্ছে না—আমরা নাকি বড়মানুষকেই ভজি—

উঠিয়া গিয়া পাতের সামনে বসিতেও হইয়াছে।

শয্যার ব্যবস্থা ছোটমামীর ঘরে।

অনেক রাত্রে গোলমাল মিটিয়া গেলে শুইতে আসিয়া দেখিল—ছোটমামী তখনও জাগিয়া...অঞ্জলিকে দেখিয়া বিরক্তিক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন—এসব কি শুনছি অঞ্জু?

—কেন ছোটমামী?

শ্রান্তির ভারে শরীরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে যেন।

—মণি নাকি তোকে কঙ্কণ গড়িয়ে দিয়েছে—তুই তাই প'রে বড়মুখ করে বেড়াচ্ছিস—আবার বলা হচ্ছে 'জামাই পাঠিয়ে দিয়েছে'—ছি ছি, একি কেলেঙ্কারি মা!

অঞ্জলি ম্লানহাসির সঙ্গে বলে—কেন ছোটমামী, একজোড়া বালাও কি দিতে পারে না তোমার জামাই?

—পারে কি না তুমিই জানো বাছা, পারলে আর দু'গাছা শাঁখা ঢনঢনিয়ে কুটুমবাড়ী আসতে না। এও বলি বাছা, আগুন কখনো ছাইচাপা থাকে? মণির পকেটে সেই দোকানের রসিদ নাকি বেরিয়েছে—বৌমা দেখে কুরুক্ষেত্র করছে, স্বামী-স্ত্রীতে এতক্ষণে কি হল জানি না মা। এ কি বিড়ম্বনা, এ্যাঁ! তোমাকেও বলি মা —গরীব বড়লোক ভাগ্যের কথা, প্রবৃত্তি ছোট কোরো না। পরের জিনিসে যে লোভ করে তার অনন্ত নরক।...ও কঙ্কণ তুমি দাও আমার কাছে, বৌমাকে চুপি চুপি ফিরিয়ে দেব আমি।

অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না বটে—সোনার জিনিস হাতে পড়িলে চিনিতে ভুল হয় না...ছোটমামী হৃষ্টচিত্তে আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলেন—বৌটিও তো সোজা নয়, বড়মানুষের মেয়ে হ'লে কি হয়...বড় ছোট নজর।

'যাত্রা'টা বোধ করি এ-যাত্রা নিতান্তই খারাপ ছিল অঞ্জলির, তা নয় তো এমন ঘটনাও ঘটে!...গতকাল হইতে নাকি সুধীরের ভেদবমি হইতেছে—এই মুহূর্ত্তে অঞ্জলির যাওয়া দরকার—মণীশ অফিসে গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া দুঃসংবাদটা পেশ করে।...

ছোটমামী হাঁউমাউ করিয়া উঠেন—সধবা মানুষের হাত হইতে কঙ্কণ খুলিয়া লওয়ার স্মৃতিটা বোধ করি মনের মধ্যে সাপের মত ছোবল মারে। কাতরভাবে বলেন—কী সর্ব্বনেশে কথা বলছিস্ মণি, বাঁচবে তো? কে বলে গেল তোকে?

—অফিসেরই এক ছোকরা, ওদের দেশ থেকে আসে।...যাক আর দেরী করে লাভ কি? ঠিক হয়ে নে অঞ্জু, ভাবছিস কেন—ভাবনার কিছু নেই, ও গেঁয়ো লোকদের একটু বাড়িয়ে বলা রোগ, যতটা বলেছে ততটা হয়তো নয়—চল্ চল্, আর দেরী নয়।

—তুমিই যাচ্ছো তা'হলে? তোমার অফিসের ক্ষতি হবে না?

তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন মেজগিন্নী।

—আরে দূর অফিস! যার জিনিস নিয়ে এসেছি তা'কে ফেরৎ দিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।

আবার পথ।

আবার দুইটি নীরব প্রাণী।

কলিকাতার কাছাকাছি পর্য্যন্ত উদ্দাম বেগে ছুটিয়া গাড়ীর গতি ক্রমশ কমিয়া আসে। বাঁকাচোরা সঙ্কীর্ণ পল্লীপথ, ধীরে ধীরে সাবধানে যাইতে হয়।

এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে মণীশ। গাড়ীটা প্রায় থামাইয়া আস্তে বলে —তোর কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত অঞ্জু!

—থাক্, আর ক্ষমা চাইতে হবে না মেজদা! আমি জানি—

—কি জানো তুমি?

সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করে মণীশ।

—অসুখ-টসুখ কারুর কিছু করেনি।

—অ্যাঁ, জানিস্ তুই? কি করে জানলি?

—এমনিই জানতে পেরেছি—

মৃদু হাসে অঞ্জলি।

—তা'হলে তো আর তোমার কাছে কিছুই লুকোবার নেই দেখছি!

—তা' নেই।

বলিয়া আর একবার সহজভাবে হাসিয়া ওঠে অঞ্জলি।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

আবার একবার মণীশ একটু ইতস্তত করিয়া গাঢ়স্বরে বলে—আমি তোকে অপমান করতে ডেকে নিয়ে যাইনি অঞ্জু, বিশ্বাস কর্।

—তুমি কি ক্ষেপে গেলে মেজদা?

—হয়তো আমি সবটা জানি না, হযতো আরো অনেক বেশী লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এসেছ, তবু এও জানিস ভাই, দুঃখ আমিও কম পাইনি।

এ সম্বোধনটা নূতন।

অঞ্জলি ব্যাকুলভাবে বলে—আমি তাও জানি মেজদা।

—তবে আমার আর একটি অনুরোধ রাখো বোন। রাখবি তো?

—রাখবো বই কি মেজদা, কি বলো?

পাতলা সাদা কাগজে মোড়া একটি বস্তু পকেট হইতে বাহির করে মণীশ।

উজ্জ্বল চাকচিক্যময় একজোড়া কঙ্কণ।

অঞ্জলি অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে...প্যাটার্ণটা অন্য, ভুল করিবার কিছু নাই, কিন্তু কী অদ্ভুত ছেলেমানুষি মণীশের!...সহসা মণীশকে আশ্চর্য্য কবিযা দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে অঞ্জলি...

—তোমার কি কঙ্কণের গাছ আছে মেজদা? হাত বাড়িয়ে পেড়ে আনলেই চলে? আবার কি বলে কিনেছ একজোড়া? লজ্জা-শরমও নেই বাপু!

—লজ্জা? 'নেই' কি করে বলি বল্? আমার দেওয়া জিনিস, ওরা তোর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে —এ লজ্জা আমার মরে গেলেও যাবে না।...

—তুমি একটি আস্ত পাগল মেজদা, আজকালকার দিনে টপ করে অতগুলো টাকা নষ্ট করা কোন বৌ সহ্য করে শুনি?

—থাক, তোমার ওকালতি করতে হবে না, শুধু ফিরিয়ে দিতে চেয়ো না দয়া করে, এ আমার নিজস্ব টাকা, সংসারের প্রাপ্য পাওনা নয়। আঙুলে একটা আংটি। কী কাজেই না লাগে! হঠাৎ খুলে পড়ে হারিয়ে যেতেও পারে। ধর তাই গিয়েছে! জীবনে কত কীইতো হারায়!

অঞ্জলী থমকিয়া তাকাইয়া দেখে।

কী সর্বনাশ, অত্যুজ্জ্বল যে হীরার আংটিটা মণীশের সুপুষ্ট আঙুলের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল সে স্থানটা ফাঁকা।

কিন্তু এও তো এক পরম বোকামি! এটাই কী ধরা পড়িবে না? কী অবোধ!

—ছি ছি, এ কী অন্যায় মেজদা! না না—কেন ভাই এ রকম পাগলামি করছো?

—তবে থাক্, নিয়ো না। বুঝলাম—ক্ষমা করতে পারোনি।

এই এক বিপদ! তর্কের উত্তর আছে, নীরব অভিমানের উত্তর কি?

—মেজদা, রাগ করলে?

—রাগ? রাগ করবার কি রাইট আছে আমার শুনি!

—কি মুস্কিল! কই দাও বাপু পরছি—এই দেখো, হ'ল তো?

—হ'ল! অনেক দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনা রইল আমার। প্রার্থনা করি এ জিনিস তোমার হাতে অক্ষয় হোক বোন। একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে পর্য্যন্ত ভয়ে সারা হচ্ছি।

দরজার সামনে নামাইয়া দিয়াই মণীশ তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া স্টার্ট দেয়। হয়তো অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইত— যদি না ধূলিধূসর মেঠো পথ গাড়ীর পিছনে ধূলার ঝড় রচনা করিয়া দৃষ্টির আড়াল করিয়া দিত।

মিছামিছি পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে কেন অঞ্জলি?

উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত শেষ ধূলিকণাটিও তো অবশেষে ফিরিয়া আসিয়াছে মাটিতে—পূর্ব্বপরিবেশের মধ্যে।...ঝড়ের চিহ্নও আর নাই।

সদর দরজায় তালা লাগাইয়া অফিস গিয়াছে সুধীর...অঞ্জলির তো আসার কথা নয়!...হয়তো প্রতিবেশিনী সরযূ-ঠাকুরঝির বাড়ী খোঁজ করিলে চাবির সন্ধান মিলিবে।...ঘণ্টা কয়েক সময় তাহার বাড়ী বসিয়া থাকাও চলে...তবু কি এই রকম বোকার মত দাঁড়াইয়া থাকিবে অঞ্জলি? কতকাল থাকিবে?

নাঃ অঞ্জলি বোকা নয়, ধাতস্থ হইতে বেশী দেরী হয় না তার।...সুধীর আসিবার আগে সংসারের কাজের মধ্যে সহজ হইয়া থাকার দরকার এটা সে বিস্মৃত হয় নাই।...নিমন্ত্রণের ব্যাপার যখন মিটিয়াই গেল তখন অঞ্জলি চলিয়া আসিবে না তো কি? মিছামিছি কেন আর পরের বাড়ী বসিয়া থাকা—বেচারা সুধীরকে যেখানে হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হইতেছে।

সরযূর বাড়ী যাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়া ছাড়া উপায় থাকে না।

কি আশ্চর্য্য, অঞ্জলি কি ভুলিযা গিয়াছিল নাকি?...মিনিটখানেক নূতন অলঙ্কারশ্রীমন্ডিত হাত দুইখানির পানে অভিভূতের মত চাহিযা থাকে। কঠিন ধাতু...তবু যেন বন্ধুর স্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া আছে কোমল প্রকোষ্ঠ দুইখানি।...

হ্যাঁ—প্রেম নয়, করুণা নয়—স্নেহমাত্র।

কিন্তু পৃথিবীটা তো এত বোকার জাযগা নয় যে, স্নেহকে 'স্নেহ' বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে!

গ্রীষ্মের দুপুরটা কি নির্জ্জন।

পুকুরের জলটা কি নিস্তরঙ্গ!

'টুপ' করিয়া সামান্য এতটুকু যে শব্দ সে সাড়া কাহারও কানে যাইবার আশঙ্কা নাই। কতটুকু সেই শব্দ?...সামান্য একটা ঢিল, ছোট্ট একটু গাছের ফল হামেশাই তো পুকুরের জলে পড়িয়া তলাইয়া যায়!

কে খোঁজ পায়?

কতক্ষণ আলোড়ন থাকে?

[১৩৫৩]

চটিটা পায়ে গলাইয়া সবে চৌকাঠ ডিঙাইয়াছি—পিছন হইতে ভাইপো শানানো গলায় চেঁচাইয়া উঠিল—মেজকা ছটার আগে আসবে তো?...

'গো ব্রাহ্মণে' ভক্তি না থাক্—হাঁচি টিক্‌টিকিটা বরাবর মানি। আধুনিক হইবার সর্ববিধ চেষ্টা সত্ত্বেও 'পিছু ডাকিলেই' কেমন যেন মেজাজটা খাপপা হইয়া ওঠে।

প্রায় খিঁচাইয়া বলি—কেন ছটা বাজলেই কি এমন রাজ্য রসাতলে যাবে, যে তার আগে আসতেই হবে?

—বাঃ। সুধাংশুবাবু ছটার সময় মীটিং কল করেছেন না? অ্যাবসেন্ট হলে চলবে না মেজকা, এমনিই তো 'বেমলা'রা সেদিন যা ঠাট্টা করেছে।

—কেন ঠাট্টার কি হয়েছে? অপরাধ?

—ওই—বলে যে—'তোদের বাড়ীর কথা বাদ দে, একের নম্বর কুনো আর ভীরু তোরা।' দাঙ্গার সময় তোমরা রাস্তায় পাহারা দাওনি কিনা। অথচ পাড়ার সক্কলে—

—সক্কলে যখন দিয়েছে, তখন আমাদের দেওয়ার দরকার?...মরুকগে ও মীটিং-ফিটিঙে আমি নেই, সাহসীর খাতায় নাম লেখাতে চাস তো—যাস্ তুই।

নিরু দুই চোখ কপালে তোলে—আমি? আমি গিয়ে কি করবো? পাড়ার সমস্ত বড় বড় ভদ্দরলোকেরা আসবেন যে—জে রায় চৌধুরী, আশু মিত্তির, মল্লিক বাড়ীর কর্ত্তা, হলদে বাড়ীর ওরা, সব জমায়েৎ হবে মিটিঙে। ছোটরাও অবিশ্যি যাবে! আমার লজ্জা করে।

—আমি পারবো না—ঝাড়া জবাব দিই—দাদাকে বলগে না।

—বাবা! তা' হলেই হয়েছে। বাবা অফিস থেকে এসে একবার বাড়ি ঢুকলে আর বেরোবেন? স্বপ্নেও ভেবোনা। তুমিই যেও মেজকা, তোমার পায়ে পড়ি।

অগত্যা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। বুঝিলাম 'বেমলা' ঘটিত অপমানটা মর্ম্মান্তিক লাগিয়াছে নিরুর, এর উপর যদি সুধাংশুবাবুর এই বিরাট সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হইয়া অ-সভ্য থাকিয়া যাই, পাড়ায় আর মুখ দেখাইতে পারিবে না বেচারা।...কম দায়ে পড়িয়া কি আর পায়ে পড়িয়াছে?

অবিশ্যি ছ'টার পর পর্যন্ত ঘুরিবই বা কোথায়? পথে বাহির হইয়াই কি সুখ আছে?

অভ্যাসের বশে বিকেলের দিকে বাড়ীতে টেঁকা যায় না তাই পথে বেরোনো। রাস্তার দুই দিকে আবর্জ্জনার পাহাড়। সুদুর ভবিষ্যতে কর্পোরেশনের লরীর আশায় অপেক্ষা করিতেছে। অপেক্ষা করিতে করিতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে...গণ-দেবতার পদতাড়নায় ফুটপাতের প্রসারিত বক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই পথ ধরিয়াই সান্ধ্যভ্রমণ।

অন্য সময় হইলে কলেরা বসন্ত আর টাইফয়েড়ের প্রবল আশঙ্কায় তুমুল আন্দোলন সুরু করিতাম—কিন্তু সে-আশঙ্কা যে কতো অমূলক সম্প্রতি তাহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।...গলিত শবের পা মাড়াইয়া সগর্ব্বে গরম জিলিপি আনিয়া খাইয়াছি—কিছুই হয় নাই।

খানিকটা ঘুরিয়াই বাড়ী ফিরিলাম।

নিরু হৃষ্টচিত্তে কাছে আসিল—এসেছো মেজকা? বাঁচলাম।...দু'বার খোঁজ করে গেছে।...

—বাবাঃ! এতো ব্যস্ত? কি যে হাতী-ঘোড়া হবে তা'ওতো জানি না।

—তা'ও জানো না? এঃ। তোমরা মেজকা সত্যিই একদম বাজে। কিছুতে যদি উৎসাহ

থাকে, পল্লীরক্ষী-বাহিণী গঠন হবে যে—পাড়ার প্রত্যেককেই তার অংশ নিতে হবে না?...

সত্য বলিতে কি, অংশ-গ্রহণের আগ্রহ্ শতাংশের একাংশও খুঁজিয়া পাইতেছিনা, নেহাৎ নিরুর তাড়নাতেই আবার চটির মধ্যে পা গলাই।...

—ফিরতে রাত হবে না তো ঠাকুর পো?

চৌকাঠ ডিঙাইতেই আবার পিছু ডাক।

আজ কপালে দুর্ভোগ আছেই আর কি! নিরুকে খিঁচানো সহজ—নিরুর মাতৃদেবীকে কিন্তু আর সেটা সম্ভব নয়, কাজেই গম্ভীর হইয়া বলি, যদিই হয়—কি হুকুম?

—হুকুম আবার কি! সকাল সকাল খেয়ে নেবে,—রাত দুপুর অবধি হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকতে পারবো না।...

রাত দুপুর মানে সাড়ে আটটা—জোর নটা। কারণ কারফিউর কল্যাণে আজকাল 'ভদ্দর শুদ্দুর' সকলকেই উক্ত সময়ের মধ্যে নিজ নিজ গোহালে ফিরিতে হয়, "হাঁড়ি আগলানো"-রূপ দুঃসহ কাজটাতো মহিলা-সমাজ হইতে উঠিয়াই গিয়াছে।...

তবু—আশ মেটে না!

শুনিতে পাই বৌদি নাকি পাঁচ আনার হবির লুট মানিয়াছেন—'কারফিউ' প্রথার চিরস্থায়িত্বের কামনায়।...যাক, হরির কাছে যে যা মানৎ করে সব ফাঁস হইয়া গেলে পৃথিবীর চেহারা আরো কি বিভীষণ হইত কে জানে!

সুধাংশু উকিলের বৈঠকখানাটা আড়ে দৈর্ঘ্যে মন্দ নয়।

পশার আছে—মক্কেলদের জায়গা দিতে হয়, কাজেই দুটোঘরের মাঝের পার্টিসান ভাঙিয়া দুখানা ঘর এক করিয়া লইয়াছেন। দেখি সেই ঘরে তিল-ধারণের ঠাঁই নাই, লোকে লোকারণ্য।...

জে রায় চৌধুরী আসিয়াছেন, আশু মিত্তির আসিয়াছেন, মল্লিক বাড়ীর কর্ত্তা, হলদে বাড়ীব বড় ছেলে, এঁরা ওঁরা তাঁরা আরো অনেকেই আসিয়াছেন। মান্য গণ্য বলিয়া যাঁদের চিনি—এবং দেখিলেই যাঁদের মান্য গণ্য বলিযা চেনা যায়।

এগুলি চেয়ারের ব্যাপার।

ঘুঁসি খাইবার উপযোগী, জাঁদরেল গোছের টেবিলও আছে একটা! মান্যগণ্য ছাড়াও আছে—নগণ্য অথচ অগ্রগণ্য—কি বলিব? জনশক্তি? বোধহয় তাই। আট হইতে আঠারো বছর বয়সের পদাতিক সৈন্য-বাহিণী।...

আরো আশার কথা, মহিলাসমাগমেরও অভাব নাই।

আশার কথা, উৎসাহের কথা, আনন্দের কথাও বৈকি। মুখে যিনি যত অস্বীকার করুন, ধুতি পাঞ্জাবী সার্ট প্যান্টের শুষ্ক মরুভূমির মাঝখানে—রঙিন শাড়ীরূপ ওয়েসিস দেখিলে চোখ জুড়ায় না এমন চোখ বিরল।

নিশ্চল জনসমুদ্রে একটি নমস্কাররূপ ঢিল ফেলিয়া ঘরে ঢুকিলাম।...বিশেষ কোনো তরঙ্গ উঠিল না—শুধুমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং—'এই যে এসেছেন' বলিয়া হাতের সাহায্যে একটি প্রতি-নমস্কারের আভাস আনিয়া চোখের সাহায্যে একখানি খালি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।...কয়েকখানি চেয়ার তখনো শূন্যহৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিল, বুঝিলাম বিশিষ্ট আরো কেউ আসিতে বাকি।...

সুধাংশুবাবু বলিলেনও তাই,—'কই আমাদের ডাক্তার মুখার্জি, মিষ্টার সিংঘী, প্রফেসর বোস কেউই তো এখনো এসে উঠতে পারলেন না! অথচ সাড়ে ছটা বেজে গেল। আশ্চর্য।'

—বাঙালীর কথা আর বলবেন না—সমস্ত সমস্যার মূলই এই—পাংচুয়ালিটির অভাব।...হলদে

বাড়ীর বড় ছেলে রায় দেন।

—যাক, যাঁরা, উপস্থিত আছেন তাঁদের নিয়েই কাজ আরম্ভ হোক। কি বলেন?

—হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...।

অনেকগুলি সায় পড়ে।

সুধাংশু উকিলই আহ্বানকারী, কাজেই তিনি স্বস্তিবাচনেরও অধিকারী নিশ্চয়। অতএব টেবিলের কাছে আগাইয়া আসিতে দ্বিধা করেন না। বার দুই গলা খাঁকারি দিয়া একটু কাশি একটু হাসি সহযোগে হাতের ভিতর গুটাইয়া রাখা একখানা কাগজ টেবিলে বিছাইয়া পড়িতে থাকেন।...পড়েন অবশ্য সোজা দাঁড়াইয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে।...

—ভদ্রোমহোদয়গণ ভদ্রমহিলা ও উৎসাহী বালকবৃন্দ! আমার সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। জানাচ্ছি—আমার আহ্বানের মর্য্যাদা রেখেছেন বলে নয়, দেশের মর্য্যাদা, ধর্ম্মের মর্য্যাদা, মানুষের মর্য্যাদা, আর আমাদের এই বড় আদরের সাদার্ণপল্লীব মর্য্যাদা রাখতে অগ্রণী হয়েছেন বলে।...আপনারা সকলেই জানেন—কেন আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি—

—জানি স্যার! পল্লীরক্ষী বাহিণী গঠন করতে—

একটি ছোকরা বলিয়া ওঠে—আলোচনা আরম্ভ করুন না, কাগজ পড়ে আর কি হবে?

— আমাদের উদ্দেশ্যটা তো সকলকে জানাতে হবে! ...সুধাংশু বলেন।

—উদ্দেশ্য আবার জানাবার কি আছে স্যার, কে না জানে? আমাদের এখন লড়তে হবে—মরতে হবে—বাঁচতে হবে—

সুধাংশুবাবু হাতেব ইসাবায় তার প্রজ্বলিত উৎসাহে কিছুটা জল ছিটাইয়া দিয়া পুনশ্চ পড়িতে থাকেন—'সমবেত হয়েছি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার শিক্ষালাভ করতে।...এ কথা মানতেই হবে— একতা না থাকলে কোন কাজই ঠিকমত হয় না।...চাই একতা, চাই সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তি, চাই মতবিরোধ আর দলাদলির উচ্ছেদ।...তোমবা বলছো—'লড়তে হবে...মরতে হবে বাঁচতে হবে—' ঠিক বলেছো—কিন্তু তাবও তো একটা নীতি আছে, শৃঙ্খলা আছে, পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা করতেই আজ—

দেশরক্ষায় বদ্ধপরিকর ছোকরাটি আর স্থির থাকিতে পারে না, মহোৎসাহে বলিয়া ওঠে—পরিকল্পনা সমস্তই তৈরী আছে স্যার! শুধু আপনাদের দিয়ে একবার পাশ করিয়ে নেওয়া। আপনারা গা দিচ্ছেন না বলেই আমরা ভেঙে পড়েছি। নইলে ভাববার আবার আছে কি? আট থেকে বারো বছরের ছেলেদের শুধু শাঁখ আর ঘণ্টা, বারো থেকে ষোল—থান ইঁট, ষোল থেকে তিরিশ স্রেফ লাঠি। ব্যস।

উকিলবাবু ভিন্ন সকল ভদ্রলোকই নীরব ছিলেন। ছোকরার কথা শেষ হইতেই আশুমিস্তির গোঁফের কোণে একটু হাসিয়া বলিয়া ওঠেন—

—আমাদের মতো বুড়োহাবড়াদের জন্যে কিছুই যে রাখলে না হে! দু-এক গাছা লাঠি সোঁটা এদিকে ছুঁড়লে হত না?...

—ও কথা বলবেন না স্যার—ছোকরা তদ্‌ব্যস্ত হয়ে ওঠে—আমরা তবে আছি কি করতে? আপনারা শুধু ডিরেকশান দেবেন। আপনারা মাথা, আমরা স্যার হাত পা—

—তুমি থামবে হে ছোকরা?

হঠাৎ জে রায় চৌধুরী বাধা-ধমক দিয়া বসেন—তোমার প্রলাপ শোনবার জন্যে কাজের ক্ষতি ক'রে এখানে আসিনি আমরা।

মুহূর্ত্তের মধ্যে পদাতিক সৈন্যমণ্ডলীর গুঞ্জন ধ্বনি থামিয়া যায়।...যেন ইলেকট্রিক শক্ খাইয়াছে তাহারা।

—আমার মতে—রায় চৌধুরী সুরু করেন—আগে গঠন!...সেবা। রক্ষীদল সাজিয়ে রেখে বিপদের দিন আসার আতঙ্কে দিন গোণবার দবকার নেই, আপাতত যারা বিপদগ্রস্ত তাদের সাহায্য, সেবা, রক্ষণাবেক্ষণটাই হচ্ছে আশু প্রয়োজন। পাড়ার একটা রিলিফ সেণ্টার খুলে—

—আর ঘেন্না ধরাবেন না মশাই—মল্লিক কর্ত্তা এতক্ষণ রূপার ডিবা খুলিয়া বৃহৎ নাসিকা গহ্বর দুইটিতে নস্য ঠুসিতেছিলেন, এইবার তৈরী হইয়া বলেন—রিলিফ সেণ্টার খুলে আর লোক হাসাতে হবে না।....হ্যাঁ, ধরতে পারেন বিড়লাকে-সুরজমল নাগরমলকে-আলাদা কথা, তা নইলে ছেঁড়া কাঁথা কুড়িয়ে আর খুদ-কুঁড়ো চেয়ে—ছ্যা ছ্যা।

রায়চৌধুরীর চোখ গরম হইয়া ওঠে, লাগসই একটা কথাই বোধকরি খুঁজিতেছিলেন, ইত্যবসরে পদাতিক মহলে পুনর্গুঞ্জন সুরু হইয়া চাপা গর্জ্জনে পরিণত হইয়াছে।...দেখিলাম বক্তা ছোকরা পাশের ছেলেটিকে কনুইয়ের ঠ্যালায় কি ইসারা করিতে চায়, সে আবার পশ্চাদ্‌বর্ত্তীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

—কি হচ্ছে তোমাদেব?...সুধাংশু বিরক্ত ভাবে বলেন—এটা একটা সভা, খেলার মাঠ নয়।

ব্যস। ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ ভাঙিয়া যায়।...যে কথাটির জন্য বোধ হয় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে খোসামোদ করিতেছিল সেই কথাটিই...একযোগে প্রত্যেকে বলিয়া ওঠে—আমরা এখানে থাকবো না স্যার।...মাণিকদাকে অপমান করা হয়েছে।...আমরা কাজ করতে চাই...কিন্তু আপনারা আমাদের পোঁছেন না।...বেশ আপনারাই করুন।...দাঙ্গার সময় প্রাণ তুচ্ছ করে রাত জেগে পাহারা দিয়েছিলাম কিন্তু আর নয়...মাণিকদা চলো।... কেষ্ট বীরেশ...গৌরে চলে আয়...

বন্যার জলস্রোতের মত হুড়মুড় করিয়া নামিয়া যায় বাঙলার জনশক্তির একখণ্ড নমুনা।...শুধু জনকয়েক কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইযা থাকে।

রায় চৌধুরী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে উহাদের গমন-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, তোমরা গেলে না যে?

—আমরা ওদের দলের নই স্যার।

—বটে?...তোমরা কোন্ দলের?

—আগে ওদের দলে ছিলাম—'কিশোর সমিতি'র...এখন 'নবশক্তি সঙ্ঘ' করেছি।

—কেন?

—সে অনেক কথা বুঝলেন? যাক্ বলতে ভয়টা কি, আমরা তো দোষী নই। পূজোর পর—মানে আমাদের "কিশোর দুর্গাপূজা সমিতির" এবারের পূজোর পর চাঁদার টাকা কিছু বেড়েছিল বুঝলেন। আমোদ-প্রমোদ তো কিছুই হ'লনা এবার?...আমরা বললাম, ওই টাকায় ক্লাবের উন্নতি করা হোক, ফুটবল নেই, ক্যারামবোর্ড নেই, পচামার্কা ব্যাডমিণ্টন বল নিয়ে খেলা, ওইগুলো হয়ে যাক্। ওরা বললে—'না—ক্লাবের কথা ক্লাব বুঝবে, এ টাকা আমরা সিনেমা দেখবো আর রেষ্টুরেণ্টে খাবো!'—শুনুন কথা! আমরাও শুনব না, ওরাও ছাড়বেনা, শেষকালে কিনা—একদিন স্যার আমাদের না জানিয়ে মেট্রোয় চলে গেল! ব্যস, সেইদিন থেকে খতম!

—ভালোই হয়েছে আপদ গেছে। চরম অবহেলার ভঙ্গীতে মাথাটা ঝাঁকাইয়া হলদেবাড়ীর বড়ছেলে মিলিটারী ভঙ্গীতে কব্জী উল্টাইয়া একবার সময়টা দেখিয়া লন—নাঃ, আর তো দেরী

করা চলে না, আর একটা এন্‌গেজমেন্ট রয়েছে সাড়ে সাতটায়। যাঁর যা বক্তব্য আছে বললে ভাল হয়।

—আমার বক্তব্য তো আমি বলে দিয়েছি—

"ফিনিশিং টাচ" হিসাবে—"

রায় চৌধুরী সিগার-কেস খোলেন।

—মানে আপনি বলতে চান কিছু যদি করতেই হয় তো পাড়ায় একটা রিলিফ সেণ্টার খোলা?

মল্লিক কর্ত্তা আর এক টিপ নস্য হাতে লইয়া উক্ত মন্তব্য করেন।

—প্রথম কর্ত্তব্য—ও ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না।

একদম বাজে। ও সব সাহায্য প্রতিষ্ঠান দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল মশাই, সাধে কি আর বলছি বাঙালির হয়ে...ভেতরের সব খবর যদি রাখেন—

—বেশ তো, যা দোষ-ত্রুটি সেগুলো সংশোধন করবার চেষ্টা করুন! ভেতরে যাতে গলদ জমতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখুন!

—বলা সহজ। কাজে নেমে দেখবেন 'ডিফিকালটি'টা কি। তা'ছাড়া যাদের সাহায্য করতে যাবেন, তা'দের মন পাওয়াই কি সোজা? হিতকথা যদি শোনেন, ও ইচ্ছে ছেড়ে দিন, ওই বক্ষীদল গড়ে তুলুন। কথায় বলে 'আত্ম রেখে ধর্ম্ম তবে অন্য কর্ম্ম'।

—আমার ধারণা আমি বদলাবো কেন বলুন? কে রায় চৌধুরী সিগারেটের দশ আনা অংশ বাকী থাকিতেই মাটিতে ফেলিয়া জুতার তলায় ঘসটাইতে থাকেন।

—আপনারও এই মত?—মল্লিক কর্ত্তা সুধাংশু বাবুর মুখপানে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করেন।

সুধাংশু বাবুর অবস্থা জলের মতো বুঝিতে পারি, "মতবিরোধ উচ্ছেদের" কাগজখানা তখনো হাতের মধ্যে খড়খড় করিতেছে। কাজেই অপ্রস্তুতের শেষ প্রস্তুত 'আমতা'র শরণাপন্ন হ'ন।...আমতা-আমতা করিয়া বলেন—ই'য়ে মানে—মিষ্টার রায় চৌধুরী অবশ্য এক হিসাবে বলেছেন ঠিকই—তবে কি না ইয়ে—

—আমার কাছে হিসাব একটিই, বুঝলেন মিষ্টার দত্ত, দু'চার রকম হিসেব নেই।...জনকল্যাণ, আর্ত্তসেবা, দুর্গতত্রাণ, এইগুলো হচ্ছে প্রথম কাজ, এই আমার একমাত্র মত।

আশু মিত্তির কি বলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মল্লিক মশাই দাবাইয়া দেন।

—ওসব গালভরা কথা নিউজপেপারেই মানায় ভালো, বুঝলেন মশাই, কাজ করছে কে? কার কতো সময়? এইতো এখানে উপস্থিত সকলের কথাই ধরুন—কে কতোটা সময় দিতে পারি আমরা দেশের কাজে? সামান্য দু'চারটে কথা আলোচনা করবার সময়, তাই হয়ে উঠে না।...বলিয়া হলদে বাড়ীর বড় ছেলের প্রতি একটি বাঁকা কটাক্ষ করেন, যিনি এই লইয়া এগারোবার ঘড়ি দেখিতেছিলেন।

রায় চৌধুরী উদ্ধতভাবে বলেন—সময় করে নিতে হবে, কাজ ভাগ করে নিতে হ'বে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বসে গড়গড়া টানলেই শুধু হবে না।

এটি ব্যক্তিগত আক্রমণ।...অবশ্য বুঝিতে দেরী হয় না মল্লিক মশায়ের।...তিনি আরক্তমুখে উঠিয়া দাঁড়ান। মেয়েলি শ্লেষের ভঙ্গীতে বলেন—আর ঈজি-চেয়ারে পড়ে পড়ে সিগারেট ধ্বংস করলেই যেন দেশ উদ্ধার হয়ে যায়! হঃ।...যারা পাবলিকের পয়সায় মোটর চড়ে বেড়াতে চায়, আর পাবলিকের মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়িয়ে নেয় তাদের স্বরূপ চিনতে

আর বাকী নেই।...

শুনে সুখী হ'লাম। এত শীঘ্র যে সক্কলকে চিনে ফেলতে সুরু করেছেন এর জন্যে বাহাদুরী দেওয়া উচিত...কি বলেন মিষ্টার দত্ত? আচ্ছা নমস্কার।

জে রায় চৌধুরী সদর্প পদক্ষেপে ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া ফুটপাথে নামিয়া যান।

—ওঃ রাগ দেখে কে! সাপের ল্যাজে পা পড়েছে কি না।

—ছি ছি, এটা কিন্তু বিশ্রী ব্যাপার হ'ল মল্লিক মশায়—সুধাংশু বিব্রত করুণ মুখে বলেন—উনি একটু ইয়ে হয়ে গেলেন—এভাবে পার্সন্যাল এ্যাটাক করা...

—গায়ে পেতে নিলেই—এ্যাটাক করা। আমি তো কারুর নাম দিয়ে বলিনি দত্ত মশাই! সেই যে একটা মেয়েলী কথা আছে না—"পড়লো কথা সভার মাঝে...যার কথা তার কাণে বাজে"—এ হয়েছে তাই।

দেখিলাম—লাগসই ভাবে ছড়াকাটিবার বিদ্যাটি চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছেন মল্লিক মহাশয়।

'আরো অনেকের' মধ্য হইতে এক ভদ্রলোক বলিয়া ওঠেন—আপনার নিজস্ব বক্তব্যটা যে শোনাই হলনা সুধাংশু বাবু, বাকীটা পড়ে ফেলুন!...তার পর আলোচনা—

সুধাংশু বাবু 'পড়িয়া ফেলিবার' প্রতিবন্ধকে যে ক্রমশঃ হতাশ হইয়া উঠিতেছিলেন—মুখ দেখিয়াই মালুম হয়। গত রাত্রে রাত্রি দুইটা পর্যন্ত জাগিয়া তৈরী করিয়াছেন।...ভদ্রলোকের প্রস্তাবে হৃষ্টচিত্তে (অবশ্য হৃষ্টভাব গোপন রাখিয়া) পাকানো কাগজটা খুলিয়া শুধু কাসি সহযোগে বলেন—ও অবিশ্যি কিছুই নয়, আলোচনার সুবিধের জন্যে একটু গোড়া বাঁধা। মানে—পড়বার আর আছে কি—আলোচনা যখন এগিয়েই গেছে—

—ছাই গেছে। আলোচনা এখনোও দু'শো বচ্ছর পেছিয়ে আছে। কথাটা বলিয়া আশু মিত্তির গোঁফের সূক্ষ্মাগ্রভাগকে পাকাইয়া সূক্ষ্মতর করিতে মনোনিবেশ করেন।

—তা'হলে—এটা শেষ করে ফেলাই যাক্, কি বলেন?

সুধাংশু বাবু পড়িতে উদ্যত হওয়া মাত্রই...হলদে বাড়ীর বড় ছেলে টেবিলে সিগারেটের টিন ঠোকা বন্ধ করিয়া বলেন—টাইমের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন মিষ্টার দত্ত কাইণ্ডলি। সাড়ে সাতটায় আমার একটা এনগেজমেণ্ট রয়েছে।

সত্য কথা বলিতে কি, এই চালিয়াৎ লোকটা পাড়াশুদ্ধ সকলেরই দুই চোক্ষের বিষ, নেহাৎ নাকি 'একতার' দায়, তাই আমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া। সুধাংশু বাবু গম্ভীর ভাবে বলেন—আপনার বিশেষ ক্ষতি করে আটকে রাখতে চাইনা, আশা করি সময়ে সহযোগিতা পাওয়া যাবে?

—ও সার্টেনলি, যদি অবশ্য কাজ কিছু হয়। বাঙালীর ব্যাপার তো? ধরে নিন যা করবেন তা'তেই সায় আছে আমার, মানে চাঁদা যা লাগে দেব। আচ্ছা নমস্কার—

চৌকাঠ পার হইয়া নামিয়া যান।

—এই সব চালিয়াৎ লোকদের ইচ্ছে করে—কি ইচ্ছে করে সেটা আর ব্যক্ত না করিয়া সুধাংশু বক্তৃতাই সুরু করেন।...হ্যাঁ কি বলছিলাম, চাই—উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে একাত্মবোধ।...মনে রাখতে হবে আমরা দুর্ব্বল নই, ভীরু নই, স্বল্প নই।...সুধু ছড়ানো শক্তিকে সংহত করার দায়িত্ব আমাদের উপর এসেছে আজ।...সংহত করা, জাগরিত করা। সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ করতে হলে—নিজেদের মধ্যে থেকেই তার বিষ নষ্ট করতে হবে—

—রবিবারের "অরুণোদয়ে" বেরিয়েছিল না এটা? সেম্ আর্টিকেল।...রঙিন শাড়ীর এলাকা হইতে প্রায় সশব্দ স্বগতোক্তি শোনা যায়।

সুধাংশু উকিল থামিয়া যান!...কাগজখানা পাকাপাকি ভাবে গুটাইয়া রাখিয়া বলেন—আর নতুন কিছু বলবার নেই; আমার মতে পাড়ার সমস্ত কার্য্যক্ষম পুরুষদের নিয়ে একটা রক্ষীবাহিণী গড়ে তোলা হোক। ষোল থেকে পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত নামের লিষ্ট করা হোক—তারপর উপযুক্ততা বিবেচনা করে—

বাধা দিয়া মল্লিক বলেন—ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার! রক্ষীবাহিনী গড়লেই হল! হাতে দেবার জন্যে একটুকরো কঞ্চিও যে নেই দত্তমশাই?...তার ওপর এই তো সব ছেলেদের স্বাস্থ্য, ('নবশক্তি সঙ্ঘের' প্রতি দৃষ্টি হানিয়া) ফুঁ দিলে পড়ে যায়। রক্ষীদল না পক্ষীদল। আমি বলি কি—প্রথমে একটা—"জনশিক্ষা"-টিক্ষা গোছ নাম দিয়ে ক্লাব খুলুন—লাঠি খেলা, ডন বৈঠক, জিমনাষ্টিক ইত্যাদি করে ফিগার তৈরী হোক, তবে রক্ষীদল।

—পুকুর খুঁড়ে জল আনতে রোগী এদিকে অক্কা পাবে এই আর কি। ঘাড়ের ওপর বিপদ, বলেন কি না ফিগার তৈরী হো'ক। মুখ্যুমি আর কাকে বলে!...

"মুখ্যুমি" কথাটা ব্যবহারের ইচ্ছা বোধ করি আশুবাবুর ছিল না। বেঁফাস বলিয়া বসিয়াছেন।...তাই তাড়াতাড়ি রূপার কৌটাটা খুলিয়া নিজে একটিপ লইয়া বাড়াইয়া ধরেন মল্লিক মহাশয়ের সামনে।...

কিন্তু দেখিলাম মল্লিক মশায় অত কাঁচা ছেলে নন্। তিনি মড়মড় শব্দে চেয়ারটা ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান—আপনার মতে বিনা শিক্ষায় বিনা হাতিয়াবে শত্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়াই বিচক্ষণতা, কি বলেন?... হ'তে পারে—আপনারা পণ্ডিত মানুষ বোঝেন ভালো, আমরা মুখ্যু লোক, বেনেমশলা নিয়ে কারবার, এসব বড় কথার কি বুঝি? আচ্ছা নমস্কার দত্তমশাই, চাঁদার দরকার হ'লে অধমের বাড়ী পদধূলি দেবেন দয়া করে।

চৌকাঠ পার হইয়া ফুটপাথে নামেন।

—নাঃ, হোপলেস্। সুধাংশু উকিল হতাশভাবে ঘরসুদ্ধ সকলের উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলেন—এভাবে ঝগড়া বিবাদ করলে কি করে কাজ এগোবে তা' তো বুঝতে পাচ্ছি না।...সকলেই যদি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—

রঙিন শাড়ীব নিশ্চল গঙ্গায় তরঙ্গ ওঠে।...

—বাস্তবিক এভাবে কতটা কি কাজ হয়ে উঠবে—ঈশ্বরই জানেন। আমরা তো অবাক হয়ে গেছি মিষ্টার দত্ত।...কথায় কি হবে! কাজ চাই।...বৃহত্তর কাজ, মহত্তম কাজ। তুচ্ছ ঘরকন্নার কাজ তাই আজ মেয়েদের আটকে রাখতে পারছে না।...নতুন কিছু গড়তে চাই আমরা।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি—এতক্ষণ নীরব ছিলাম আর এখনই স-রব হইবার প্রেরণা অনুভব করিতেছি বলিয়া কিছু মনে করিবেন না।...কিম্বা কিছু না হয় মনেই করুন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, উত্তর আমি দিবই।

উত্তর দিলাম—আপনাদেব নতুন আইডিয়াটা কি?

সুধাংশুবাবু শ্যেনদৃষ্টিতে একবার চাহিলেন...না, ওঁদের দিকে নয়, আমার দিকে।

যিনি সবচেয়ে তন্বী আর সব চেয়ে তীক্ষ্ণ, তিনি চেয়ারটা টানিয়া জনতার মুখোমুখি বসেন।...চশমার কাঁচ মোছা, সিঁথির চুল আর ঘাড়ের চুল ঠিক করা, ভ্যানিটি ব্যাগটি গুছাইয়া ধরা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি সারিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন—আইডিয়া হচ্ছে—রাজ্যের প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে মহিলা-সমিতি গড়ে তুলতে হবে! সামান্য এই "সাদার্ণ পল্লীর" এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। সর্ব্বশ্রেণীর মেয়েরা যাতে দেশের কথা দশের কথা ভাবতে শেখে, বুঝতে শেখে—

—সুন্দর আইডিয়া! কি ভাবে আপনারা পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চান?

—মানে এমন বিশেষ বেশী কিছুই নয়—মাঝে মাঝে সমিতির ঘরে সকলে একত্র হয়ে আলাপ-আলোচনা...ই'য়ে ধরুন—বাধ্যতামূলক ভাবে সেলাই বোনা, চামড়ার কাজ ইত্যাদি শেখানো—

—চমৎকার নতুন পরিকল্পনা—উচ্ছ্বসিতভাবে বলি—সম্পূর্ণ নতুন আইডিয়া, এটা যদি করতে পারেন, দেশে একটা আদর্শ খাড়া হয়ে উঠবে। বাস্তবিক মেয়েরা নাহলে এরকম নতুন আইডিয়া আর কারো মাথা থেকে বেরোনো সম্ভব হতো না। তবে অমনি তার সঙ্গে ন্যাকড়ার পুতুল তৈরী, আর তক্‌লি কাটাটাও ঢুকিয়ে দেবেন—

সম্মুখবর্ত্তিনী প্রথমে গর্বোজ্জ্বল দুই নয়ন তুলিয়া আমার পানে তাকাইয়া ছিলেন, ন্যাকড়ার পুতুল আর তক্‌লির উল্লেখে হঠাৎ কেমন নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন...আমার মুখ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তিনীদিগের সহিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হইতে থাকে।—

হয়তো দৃষ্টি বিনিময় ছাড়া কিছুই হইত না—গোল বাধাইলেন উকিল নিজেই। হঠাৎ আমার কথা শেষ হইতেই মৃদু ক্ষুব্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—কি ছেলেমানুষী হচ্ছে সমীরবাবু?...

ব্যস। আর যায় কোথা!...

অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় অনর্থপূর্ণ হইয়া উঠিল।...সরুমোটা তীক্ষ্ণ তীব্র সবগুলি কণ্ঠ একসঙ্গে ঝঙ্কারিয়া ওঠে—আপনার এখানে আমরা অপমানিত হ'তে আসিনি মিষ্টার দত্ত, আমরা ভ্যাগাবণ্ড নই,...আচ্ছা নমস্কার!

ভ্যানিটীব্যাগ, শাড়ীর আঁচল প্রভৃতি সামলাইতে কিছুটা সময় লাগে...সুধাংশু সেই ফাঁকে আগাইয়া গিয়া বিনয়ে একেবারে গলিয়া পড়েন—কি আশ্চর্য, আপনারা বিরক্ত হ'লেন নাকি?...সমীরবাবুর কথা বাদ দিন, উনি ওই রকমই...সমীরবাবু আপনার উচিত ক্ষমা চাওয়া।

বিনয়ে গলিয়া পড়ি আমিও—একশোবার। সর্ব্বদাই ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে প্রস্তুত জানবেন।...বলিয়া হাত জোড় করি।

মহিলারা আর যাই হো'ন চিঁড়া নন্, কথায় ভিজিলেন না, —মাপ করবেন—নমস্কার—বলিয়া সদলবলে চৌকাঠ ডিঙাইয়া ফুটপাথে নামিয়া পড়েন।

—ছি ছি, কি অন্যায় দেখুন দেখি সমীরবাবু! আচ্ছা আপনার কি কিছুতেই স্বভাব বদলাবে না?

—বেঁচে থাকতে?...সবিস্ময় প্রশ্ন করি।

সুধাংশু হাসিয়া ফেলেন—নাঃ আপনিই সব ডোবালেন। এই যে এঁরা রাগ করে চলে গেলেন—

—যেতে দিন না। সেলাই বোনা—কিছুদিন না শিখলেও দেশের মেয়েদের চলে যাবে।...অবশ্য যদি বলেন—সঙ্ঘের প্রেরণা যোগাতে এঁদের উপস্থিতি 'অবশ্য প্রয়োজন', তা'হলে—এখনো চেষ্টা করে দেখি। হাতে পায়ে ধরলে—

মানুষ যখন নিজে একটা ঘোর বিপাকে পড়িয়া চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকে...মনে করে...পৃথিবী বুঝি থামিয়া আছে। কিন্তু পৃথিবী থামে না, ঠিক তালে চলিতে থাকে।...

আমরা নিজেদের সমস্যায় ব্যস্ত, ওদিকে "আরো অনেকের" দল হাই তুলিতেছেন।—'আজ তা'হলে উঠি আমরা সুধাংশুবাবু? 'কাজ যা হবার তা' তো বুঝতেই পারছি'—'আচ্ছা নমস্কার'।...একে একে দুইয়ে দুইয়ে তিন চার পাঁচে ঠেলাঠেলি করিয়া, 'অনেকের দল' একসঙ্গে চৌকাঠ ডিঙাইয়া ফুটপাথে নামিয়া পড়েন!

পদাতিক দল দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে মিনিটে তিনবার পা বদল করিতেছিল...তাহাদের পানে চাহিয়া বলি—যাক ঘর তো ফর্সা হয়ে গেল, তোমরাই বা আর দাঁড়িয়ে কেন? যাও বাড়ী যাও।

—আমরা কাজ চাই স্যার। কিছু কাজ দিন, চলে যাই।

সুধাংশুর ঠাণ্ডা রক্তও কেন জানি না আচমকা তাতিয়া ওঠে। টেবিলে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসাইয়া বলেন—কাজ চাই মানে? কাজ বাস্তায় পড়ে আছে? একি আমাব মেয়ের বিয়ে—যে পরিবেশনে লাগিয়ে দেব? যাও চলে যাও। তোমাদের ওই মাণিকদাব দলে নাম লেখাও গে আবাব, বিরোধ মিটিয়ে এক হয়ে যদি আসতে পারো তবেই এসো।

—কেটে ফেললেও হবে না স্যার। বেশ, আপনাবা আমাদেব না চান বয়ে গেল। দেশ বক্ষার দায় তো আমাদের একলার নয়।...

অতঃপর চৌকাঠ ডিঙাইয়া ফুটপাথে।

সুধাংশু আর আমি।

মুখোমুখি।

অন্যমনস্কভাবে হাতের কাগজখানা নাড়াচাড়া করিতে কবিতে মুখ তুলিয়া অল্প হাসিব সঙ্গে সুধাংশুবাবু বলেন—শুনবেন নাকি শেষটা?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলি—আজ থাক্, বৌদির হুকুম 'হাঁড়ি আগলে বসে থাকতে পারবেন না।'...মনে মনে বৌদিকে ধন্যবাদ দিযা ফেলি। আড়ে দৈর্ঘ্যে নেহাৎ ছোট তো নয় প্রবন্ধটি।...

চৌকাঠ পার হইয়া ফুটপাথে নামি।...

চোখাচোখি হইবার ভয়ে দ্বিতীয়বার পিছন ফিরি না, তবে শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি, মানুষ সম্বন্ধে হতাশ সুধাংশুবাবু সারাঘরে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়ানো চেয়ারবেঞ্চিগুলোকে সঙ্ঘবদ্ধ কবিতেছেন।

[১৩৫৩]

আফিং

রূপের কথা কেউ ধর্ত্তব্য করে না।

সুমিতার মতো রূপ এ বাড়ীর আনাচে-কানাচে মেলে।

সুমিতার বুড়ি বুড়ি দিদিশাশুড়ীদের রং দেখলে এখনো তাক লেগে যায় লোকের, চোখ ঝলসে যায় শাশুড়ী খুড়শাশুড়ীদের দেখলে। ননদরা যে যেখানে পড়েছে সেখানেই সর্ব্বসম্মতি- ক্রমে 'ডাক্সাইটে' খ্যাতি পেয়ে বসে আছে। এদের কাছে সুমিতা নিষ্প্রভ।

সুধীরঞ্জন ওকে এবাড়ীতে নিয়ে এসেছে গুণের টিকিটের জোরে। বিদেশে ঘুরে এসেও কী করে সুমিতা ওর চোখে পড়লো, আর মনে ধরালো রং, সে সব অনেক কথা। মোটের উপর, সুমিতার বাবা কোনোদিন সুধীরঞ্জনের মতো আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়াবার কল্পনাও করেননি।

কেউ বললো ভাগ্যের জোরে, কেউ বললো গুণের জোরে।

সত্যিই এমন গুণী বৌ এ বাড়ীতে আর কখনো ঢোকেনি।

শুধু তিনটে পাশ করা আর ইউনিভার্সিটির নামকরা মেয়ে বলেই নয়, রান্নায় আর মেয়েলি শিল্পে, ছবি আঁকায় আর কবিতা লেখায়, সমিতি গঠনে আর পত্রিকা পরিচালনে—সবদিকে ওর সমান দক্ষতা, সমান নৈপুণ্য।

তাছাড়া—সুরসরস্বতীকে কণ্ঠে বহন করে এনেছে সুমিতা এ বাড়ীর পথ চিনিয়ে। এদের বাড়ীতে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়া ছাড়া, স্বরকে সুরে রূপান্তরিত করবার আর কোন পদ্ধতি কখনো শেখেনি মেয়েরা।

এদের বাড়ীতে গানের চাষ হয় বৈঠকখানায় অবাঙালী ওস্তাদের মারফৎ বাগানবাড়ীতে নামকরা বাইজীদের কণ্ঠে। বাড়ীর 'ঝি বৌ' গান গাইবে এটা অচিন্তিত।

সেই অচিন্তিত দুর্ঘটনা যখন ঘটলো, তখন চাপা ঝড় একটা উঠেছিল বৈকি, কিন্তু ঝড়কে শান্ত করে এনেছে সুমিতা সেই সুরেরই মন্ত্রে।

শ্বশুর ভাসুর সম্বন্ধীয়েরা আড়াল থেকে শুনে যথার্থ বিস্ময়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এমন নির্ভুল তালমান সম্বলিত উচ্চাঙ্গের গান গাওয়া কেবলমাত্র নামী ওস্তাদের পক্ষেই সম্ভব, শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর দল মুগ্ধ হয়েছেন কীর্ত্তনের মধুর রসে, দেবর আর ননদাই জাতীয়েরা অকুণ্ঠিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে নানা রসের গান শুনে। আধুনিক আর রাবীন্দ্রিক, গজল আর ভজন কিছুতেই খাটো নয় সুমিতা। খাটো হবে না এই তার পণ। তাই একটার পর একটা শিখেছে দ্রুত প্রতিভায়।

—মেয়েমানুষে বাঁশী বাজায় এই প্রথম দেখছি—সুমিতার এক পিসতুতো ননদ জাঁকিয়ে এসে বসলো সুধীরঞ্জনের কাছে। বিয়ের সময় ও আসতে পারেনি বিশেষ কি এক বাধায়। সুবিধে হতেই এসেছে মামার বাড়ী।

এসেই শুনলো নতুন বৌ চারতলার ছাদে, শুনলো নতুন বৌ বাঁশী বাজাচ্ছে।

শোনালো সুমিতারই এক প্রায় সমবয়সী খুড়শাশুড়ী।

—সর্ব্বনাশ! বাঁশী কিগো ছোট মামী? বিরজা হেসে ঢলে পড়ে—মেয়েমানুষে বাঁশী বাজায় এ তো কখনো শুনিনি!

ছোটমামী বাঁকাহাসির সঙ্গে উত্তর দেন—এখন কতো নতুন জিনিষ দেখবে শুনবে, এখুনি হয়েছে কি? এ বাড়ীর হাওয়া বদলে গেছে।

—তাই দেখছি, তা হঠাৎ এ রকম গাইয়ে বাজিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে মেয়ে আনার সখ হলো যে মামাদের?

—মামাদের আর কই? তোমার ভাইয়ের বলো? ভাই তো এলাহাবাদ থেকে এসে বললো—'এমন মেয়ে দেখে এসেছি হাজারে একটা মেলে না। বিয়ে যদি করতে হয় ওই মেয়ে।'

—বলো কিগো ছোটমামী? এ বাড়ীর ছেলে এতো বেহায়া হয়ে উঠলো কবে থেকে?

—যবে থেকে তোমাদের নতুন বৌদিকে দেখলো।...মুক্তোর মতো দাঁতে ঝিলিক মেরে হেসে উঠলো বিদ্যুৎলতা।

বিরাজ আঁচলে বাঁধা রূপোর কৌটা থেকে একটিপ দোক্তা নিয়ে মুখে ফেলে বলে—দেখতে তো শুনলাম এমন কিছু নয়।

—সর্ব্বনাশ! শুনছো না হাজারে একটা? বিদ্যুৎলতা পানের ডিবেটা তাক থেকে পেড়ে

এনে ভাগ্নীর হাতে দিয়ে বলে,—রং তো আমাদের অলকার চাইতেও নীরেস।

অলকাই এ বাড়ীর ময়লা মেয়ে।

—ওমা তাই নাকি! বিরজা যেন স্তম্ভিত—তাহলে আর ফর্সা কোথায়? নেহাৎই মাঝারি। তা মুখ চোখ গড়ন পেটন?

—দেখো গে না বাপু, আমি কেন বলে দোষের ভাগী হই?...বলে উঠে যায় বিদ্যুৎলতা অন্য কাজের অছিলায়। বেশী বলতে আবার ভয় করে, বিরজা মেয়েটি তো সোজা নয়, হেসে হেসে সব কথা শুনে নিয়ে কোন ফাঁকে টুক্ করে গিয়ে লাগিয়ে দেবে কাকে না কাকে।

'কথা'!

বড়ো ভয়ানক দু অক্ষবের এই কথাটি এতোটুকু এদিক ওদিক হলো তো রক্ষে নেই! অমনি কথাব সৃষ্টি হয়ে বসে আছে। 'কথা'র পাকচক্রে পাক খায এ বাড়ীব প্রত্যেকের জীবনধারা। গতি স্বচ্ছন্দ হবাব উপায় নেই, কথার নুড়ি পাথরে ঠেক খেয়ে খেয়ে চলতে হয খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

স্বাচ্ছন্দ্য নেই বলেই অনেক আবর্ত্ত, অনেক সঙ্কীর্ণতা।

প্রত্যেকে প্রত্যেককে ছোবল মাববাব চেষ্টায ফণা উঁচিযে বসে আছে।

বিবজা সোজা উঠে গিযেছিল ছাদে, আর বাঁশী কেড়ে নিয়ে হিড় হিড় কবে টেনে নামিয়ে এনেছিল সুমিতাকে।

—থাক হযেছে—বাধিকা ঠাকরুণকে আর বাঁশী বাজাতে হবে না, কেষ্ট ওদিকে ছটফটিয়ে মবছে যে। চলো চলো!

সুমিতা এর নাম শুনেছে, দেখেনি। বিনাপ্রতিবাদে চললো।

শ্বশুরবাড়ী এসে এতোদিনে এই শিক্ষাটি ওর হযেছে, কথা যতো কম কওযা যায ততোই ভালো।

নীচে এসে সুমিতাকে একটা চেযারে বসিয়ে খাটের উপর জাঁকিয়ে বসলো বিরজা সুধীরঞ্জনের কাছে।

বাঁশী সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ ওই মন্তব্যটি করে হেসে গড়িযে পড়লো প্রায় সুধীর গায়ের উপব।

সুমিতার মনে হলো, কী বাচাল!

—যাই বলো সুধীদা, বৌ কিন্তু ৰূপে তোমার কাছে লাগে না। পাশে দাঁড়াতেই পারে না।

হঠাৎ চকিত হয়ে তাকালো সুমিতা।

জালিদার একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বালিশের ওপর আধশোয়া হযে বসে আছে সুধী, যেন আলো জ্বলছে।

আশ্চর্য্য! আগে কি কোনদিন এমনভাবে লক্ষ্য করেনি সুমিতা?

বোধ হয় করেনি।

ছেলেবেলা থেকে বরাবর নিজের সম্বন্ধেই সাটিফিকেট পেয়ে এসেছে, তাই তেমন করে খেয়াল হয়নি।

নিজের মূল্য সম্বন্ধে যে মর্য্যাদাবোধ ছিল হঠাৎ যেন আহত হলো। এমন স্পষ্ট করে তুলনা কেউ আগে করেনি।

—কালোয়াতি গানটান গাইতে পারে নাকি শুনলাম।

—সব রকমই পাবে—সুধীর মুখে কেমন একটা স্থূল আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে ওঠে, যেটা দেখে সুমিতার হঠাৎ মনে হয়—কী অশোভন! আর হঠাৎই ওর টুকটুকে ঠোঁটের হাসিটা দেখে মনে হয় পুরুষ মানুষের পান খাওয়াটা কী বিশ্রী বেমানান।

বিরজা যেন শুধু হাসবে বলেই এসেছে। অকারণে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়বে!

—সব রকমই পারে? নাচতে?

—তাও পারে বোধ হয়।

মৃদু হেসে একটু চোবা দৃষ্টিপাত কবে সুধী সুমিতার চোখের আশায়, কিন্তু সুমিতা ততক্ষণে কঠিন হয়ে উঠেছে বিবজার মন্তব্যে।

—তবে আর ভাবনা কি? কাজে কর্ম্মে পূজো পার্ব্বণে বাইজীর খবচটা বাঁচিয়ে দেবে তোমার বৌ, কি বলো?

কী কুৎসিত! কী অমার্জ্জিত!

কিন্তু আশ্চর্য! সুধী বিবক্ত হলো না। বিবক্ত হচ্ছে না। বরং ঘন্টাখানেক ধরে হাসি গল্প চালিয়ে যায় স্থূল বসিকতার ভাষায়।

কী বিশ্রী!

সুধীরঞ্জনকে যেন আজ নতুন দেখলো সুমিতা।

কই এমন অমার্জ্জিত এমন গ্রাম্য তো মনে হয়নি কোনদিন সুধীকে।

এতোদিন সুমিতার মহিমায় বিগলিত ভক্ত মূর্ত্তিই দেখেছে।

সভ্য সংযত ভদ্র।

সেটা কি আববণ? চেষ্টাকৃত পালিশ? বিরজার উদ্দাম স্বভাবের হাওয়ায় উড়ে গেল সেই আববণ? পালিশ গেলো মুছে? নাহলে বিবজার মতো এমন একটা বাচাল বেহায়া মেয়েকে সুধী সহ্য করছে কি করে? শুধু সহ্যই নয়, বরং যেন বেশ উপভোগই করছে ওর বিশ্রী বাজেমার্কা ঠাট্টা ইয়ার্কিগুলো।

ফুলশয্যাব রাত্রে নতুন বৌযেব সঙ্গে 'ভাবটা' কতোদূর এগোলো একথা কোনো মেয়ে যে কোন ছেলেকে জিগ্যেস করতে পারে—তাও এমন নগ্ন নিরাববণ ভাষায়— ভাবতেই পারে না সুমিতা।

অবশ্য এটা সুমিতারই অজ্ঞতার বাড়াবাড়ি।

ক'জন মেয়ে ওব মতো বযসে এমন অনভিজ্ঞ? কে ওর মতো বাস করে সুরের স্বর্গলোকে? সবচেয়ে অপূর্ব্ব, সব থেকে বিভ্রান্তিকর সমস্ত বয়সটা কে কাটিয়ে দেয় কৃতিত্বের স্বর্ণচূড়ার পানে তাকিযে?

বিরজার মতো মেয়েই বেশী।

সুমিতা তা জানে না তাই আহত হয়। আহত হয়—স্বামীর পরিতৃপ্ত মুখ দেখে।

সুমিতা কি বিরজাকে ঈর্ষা করছে? না বিরজার অসংযত চাপল্য নিতান্তই ওর চক্ষুর পীড়াদায়ক বলে এই বিরক্তি?

অনেকক্ষণ অনেক বক্‌বক্‌ করে অবশেষে বিরজা উঠলো।

যাবার সময় দোক্তার কৌটো খুলে একটিপ হাতে নিয়ে টানা চোখ টেনে বলে, পারলাম না বাবা তোমার বৌকে এক ফোঁটা হাসাতে। এমন 'গোমড়ামুখী' বৌ নিয়ে কি করে ঘর

করবে সুধীদা? তোমার দুঃখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে যে গো! আহাহা, মুখ দেখো! যেন মনে হচ্ছে এই মাত্র এই পাপ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হলো! বলি বৌ তোমাব ভাত ডাল খায় তো সুধীদা! না কি স্বর্গের সুধা খেয়ে থাকে?

—কি জানি!—সুধী হেসে ওঠে—মেয়েদের আহারশালায় যে এ শালাদেব প্রবেশ নিষেধ। 'বাড়াভাত বেড়ালে ডিঙাতে পারে না' এই তো প্রবাদ মেয়েদের সম্বন্ধে।

ছি ছি!

সুমিতার সমস্ত মন 'ছি ছি' করে ওঠে।

এমন অসংযত ভাষা ওব স্বামীর? এমন অকচিকব পবিহাসের ভঙ্গী?

জীবনটাকে কি সুমিতা জলাঞ্জলি দিয়ে ফেললো নিতান্ত অসাবধানে?.....জ্যোৎস্নার আলোয় ছাদে বসে বাজাচ্ছিল বাঁশী, বিরাজ এসে যেন ওকে সেই উঁচু ছাদ থেকে টেনে এনে ধুলোয় আছাড় মেরেছে। সুরের স্বপ্নটাই শুধু ভেঙে যায়নি, ভেঙেছে বাঁশী, ভেঙেছে সুমিতার স্বর্গ।

বিরাজ উঠে যায় কিন্তু সুমিতা তেমন সহজে উঠে আসতে পারে না বিছানায়। দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে থাকে একটা বিমূঢ় বিদ্বেষে।

সুধীর আহ্বানে উঠে যদি বা যায় নিজেকে গুটিযে কঠিন হযে পড়ে থাকে এক পাশে। কিছুতেই ভুলতে পারে না সুধীর পান খাওয়া মুখেব মাত্রাতিরিক্ত হাসি, অসংযত রসিকতা, বিরজার আঁচল থেকে কাড়াকাড়ি করে দোক্তা খাওয়া।.......

—কি হলো তোমার আজ? সুধীবের কণ্ঠে আজ যেন ঈষৎ প্রভুত্বেব সুব।

—হলো কি শুনি?

—কি হবে?

নিতান্ত শ্রান্তস্বব সুমিতাব।

—কি হবে তা তুমিই জানো। বিবজাব সঙ্গে একটাও কথা বললে না কেন?

—কি কথা বলবো?

—সেটা আমি শিখিয়ে দেবো নাকি? এটুকু ভদ্রতা শেখোনি এতোখানি বযসে?

কী উত্তর দেবে সুমিতা? চোখ ছাপিয়ে যাব জল উপচে পড়ছে?

—কাল সকালে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে কথা কইবে, বুঝেছো!

—তোমরা সব্বাই কথা কইলে হয় না?

সুমিতার স্বর আরো ক্লান্ত।

—না, হয় না। তুমি দু'চারটে পাশ করেছো বলেই নিজেকে ওর চাইতে মস্তবড়ো ভেবো না বুঝলে? ওদের যা টাকা, একলা ও আমাদের সকলকে কিনতে পারে তা জানো?

—জানলাম—বলে পাশ ফিরে শোয় সুমিতা।

সুধীর সমস্ত দৈন্যই যদি হঠাৎ এমন রূঢ় ভাবে ধরা পড়ে যায়, কি করবে সুমিতা—নিজেকে কঠিন করে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া?

সত্যি তো আর নিজের ভুলের খেসারৎ দিতে দেয়ালে মাথা ঠুকতে পারে না? পারে না লোক হাসিয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে পালাতে?

একা বিরজা সক্কলকে কেনবাব ক্ষমতা রাখলেও, অহঙ্কারী নয় বলতেই হবে। নিজেই সে

যেচে পড়ে আবার আলাপ করতে আসে সুমিতার সঙ্গে।. অথচ ঠিক আলাপ করার সদিচ্ছাই কি সবটা?

কারণে অকারণে সুমিতাকে খাটো করার ইচ্ছেটাও ধরা পড়ছে না কি?

কিন্তু কেন?

কেন বিরজা অমন অমায়িক মুখে সুমিতার বাপেব মাইনের টাকার অঙ্কটা শুনতে চায়? শুনতে চায় চাকরবাকর ক'টা ছিলো ওদেব? সুমিতার মা নিজের হাতে রান্না করেন শুনে কেন অতো সকরুণ সহানুভূতি জানাতে আসে?

সুমিতা তো ওর দিক ঘেঁষতে চায না।

অনভিজ্ঞ সুমিতা জানে না, চায় না বলেই এই আক্রোশ বিরজার।

তা'ছাড়া—?

ভাঁড়াব ঘরে বসে কিসমিস বাছতে বাছতে এ কী অদ্ভুত কথা শুনলো সুমিতা? এ কোন্ ভাষা? ......সুমিতাব আজন্মেব পরিচিত বাংলা ভাষা?

ভাঁড়ারের পাশেব বাসনেব ঘরটায দাঁড়িযে কি বলাবলি করছে বিধবা বড়ো ননদ সুবর্ণ মেজ খুড়ির সঙ্গে?

—দেখেছো মেজখুড়ি, বিরজা লক্ষ্মীছাড়িব রকম? এখনো সুধীর সঙ্গে ঢলাঢলি করে মরছেন! আগে যা করেছিস করেছিস, এখন ওর বিয়ে-থা হয়েছে, 'সং পাগল' যাই হোক—দু'টো চারটে পাশ করা বৌও একটা হযেছে—এখন আবার ওব সঙ্গে অতো মাখামাখি কিসের?

—আর বলিসনে মা, মেজখুড়ি বলেন—দেখে দেখে যেন গা জ্বলে যাচ্ছে। কবে যে আপদ বিদেয় হবে। লেখাপড়া শিখলে কি হবে—নতুন বৌমাটিও তো আমাদের তেমনি বোকা!

—সুধীর কথাও বলি, বিধবা দিদি বিরক্ত ভঙ্গীতে বলেন—নিজে পছন্দ করে বিয়ে করে আনলি, দেখতে দেখতে তো মূর্চ্ছা যাচ্ছিস, তার মাঝখান থেকে আবার এদিক ওদিক মন কেন?

—তুই আর হাসাসনি বিমলা—মেজ খুড়ি শ্লেষমাখানো হাস্যের সঙ্গে বলেন —পুরুষ মানুষকে আবার বিশ্বাস! তা আবার এ বাড়ীর পুরুষ!

—বিরজা সর্ব্বনাশীও যে তেমনি! বিমলা তিক্তস্বরে বলে—বয়েস তো কম হলো না, এখনো ঢলানেপনা গেলো না! বৌটার সামনেই কি আদিখ্যেতা না করছে!...........ও বেচারা নেহাৎ বোকাসোকা ভালোমানুষ তাই রক্ষে!

এসব কোন ভাষা?

সুমিতা কি বেঁচে আছে? আছে পৃথিবীর মাটিতে ভর করে? আছে বৈ কি, না হলে এখনো বসে বসে নিখুঁৎ করে কিসমিস বাছছে কি করে?.......কিন্তু কে করছে কাজটা? সত্যিই কি সুমিতা? না কি সুমিতার প্রেতাত্মা?

মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে যে।

তবু তার পরেই—ক্ষণপরেই—দাসীর কাছে—করতে হলো অসহায় আত্মসমর্পণ। বাদাম বাটা মুসুর ডাল বাটা আর কাঁচা হলুদ নিয়ে যে অপেক্ষা করছিল এতোক্ষণ।........বাড়ীর রীতি।

রূপচর্যা এ পরিবারের বৌদের প্রধান কর্ত্তব্য। সুমিতার তো আরো বেশী করেই হওয়া উচিৎ। রঙের ঘাটতি যাতে সহনীয় হয়ে আসে প্রসাধনের জৌলসে!

তারপর আহার পর্ব্ব।

সেও এক বিরাট ব্যাপার। প্রকাণ্ড দালান অলঙ্কৃত করে যে নারীবাহিনী উক্ত পর্ব্ব সমাধা করতে বসবেন, দেখলে মনে হয় না জগতে আর কোনো কাজ আছে তাঁদের, আছে কোনো ব্যস্ততা।

গালগল্পের সমুদ্র বয়।

বেলা গড়িয়ে গিয়ে বিকেল বেলায় ঠেকে।

আসন ছেড়ে ওঠবার উপায় নাই। পার্শ্ববর্ত্তিণীদের পক্ষে সেটা অপমান।

কী অসহ্য এই পরিবেশ!

তবু সহ্য হয়ে যায়।.....সহ্য হযে যায় রাত্রি আসে বলে।

যে রাত্রি আসে এই ক্লান্তিকর দিনের পুরস্কার বহন কবে!

অনেক রাত্রে—যখন সংসাবেব চাকা ক্লান্ত হয়ে ঝিমিযে আসে, থেমে পড়তে চায, তখন.....তখন আছে চারতলার ছাদ। আছে মাতৃস্নেহের মতো নিবিড় স্নিগ্ধ অন্ধকাব.....আছে বন্ধুর হাসির মতো কোমল উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। .....আছে কণ্ঠ, আছে যন্ত্র।

প্রথম প্রথম সকলকে গান শোনানোর তাগাদা ছিলো বেশী, এখন সে কথা প্রায ভুলেই গেছে লোকে। মনে করে খেয়াল কবে কেউ আব শুনতে চায না।

একাই সুমিতা উঠে যায় ছাদে।

বাজায় যা খুসি। গুণ গুণ করে গায় প্রিয় গানেব দু এক কলি।

নীচের তলায় তখন ওকে উপলক্ষ্য কবে যে উদ্দাম সমালোচনা আব তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গেব ঝড বয়, তার কিছুই টের পায় না বেচাবা।

কি করে জানবে—এলাহাবাদের বিখ্যাত মেয়ে সুমিতা বায এখানে এসে খ্যাত হচ্ছে 'নাবেট বোকা' বলে, 'সং' আর 'পাগল' বলে। .....এ যুগে যে এখনো এমন বাড়ী আছে তাই কি ছাই জানে ও?

কেউ তো বুঝিয়ে দেয় না ওকে।

কেনই বা দেবে? সবাই যে প্রতিপক্ষ। এ বাড়ীব বৌয়ের হাতের আঁকা ছবি সগৌরবে বিরাজ করবে বৈঠকখানায়, এ বাড়ীর বৌযেব কণ্ঠস্বব পৌঁছবে শ্বশুব-ভাসুবের কানে, এতো বড়ো অবিচার অনায়াসে মেনে নেবে—বাড়ীর অন্য বৌযেরা এটা আশা কবা অসঙ্গত।

বোঝাতে পারতো সুধীরঞ্জন।

কিন্তু সে চায় না, অনেক আরাধনায় পাওয়া রাত্রির সময়টুকু তুচ্ছ সাংসারিক কথার কাজে লাগায়।

সে অনেক রাত্রে বৈঠকখানা থেকে ফিরে উঠে আসে ছাদে, ঘড়ির খবর জানিয়ে আবেদন জানায় নীচে নামার।

তখন চমক ভাঙ্গে সুমিতার, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

হয়তো বা সেই লজ্জার খেসাবৎ দিতেই নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দেয় সুধীর উদ্দাম আবেগের কাছে।

ইউনিভার্সিটির নামকরা মেয়ে সুমিতার, গুণী ওস্তাদদের আদরের ছাত্রী সুমিতার বর্ত্তমান জীবন এই। এইভাবে আবর্ত্তিত হচ্ছে দিন আর রাত্রির চক্রপথে। প্রাণহীন নিরুত্তাপ দিন....মোহময় বিহ্বল রাত্রি।

সেই রাত্রির আশ্রয় গেলো ভেঙে!

আশ্রয়হারা হয়ে গেল সুমিতা! তবে আর সুমিতা তিষ্ঠোবে কি করে এখানে? ......কেন ফিরে যাবে না শান্তিময় কুমারী জীবনের শীতল ছায়ায়?

সুধীর জেঠামশাই সুমিতার বাপকে বললেন—এভাবে নিয়ে যেতে চান যেতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন আবার ফিরে আসা কঠিন হবে।

সুমিতার বাপ অল্প হেসে বলেন—সে দুশ্চেষ্টা করবোই বা কেন অবিনাশবাবু? কঠিন কাজকে আমি বড়ো ডরাই।

—হুঁ। তাহলে মনস্থ করেই এসেছেন? যাক, খোরপোষের টাকা পাঠানো হবে নিয়মিত; এ বাড়ীর বৌ পরান্ন ভোজন করে না কখনো।

সুমিতার বাপ তেমনি মৃদু হেসেই বলেন—কে যে পর, কে যে আপন সেটা নির্ণয় করাও তো একটা সমস্যা...অবিনাশবাবু!.....অনুগ্রহ করে ওটা পাঠিয়ে আর আমার কাজ বাড়াবেন না।

কুটিল হাসির সঙ্গে অবিনাশবাবু বলেন—তা' সামাজিক বন্ধনটুকুও যদি অস্বীকার করতে চান তো আলাদা কথা। অবিশ্যি অসুবিধে আপনার হবে না, বিদ্বান মেয়ে আপনার উপার্জ্জন করে খেতে পারবে। আচ্ছা...নমস্কার।

যাবাব সময় সুধীর কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না।

গাডীতে উঠে দেবেশবাবু সস্নেহ মমতায় মেয়ের পিঠে হাত রেখে বলেন—এই সাতটা আটটা মাস কি কবে এই চামারদের ঘর করেছিস মা?

বাপেব কোলে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সুমিতা, উত্তর দিতে পারলো না।.... দেবেই বা কি করে?

এ বাড়ীব চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে এসে নিজেই যে অবাক হয়ে যাচ্ছে সুমিতা, এই সুদীর্ঘ সময়টা এখানে কাটিয়ে গেছে ভেবে।

যে কাটিয়ে গেলো সে কি সুমিতা?

সুমিতাকে তার চিরাভ্যস্ত মার্জ্জিত পরিবেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিতে পারতো লেখনি, নিজে হাঁফ ফেলে, সুমিতাকে হাঁফ ফেলবার অবকাশ দিয়ে।.....প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যেতো—যেখানে আছে—সকরুণ স্নেহ, অনাবিল প্রীতি, আছে সশ্রদ্ধ বন্ধুত্ব। যেখানে বজায় থাকবে ওর মর্য্যাদা। নিরুত্তাপ, বিস্বাদ দিন, ক্লেদাক্ত অসহনীয় রাত্রি।...যার কোথাও নেই ভয়াবহ অন্ধকারের স্তূপ যেখান থেকে বিদায় নিলো সুমিতা।

সেই তো নিশ্চিন্ত ছুটি কলমের।

কিন্তু হল কই সে ছুটি?

এখানে এসেও হাঁফ ফেলার বদলে যে হাঁফিয়েই ওঠে সুমিতা।......মনে হয় যেখান থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলো ওর সেই পরিচিত জায়গাটা কোথায় যেন গেছে হারিয়ে। এই ছোট্টবাড়ীর মাপাজোপা সংসারে ওকে যেন আর আঁটছে না।.....মনে হয়—বাড়ীটা কী ছোট! জীবনযাত্রার আয়োজনগুলো কী অকিঞ্চিৎকর!.....সুদীর্ঘ দিনটা কী অর্থহীন!

তাই কলমটার আর অবসর নেওয়া হয়ে ওঠে না। কারণ সুমিতা নিজেই তাকে পেড়ে

নিয়ে বসেছে। মসৃণ কাগজের বুকে যথেচ্ছ আঁক কেটে চলেছে—মধ্যরাত্রির নির্জ্জনতার সুযোগে।

আকাশ ভেঙে নেমেছে বৃষ্টি।

চলছে ঝড়ের মাতামাতি। দরজা জানলার কপাটে কপাটে কে যেন আছাড় খেয়ে মরছে.....বাতাসে বাতাসে তার আর্ত্তস্বর।...সেই অদ্ভুত আর্ত্তস্বরে অবশ হয়ে আসছে দেহেব প্রতিটি স্নায়ু শিরা, দুর্বল হয়ে উঠছে মন।

স্নেহ আর প্রীতি, মর্য্যাদা আব সম্মান ছায়ার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে....মিলিযে যাচ্ছে তার মূল্যবোধ।....

চকিত বিদ্যুতের আলোয় যা স্পষ্ট প্রখর হযে উঠেছে...সে একটি বিদ্যুতালোকিত প্রকাণ্ড ঘর! সেই ঘরের সঙ্গে মানান করা উঁচু পালঙ্কেব উপব শয্যাব সমাবোহ।...সার্টিন ভেলভেট লেস চিকণের ভারে ভারাক্রান্ত।...সে শয্যা যেন সুমিতার এই অনাড়ম্বব শীর্ণ একক শয্যাকে তীব্রভাবে ধিক্কার দিচ্ছে।

কিন্তু আলো জ্বলছে কি শুধুই ঘরের সীলিঙে? বিছানার উপর জ্বলছে না? চোখ যে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

সেই আলোয় গড়া মূর্ত্তির আগুনরঙা বিহ্বল দুটি বাহু যাকে উদগ্র আগ্রহে বন্দী করে রেখেছে সে কে?

সে তো সুমিতাই।

তবে কেন সুমিতা এই আকর্ষণহীন অর্থহীন মৌন শয্যাব উদাসীন বক্ষে বিসর্জ্জন দেবে নিজেকে? সামান্য অভিমানে জীবনটা কববে বাজে খবচ? কেন সমস্ত দ্বিধা কাটিযে টেনে নেবে না কাগজ আর কলম? কেন রচনা কববেনা নিজেব ভাগ্যলিপি? যে লিপি নিজেব হাতে ছিঁড়ে এসেছে অসতর্ক অবিবেচনায!

তাই মধ্যবাত্রিব নির্জ্জনতাব সুযোগে—সঙ্কোচ ঘুচিযে দেওযা ঝড়ের আড়ালে চিঠি লিখতে বসে সুধীকে—ভয়ানক মন-কেমন করছে।

অনেক বিদ্যের ছাপমারা সৌখিন সাহিত্যিক ভাষায় নয়—ইনিয়ে বিনিযে মেয়েলি ভাষায়! এছাড়া অন্য ভাষা বোঝবার ক্ষমতা যে সুধীর নেই, সে সত্যটা তো অজানা নয় সুমিতার।

[১৩৫৩]

যথাপূর্ব্বং

দীর্ঘকাল ধরে চরম দুর্দ্দিন গেছে। একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে কি ভাবে যে কাটতো মহাভারত মণ্ডলের, তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। অবিশ্যি দুরবস্থার দিন কষ্টে কাটবে এ আর বিচিত্র কি! ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা আছে বলেই শত কষ্টেও টিকে থাকতে পারে মানুষ, এই যা।

তবে চিরকাল তারা নাকি এতো দুঃখী ছিলো না! নাকি অগাধ বিষয়সম্পত্তি ছিলো মহাভারতের ঠাকুদ্দার। অবিশ্যি গাড়ী-পালকী হাতী-ঘোড়ার ঘটাঘটি ছিলো না তার। এক কথায় বলতে গেলে, মেয়েলি ব্রতকথার 'কথা' ধার করে বলতে হয় "ঘরে ঘটি-বাটি ঝক্‌মক্ করে, আলনায় কাপড় ঝলমল করে, গোয়ালে গরু মরাইয়ে ধান, মনে সুখ মুখে পান।"

মহাভারতের বাপ সম্পত্তি রাখতে পারেনি বদ-খেয়ালীতে নয় বে-খেয়ালীতে। তার নির্বুদ্ধিতার সুযোগে জ্ঞাতিরা যতো পেরেছিলো ঠকিয়ে খেয়েছিলো, আর শেষ পর্য্যন্ত পাশের গাঁয়ের ঘুঘু জমিদার গোরাচাদ রায় প্যাঁচোয়া বুদ্ধি-কৌশলে তার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি জমি-জমা বাগান-পুকুর সব কিছু আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিয়েছিলো।

শেষটায় এই দাঁড়ালো, মহাভারতরা হলো ঐ ঘুঘু জমিদারের প্রজা।

বাপ-বেটায় বহাল হলো ওদেরই ক্ষেতের নগদা মজুরের কাজে। মজুরির সঙ্গে দু'চার ঘা কোড়াও জোটে না তা নয়, তবে তার জন্যে বিশেষ মনখারাপ করে না ওরা। তেমনি আবার বাবুদের নেক্‌নজরে পড়তে পারলে মেলে কিছু কিছু ভাল-মন্দ।

বাপ মরতে মহাভারত কর্ত্তা হলো। তখনই একপাল ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে তার। তারা অনবরত কাঁদে, চেঁচায়, ঘ্যান-ঘ্যান করে 'খিদে' বলে, 'দাও দাও' রব তোলে। মহাভারত নির্বিকার। কিসের এতো চাহিদা ওদের বুঝতে পারে না।

নিজে সে জ্ঞানাবধি দেখছে তাদের 'কিছু' নেই।

পেটে ভাত পরনে কাপড় তো নেই-ই, তা'ছাড়া জানলায় গরাদ নেই, দরজায় কপাট নেই, দেযালে বালি নেই, উঠোনে বেড়া নেই। দেখেছে—তাদের 'ঢেঁকশেলে' চাল নেই। গোয়ালের চালে খড় নেই। অবিশ্যি ওটা না থাকাতে ক্ষতিও কিছু নেই, গোয়ালে গরুই বা কোথায়?

আজন্ম 'নেই' দেখে দেখে 'না থাকাটা'ই বেশ ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিলো মহাভারতের। জানতো—মাঠে-ঘাটে গাছে-পালায় যেখানে যা আছে সব বাবুদের।

ওরই মধ্যে মহাভারতের একটু কাব্যির সখও ছিলো।

ভাঙা দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসে যাত্রাগানের পালা বাঁধতো। তাড়া-তাড়া বালির কাগজের দপ্তর ভবে উঠতো। লিখতো 'দিব্য কাহিনী' 'অতীত গাথা'।

ছেলেগুলো বড্ডো চেঁচামেচি বায়না করলে, ডেকে ডেকে কাছে বসিয়ে মহোৎসাহে বলতো—আয় দিকি ইদিকে। শোন্—

গলাটা ভবাটি ছিলো মহাভারতের, সুবটাও ছিল জোরালো। কিছুক্ষণের জন্যে সত্যিই বেশ ভুলে থাকতো ছেলেগুলো।

দিব্যিই কেটে যাচ্ছিলো।

যাদের 'নেই' তারা যদি মনকে মানিয়ে নেয়..."আমাদের কিছু থাকতে নেই", তা'হলেই তো গোল মিটে গেলো।

'কাল' করলো মহাভারতের বড়ো ছেলে ক্ষুদে।

দু'পাতা বিদ্যে শিখে মস্ত লায়েক হয়ে উঠে বলে কি না—আদালতে মামলা তোলো বাবুদের নামে!

শুনে তো মহাভারত মণ্ডলের চক্ষুস্থির। এ ছোঁড়া বলে কি! 'হাঁ' হয়ে বলে—বাবুদের নামে মামলা করবো কি রে হতভাগা?

লেখাপড়া শিখেছে, কায়দা করে বললো—আর 'হতভাগা' থাকবো না বলেই তো করতে চাই। কেন ভয়টা কি?

কিন্তু ভরসাই বা কি? ওরা কি তা'হলে আস্ত রাখবে?

বিস্তর তর্কাতর্কি হলো বাপ-বেটায়! শেষ পর্য্যন্ত মামলা রুজু হলো। ক্ষুদের ভাঁড়ারে অনেক যুক্তি অনেক নালিশ। তা'ছাড়া—ও হলো যাকে বলে নওজোয়ান। ঠাকুদ্দার বোকামীতে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বসে আছে বলে তাই মেনে নিয়ে বসে থাকবে, লড়ালড়ি করবে দেখবে না, এ চলবে না ওর কাছে। জীবন পণ করে বসলো সে। দেখবে, আর কতো দিন গোরাচাঁদের বংশধররা ওদের বুকে বসে দাড়ি ওপড়ায়? যাদের 'হক্' তারাই 'নাহক্' হয়ে বসে আছে, এ আবার একটা কথা নাকি!

ছেলের বোল্‌চালে ক্রমশঃ মহাভারতও হকের সপক্ষে তেতে ওঠে।

যাক্ গে, এ সব তো গত কথা!

খবরের কাগজের 'আইন আদালতে'র পৃষ্ঠায় যাঁদের চোখ বুলোনোর অভ্যাস আছে, তাঁদের মনে থাকলেও থাকতে পারে সেই বিখ্যাত দীর্ঘমেয়াদী মামলার কাহিনী।

কম দিন তো চলেনি মামলা।

'ক্ষুদে' তো মামলা চালাতে চালাতে মরেই গেলো। সেও আজ কতো দিনের কথা।... কিন্তু লড়ে এসেছে ওরা সমানেই। মহারভারত মন্ডল আর তার মেজ সেজ ছেলে রাম আর শ্যাম। জিদ চেপে গিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে—

কুঁচো-কাঁচারা বড়ো হয়েছে,—আরো দু'-একটা ছেলেপুলে জন্মেছে। মল-পরা, নোলোক-পরা বৌটা মহাভারতের 'দশবাই চণ্ডী' হয়ে উঠেছে। মুখের তোড়ে দাঁড়াতে পারে না মহাভারত।

শ্বশুরবাড়ী এসে পর্য্যন্ত রায় বাবুদের বৌ-ছেলের সুখ-ঐশ্বয্যি দেখে দেখে অনেক সাধ অনেক বাসনা জাগতো মহাভারত-গিন্নীর মনে। তবে জানতো—আমাদের "থাকতে নেই"। এখন মহাভারতের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে সে।

নিরুপায় মহাভারত ক্রমান্বয়ে স্তোক দেয়—মামলাটার নিস্পত্তি হয়ে যাক, দেখিস একবার। তখন তুই 'সোনার খাটে গা মেলবি, রূপোর খাটে পা'—

মহাভারত-গিন্নী মুখঝামটা দিয়ে বলতো—অতোয় কাজ নেই, কোনো গতিকে ছেলেমেয়েগুলো খেতে পরতে পেলেই বাঁচি।

অবিশ্যি রাগ পড়ে গেলে আবার ঘুরে এসে কিছু কিছু ফিরিস্তি যে বাড়ায়নি তা' নয়, কিন্তু বাড়াবে না-ই বা কেন? সত্যিই তো আর 'কোনো গতিকে খেতে-পরতে পাওয়াটা'ই বাঁচার শেষ কথা নয়।

অমন অরুচির বাঁচন তো বেঁচে এসেওছে এত কাল।

অমন বাঁচার চাইতে মরাই ভালো।

অন্যায় কিছু বলেনি মহাভারত-গিন্নী। আর অসঙ্গত কিছু চায়ও নি। কে না বলবে, বেঁচে থাকতে হলে—চালে খড় চাই, উঠোনে বেড়া চাই, দোর-জানালায় কপাট চাই। কে না মানবে, তাল গাছ প্রমাণ মেয়েগুলোর বিয়ে দেওয়া চাই, বুড়োমদ্দ ছেলে ক'টার কাজকর্ম্ম চাই, উঠতি বয়সের ছেলেটার কিছু লেখাপড়া চাই, রোগে জীর্ণ হাড়সার মেয়েটার চিকিচ্ছেপত্তর চাই, মা-মরা নাতিটার দুধ এক ফোঁটা চাই!

এ সব যদি পাওয়া হয়ে যায়, তখন মন্ডল-গিন্নী নিজের জন্যে কিছু কি আর না চাইবে? আর তাই বা চাইবে না কেন?

বাঁচার মতো বাঁচতে হলে গয়না কাপড়ই কি চাই না?

জগতে তা'হলে আছে কেন ঢাকাই বেনারসী, বাউটি বাজুবন্ধ?

তা' চাক্, মহাভারত তো অরাজী নয়।

অন্তত অবিরত তাই বলে তো।

—আর ক'টা দিন সবুর কর। যা করবো তা' আমার প্রাণেই আছে।...কি করবো বেটারছেলেরা যে ছেড়েও ছাড়ে না, 'মরণ কামড়ি' দিয়ে পড়ে আছে।...অবিশ্যি জিৎ আমারই হবে দেখিস। সবাই আমার পক্ষে।

নিশ্চিত জিৎ আর স্বর্ণময় ভবিষ্যতের আশায় দিন গোণে মণ্ডল-গিন্নী।

ওরই মধ্যে আবার ছেলেমেয়েগুলোও ধুয়ো তুলতে শিখেছে।

—বাবা, বাবুদের মতন পালিশ চকচকে হাওয়াগাড়ী হবে আমাদের?

মহাভারত অসঙ্কোচে ঘাড় হেলিয়ে বলে—হ্যাঁ।

—খাট আলমারী? আয়না টেবিল? আলো পাখা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়! হবে না তো কি?

—বাবা, বাবুদের বাড়ীতে কেমন রেডিও বাজে!

—আমাদের বাড়ীও বাজবে।

—বাবা, মা বলে আগে নাকি ওই গোয়ালটায় গরু ছিলো, আর মরাই দু'টোয় ধান ছিলো!

মহাভারত আত্মবিশ্বাসের প্রসন্ন হাসি হেসে বলে—'ছিলো', এবার ফের 'থাকবে'। থাক—বে—কি, থেকে বসে আছে। শুধু মাত্তর একটা গোয়াল, দুটো মরাই? হুঁ। ....আরো কতো বাড়বে।

শুনে শুনে আম্বা বেড়ে যায় সবে গোঁফগজানো যদু বলে ছেলেটার, সে বায়না নেয়—বাবা, জাহাজে চড়ে বিদেশ গিয়ে, বিদ্যের জাহাজ হয়ে আসবো আমি।

মহাভারত মহোৎসাহে বলে—তা' আর বলতে! পৃথিবী সুদ্ধু লোক হাঁ হয়ে যাবে বিদ্যে দেখে।....বলুক দিকি এর পরে কেউ 'মুখ্যু চাষা'!

রোগা মেয়ে টেঁপি ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে এসে বলে—বাবা, বাবুদের বাড়ী অসুখ হলে হ্যাট-কোট পরা ডাক্তার আসে। ছুঁচ ফুটিয়ে অসুখ ভালো করে। আমার জন্যে একটা ছুঁচ হাতে ডাক্তার—

কথা শেষ করতে পারে না মেয়েটা, গলা কাঁপে।

বুঝুক' না বুঝুক, মহাভারত ঘাড় হেলিয়েই যায়।

আবার থেকে থেকে আরও উৎসাহ দিয়ে বাড়ায় ওদের—কি এতো 'বাবুদের' বাড়ীর মহিমে দেখাচ্ছিস? আমাদের আরো কতো মহিমে হবে। ওদের তো শুধু ফ্যাশানই আছে, আর আমাদের?

ছেলেমেয়েরা অবাক অবাক চোখে বলে—আমাদের? আমাদের কি আছে বাবা?

মহাভারত চোখ ড্যাবা-ড্যাবা করে বলে— আমাদের লক্ষ্মী আছে, ষষ্ঠী আছে, মনসা আছে, 'মাকাল' আছে।....ইতু, ভাদু, ঘেঁটু, গন্ধেশ্বরী—কি নেই?......আছে ওদের ওসব? দেখেছিস কখনো?

এরা স্বীকার করে, কখনো দেখেনি বটে।....কিন্তু নিজেদেরই যে সে সব কোথায় আছে, ভেবে পায় না। এতোই যদি 'আছে' তাদের, কিছু তবে নেই কেন!

জিগ্যেস করতে সাহস করে না।

জানে, বাবা অনেক জানে, অবিশ্যিই আছে কোথাও।

মুখের বুলি হয়েছে মহাভারতের—গোরা রায়ের পোলাগুলোকে একবার হঠাতে পারলে দেখে নিই।

কিন্তু হঠাতে চাইলেই কি সহজে হঠে, এতো কালেব দখলদারেবা? হঠতে যদি হয়ই, তারাও একবার দেখে নেবে বৈ কি।

বিদায় বেলায় কী দায় চক্ষুলজ্জাব? পোড়ামাটিব নীতিও একটা নীতি তো?

মেয়েলি কথায় বলতে গেলে—চুলোচুলি চলে।

চুলোর দোরে যায় লোকলজ্জা।

নালিশ সালিস, সাক্ষী সাবুদ, উকিল মোক্তাবে সে কী কাণ্ড-কাবখানা!

মামলা করতে করতে বুড়ো হয়ে আসে মহাভাবত।

মামলার খবচ যোগান দিতে দিতে তন্নাস্তি। ঘরসংসার বৌ ছেলেপুলেব আরো হাড়িব হাল।

ঘরের দেয়ালে না হয় বালিই ছিলো না, ক্রমশঃ দেয়ালও রইলো না আর। দরজার কপাট চুলোয় যাক, চৌকাঠগুলো সুদ্ধু লোপাট হয়ে গেলো।......

মোটা ভাত-কাপড়টা মাঝে মাঝে জুটতো, এখন একেবারে কৌপীনবস্তু। 'বায়ুভুক্' হতে পারলেই ভালো হতো, হতে পাবে না, তাই—'আয়ুভুক্' হয়ে বসে আছে।

তবু মামলা চালাচ্ছে।

শেষ পর্য্যন্ত, বলতে গেলে এক বকম মাবপিট ধস্তাধস্তি কেলেঙ্কাবি।

প্রত্যক্ষে না হোক, গুণ্ডা লাগিয়ে পরোক্ষে।

বায়-গুষ্টীর ছেলেদের পথে বেরোনো দায় হয়।

দেখে যে—নাঃ, আব চলছে না।

থাকতে আব দেবে না এবা। কর্ত্তারা পবামর্শ দেয় ছেলেদের:— 'এতো কাল ধবে যা গুছিয়ে নিয়েছো, তাই নিয়ে-থুয়ে সরে চলো বাপ। নবকপুবী হয়ে উঠেছে। উঃ!'

মহাভারতও নিজের ছেলেদেব আরো প্রেবণা যোগাতে 'অতীত গাথাব' খাতা তুলে রেখে, রঙতুলি নিয়ে ভবিষ্যতেব ছবি আঁকতে বসে।

বলে—এ গাঁকে কী ইন্দির ভুবন করে তুলবো দেখিস। দেখে-শুনে 'তাক্' লেগে যাবে লোকের।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়লো।

গোবাচাঁদ রায়ের বংশধবদের পালাতেই হলো শেষ পর্য্যন্ত ল্যাজ গুটিয়ে। এতো উৎখাত কবলে মানুষ পাবে টিঁকতে?

পৈতৃক ধন ফিরে পেলো মহাভারত মণ্ডল।

পেয়েই প্রথম দিন এমন নাচ নাচলো, সত্যিই দেখে তাক্ লেগে গেলো লোকের।

মণ্ডল-গিন্নী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—উঃ, বাঁচা গেলো! এইবার লেগে পড়ো তিনপুরুষের হাড়ির হাল ঘোচাতে। ভাঙা ইঁটের বোঝা বিদেয় করে, বাড়ী তোলো নতুন করে, খেঁদি পাঁচির বিয়ে দাও, রেমো-শেমোকে এক একটা ব্যবসায় লাগিয়ে দাও, যদুটাকে 'কলেজ' না কি বলে তাইতে, আর মধুটাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দাও। টেঁপিটার জন্যে একটা ভালো মতন ডাক্তার ডাকো। নাতিটার দুধের ব্যবস্থা করো। ধৈর্য্য আর মানছে না আমার।

সত্যি, মানবেই বা কি করে? অবস্থা যে চরমে এসে ঠেকেছে।—আর কতো দিনের আশা! ওই আশাটুকু বুকে করেই তো জীইয়ে ছিলো এতো দিন!

মহাভারত কিন্তু ওসবের মধ্যে গেলো না।

কে জানতো মামলা জিতে ওর মতি-বুদ্ধি এমন বিগড়ে যাবে! কে ভেবেছিলো টাকা হাতে পেয়ে দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী বৌ ছেলেদের বিস্মরণ হবে! এষ্টেটপত্তর হাতে পেয়েই সে কিছুর মধ্যে কিছু না—সুরু করলো ভোজ লাগাতে!

ছেলেপুলে খেতে পেলো না পেলো ভ্রূক্ষেপ নেই, আজ এ-গাঁয়ের লোক, কাল ও-গাঁয়ের লোক, সবাইকে ডেকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ায়।

শুধুই কি খাওয়ানো? কে তার ঠিক নেই, তাদের নিয়ে নাচানাচি দেখে কে! তাদের আপ্যায়িত করতে আলো জ্বালছে, বাজী পোড়াচ্ছে, হাউই ওড়াচ্ছে।

মহাভারত-গিন্নী চটেমটে হাত-পা আছড়ায়।

বলে—আজ পর্য্যন্ত ঘরে একসঙ্গে দু'মণ চাল এলো না, বারো ভূতকে গুচ্ছির পিণ্ডি গিলিয়ে কি আমার সগ্‌গে বাতি পড়বে? ছেলেগুলো যে মরছে—

মণ্ডল রহস্যময় হাসি হেসে বলে—এতো কাল মরলো না, আর আজই ধাঁ করে মরে যাবে? নাচানাচি কি সাধে করছি? ওসব করতে হয়। নইলে মান থাকবে কেন? কী হতমান্যি হয়েছিলাম এযাবৎ বল দিকি?

মণ্ডল-গিন্নী ভাবে—তা বটে! 'হতমান্যি' বলে 'হতমান্যি'!

নেমন্তন্নর পালা কমলে, নিজেই মহাভারত এ-গ্রাম ও-গ্রাম এ-দেশ ও-দেশ পরিক্রমায় বেরোয়। বললে খারাপ শোনায়, ইত্যবসরে কোন ফাঁকে নিজের ব্যবস্থাটি ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা করে নিয়েছে। যা করছে রাজাই চালে!

নইলে মান থাকবে কেন?

হাওয়াগাড়ীতেও মন ওঠে না, বাইশ ঘোড়ার গাড়ী চাপে। চলতে-ফিরতে আগে-পিছে লোক-লস্কর পাইক-পেয়াদা-ঢুলি-বরকন্দাজ। রায় বাবুদের বাবুয়ানা কোথায় লাগে? সেই যে বলে না—'কাঙালের হয়েছে ঘটি, জল খেয়ে খেয়ে মলো বেটি'। এ যেন সেই তাই।

দেখেশুনে মণ্ডলগিন্নী নিজের গালেমুখে চড়ায়।

বলে—হায়া লজ্জার মাথায় মুগুর মেরে বসে আছো? এতোখানি বিষয়-আশয় হাতে পেলে তবু ছেলেপেলেগুলানের পেটে ভাত জুটছে না, পরনের 'ট্যানা' ঘুচছে না। লাজ লাগে না এই ন্যাকরা পরে বেড়াতে?

যখন পেটে কীল মেরে কবিগান লিখতো মহাভারত, তখন বরং ভয়-লজ্জা ছিলো। এখন কোমরের বলে বুকের পাটা বেড়েছে। গিন্নীর কথায় তোয়াক্কা করে না, বলে—তুই ওসব বুঝবি কি? এ সব করতে হয়। নইলে ইজ্জত বাড়ে না।

মণ্ডল-গিন্নীও এখন তেমন বোকা নেই যে, যা বোঝাবে তাই বুঝবে। হাত-মুখ নেড়ে বলে—ওরে আমার কে রে! ভারী ইজ্জত দেখাতে এসেছেন! বলি যাদের কাছে ইজ্জতের গুমোর করতে যাও, তাদেরকে ডেকে একবার ঘরের 'হাল' দেখিয়েছো? চালে খড় নেই, 'চাল' ফলাতে বসেছে!

মহাভারত বিরক্ত হয়ে বলে—যা যা, ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিস নে মাগী! চালে খড় আছে কি নেই, উঁকি দিয়ে দেখতে আসছে কেউ?

—আর এই যে গুচ্ছির অপোগণ্ড সৃজন হয়েছে, এগুলানের কোনো হিল্লে হবে না?

মহাভারত চোখ গরম করে বলে—হবে না, তা বলেছি কোনো দিন? তোর যে দেখি,

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

—গাছ মুড়িয়ে বারো ভূতে খেয়ে নিচ্ছে যে! বাছাদের আমি কেবল 'নোভ' দেখিয়ে দেখিয়ে বেখে এসেছি এতো কাল—

মহাভারত মেজাজ গরম করে বলে—এতো কাল বেখে এসেছিস তো আরো কিছু কাল রাখ গে যা। দেখিস করি কি না।

—মরে পেত্নী হয়ে, বেল গাছে বসে দেখবো।

বলে রাগ করে ঘাটে চলে যায় মণ্ডল-গিন্নী। না, দড়ি-কলসী নিয়ে নয়, শুধু কলসী নিয়ে। আশাভঙ্গ মনে।

কত্তারই ঐশ্বয্যি বেড়েছে, তাব তো যে ঘাসজল, সেই ঘাসজল!

কিন্তু রাগ করে বসে থাকলে তো চলবে না।

কোনো প্রতিকার-চেষ্টা না কবে বসে থাকবে?

অনেক ভেবে-চিন্তে নিজের ভাইকে ডাকিয়ে আনালে।

ছোট ভাই নয়, দাদা।

দাদা যুধিষ্ঠির ওঝা এসেই গোঁফ মুচড়ে বললে—কি বলছিস্ বল!

মণ্ডল-গিন্নী কাঁদো-কাঁদো হয়ে উত্তব দেয়—আব কিছু বলিনি দাদা, তোমাব হাতেই জান-মান তুলে দিচ্ছি, তুমি একটা বিধেন করো।...ও বুড়োব ভীমবতি ধবেছে।

যুধিষ্ঠির কিছু বলবার আগেই ভাঙা ইঁটেব স্তূপ থেকে একটা সাপ বেবিযে সব-সর করে চলে গেলো যুধিষ্ঠিরের পায়েব কাছ দিয়ে।

যুধিষ্ঠির আঁৎকে উঠে তিন লাফ দিযে বললে— পুঁটি, ও কি?

—কি আবার! দেখতে পেলে না কালকেউটে?

—বলিস্ কি! এ্যাঁ? এমনি করে বাসবাড়ীতে খোসমেজাজে চরে বেডাচ্ছে?

—তবে আর বলছি কি দাদা?.....পুঁটি কেঁদে পড়ে—ওই নেগেই তো তোমায ডাকা। এই বাড়ীতে ছেলে-পেলে নিয়ে বাস কবতে হচ্ছে আমাকে। তুমি তো মোটে একটা কেউটে দেখলে, অমন কতো আছে।

যুধিষ্ঠির পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে—হুঁ। তা' মহাভারত বলে কি?

—ওর কথা বাদ দাও দাদা। বলতে গেলে হুমকি দেয়। বলে—"সাপ-খোপ কি আজ জন্মেছে? ওসব বাবার আমল থেকে আছে না? এখন পাঁচিল পড়ে গিয়ে বাস্তুহাঁড়ি ভেঙে গেছে, তাই চোখে পড়ছে।".....আছে—তাই নয় মানলাম, তাড়াবে না তা' বলে?.....কেবল স্তোক্ দিযে দিয়ে বেখেছিলো— 'মামলাটায় বে-কায়দা করে রেখেছে, জিতলে দেখিস্।' সে কী 'হ্যান কবেঙ্গা ত্যান্ কবেঙ্গা' বোল-চাল! আব এখন এই দেখো!

যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে নেড়ে বলে—তা' দেখতে হবে বৈ কি। মহাভাবতটা যে এমন তা তো আগে জানতাম না।

পুঁটি বিগলিত আনন্দে বলে—দুরবস্থা কালে মানুষকে চেনা যায় না দাদা! পয়সা হাতে পড়লে আসল মূর্ত্তি ধরা পড়ে।

মুখ্যু হোক, চাষা-গিন্নী হোক, মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মেছে, এই ওর নিজের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে মহাভারতের ভূত ছাড়াতে ডেকে এনেছে যুধিষ্ঠির ওঝাকে।

যতোই হোক, মহাভারত পরের ছেলে। আর যুধিষ্ঠির ওর নিজের সহোদর ভাই।

দু'জনে গাল-গল্প করছে, এমন সময় পুঁটির বড়ো মেয়ে খেঁদি চটা-ওঠা এনামেলের গেলাসে করে কালো কেলেন্দি একটু চা এনে দিলো মামাকে।

মামা চমকে উঠে বললে—ঈস্! এ মেয়েটার যে বয়সের গাছ-পাথর নেই দেখছি! বিয়ে দিবি না?

—দেবো বলেই তো তোমার শরণ নেওয়া দাদা!

—অ।.....আচ্ছা, কি কি সমিস্যে তোর বল্ শুনি।

পুঁটি বোঝে, এইবার দুঃখু ঘুচলো। অন্ধকার কেটে আলো আসছে। বাঙলা কবিতা কখনো পড়েনি, তাই আওড়াতে পারলো না "দিন আগত ওই"। শুধু মনে মনে ঠাকুর-পেন্নাম করে বললো—সমিস্যির শেষ নেই দাদা। তবু যেটা নইলে নয় তাই শোনো। শুনে প্রিতিকার করো।

—করবো! করবো!

তখন পুঁটি গলদশ্রুলোচনে বিশদ ভাবে সমস্ত সমস্যার কথা দাদার কর্ণগোচর করলো বসে বসে।

দাদা বিস্তর নিন্দেবাদ করলো মহাভারতের, অনেক আশ্বাস দিলো বোনকে, তার পর মিটিমিটি হেসে বললো —'অষ্টাঙ্গে ব্যথা', ওষুধ দেবো কোথা? যত দূর দেখছি, কাজ বড়ো সোজা নয়, থাকতে হবে লেগেপড়ে। তা' তোর ভাজ আর ভাইপো ভাইঝি ক'টাকে আনিয়ে না নিলে.... ?

পুঁটি পরমোৎসাহে বললে—সে কি? বিলক্ষণ!

—আর দেখ, হাতখরচা বলেও মোটা কিছু নিতে হবে আমাকে। বুঝছিস তো? বেগারের কাজে মন লাগে কি?

পুঁটি বিচক্ষণের মতো বলে—সে তো সত্যি! নিও তুমি। আদায়-পত্তর তো তুমিই করবে এবার থেকে!

যুধিষ্ঠির পেটে হাত বুলিয়ে ঘুরে ঘুরে বলে—আমার আবার আপিঙের বদভ্যেস, জানিস তো? সের দেড়েক দুধের ক্ষীর আমার চাই।

পুঁটি মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—আর দেখ, তোর এই সাপের আড্ডায় তো আর আমার কাচ্চা-বাচ্চাকে এনে তুলতে পারি নে, নদীর ধারে ওই যে—বাবুদের দরুণ ছবিপানা বাড়ীগুলো রয়েছে, ওরির একটায় থাকবো আমি।

পুঁটির অনেক দিনের লোভ ওই বাড়ীর ওপর। শুধু মহাভারতের গাফিলিতেই হয়ে ওঠেনি। শুষ্ক কণ্ঠে বললে—বেশ।

যুধিষ্ঠির এ-দিক ও-দিক ঘুরে, আর একবার মহাভারতের মুণ্ডুপাত করে চক্কর খেয়ে এসে বলে—দেখ পুঁটি, অতো দূর থেকে রোজ রোজ এখেনে আসা—সোজা তো নয়! মহাভারতের মতন অমনি একটা হাওয়া গাড়ী আমার নিয্যস চাই।

পুঁটি ফ্যাকাসে মুখে ঘাড় কাৎ করে।

—আর শোন্ ভালো কথা, 'এসিস্‌টেন্ট' না কি বলে, ওই দুটো না রাখলে একা পেরে উঠবো না।

পুঁটি ম্লান মুখে বলে—সবই নাও দাদা, যা যা দরকার। মোটের ওপর আমার দুঃখুটা মনে রেখো।

—আরে, আরে, সে আর বলতে।

পরদিন মামা আসে সংসার উঠিয়ে। কত আশা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে পুঁটি।

মহাভারতের কাছ থেকে চাবি-চোবলা, দলিলপত্তর সব কিছু আদায় করে নেয়। বলে—এবার থেকে আমিই দেখবো ওদের।

চক্ষুলজ্জায় মোড়ল বেশী 'না' করতে পারে না। তাছাড়া দেহাতের দিকে—আলাদা একটা খাসমহল করিয়ে নিয়েছে নিজের, সেখানেই থাকে। এ বরং ভালোই হলো।

যুধিষ্ঠিরের নতুন গাড়ী আসে। প্রায় 'বাবু'দের মতনই পালিশ-চকচকে। আসে ইয়া ভাগলপুরী গাই। আসে খাট আলমারী আয়না দেরাজ, আলো পাখা! আসে কৌচ কেদাবা, সোফা সেট, রেডিও।

এতো খাটবে এদের জন্যে, এটুকু না পেলে পেরে উঠবে কি করে?

মহাভারতের বাড়ীর সামনে দিয়েই যায় জিনিষগুলো। ছেলেমেয়েগুলো ভাঙা ইঁটের পাহাড়ের ওপর দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে।

মা বলে—এইবার দাদা হাত দিয়েছে সুরাহা একটা হবেই। তোদেরও ওই সব এলো বলে, দেখ না।

দেখতে থাকে তারা।

দেখে মামাতো-ভাইদের লপচপানি।....মামার এ্যাসিস্‌টেন্টদের বোল-বোলাও।....দেখে একে-একে মামার শালা সম্বন্ধী ভায়রা যে যেখানে ছিলো, তাদের শুভাবির্ভাব!....দেখে আর নিশ্বাস ফেলে।

মামার হাত পড়ায়—প্রথমটায় আহ্লাদে খুব চঞ্চল হয়েছিলো সবাই।

খেঁদি, পাঁচি নির্জ্জনে বসে ফর্দ্দ কবতো বিয়ের সময় কি কি গযনা কাপড় নেবে।...রাম শ্যাম দু'জনে বসে বড়ো বড়ো ব্যবসার স্কীম কবতো যাতে টাকাটা পেলেই লেগে পড়ে।...চিরদিনের 'বাবু বাবু' মনওলা যদুটা সব সময় স্বপ্ন দেখতো—মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠেছে সে, দেশজোড়া খ্যাতি তার। জাহাজে চড়ে এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে আসছে নতুন নতুন বিদ্যের জাহাজ হয়ে।...জন্মরুগ্ন টেঁপিটা বসে বসে ভাবতো 'হ্যাট-কোট পরা ডাক্তার' এসে তার গায়ে ছুঁচ বিঁধিয়ে সারিয়ে তুলেছে তাকে। সেও পাঁচজনের মতন বেড়াচ্ছে ছুটছে।...মা-মরা নাতিটার খালি পেটের চিন্তা। দুধের বয়েস পার হয়েছে, তবু আজন্মের তেষ্টা তো? কল্পনায় খালি ঘটি-ঘটি দুধ খায়। তার সঙ্গে অবিশ্যি কাঁসি-কাঁসি ভাত, দাগা-দাগা মাছ, ধামা-ধামা ফল, এ সবও ভাবতে ছাড়ে না।

মানে ছাড়তো না।

এখন সবাই সবই ছেড়েছে।

সার বুঝেছে—ঘুমই সকল দুঃখের ওষুধ!

সব ক'টা মিলে দিনরাত্তির ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। মা ডাকাডাকি করলে একবার উঠে চোখ মুছতে মুছতে ক্ষুদের ভাত ক'টা খায়।....তাও আবার যুধিষ্ঠিরের মাপা চাল। ফেন গালবার হুকুম নেই।....বলে—তোদের বাবা যা দেবে তাই দেবো তো আমি? আমি কোথায় পাবো? পেট না ভরে, কচু খাও, আদা খাও, কাঁচকলা খাও। বিস্তর জন্মেছে উঠোনে বাগানে, আনাচে-কানাচে।

গিন্নী কাতর হয়ে মহাভারতকে ডেকে কিছু বলতে গেলেই সে বলে—কেন 'ওঝা'কে তো সব বুঝিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছি। আর দিক্ কোরো না আমায়। ঢের খেটেছি, একটু ঘুমোতে দাও।

মণ্ডল-গিন্নীরই শুধু চক্ষে ঘুম নেই। আবার দাদাকে 'দিক্' করতে ছোটে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

'ওঝা'র বাড়ীটা তিনতলা। সেই উঁচু বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলে—গোলমাল করছিস কেন? একসঙ্গে সব হবে?....এই দেখ—তোর মেয়েদের বিয়ের সময় গয়নার কি কি প্যাটার্ণ হবে তার ক্যাটালগ তৈরি করছি।

পুঁটি ক্ষীণ ভাবে বলে—গয়নায় কাজ নেই দাদা, একটা একটা বিয়ে হলেই বাঁচি। দেড় কুড়ি দু'কুড়ি বয়েস হয়ে গেলো—

দাদা খিঁচিয়ে বলে—দু'কুড়ি বছর অপিক্ষে করতে পেরেছিস, আর দু'দশটা বছর সবুর সইছে না?....আমি কি বসে আছি? তোর বিষয়-সম্পত্তির ফয়সালা করতে, আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল!

তবুও পুঁটি মরণ-কামড় দেয়—আর বাড়ীটা? নিদেনপক্ষে জঞ্জালগুলোও যদি ফেলিয়ে দাও—

যুধিষ্ঠির দার্শনিকের হাসি হাসে—এক কথায় বলতে সোজা, বুঝলি রে পুঁটি! বাড়ী কোন্ কালের? তোর দাদাশ্বশুরের বাপের আমলের! কোন না, দুশো বছর হবে। অতো কালের জঞ্জাল এক দণ্ডে সাফ হবে?

—দাদা, সেজ মেয়েটা যে মরছে।

—মরা-বাঁচা ভগবানের হাত পুঁটি। এই তো 'মরি মরি' করেও এ-কাল অবধি টিঁকে আছে? তবে ভাবছি আমি সব্বার জন্যে। মনে করেছিস, তিনতলায় বসে থাকি নিশ্চিন্দি হয়ে?....ভাবি কি না প্রমাণ দেখ।

পকেট থেকে একখানা লম্বা কাগজ বার করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় যুধিষ্ঠির বোনের ঘাড়ে।

পুঁটিও আর বেশীক্ষণ উর্দ্ধমুখী হয়ে দাঁড়াতে পারছিলো না। যতোই হোক বুড়ো হয়েছে তো।

কাগজখানা কুড়িয়ে এনে ছেলেদেরকে ডেকে বলে—দেখ তো, এ সব কি নেকা নিকেছে তোদের মামা?

ছেলেরা একনজর দেখেই ফেলে দেয়। অগ্রাহ্যভরে বলে—ও কিছু না।

—তবে দিলো যে মামা? .....বললো—

ছেলেরা অবজ্ঞাভরে বলে—বলতে তো কাঠ-খড় লাগে না, মুখ থাকলেই বলা যায়।......ফর্দ্দ তৈরি করছে গো মামা আমাদের।

পুঁটি অবাক হয়ে বলে—ফর্দ্দ কিসের রে?

—এই, আমাদের সুব্যবস্থার জন্যে কি কি করবে, কতো খরচা হবে তার ফর্দ্দ।.....টেঁপিকে নাকি সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাবে চিকিচ্ছে করাতে। তার হিসেব ধরেছে—চুরানব্বই হাজার তিনশো তের টাকা এগারো আনা সাত পাই।

টেঁপির মা পুঁটির হাঁ আর বুজতে চায় না।

[১৩৫৩]

"লক্ষণ হানিল বাণ অগ্নি অবতার।
তরণী বরুণ বাণে করিল সংহার।।
পাশুপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ।।"

বটতলার ছাপা বিবর্ণ মলিন মলাটছেঁড়া রামায়ণখানা প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে পড়া চাই মুকুন্দর। হ্যারিকেনের সামনে পুঁথিখানা মেলে ধরে দুলে দুলে আর সুর করে পড়তে থাকে মুকুন্দ, ছেলেকে শোনাবার জন্যে, না নিজের জন্যেই বলা শক্ত।

নেশা ধরেছে বাপ-ব্যাটার।

সন্ধ্যাবেলা দোকান বন্ধ করে এসেই মুকুন্দ হাত-পা ধুয়ে হ্যারিকেনটি জ্বেলে নিয়ে ছোট জলচৌকিটার ওপর বসায়, কুলুঙ্গি থেকে রামায়ণখানি পেড়ে নিয়ে ডাক দেয়—কানাই ঘুমিয়েছিস নাকি?

কোনদিনই ঘুমোয় না কানাই, তবু প্রশ্নটা তার করাই চাই।

ঘুমোবে কি—কানাই তো বিকেল থেকেই ছটফট করে বাপের আসাপথ চেয়ে।....পিতৃভক্ত বলে যে খুব বেশী খ্যাতি আছে কানাইয়ের এমন মনে করবার কারণ নেই, তবু এ সময়টা বাপকে দেখলে তার চোখ জুড়োয়। গাছ-পালায় ঘেরা আলো-আঁধারি উঠোন, দালানের দেওয়ালে কালো কালো ছায়া...লন্ঠন বসাবার জলচৌকিটার নীচে ঘন অন্ধকার। এই পরিচিত অথচ রহস্যময় পারিপার্শ্বিকতার মাঝখানে পাঠক-মুকুন্দর রূপটাই যেন নতুন, আকর্ষণীয়।

বড়ো বড়ো দু'টো চোখ মেলে বাপের মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে বসে থাকে কানাই। অতি পরিচিত এই শব্দযন্ত্রটা—সারাদিন যেটা রাজ্যের লোকের সঙ্গে বকাবকি করে মরে, গালাগালি করে কানাইকে আর কানাইয়ের মাকে, উঠোনের লাউ কুমড়োর ডগা সামলাতে গরু-ছাগল তাড়ায় 'হেট্ হেট্' করে—তার মধ্যে থেকে কেমন করে বার হয় এমন চিত্ত-চমকপ্রদ শব্দের সমারোহ! কোথায় লুকানো থাকে এই শব্দভাণ্ডার? কোথায় আঁকা হয় এতো রোমাঞ্চকর ছবি!

ছবি ছাড়া আর কি? চোখের উপর যে স্পষ্ট দেখতে পায় কানাই—রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইয়ের অলৌকিক কীর্তিকাণ্ড, দশমুণ্ড রাবণের এককুড়ি অগ্নিবর্ষণকারী জ্বলন্ত চোখ, দশজোড়া হাতের ধারালো অস্ত্রের ঝক্ঝকানি, অসংখ্য বানরকুলের লাঙ্গুল আন্দোলন!......

মাঝে মাঝে কানাই বাপের মুখ ছেড়ে বইয়ের পাতায় ঝুঁকে পড়ে, কালো পিঁপড়ের সারির মতো অজস্র কালো কালো লাইনের আলাদা আলাদা থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন একাকার হয়ে যায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখদুটো জ্বালা করে আসে।...কোঁচার খুঁটটা তুলে চোখ মুছতে দেখে মুকুন্দ হঠাৎ চোখ তুলে ছেলের মুখেব দিকে চেয়ে সস্নেহে বলে—কাঁদছিস্ কেন রে, কানাই?

দিনের বেলায় মুকুন্দর থেকে এখনকার মুকুন্দ যেন আলাদা মানুষ! এখন ছেলের সঙ্গে কথা কইতে কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ে স্নেহের সুর, ধরা পড়ে ছেলের মার সঙ্গে কোমল অন্তরঙ্গতার। এ সময় অনায়াসে বসা যায় বাপের কাছ ঘেঁষে, সাহস করে জিগ্যেস করা যায় সেই সব প্রশ্ন, যে সব প্রশ্নের রাশি মস্তিষ্কের কোষে কোষে ভীড় করে বেড়াচ্ছে।

বাপের কথায় অপ্রতিভ কানাই মাথা হেঁট করে হাসে, য্যাঃ, কাঁদবো কেন? চোখ জ্বালা করছে যে!

—ঘুম পেয়েছে আর কি। সারাদিন তো চোখের পাতা বুজবি না! পঠিত পাতার মধ্যে একটা আঙুল রেখে বইটা মুড়ে মুকুন্দ রান্নাঘরের দিকে চেয়ে হাঁক দেয়—কই? খেতে টেতে দিচ্ছ না কেন ছেলেটাকে? ঘুম লাগে না ওর?

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কানাইয়ের মা রাধা বলে—কেন, বেশ তো রাম-রাবণের যুদ্ধ চলছিল—আবার ঘুম লাগা কিসের?

—রাম-রাবণের যুদ্ধ তো দিনের বেলা—বলে মুচকি হাসে মুকুন্দ।

—তা বটে—ব'লে হাসির ঝিলিক মেরে রান্নাঘরে ঢুকে যায় রাধা।

অবশ্য সব দিন এতো সহজে যায় না, যায় সেদিন যেদিন হয়তো কড়ায় চাপিয়ে এসেছে বড়িচচ্চড়ি, কিম্বা জ্বলন্ত উনুনের মুখে সমর্পণ করে এসেছে পাকা পটল বা কচি বেগুন।...

মা তাড়াতাড়ি গেলে যেন হাড়ে বাতাস লাগে কানাইয়ের। ঠিক জানে মা এসে বসলেই পাঠের বাঁধুনি যাবে এলিয়ে—আসরটা হবে মাটি। বক্‌বক্ করে মেলাই আজেবাজে কথা কয়ে হঠাৎ এক সময় খাওয়ার জন্যে তাড়া দেবে রাধা।

—এইটুকু শেষ করে নিই—বলে আরব্ধ অধ্যায়ের বাকী অংশটুকু পড়ে ফেলবে বটে মুকুন্দ, কিন্তু সে কি পাঠ? নেহাৎই উচ্চারণ মাত্র। হয়তো বা তরণীসেনকে বধ করতে বাকী রেখেই মুকুন্দ হাই তুলে বইখানা মুড়ে ফেলবে। কানাই বেচারা যে সেই লঙ্কাপুরীতেই পড়ে রইলো, এটা আর খেয়াল হয় না তার।

নিরাপত্তা হিসাবে সারাদিনটা মা'র স্নেহচ্ছায়াটা পছন্দ করলেও সন্ধ্যাবেলায় এই রামায়ণের আসরে মা'র উপস্থিতি নিতান্তই চক্ষুশূল কানাইয়ের।

এতো বাজে কথাও বলতে পারে মা। নীলমণির মা'র নতুন কেনা গাইটা দিনে সাড়ে চার সের দুধ দেয়, কিম্বা লক্ষ্মী বাঁড়ুয্যের মেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না।..এগুলো কি একটা বলবার মতো কথা? কী রস পায় ওতে রাধা?...অথচ লঙ্কাদাহনের মতো মারাত্মক কাহিনীটা শুনতে শুনতে ঘনঘন হাই তুলবে আর বলবে, নাও নাও তোমাদের পুঁথিপত্তর তোলো তো। রাতদুপুর পর্যন্ত হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকতে পারিনে বাপু।

মা চলে গেলে নিশ্চিন্ত কানাই বাপের আরো কাছ ঘেঁষে বসে উত্তেজনারুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আচ্ছা বাবা, লক্ষ্মণ যদি অতো বীর তবে একদিনে সব মেরে দিল না কেন?

মুকুন্দ হেসে ওঠে—দূর পাগলা, লঙ্কাপুরীতে কী সোজা রাক্ষসের কাঁড়ি? সেদিন পড়লাম, শুনলি না? একলক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি রাবণের। লক্ষ জানিস তো? দশ দশে একশো, একশো দশে হাজার, আর একশো হাজারে এক লক্ষ—বুঝতে পারলি? তা ছাড়া সৈন্য হচ্ছে একশো অক্ষৌহিণী।

অতো হিসেব কানাইয়ের মাথায় ঢোকে না...লাখ-বেলাখ যে বিরাট একটা কিছু, এইটুকু তার বোধগম্য, তাই হিসেব-পত্তরে কান না দিয়ে মহোৎসাহে বলে—আর যদি মিনিটে মিনিটে বাণ মারে? শতঘ্নী বাণ, সহস্রঘ্নী বাণ, অগ্নিবাণ আর ব্রহ্মবাণ?

উচ্চারণে ভুলচুক নেই কানাইয়ের।

মুকুন্দ ছেলের উৎসাহদীপ্ত মুখের পানে চেয়ে একবার হেসে ওঠে—ক্ষ্যাপাব্যাটার সব মুখস্ত!...ওগো শুনছো, 'কালেখ্যে' তোমার ছেলে লড়ায়ে গোরা হবে দেখছি।

আবার 'ওগো'! এইটাই বড়ো বিরক্তিকর কানাইয়ের। শতঘ্নীবাণ না হোক্, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে বাবার কাছ থেকে যে তথ্যগুলো আদায় করে নেবার ইচ্ছে থাকে মনে মনে, সেগুলো কেবলি বাধাপ্রাপ্ত হয় বাবার এই অনর্থক 'ওগো' ডাকে।

রাধা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেই তো সব মাটি। মেয়েমানুষ যুদ্ধের কলাকৌশল কিছুই তো বোঝে না ছাই।... রাধা খেতে ডাকলেই তাই দুই চোখে অগ্নিবাণ হেনে কানাই মাকে বলে—এখুনি খাবো না আমরা, যাও। ঘুম পায়নি আমার।

রাধা বিরক্তস্বরে বলে—তা' পাবে কেন? পুঁথিপত্তর সাঙ্গ হ'লেই দাওয়ায় পড়ে ঘুমোও তো বুঝবে।...খেয়ে নিবি আয় শিগগীর, লক্ষ্মীছাড়া!

—মিথ্যে গালমন্দ করা কেন—বলে মনের অসন্তোষ প্রকাশ করে মুকুন্দ। নিজে যে সারাদিন ছেলেকে "হারামজাদা শয়তান" ভিন্ন ডাকে না, মেরে পিঠের ছাল তোলে, সে কথা আর মনে থাকে না তখন।

রাধাও অবশ্য সেসব কথা তুলে পরমগুরুকে অপদস্থ করে না। শুধু মুখঝামটা দিয়ে বলে যায়—বেশ তো, ছেলের সোহাগ করো না বসে বসে, এরপর ভাত না গিলে ঘুমিয়ে কাদা হ'লে বুঝবে।

বলে বটে, তবে কণ্ঠস্বরে ছেলের সোহাগ সম্বন্ধে খুব বেশী আপত্তির ভাবও ধরা পড়ে না।

মুকুন্দ বোধ করি ছেলের সোহাগার্থেই সূচিপত্র দেখে বীরত্বব্যঞ্জক জায়গাগুলো বেছে বেছে পড়ে...নিত্য শোনা একই কাহিনী, তবু কানাইয়ের প্রত্যেক সঙ্কটমুহূর্তে গায়ে কাঁটা দিয়ে আসে, বুক দুর্‌দুর্‌ করে, উত্তেজনায় চোখমুখ রাঙা হয়ে ওঠে।...

রাম আর লক্ষ্মণ, রাবণ আর কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিত আর হনুমান—প্রত্যেকের জায়গায় এক-একবার নিজেকে বসিয়ে নিয়ে যেরকম অদ্ভুতভাবে কল্পনার রাশ ছেড়ে দেয় কানাই, জানতে পারলে স্বয়ং বাল্মীকি-কৃত্তিবাসকেও হেঁটমুণ্ডে হার স্বীকার করতে হ'তো।

খেলা মানেই যুদ্ধু-যুদ্ধু খেলা।

অন্য সব ছেলেরা মাঝে মাঝে মুখ ভার করে বলে—"কেনো'র সঙ্গে আমরা আর কেউ খেলবো না ভাই, কেবল কেবল মরতে ভাল লাগে বাবা!" তা' অভিযোগ তা'দের অন্যায় নয়—কল্পনায় যাই করুক, বাস্তব ক্ষেত্রে কানাই সংহারকের পার্ট ছাড়া আর কিছু নিতে রাজী নয়। কাজেই পালা করে সকলকেই একাধিকবার মৃত্যুবরণ করতে হয়।

যুদ্ধু-যুদ্ধু খেলা সকলের কাছে পুরানো হয়ে আসে, হয় না শুধু কানাইয়ের কাছে। সুযোগ আর সুবিধে পেলেই সে মারণাস্ত্র তৈরি করতে বসে। আর স্বপ্ন দেখে—বড় হয়ে যখন সত্যিকার যুদ্ধু করবে তখনকার ঐশ্বর্য্যময় সমরোপকরণের!

কিন্তু কানাইয়েরই বা দোষ কি? যুগযুগান্তর ধরে পৃথিবীর ইতিহাস 'যুদ্ধ' ভিন্ন আর কি নতুন কথা বলেছে? যুগের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তন হয় পদ্ধতির, ইতিহাসটা থাকে অভিন্ন।

স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পাঠ্যপুস্তকেও সেই একই নজীর দেখে আসছে কানাই।

পাঠ্যতালিকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যাচ্ছে পুরাণের যুগ, ফিকে হয়ে আসছে রাম-লক্ষ্মণের বীরত্বমহিমা...স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, বিজয়সিংহ।

পুরাণ থেকে ইতিহাসে—অতীত থেকে বর্ত্তমানে—সংগ্রামের পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে মানুষ...কিন্তু হঠাৎ কখন স্তব্ধ হয়ে গেল সেই প্রাণপ্রবাহ?

"পলাশীর যুদ্ধ" বইখানা হাতে করে কিশোর বালক স্তব্ধ হয়ে ভাবে...পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজও রক্তের জোয়ার! শুধু ভারতের মাটি ঘুমন্ত ঠাণ্ডা! তার সমুদ্রে জোয়ার ওঠে কেবল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না লেগে...আর যা সংগ্রাম সে শুধু জীবনসংগ্রাম!

নিরীহ বাংলার তেলেজলে গড়া কাঁচামাটির ছেলে—ওর রক্তে কেন যুদ্ধের ক্ষুধা? ওর চোখে কেন প্রতাপ-শিবাজীর স্বপ্ন?

ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর সখ অবশ্য মুকুন্দর নিজের। গোটাচারেক ক্লাস পার হ'তেই রাধা বরাবর বলেছে—আর বিদ্যের দরকার কি, দোকানের কাজকর্ম্ম শিখুক এবার। এখন থেকে না শেখালে বাবু হয়ে যাবে যে!

কথাটা তখন মুকুন্দর মনঃপূত হয়নি, একটা পাশ দিয়ে বসলে দোকানের কদর বাড়বে কতো! 'মনিহারী দোকান' না বলে মুকুন্দর দোকানকে তখন 'ষ্টেশনারি শপ্' বলবে লোকে। বাবু-ভদ্দরলোক এলে দুটো ইংরাজি কথা বলতে পারবে ছেলে, তাই বছর বছর এগিয়ে পাশের পড়া পড়ছে এখন কানাই। কিন্তু আজকাল মুকুন্দ পড়েছে চিন্তায়। পুঁথি-কেতাবে যেরকম মন কানাইয়ের, তার সিকিও নেই দোকানের ওপর...যখন-তখন কী যে ভাবে বসে বসে! গেরস্তর ছেলের ওসব কি!

পঞ্জিকায় কী যেন একটা শুভদিন দেখে ছেলেকে ডেকে বলে মুকুন্দ—চল্ দিকিনি, আজ সুযাত্রার দিন—দোকানে গিয়ে বসবি চল্।

কানাই বিব্রতভাবে বলে—কেন?

—কেন? বাঃ!....হাসতে চেষ্টা করে মুকুন্দ—কেন কি রে? বুঝেপড়ে নিতে হবে না? আমি আর ক'দিন, তোর এই পাশটা দিতে যা দেরী, তারপর ওই দোকান আছে আর তুমি আছো! আমি বাপু দায়ে খালাস।

কানাই বিরক্ত ভাবে বলে—দোকান-টোকান আমার ভাল লাগে না।

—বটে! মুকুন্দ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—তা' কি তোমার ভালো লাগে শুনি? কি করবে এর পর?

—আমি লড়াইয়ে যাবো।

একটু 'গোঁ'ভরে কথাটা উচ্চারণ করে কানাই।

মুকুন্দ বার দুই ছেলেকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে গম্ভীরভাবে বললে—ও, লড়ায়ে যাবে? কথাটা ভালো—তবে তোমার জন্যে ফের আবার একটা লড়াই বাধাতে হয় বিলেতে। পৃথিবীর সব যুদ্ধুটুদ্ধু মিটে শান্তি হ'ল, এখন ছেলে বায়না নিচ্ছেন কিনা 'লড়ায়ে যাবো'!

শান্তি হয়ে গেছে! হ্যাঁ, কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই তো বলছে সবাই।

কানাই কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে। হায়, কিছুদিন আগেও যদি এমন সাহস করে বলবার শক্তি হ'ত! কানাইয়ের ভাগ্যদোষেই যে অমন ঘোরালো যুদ্ধটার এতো তাড়াতাড়ি শান্তি হয়ে গেল এতে আর সন্দেহের কি আছে। হাতের গোড়ায় আসতে না আসতে কোথায় যেন ভোজবাজীর মতো মিলিয়ে গেল।...কিন্তু লড়াইয়ে যেতে চাইলেও একটু যেন খটকা আছে কোথাও। পলাশী...পানিপথ...হলদিঘাটের যুদ্ধে যে গৌরব, 'মিলিটারী"তে ভর্ত্তি হয়ে সেটা বজায় থাকবে

তো? খাঁকি সুটটা অবিশ্যি দেখতে মন্দ নয়, 'মন্দ নয়' কেন বরং ভালোই, কিন্তু উষ্ণীষ-কোমরবন্ধ-লৌহবর্ম্মের কাছে? খাঁকি সুটে সুবিধা হয়তো আছে, কিন্তু সমারোহ কোথায়?

তা ছাড়া—কোথায় সেই লড়াই? কাদের সেই জয়পরাজয়? ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে তার যোগ আছে নাকি কিছু? ভারতে দু'শো বছব ধরে যে স্রোত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সে তো আজও তেমনি স্তব্ধ।

ছেলেকে চুপ করে থাকতে দেখে মুকুন্দ বুঝলো—ওষুধ ধবেছে, মনে মনে হেসে বলে—তা' বেশ তো, লড়াইয়ে গেলেও কিছু আর এক্ষুনি যাচ্ছো না? দোকানটা একবাব ঘুরে আসতে দোষ কি?

—না, আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি।

—ইস্কুলে? আজ ছুটি না?

—ক্লাসের ছুটি। স্কুলের মাঠে লেকচাব হবে তাই শুনতে যাচ্ছি।

মুকুন্দকে দ্বিতীয় কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে ছুটে পালায কানাই।

"কপাল আঁকড়ে বসে থাকলে চল্‌বে না ভাই, কপাল আমাদেব নিজেদের গড়তে হবে। লড়তে হবে—কাড়তে হবে—নিজের গণ্ডা আদায় কবে নিতে হবে। ঘবের পাশে শত্রু বসে আছে 'ওৎ' পেতে, হুঁসিয়াব সব, হুঁসিয়ার! আপনাদেব জাত-মান-ধন-প্রাণ রক্ষা করতে পরের মুখ চেয়ে বসে থাকবো কেন আমরা?—এসো এগিযে এসো—পৃথিবী জুড়ে লড়াই করছে মানুষ, শুধু আমবাই পড়ে মাব খাবো? কখনই নয!—মায়েব দুধ খাওনি তোমবা?—ভগবানের দেওয়া হাত নেই দু'খানা? বীরের মতো ঝাঁপিযে পড়ো, বাঙালীর কলঙ্ক ঘোচাও..."

সহর থেকে নেতাবা এসেছেন।

ভাষায় তাঁদের আগুন জ্বলে। এক-একটি শব্দস্ফুলিঙ্গ ঠিকবে ওঠে বিদ্যুতের মতো। আগুনের ছোঁয়াচ লাগে ছাযাশীতল আম্রকাননের নিবিড় স্নিগ্ধতায়। অনেকদিনের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা ঘুম ভেঙ্গে যায। হুঁসিয়াব হযে ওঠে নিরীহ চাষারা।

লড়াই! লড়াই!

স্কুলের মাঠ থেকে কানাই ফিরে এলো সেই অগ্নিকণা বয়ে। কানাইয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনার জোরেই কি সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ এলো হাতের গোড়ায? শ্রীচৈতন্যের দেশে শানানো হবে তলোয়ার?—দু'শো বছরেব থমকে-যাওয়া নদীতে দেখা দেবে নতুন বন্যা?

সহর থেকে যাঁরা এসেছিলেন—ফিরতি ট্রেনেই ফিরে গেছেন তাঁরা। কতো কাজ তাঁদের, কতো চিন্তা! লড়াই করবার সময কোথা? লড়াই চলে তাঁদের মস্তিষ্কের কোটরে। তাই দিয়ে গিয়েছেন লড়াইয়ের সঙ্কেত, দিয়ে গিয়েছেন মন্ত্রগুপ্তি শিক্ষা।

কানাইয়ের দল এসে জমা হয় মাতব্বরদের আড্ডায়, দেখে আয়োজনের ঘটা। অধীর হয়ে প্রশ্ন করে—কই লড়াই? কোথায় সেই রণক্ষেত্র? শত্রুপক্ষ কারা?

মাতব্বররা মুচকি হাসে—রোস্‌ না, সময়ে জানতে পারবি। শত্রু-মিত্র কি আগে চিনতাম রে বাবা? ভগবান এতোদিনে চোখ ফুটিয়েছে। চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে 'ন্যাতা'রা।

চক্ষুস্মান ব্যক্তিরা তো বসে বসে মতলব ভাঁজছে, দৃষ্টিহীন কানাইয়ের শান্তি নেই। ঘুম নেই রাত্রে...রাত্রির অন্ধকারে ঝিকিমিকি তারাভরা আকাশের পানে চেয়ে খোলা চোখে স্বপ্ন দেখে

সে—প্রতাপ-প্রতাপাদিত্য বীরবাদল-মোহনলালের...নতুন যুগের বীর নেতাজীর। স্বপ্ন দেখে—উন্মুক্ত রণক্ষেত্রের...দুই সীমান্তে দুই দলের শিবির...স্বপ্ন দেখে—খোলা তলোয়ারের ঝনঝনানির।

যতোই হোক্ চাষার ঘরের ছেলে।

'বই কেতাবে'র দৌড় এতদূব নয় যে, আণবিক বোমার খবর রাখবে, ঘুরে ফিরে তাই সেই অচলযুগের পটভূমিকাতেই নিজেকে দাঁড় করিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

এমনি একদিন জেগেই ছিল সে। টোকা পড়লো জানালার গোড়ায়।...

—কে?—চমকে উঠলো কানাই।

—চুপ, আমি নবীন। আয়, বেরিয়ে আয়—তোর বাবা টের পায় না যেন।

গায়ের কাপড়টা জড়াতে জড়াতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে কানাই।—কি ব্যাপার নবীনকাকা?

নবীন ফিসফিস করে বললে—এখানে কথা হবে না, চল্ ইস্কুলের মাঠে, ওখান থেকেই বেরোনো হবে।

বেরোনো হবে!

—তারা কি এসে গেছে?

গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে কানাইয়ের, বুক টিপটিপ করে।

নবীন একটু আশ্চর্য হয়ে বলে—কারা এসে গেছে, শুধোচ্ছিস? নেপাল—মতি—রামকেষ্ট—হরি—

—না, না, ওরা নয়—তারা...মানে শত্রুরা!

শুকনো গলাটা ঢোক গিলে ভিজোতে চেষ্টা করে কানাই। হায় ভগবান! উৎসাহের চোটেই যদি শরীর অবশ হয়ে আসে, বীরত্ব সে দেখাবে কি ক'রে?

নবীন কিন্তু হেসে ওঠে। অন্ধকারে হাসিটা দেখা যায় না, ঠাণ্ডা একটা শব্দ শুধু।

—শত্রু আবার 'আসবে' কোথায় রে ক্ষ্যাপা ছেলে? ঘাড়ের ওপরই তো বসেই আছে তারা, জমি-জায়গা দখল করে। এইবার ট্যাঁ-ফোঁ ঘোচাচ্ছি বাছাদের। চল চল—দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কানাইয়ের হাতটা ধরে টেনে নিয়ে যায় নবীন।

ইস্কুলের মাঠে গুলতানি।

একদল বুঝি এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে, বাকী দল যাবে—হাতিয়ার শানাচ্ছে। বিদ্যুৎঝলকানো ইস্পাতের ফলা নয়—মোটা মোটা খেঁটে বাঁশ। সহজ সরল অস্ত্র!

কানাই কি কিছুই বুঝতে পারে না? অমন নির্বোধের মতো শুধু সম্মুখবর্ত্তীর অনুসরণ করে চলেছে কেন খালি হাতে?

বেশীদূর এগোতে হ'ল না— অগ্রবর্ত্তী দল ফিরছে। 'কাজ ফতে!' 'এ্যাঁ, বলিস কি?'...'পাড়াকে পাড়া'?...''তবে আবার কি! যে দু'চার ব্যাটা ছিট্‌কে পালাচ্ছিল তাদের দিয়েছি একেবারে এই—'

খেঁটে বাঁশটা মাথার ওপর বাগিয়ে তুলে ধরে ইসারায় বুঝিয়ে দেয় মতি।

অদ্ভুত একটা আর্তরোল আসছে, তার সঙ্গে বিশ্রী গন্ধ আর বাঁশ ফাটার শব্দ। ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া আর খড়ের চাল বৈ তো নয়। আকাশটা অমন লালে লাল হয়ে উঠেছে কেন?...তরণীসেনের

মতো 'চিকুর শর' হেনেছে নাকি কেউ? লক্লক্ করে শিখা উঠছে কিসের? দশমুণ্ড রাবণের বিশখানা হাত দিকে দিকে প্রসারিত হয়ে গ্রাস করতে চাইছে পৃথিবীর সমস্ত শুভ আর কল্যাণ?

—চল্ চল্, ঘর চল্!—নবীন সাবধান করে দেয়—ঘরে গিয়ে বেমালুম নাক ডাকাবি সবাই, কাক-পক্ষীতে জানতে না পারে। শালার পুলিশ এসে দেখবে পাড়া নিশুতি।...আরে, এটা আবার কি? এঃ, রাম রাম!

মতি দাঁত বার করে হাসে—ব্যাটা পালিয়ে আসছিল, দিয়েছি ভবলীলা সাঙ্গ করে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ওরা, কিন্তু কানাই? ওর চোখ অমন বিস্ফারিত হয়ে উঠছে কেন? 'লীলা সাঙ্গ' করা জীবনটাকে চিনে ফেলেছে বলে? ওপাড়ার সেই লোকটা না? প্রায়ই যার সঙ্গে ছিপ ঘাড়ে করে মাছ ধরতে যায় মুকুন্দ পীরতলার পুকুরে? কপালের আধখানা ফেটে গিয়ে জমাট হয়ে রয়েছে রক্তের চাপ!

রক্ত!

কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন? লড়াইয়ের সঙ্গে ও-জিনিষটার যে বড়ো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

এই তবে লড়াই? ইতিহাসের যে ধারা দেড়শো বছর ধরে স্তব্ধ হয়ে আছে, তাকে মুক্তি দেবে এই নতুন রক্তের স্রোত? প্রতাপ আর প্রতাপাদিত্য, শিবাজী আর পৃথ্বীরাজের হাতে লেগেছিল যে রক্ত, সে কী তবে এমনই কালো আর জমাট বাঁধা!

[১৩৫৪]

আদিম

দুটো বেণী দিয়ে গড়া প্রকাণ্ড খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো, হাতে ভারী ওজনের মোটা মোটা কঙ্কণ, মিহি ক্রেপের শাড়ীর জমকালো টিসুর আঁচলাটা অবহেলায় পিঠে ফেলা, পায়ের জুতোয় আর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগে শ্রীনিকেতনী শিল্পচাতুর্য্য—অতি আধুনিকার একখণ্ড নিখুঁৎ নমুনা কৃশাঙ্গ কস্তুরী, গাড়ী থেকে নেমে যেন হালকা হাওয়ার মতো ভেসে বাড়ীতে উঠে এলো।

উঠেই আসতে হয়, রাস্তা থেকে বাড়ীটা উঁচু।

প্রদীপ বলে "বাইশতলা দেশ"।

মিথ্যে বলে না। উপরে নীচে এখানে ওখানে পথ আর বাড়ীর যেন গোলকধাঁধা।

কস্তুরীকে দেখে প্রদীপের একাধারে গৃহরক্ষক সেবক পালক সব কিছু,পাহাড়ী বালক নানকুটা হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে। তা'র চাকরীদশায় এহেন অপরূপ আবির্ভাব কখনো ঘটেনি।

কস্তুরী ওর স্তম্ভিত ভাবটা উপভোগ করে আরো যেন ঝড় বইয়ে দেয়— ঘরে আবার চাবি লাগানো কেন রে? কী মুস্কিল! খোল খোল।

বলা বাহুল্য এমন দরাজ হুকুমের পর ইতস্ততঃ করা সম্ভব নয়। নানকু সসম্ভ্রমে দোরটা খুলে দেয়।

ভ্যানিটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে দিব্য সপ্রতিভ ভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে কস্তুরী।

আর ঢুকেই প্রদীপের টেবিলের কাগজপত্র উল্টে-পাল্টে তছনছ করতে থাকে। কবি কোথাও

কিছু লিখে ছড়িয়ে রেখে গেছে কি না।

ও বাবা! প্যাডের মধ্যে এ যে চিঠি! কস্তুরীকে মনে আছে তা'হলে! আজ মাস দুই আড়াই তো প্রায় চিঠিপত্র বন্ধ। মাঝে মাঝে দু'এক ছত্র যা পাঠায় সে আর চিঠি নয় নেহাৎই দায়সারা কুশলবার্তা।

আরে এ যে রীতিমতো সাহিত্য!.....চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে প্যাডটা খুলে ধরে কস্তুরী, তন্ন্ সয়না।

বাস্‌রে, এসব আবার কি লিখছে প্রদীপ!

"—রাত জেগে তোমায় চিঠিটা লিখছি কস্তুরী—রাত্রে আজকাল জেগেই থাকি প্রায়, কিছুতেই কেন জানি না ঘুম আসতে চায় না। তবু এই জেগে থাকা আমার খারাপ লাগে না। মনে হয় রাতে ঘুমিয়ে থেকে ভারী ভুল করি আমরা। ঘুমিয়ে থাকি তাই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য আমাদের অজানা থেকে যায়। আমরা যখন সারাদিন স্থূল প্রয়োজনের তাগিদে ছুটোছুটি করে মরি, তখন ঘৃণায় করুণায় বোবা পৃথিবী নিশ্চল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। রাত্রে যদি ঘুমিয়ে না পড়ে আমার মতো জানলায় এসে বসো কস্তুরী, তা'হলে অনেক কিছু জানতে পারবে। জ্ঞানের পরিধি কতো বেড়ে যাবে তোমার। ভারী আশ্চর্য্য লাগবে সুদীর্ঘকাল ধরে রাত্রিটা ঘুমিয়ে নষ্ট করে এসেছো বলে।

তুমি কি জানো কস্তুরী, রাত্রির অন্ধকারে অরণ্যে যে মর্মরধ্বনি ওঠে সে ধ্বনি কিসের? তুমি হয়তো আজও জানো না সেকথা, আমি জানি।...... পাতায় পাতায় বাতাসের লীলামৃগয়ার মুখর চপলতা সে নয়, সে ধ্বনি কোটি কোটি অশরীরী আত্মার বিক্ষুব্ধ আর্তনাদ। প্রতিদিন প্রতিরাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্করুণ আকর্ষণে যেসব হতভাগ্যরা আশা-আকাঙ্ক্ষার ভরাপাত্র নামিয়ে রেখে এই শোভাসম্পদময়ী ধরণী থেকে অসময়ে স্খলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে—অনন্ত শূন্যের ক্ষুধার্ত জঠরে, দলে দলে উঠে আসে তারা, অন্ধকারের অসাবধান অবসরে। উঠে আসে—ছেড়ে যাওয়া পুরানো পৃথিবীর বুকে। উঠে এসে অবাক হয়ে যায় তারা। বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যায়। ধিক্কারে স্তম্ভিত হয়ে যায় পৃথিবীর দুর্ব্যবহারে।.... এসে চিনতে পারে না কিছু, খুঁজে পায় না নিজের পুরানো জায়গাটাকে। বুঝতে পারে না—কোথায় হারিয়ে গেলো, তা'কে হারিয়ে ফেলার গভীর ক্ষতচিহ্নটা? জানতো না— মমতাহীনা পৃথিবী হারিয়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে মুছে ফেলে ক্ষতির সকল চিহ্ন। নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে নেয় আগামী নতুনের জন্য।....

কাউকে হারিয়ে ফেলে হাহাকার করতে বসবে এতো সময় পৃথিবীর হাতে নেই।.....

বুঝতে পেরে ওরা ক্ষুব্ধ অপমানে দলে দলে গিয়ে জড়ো হয় অরণ্যে অরণ্যে। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ওদের হতাশ হাহাকার। যেন মাথা কুটে কুটে সাড়া তুলতে চায় মমতাহীনার প্রস্তরীভূত বক্ষপঞ্জরে। বুঝি মনে পড়িয়ে দিতে চায়...."আমি ছিলাম" "আমি ছিলাম"...."একদা তোমার এই শোভাসম্পদের উপর ষোলো আনা অধিকার ছিলো আমার, এমন নির্মম ঔদাসীন্যে আমাকে ভুলে যেও না।" এক সময় ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়ে ওঠে নিজেরা নিজেরা। নিশ্বাস ফেলে বলে—"ভুলে গেছে আমাদের!" ...."আমরা নেই!" তখন হয়তো ক্ষণকালের জন্যে অরণ্যানী স্তব্ধ হয়ে যায়, শুধু একটা অনুচ্চারিত 'হায় হায়' স্থির হয়ে থাকে।

আবার আছড়ে এসে পড়ে নতুন দল।

আবার তাদের ভারাক্রান্ত নিশ্বাসে পাতায় পাতায় ওঠে মর্মর শিহরণ। সারারাত্রি ধরে চলে

এই আনাগোনা, এই মাতামাতি।

নিরুপায় অরণ্যকে সমস্ত রাত ধরে সহ্য করতে হয় অশরীরী আত্মাদের এই অদ্ভুত আক্রমণ। ঊষার আলো ফুটলে তবে অরণ্যের মুক্তি, তখন সে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। প্রেত আত্মারা আলোর আভাসে সচকিত হয়ে ওঠে, বুঝতে পারে জীবিত প্রাণীর রাজ্যে এ তা'দের অনধিকার প্রবেশ। বুঝতে পেরে ম্লানমুখে বিদায় নেয় তারা।

... ...

আমার এই অদ্ভুত কল্পনার খবর পেয়ে তুমি কি হাস্‌ছো কস্তুরী?...ভাবছো দিনের আলোয় কি অরণ্যে মর্মরধ্বনি ওঠে না?...

ওঠে বৈকি। ওঠে!

সে ধ্বনি শাখাপত্রে বাতাসের লীলাচাপল্যের। তখন কেউ ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা কয়ে ওঠে না।...কস্তুরী, দিনের আলোয় তুমি যদি অরণ্যের জটিলতায় ঘুরে বেড়াতে চাও, তখন যে শব্দ তুমি শুনতে পাবে, সে নিতান্তই তোমার নিজেরই পায়ের চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। তখন রহস্যহীন মৌন অরণ্য গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকবে তোমার দিকে। সারারাত্রির মাতামাতির ইতিহাস দেখতে পাবে না তার মুখের কোনো রেখায়।

কস্তুরী, অরণ্যের এতো কাছাকাছি কখনো থেকেছো তুমি, যেখান থেকে জানালা খুললেই বনের গন্ধ পাওয়া যায়? গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে এসে জানালায় দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করেছো অরণ্য-মর্মরের সত্যকার ইতিহাস?

না না!!

নিশ্চয় তুমি এসব দেখোনি কস্তুরী, নিশ্চয় শোনোনি এ সব! যদি শুনতে পেতে—তা'হলে পরীক্ষায় একটা বাড়তি ডিগ্রী আর কিছু পরিমাণ বেশী নম্বর আহরণের আশায় ইঁটকাঠের অরণ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে অমন দুরূহ তপস্যায় মগ্ন থাকতে পারতে না। তোমার এই তপস্যাটা কী হাস্যকরই আজ লাগছে আমার কাছে! আকাঙ্ক্ষার পরিধি কতো ছোটো হয়ে গেছে আমাদের, ভাবলে তোমার বিস্ময় লাগে না কস্তুরী?

পড়ে হাসছো?

কিন্তু সত্যি বলছি, কেন জানি না, রোজ রাত হলেই এই অদ্ভুত কল্পনায় যেন পেয়ে বসে আমাকে। কী হাস্যকর লাগে নিজেদেরকে!...কী তুচ্ছ লাগে দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের সহস্র খুঁটিনাটি!...

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গেলো এখানে—চিঠিতে খুলে লেখবার উপায় নেই। দেখা হলে বলবো। আমার মনে হয়, হয়তো এ সমস্ত সেই ঘটনারই প্রতিক্রিয়া। সত্যকার একটা পরীক্ষা না এলে—"

প্যাডটা উল্টেপাল্টে দেখে কস্তুরী। নাঃ, আর কোথাও কিছু লেখা নেই। নিশ্চয় রাত্রে লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কবি, তারপর ভোর না হ'তেই ছুটেছেন চাকরী বজায় রাখবার কঠোর তপস্যায়।

মৃদু একটু হাসি ফুটে ওঠে কস্তুরীর ঠোঁটের কোণে।

আহা বেচারা! ও কি জানতো সাড়ে তিনশো মাইল দূর থেকে হঠাৎ এসে পড়ে কস্তুরী ওর কাব্যির ওপর হানা দেবে?...নিশ্চয় আবার আজ রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে দু'চারটে সিগারেট ধ্বংস করে নিয়ে মৌজ করে বসে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করতো কথার জাল বুনে বুনে।

মধুর রসের প্লাবন বইয়ে ফেলেও কস্তুরীকে ভাসিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই বোধহয় এবারে অদ্ভুত রসের আমদানী করতে সুরু করেছে প্রদীপ!

'অরণ্য মর্মরের সত্য ইতিহাস'!

রৌদ্রদগ্ধ বহিঃপ্রকৃতির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আর একবার হেসে ওঠে কস্তুরী। আহা বেচারা রে! শক্তিসামর্থ্যওয়ালা এতোখানি লম্বাচওড়া পুরুষ জাতটাকে 'বিরহ' জিনিসটা কী কাবুই না করে ফেলে!.....তা' নয়তো সমস্ত দিন খেটেপিটে এসে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কিনা মাঝরাত্রে জানলা খুলে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বঞ্চিত আত্মাদের অতৃপ্ত হাহাকার শুনতে বসেন!

মাথা খারাপ! কিন্তু "ঘটে যাওয়া ঘটনাটা" কি?

প্যাড্‌টা চাপা দিয়ে রেখে ভ্যানিটিব্যাগটা লুফতে লুফতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে কস্তুরী। বাচ্চা চাকরটাকে ডাক দিয়ে প্রশ্ন করে— ওহে বীরভদ্র, তোমার 'সাহেব' কখন ফিরবেন জানো?

পাহাড়ী ছেলেটার ভাগ্যে এমন একটি গরীয়সী প্রশ্নকারিণী কখনো জুটেছে কি না সন্দেহ। তবে সে বিগলিত কৃতার্থে একগাল হেসে ভাঙা বাঙলায় যা বলে সেটা কস্তুরীর পক্ষে খুব হৃদয়গ্রাহী হয় না। সন্ধ্যার আগে প্রদীপের ফেরবার কোন আশাই নেই নাকি।

আর এখন সবে বেলা এগারোটা।

অর্থাৎ কমপক্ষে এখনো ঘণ্টা সাতেক একা থাকতে হবে কস্তুরীকে! ট্রেনে এলে এইটি হতো না। যথারীতি খবর দিয়ে বেরিয়ে, অধীর আগ্রহে স্টেশনে অপেক্ষমান প্রদীপের কাছে এসে নেমে পড়তে পারলেই হয়ে যেতো। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে দিশেহারা প্রদীপের সেই চেহারা কল্পনা করতে পারছে কস্তুরী।

তা নিজেই বা সে কি কম কবিত্বটা করে বসেছে? যেই ইচ্ছে হলো আকাশে উড়ে চলে এলো! হঠাৎ এসে পড়ার মজাটাই মনে রেখেছে, অসুবিধেটা ভেবে দেখেনি তো!

এতোক্ষণ কি করবে সে? স্নান আহার সেরে নিয়ে দিব্যি নিটোল একটি ঘুম দেবে?

আরে ছিঃ, অসম্ভব!

তবে?

জুতোর চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে বনের ধারে ধারে?

উঁহু, রক্ষে করো বাবা!

তা' হলে?

প্রদীপের ঘরসংসার তচ্নচ্ করে নতুন করে গোছাতে বসবে? 'পুঁথিগতপ্রাণা' হলেও কস্তুরী যে গৃহিণীপনার অযোগ্য নয়, একথা প্রমাণ করে দেবে প্রদীপের কাছে?...থাকগে যাক, কে অকারণ অতো খাটে! সংসার করতে যখন আসবে, দেখিয়ে দেবে একেবারে।...তবে কি ওর খাতাপত্র বই কাগজ তল্লাস করবে বসে বসে? আরো কি কি উদ্ভট পাগলামীর নমুনা সংগ্রহ করতে পারা যায় তাই দেখতে?

দূর! মজুরী পোষাবে না!

সব থেকে ভালো, যতো ইচ্ছে আলিস্যি করে স্নানাহারপর্ব সেরে এই চাকরটার সঙ্গে গল্প জমানো।...হোক না বালক মাত্র, তবু কৃতার্থ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। শিথিল ভঙ্গীতে খোঁপাটা খুলতে খুলতে ভ্রূভঙ্গী করে বলে—এই হাঁদারাম, তোর সাহেবের ঘরবাড়ী সব তো এক কথায় আমার হাতে ছেড়ে দিলি, বল দিকিন আমি কে?

'হাঁদারাম' ঘাড় হেলিয়ে বলল—জানি, মেমসাহেব!

—চমৎকার! কে তোকে বললো শুনি?

—কেউ বললো না। আমি বুঝছি।

—বেশ করেছো। যাও এখন চানের জল দাও দিকি? হুঁ, তা'পর তোদের এখানে কিছু খেতেটেতে পাওয়া যাবে তো?

—খুব !—যতোটা সম্ভব ঘাড় হেলিয়ে জবাব দেয় নানকু।

ভারী আশ্বাসের সুর ছেলেটার কণ্ঠে।

কস্তুরী হেসে ফেলে বলে—শুনে বাঁচলাম। তা' কি খেতে দিবি, একেবারে জেনেই প্রাণ শীতল করে যাই। কি আছে তোদের ভাঁড়ারে?

কথার সুখেই কথা কওয়া। খুসির পাত্র উপ্‌চে পড়লে এমনই হয় বোধ হয়। পাহাড়ী ছেলেটা কস্তুরীর কৌতুক-কথার অর্থ বুঝুক না বুঝুক, তবু উপযুক্ত শ্রোতার অভাবে ওর সামনেই নিজেকে ঝলসে তুলবে কস্তুরী।...গানের সুরের মতো হেসে উঠবে অকারণ, গেয়ে উঠবে এক লাইন গান। কথা বলবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

প্রদীপ অনুপস্থিত। তবু সারাবাড়ীতে তো তার উপস্থিতির বাতাস বইছে! এ বাড়ি কস্তুরীর, এ সংসারের ওপর যথেচ্ছ কর্ত্রীদের দাবী কস্তুরীর, ভাবতে কী অপূর্ব রোমাঞ্চ!

সত্যি! বইখাতা নিয়ে তখন চলে এলেই হতো প্রদীপের সঙ্গে।... নাই বা অনার্স নিতো, নাই বা হতো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

কী লাভ হবে তাতে? কী ক্ষতি হতো এম-এট্রা যদি নাই দিতো? প্রদীপ 'বেচারা', না কস্তুরী নিজেই 'বেচারী'?

খোলাচুল আঙুলে জড়াতে জড়াতে কস্তুরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে—কই বল শুনি?

ছেলেটা মহোৎসাহে জানায়—চালডাল আলু পিঁয়াজ ডিম মাখন ঘি আটা—কোনো বস্তুরই অভাব নেই সাহেবের ভাঁড়ারে। তবে যদি মেমসাহেবের মুরগীর মাংস খাবার বাসনা থাকে, কিঞ্চিৎ সবুর করতে হবে।...অবিশ্যি বেশী নয়, ছুটে গিয়ে ওই বনের ধারে মনিহারীর বৌকে খবর দিয়ে আসতে যা দেরী।

—মনিহারীর বৌ? সে আবার কে?

সাধারণ কৌতূহলে প্রশ্ন করে কস্তুরী। কিন্তু উত্তর শুনে কৌতূহল আর সাধারণ থাকে না, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

মনিহারীর বৌ!

সেই যে মনিহারী, সাহেবের 'টুরে' বেরোনোর সময় তল্পী বইতো, সাহেবের গাড়ী আর বন্দুক সাফ্ করতো, যে মারা পড়লো সাহেবেরই সেই বন্দুকের গুলিতে! তারই বৌ!...সাহেবের প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের কাছে মিছে কথা বলেছে বলে ওর আত্মীয়-কুটুমেরা ওকে একঘরে করে দিয়েছে কিনা।...ওই বনের মধ্যে একটা চালা তুলে নিয়ে একলা থাকে সে এখন—মুরগী পোষে, ডিম বেচে, বেতের চুপড়ি বোনে।

তা'কে একবার খবর দিতে পারলেই কস্তুরীর বাসনা পূর্ণ হয়।... এমন কি ও এসে মাংস রান্না করে দিয়ে যেতেও পারে পর্যন্ত। খুব ভালো রাঁধে ও। কতোদিন রান্না মাংস চুপি চুপি রেখে যায় সাহেবের জন্যে, সাহেব না জেনে তারিফ করেন এই আনাড়ি ভূত নানকুকে।

আঙুলের আগায় খোলাচুলের গোছা এঁটে এঁটে বসেছে, লাল হয়ে উঠেছে আঙুলের ডগা।... কিন্তু মুখটা? মুখটা অমন লাল হয়ে উঠেছে কেন কস্তুরীর? অদৃশ্য কোন রজ্জুতে কেউ ওর কণ্ঠনালীটা কি জড়িয়ে জড়িয়ে পাক দিচ্ছে? ও বসে পড়েছে—উঠোনে পড়ে থাকা তেলচিটে খাটিয়াটার ওপর! ধুলোয় লুটোচ্ছে দামী শাড়ীর ঝক্‌ঝকে আঁচলটা।...এই তবে 'ঘটনা'?

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বরকে এইটুকু মুক্তি দিতে পারে কস্তুরী—ও—ওই মনিহারী গুলি খেলো কেন?

ছেলেটা অকপট সরলতায় ব্যক্ত করে, যদিও অপরের কাছে বলতে মানা কিন্তু কস্তুরী যখন নিতান্তই সাহেবের নিজের মেমসাহেব, তখন বলতে বাধা নেই। পুলিশ জানে বটে বন্দুক সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ ভুলক্রমে গুলি ছুটে মারা গেছে মনিহারী, ওর বৌও বলেছে সেই কথা পুলিশের কাছে! কিন্তু আসল কথা তা নয়! রাতের অন্ধকারে সাহেব ওর চোখ দেখে বনবিড়াল ভেবে ভয় খেয়ে গুলি করেছেন।

—ভয়? কিসের ভয়! মানুষকে বনবিড়াল ভাববার মানে?

আর্ত চীৎকার করে ওঠে কস্তুরী।

ছেলেটা হতাশভাবে দুইহাত উল্টে বলে—কি জানি মেমসাহেব! ও পাগলাটা কেন যে রাতভোর জেগে জেগে সাহেবের জানলায় চোখ রেখে ঘর পাহারা দিতো কে জানে! ওর চোখ দুটো ছিলো ঠিক বনবিড়ালের মতো। রাতে আগুনের মতো জ্বলতো।...ঘুমের ঘোরে উঠে সাহেব হঠাৎ ভয় খেয়ে—

ধীরে ধীরে ধাতস্থ হচ্ছে কস্তুরী।

গম্ভীরভাবে বলে—তা' ওর বৌ পুলিশের কাছে মিছে কথা বলতে গেলো কেন?

ছেলেটা যেন কস্তুরীর অজ্ঞতায় অবাক হয়ে যায়। নিজে নিতান্ত বিজ্ঞের মতো বলে—না বললে সাহেবের নামে কেস্‌ হতো না?

—হতোই বা! উদ্ধত স্বরে বলে কস্তুরী—সাহেবের ফাঁসী হলে ওর কি লোকসান ছিলো? ওর নিজের স্বামী খুন হয়ে গেলো—

ছেলেটা নিজের ঠোঁটের উপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে কণ্ঠস্বর খাটো করবার ইঙ্গিত জানায় কস্তুরীকে। চুপি চুপি প্রতিপ্রশ্ন করে—সাহেবের ফাঁসি হলে ওর আদমী বেঁচে উঠতো?

এতবড়ো মহৎ প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মানুষের কাছে থাকে না। কিন্তু কস্তুরী কেন সেই মহানুভব নারীর কাছে কৃতজ্ঞ হচ্ছে না? যার একটিমাত্র কথায় ফাঁসি হয়ে যেতে পারতো কস্তুরীর স্বামীর! সে সুযোগ গ্রহণ না করে যে নিজের স্বামীহন্তার প্রাণরক্ষা করেছে!

বরং আরো রুক্ষ আরো ক্রুদ্ধ স্বরে মন্তব্য করে বসে কস্তুরী—নাই বা বাঁচলো—মানুষ খুন করলে ফাঁসি হওয়াই তো উচিত!

পাহাড়ী ছেলেটা চমকে মুখ তুলে এক নিমেষ তাকিয়ে থাকে কস্তুরীর মুখের দিকে। তারপর গম্ভীরভাবে বলে চলে যায়—গোসলখানায় জল দিচ্ছি।

সাতঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, বেলা তিনটের মধ্যেই এসে পড়ে প্রদীপ। এরোড্রোমের এক ছোকরা কর্মচারী কী সূত্রে যেন চিনতো কস্তুরীকে, সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবর দিয়েছে

প্রদীপকে।

ছুটে এসেছে গাড়ীখানার 'হাওয়া গাড়ী' নাম সার্থক ক'রে। ছুটে এসেছে বিস্ময় আনন্দ আর উৎসাহে জ্বল-জ্বল করতে করতে। নাঃ, নিজেকে আর আটকে রাখতে রাজী নয় সে, ছোকরা চাকরটার সামনেই কস্তুরীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আর কি!

কিন্তু আশ্চর্য!

কস্তুরী কী কঠিন আর কী নিরুত্তাপ!

জমাট কঠিন হিমশীতল একখণ্ড বরফ স্বামীকে উপহার দেবে বলেই কি এই হিমপাহাড়ের দেশে ছুটে এসেছে কস্তুরী? রোদপড়া বরফের মতোই কী ভয়ানক ঝকঝক করছে ওর সাদা উজ্জ্বল চোখ দুটো!

—কি হলো কস্তুরী? শরীর খারাপ লাগছে?

—শরীর? হেসে ওঠে কস্তুরী—আশ্চর্য রকমের ভালো লাগছে। পাহাড়ে হাওয়ায় এখুনি খিদে বেড়ে যাচ্ছে!

প্রদীপ ব্যথিত স্বরে বলে—এলে যদি তো অমন দূরে কেন কস্তুরী? কী অদ্ভুত লাগছে তোমাকে! 'তুমি' বলে যেন চেনাই যাচ্ছে না!

কস্তুরী আর একবার হাসির ঝিলিক দিয়ে ওঠে—রাত জেগে 'ক্ষুদিত আত্মা'র নিশ্বাস শুনে শুনে তোমার পার্থিব দৃষ্টিটা কিছু খাটো হয়ে গেছে বোধহয়।

—ওঃ! তুমি আমার চিঠিটা পড়েছো বুঝি?...চমকে ওঠে প্রদীপ।...ও সব আমার অর্থহীন পাগলামী! দেখলে কেন? লিখেছিলাম তোমাকে, কিন্তু পাঠাতাম না। তুমি এসেই সব দেখে ফেললে?

—অন্যায় হয়ে গেছে, না?

কস্তুরী বাঁকা কটাক্ষে বলে—হঠাৎ বড়ো অসুবিধেয় পড়ে যেতে হলো, কেমন? যাক্ কালই ফিরছি, বেশী অসুবিধে বাড়াবো না।

ব্যাকুল প্রদীপ এ রহস্যের মীমাংসা করতে পারে না।

এমন হঠাৎ এসে পড়লো কেন কস্তুরী? এসেছে যদি তো এমন দূরত্বের আবরণে ঘিরে রেখেছে কেন নিজেকে? কেন ওর স্বভাবসিদ্ধ প্রগল্‌ভতায় বেপরোয়াভাবে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঝুলে পড়ে বলছে না—'কী মজা করলাম বলো তো? কেমন জব্দ! চিঠি না দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে আর?'

যাক গে। এখন আর রহস্যভেদের চেষ্টা করে লাভ নেই।

রাত্রিটা তো হাতে আছে—সমস্ত দ্বন্দ্ব সমস্ত বাধা, যতো কিছু অভিমান আর ভুল বোঝার মধুর পরিসমাপ্তির আশ্বাস নিয়ে! এখন চলুক সাধারণ আতিথ্যের পালা।

তা' সেটা উভয় পক্ষেই চলে। ভদ্রতা আর সৌজন্যের কে কতো নিখুঁৎ অভিনয় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে যেন।...চা খাওয়া সারা হতে বেলা পড়ে যায়।

প্রদীপ বলে—চলো কস্তুরী, বেড়িয়ে আসা যাক একটু।

—বেড়াতে? কোথায়?

—বনে জঙ্গলে যেখানে তোমার খুসি। আজ সব তোমার ইচ্ছেয়—

কস্তুরী তীক্ষ্ণ হেসে বলে ওঠে—বনের পথটা তোমাকে ভীষণভাবে টানে, তাই না?

প্রদীপ একটু থতমত খেয়ে ওর দিকে তাকায়, তারপর অবাক হয়ে বলে—ঠিক বলেছো কস্তুরী! সত্যিই অরণ্য যেন অবিরত আমাকে আকর্ষণ করতে থাকে। কেন বলো তো?...নিজেই বুঝতে পারি না আমি কেন এমন হয়। কতোদিন মাঝরাতে ইচ্ছে করে, বেরিয়ে পড়ে দেখি কি রহস্য লুকোনো আছে ওখানে! কেন কিছুতেই ওকে ভুলে থাকতে পারি না আমি! তুমি বলতে পারো কস্তুরী, কেন এমন হয়?

—পারি। গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় কস্তুরী—বুনো পাহাড়ী মেয়েরা অনেক কিছু মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক জানে।

—এর মানে? এ আবার কি একটা যা খুসি উত্তর হলো? ওকথা বললে যে—

—বললাম এমনি। চলো চলো। দেখে আসি—তোমাব অরণ্যের আত্মাকে।

—দূরছাই! প্রদীপ চেষ্টাকৃত লঘুস্বরে বলে—কি দুপাতা ছাইপাঁশ বাজে কথা লিখে রেখে তোমার মাথাটাকেই বিগড়ে দিয়েছি দেখছি!

বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়।

কৃষ্ণপক্ষের মৃদু জ্যোৎস্না গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও হালকা কোথাও ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।....পায়ের চাপে চাপে শব্দ উঠেছে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার।

আগে কিছু কিছু কথা হচ্ছিল, ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে গেছে। নির্বাক দুটি প্রাণী যেন কোনো অমোঘ বন্ধনে বন্দী হয়ে যন্ত্রের মতো চলেছে পাশাপাশি।...

হঠাৎ এক সময় মৃদু একটু হেসে কস্তুরী বলে ওঠে—দেখো অরণ্যের জটিলতায় পথ হারিয়ে ফেলবে না তো?

প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু চুপ করে থেকে স্থির স্বরে বলে—বোধ করি অমনি কোনো সন্দেহ তোমার পথকে জটিল করে তুলছে কস্তুরী। কিন্তু নিশ্চিত থেকো, আমার পথ হারাবে না। আমার ধ্রুবতারা আছে।

—কই? কোথায়?

একটু দুর্বল আর ফ্যাকাসে শোনায় কস্তুরীর গলা।

—বাঃ, বলে খেলো হবো কেন? সে হলো নিজের জিনিষ।

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কস্তুরী। সভয়ে বলে—বনের ভেতর ওখানে আলো কিসের?

—আলো নয়, আগুন। শুকনো পাতা জ্বেলে ভাত রাঁধছে...ওকি ওকি, পাথর ছুঁড়ছো কেন?...কী সর্বনাশ!—হঠাৎ একি—

পথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া ভারী পাথরের টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে কস্তুরী প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—দেখতে পাচ্ছো না! ওখানে কি যেন একটা বুনো জানোয়ার বসে রয়েছে?

—কী ভয়ানক! ও যে মনিহারীর বৌ! ওই তো পাতা জ্বেলে ভাত রাঁধছে। কিম্ভুত মতো বিশ্রী জোব্বাজাব্বা পরে আছে বলে ওই রকম দেখাচ্ছে। ওর গল্প করবো তোমার কাছে।...এখন বলছো জানোয়ার, শুনে বলবে দেবতা।....ও আমার প্রাণদাত্রী, তা জানো? আচ্ছা—এখন পরিচয় করিয়ে দিই, পরে সব বলবো!...ওরে এই বৌ! এ—মনিয়ার বৌ রে—

পায়ে পায়ে দু'জনেই বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে গেছে ততক্ষণে।

সাড়া পেয়ে আগুনের কাছ থেকে উঠে আসে মানুষটা। উঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কথার উত্তর দেয় না, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মানুষের দিকে।...

গাছের সারি এখানে পাতলা, জ্যোৎস্না যেন খানিকটা হাঁফ ফেলে বেঁচেছে। সেই মৃদু জ্যোৎস্নায় সামনাসামনি স্থির হয়ে থাকে দু'জোড়া চোখ।

খুব স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।...অস্পষ্ট হয়ে গেছে শিফন শাড়ী, ওমেগা ঘড়ি, জয়পুরী কঙ্কণ আর শান্তিনিকেতনী বটুয়া...অস্পষ্ট হয়ে গেছে বহু ব্যবহৃত ঘাগরার গায়ে বেরঙা ছিটের তালি, দড়াদড়া সেলাই! অস্পষ্ট হয়ে আছে সমস্ত পরিবেশ!

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শুধু দু'জোড়া চোখ।

কি আছে সে চোখে?

প্রভুপত্নীর প্রতি সসম্ভ্রম সমীহ?

স্বামীব প্রাণদাত্রীর প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা?

না। সে চোখে আছে শুধু আদিম অরণ্যেব নিবিড় ছায়া, অথবা ছায়া নয় আগুন। আগুন যারা জ্বালাতে জানতো না সেই গুহাবাসিনী আদিম প্রপিতামহীদের চোখে যে আগুন ঝিলিক্ মারতো সেই আগুন!

পরিবেশটা সহনীয করে তুলতে প্রদীপ বুঝি বলতে চেষ্টা কবে—'কি বে, রান্না করছিস?' কিন্তু গলা দিয়ে ওর স্বর ফোটে না। যেমন এসেছিলো তেমনি ফিরে যায় মনিহারীর বৌ, শুধু অবহেলার একটা সেলাম জানিয়ে।

ফেরার পথে হালকা ভঙ্গীতে কস্তুরী বলে—উঃ, কী ভয়ানক চোখ দুটো ওর! যেন জ্বলছিল! ভাগ্যিস তোমার বন্দুকটা সঙ্গে ছিলো না! থাকলো—হয়তো বা বনবিড়াল ভেবে গুলি করে বসতাম!

চমকে ওঠে প্রদীপ।...কে বললো ওকে?

মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে যায় ওর কাছে। ওঃ, তাই! তাই এই ভাবান্তর কস্তুরীর! কিন্তু বেশ স্থির কৌতুকের ভঙ্গীতেই বলে—তবু ওর বাঁচাটা নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে, নইলে অস্ত্রের অভাব তো ছিলো না কস্তুরী! আদিম পৃথিবী সেই আদিম বর্বর যুগ থেকে এই সভ্যভব্য আণবিক যুগ পর্যন্ত মানুষের হাতেব কাছে পাথরেব টুকরোর যোগান ঠিকই রেখেছে!... প্রস্তরযুগ শেষ হয়ে গেছে বলে যে সে অস্ত্রে কাজ হয় না, তা তো নয়?

[১৩৫৪]

অনুপমার ঘর

অনুপমার বয়সটা যদি পঞ্চাশ-বাহান্ন ধরিয়া লওয়া যায়, তবে নববধূর ভূমিকায় অনুপমাকে দেখিতে চাহিলে আপনার দৃষ্টির সীমানাকে বছর চল্লিশ পিছাইয়া দিতে হয়।

যবনিকা উত্তোলন করিতেই চোখে পড়িবে নবদম্পতির শয়নকক্ষের দৃশ্য। না না, অত কুণ্ঠিত

হইবার কিছু নাই, বাপের বাড়িতে পুতুল খেলনাগুলো ফেলিয়া আসার শোকে এই কিছুক্ষণ আগেও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছে অনুপমা।

ঘটনাটা ঘর-বসতের দিনের।

'দিন' নয়, রাত্রির।

অষ্টাহের স্মৃতিটা তো ছায়ামাত্র। কতকগুলা এলোমেলো মানুষের ভিড় আর অর্থহীন গোলমাল ছাড়া আর-কিছুই মনে পড়ে না হীরালালের, তাই উৎসুক আগ্রহে এক বৎসর যাবৎ এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে সে। হীরালালের বয়সটাও মারাত্মক নয়! তবে কৌতূহল বলিয়া একটা কথা আছে তো। সেই বয়সটা হইয়াছে।

বছর না ঘুরিতেই 'ধুলোপায়ে ঘর-বসতে'র প্রথা তখনও বিশেষ চালু হয় নাই। হীরালালদের খুঁতখুঁতে বাড়িতে আবার দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। শ্বশুর-বাড়ি নিমন্ত্রণ যাওয়া অবধি বেআইনি।

বিবাহের কনে বদল করিয়া ঘর-বসতে অন্য মেয়ে চালান দিলেও হীরালাল ধরিতে পারিত কি না সন্দেহ। কাজেই আপাতত হীরালালের কাছে বউ সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু এমন স্মরণীয় রাত্রে বউ যে ব্যবহারটা করিয়া বসিল সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

আশা-আনন্দ-শঙ্কা-ভয়-মিশ্রিত অনাস্বাদিত হৃদয়াবেগের ভারে তরুণ হীরালাল যখন কথা বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না, তখন নিতান্ত বালিকা অনুপমা ঘোমটা নামাইয়া পাকা গিন্নীর ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, তোমাদের বাড়িটা কী বিচ্ছিরি, মা গোঃ! একখানা বাড়িতে গাদাগাদি করে পঞ্চাশটা লোক! দেখলে যেন প্রাণ হাঁফিয়ে আসে, উঃ! আমি কিন্তু বাবু আগে থাকতে বলে রাখছি 'ভেন্ন' হব।

দৃশ্যতঃ হীরালাল যেমন বসিয়া ছিল তেমনি 'কাঠ মারিয়া' বসিয়া থাকিল বটে, কিন্তু তাহার নিজের মনে হইল, কে যেন তাকে তুলিয়া ধরিযা সশব্দে আছাড় মারিয়াছে।

ঘর-বসতের কনের মুখে এই কথা!

বাহিরে 'আড়ি-পাতুনী'দের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া শুদ্ধ বাংলায়—'সর্বাঙ্গ ডোল' হইয়া উঠিল হীরালালের। অথচ সে বেচারা সম্বিত ফিরিয়া পাইবার আগেই নূতন বউ তাহার সম্পূর্ণ মতামত ব্যক্ত করিয়া ফেলিল, ছোট্ট একটি নিরিবিলি বাড়িতে নিজের ইচ্ছেমতন সাজালাম গোছালাম, ফিটফাট থাকল—তা নয়, এ যেন বারো মাসই রথদোলের হুল্লোড়!

হীরালাল পূর্ব-পরিকল্পিত সমস্ত কাব্যিক ভাষা ভুলিয়া বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, তুমি তো মোটে আজ একদিন এসেছ, বারো মাসের খবর জানলে কী করে?

জানব না কেন? বড় সংসার দেখতে তো আর বাকী নেই! আমার নিজের মামার বাড়িই তো দেখেছি। কিছু যদি সভ্যতা-ভব্যতা আছে কারুর! দিনরাত্তির খালি গরুর মতন খাচ্ছে আর রাঁধছে, রাঁধছে আর খাচ্ছে।

নববধূর ভাষা-মাধুর্যে চমৎকৃত হীরালাল হতাশ ভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিয়া বলে, গরুরা অবশ্য গরুর মতই খায় বটে, তবে রাঁধেও নাকি? কই, শুনি নি তো কখনও? তোমার মামার বাড়ির দেশে বুঝি—

ওই হল।—অনুপমা এইবার একটি অনুপম হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, গরুর মতন না হয় ভূতের মতন। না, তাও হয়তো বলবে 'ভূতেরা রাঁধে, কই শুনি নি তো?'—হি-হি-হি! কিন্তু সত্যি সত্যি, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, নিজের একখানি আলাদা বাড়ি থাকবে, এমনি বিয়ে হওয়া আমার বরাবরের সাধ। তা ভগবান দেখছি আমার ভাগ্যে ঠিক উল্টোটি লিখে

বসে আছেন, এখন আলাদা হওয়া ছাড়া উপায়?

নিরুপায়ের ভঙ্গিতে দুই হাত উল্টায় অনুপমা।

মামার বাড়িটা যতই অরুচির হোক, এই বয়সে এমন রুচিসম্মত বাক্যবিন্যাস প্রণালীটা যে অনুপমা মাতুলালয়ের সূত্রেই পাইয়াছে সে বিষয়ে আর ভুল নাই।

এই ইঁচড়েপক্ক বউটিকে লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনটা কিরূপ হইবে অতদূর ভবিয়া উঠিতে পারে না হীরালাল, শুধু বাহিরের তীক্ষ্ণ কানগুলির কথা স্মরণ করিতে করিতে বারে বারে কণ্টকিত হইতে থাকে।

গোড়া-পত্তনটা এই।

বারো বছরের অনুপমা নিজস্ব একটি ছোট্ট সংসার আর ছবির মত একখানি বাড়ির স্বপ্ন লইয়া শ্বশুরঘর করিতে আসিল। আর আঠারো বছরের হীরালাল এযাবৎ পাঠ্য-অপাঠ্য যত কিছু বই হইতে যা কিছু কাব্যরস সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত শিকায় তুলিয়া রাখিয়া কিশোরী প্রিয়ার কাছ হইতে অভিনব জ্ঞান সঞ্চয় করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, উক্ত 'ঘর-বসতে'র পরদিন নূতন বউয়ের নামে 'টি-টি'ক্কার পড়িয়া গিয়াছিল। আড়ি পাতিবার জন্য যাহারা শীতের রাত্রে নিউমোনিয়ার আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া ঘণ্টা দুই-তিন জানালার বাহিরে কান পাতিয়া খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে, আর যাই হোক, এতটা আশা করে নাই তাহারা। নববধূ কান্নাকাটির পরিবর্তে বড়জোর 'বাচাল' বা 'বেহায়া' নাম কিনিবার উপযুক্ত আচরণ করিতে পারে, কিন্তু কখনও কাহাকেও 'ভেন্ন' হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে শোনা যায় নাই। আড়ি-পাতুনীদের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।

নূতন ডুরেশাড়ি, মল আর নোলক পরা টুকটুকে বউটি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যাইবার কথা। কিন্তু সকালবেলা বউ দোতলা হইতে নামিয়া আসামাত্র আপাদমস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল শাশুড়ী ঠাকুরানীর। অর্থাৎ রাতারাতিই দূত মারফত বউয়ের গুণাগুণ জানিয়া ফেলার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহার, বোঝা গেল।

আপন মনে নীচে নামিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটার বহর বাড়াইয়া দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল অনুপমা।

শাশুড়ী ত্রিপুরাসুন্দরী একটা ছুতা পাইলেন যেন। মুখখানা যতটা বিকৃত করা সম্ভব করিয়া মুখঝামটা দিয়া উঠিলেন, আহা, মরে যাই, আমায় দেখে আবার ঘোমটা! তবু যদি না ঘোমটার ভেতর খ্যামটা নাচ হত! সেই বলে না—'লাজে বউ খান্ খান্, ঘোমটার ভেতর ন্যাজা খান, এ যেন তাই। বলি, বাপের বাড়ি থেকে খুব শিক্ষে শিখে এসেছ তো বাছা!

দাদারও দাদা থাকেন, কাজেই শাশুড়ীরও শাশুড়ী থাকা অসম্ভব নয়, তবে খাঁটি শাশুড়ী নয়—খুড়শাশুড়ী। কাজেই শাসনকর্তা নন, বড়জোর কুটুস্‌কামড় করিতে পারেন। ত্রিপুরাসুন্দরীর খুড়শাশুড়ী মহেশ্বরী একটা রসালো ঘটনার আভাস পাইয়া পুলকিত চিত্তে বাহিরে আসিয়া কহিলেন, ও কী মেজবউমা, সক্কালবেলাই ছেলেমানুষকে ভয় খাইয়ে দিচ্ছ কেন বাছা? আহা যতই হোক, কচি শিশু, মা বাপ ছেড়ে—

কথা শেষ হইবার আগেই ত্রিপুরা ঝঙ্কার দিয়া উঠেন, থাক্ ছোটখুড়ি, তুমি আর ফোড়ন কেটো না, আমি বলে নিজের জ্বালায় জ্বলছি!...ছেলেমানুষ! কী আমার ছেলেমানুষ রে! ওই ছেলেমানুষ আমার হীরুকে এক হাটে বেচে আর-এক হাটে কিনবে তা দেখো। ওমা, বাবার জন্মে শুনি নি যে ঘর-বসতের বউ এসে বলে 'ভেন্ন হব'।

মহেশ্বরীও সে খবরটা না পাইয়াছেন এমন নয়, কিন্তু অজানার ভাব বজায় রাখিয়া বলেন, কী হবে? কী বলেছে?

ভেন্ন হবেন গো—বর নিয়ে আলাদা হবেন। শুনেছ এমন কথা?

ওমা, সে কী কথা!...হ্যাঁ গা নাতবউ, এসব কী কথা?

বেচারা অনুপমা হীরালালের সামনে যতই প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করুক, পুলিশ-কমিশনার আর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট উভয়কে একত্রে দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া ঠিক একই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে।

ত্রিপুরার উনানের আগুন বহিয়া যাইতেছে, দাঁড়াইয়া কথা শুনিবার সময় নাই, তাই জ্বলন্ত উনানের মতই মুখচ্ছবি করিয়া বলেন, বেঁচে থাকলে আরও কত শুনবে ছোটখুড়ি, এখনই হয়েছে কী? ওমা, আমি কোথায় যাব! ভাবছি, আর যেন জলবিছুটি দিচ্ছে গায়ে!

জলবিছুটির জ্বালাতেই ছটফট করিয়া বোধ করি তাড়াতাড়ি চলিয়া যান ত্রিপুরাসুন্দরী।

অতঃপর ননদ আর ভাজ, পিসশাশুড়ী আব জ্যাঠশাশুড়ী, ভাগ্নী আর ভাসুরঝির দল একে একে দুইয়ে দুইয়ে আসিয়া অনুপমাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ এবং সদুপদেশের তীক্ষ্ণ শরজালে জর্জরিত করিয়া যাইতে থাকে।...

এই বারো বৎসর বয়সে অনুপমা প্রথম টের পাইল যে, তাহার নিজের মনটা কত কুটিল, বুদ্ধিটা কত প্যাঁচালো আর স্বভাবটা কত নীচ। ছেলেবেলা হইতে এইরকম কথার বাঁধুনির জ্বালায় 'গিন্নীবুড়ী' 'পাকাবুড়ী' প্রভৃতি বিশেষণ বিলক্ষণ জুটিয়াছে তাহার—এ কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সে সব সম্বোধনের মধ্যে এমন তীব্র ঘৃণার ভাব তো ছিল না।

'ভেন্ন' হইবার কথাটা বলা যে নিতান্ত দোষণীয় হইয়াছে সে বিষয়ে অবশ্য আর সন্দেহ থাকে না অনুপমার, কিন্তু তবুও চিরকাল এই 'রাক্ষসপুরী'তে থাকিতে হইবে মনে করিয়াই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় তাহার।

এক্ষেত্রে আলাদা হইবার ইচ্ছাটাই মনে মনে বদ্ধমূল হওয়া ছাড়া উপায় কী? অদূরভবিষ্যতে না হোক, সুদূরভবিষ্যতেও একদিন কি সুযোগ মিলিবে না?

অতএব দিনের বেলায় যতই ভীত ত্রস্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠুক অনুপমা, রাত্রে হীরালালের কাছে নিজমূর্তি ধরিতে ছাড়ে না। নিত্য রাত্রেতো আর কেউ আড়ি পাতিতে আসিবেনা।

হীরালাল কখনও হাসে, কখনও বিব্রত হয়, কখনও বিরক্ত হইয়া বলে, তোমার মতন অদ্ভুত মেয়ে আমি কখনও দেখি নি, খালি 'একালষেঁড়েপনা'। একলা সংসার করার এত সাধ কেন? পাঁচজনের সংসারই তো ভাল।

অনুপমা ছলছল চোখে বলে, হ্যাঁ, ভাল তো কত! খালি একশো লোকের বকুনি খাও, আর দুশো লোকের মন যুগিয়ে চল! নিজের ইচ্ছেয় কিছুটি করবার জো নেই।

এখুনি আবার তোমার এত নিজের ইচ্ছে কিসের?—হীরালাল হাসিয়া ফেলে।

বাঃ ইচ্ছের আবার এখুনি-তখুনি কী? কোন কিছু ইচ্ছে করে না মানুষের? এই তো সেদিন পানের বাটাগুলো ময়লা হয়ে রয়েছে বলে পিসিমাকে বললাম—'পিসিমা, বাটার সাজগুলো মাজব, একটু তেঁতুল দিন না', পিসিমা অমনি বলে দিলেন—'তোমায় আর অত গিন্নীত্ব করতে হবে না বাছা, পান সাজছ পান সাজ।' আচ্ছা, আমি কী মন্দ কথা বলেছি?

বলা বাহুল্য, কোন তরুণ স্বামীরই এসব তুচ্ছ সাংসারিক কথায় কান দিতে ইচ্ছা হয় না, তা ছাড়া প্রতিকারের কোনো উপায়ই যখন হাতে নাই। কিন্তু কান দিতে হয় অপর এক কারণে। কারণ, দেওয়ালেরও যে কান আছে এ কথা অনুপমা না জানুক হীরালাল তো জানে। সেই

কথা বলিয়াই বধূকে সাবধান করিয়া দেয় সে।

অনেক অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে অনুপমারও সঞ্চয় হইয়াছে, তাই কিছুটা সাবধান হয় এবং মনে মনে এমন একখানি ঘরের ধ্যান করিতে থাকে যে ঘরের জানালা খুলিয়া রাখিয়াও স্বচ্ছন্দে শোওয়া যায়, গলা খুলিয়া দুইটা কথা কহা যায়।

হায়! তেমন একখানি ঘর কবে জুটিবে অনুপমার?

অনুপমা যদি নেহাত নীরস গদ্যকারের হাতে না পড়িয়া কবির হাতে পড়িত, তবে হয়তো 'পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা'র মত প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্ন হইতে পাইলেই ধন্য হইত, এবং নিরালা ঘর একখানি যদি কামনাও করিত—সে কেবল বাজে লোকের কৌতূহলী দৃষ্টিপাতের আশঙ্কায়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিতান্তই পনেরো বছরের মেয়ে অনুপমা প্রিয়তমেব দিকে পিঠ ফিরাইয়া শুইয়া মনে মনে একখানি নিরিবিলি ঘরের ধ্যান করিতে থাকে—এই সব ঘরগৃহস্থালীর কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে না পারার খেদে, ইচ্ছামত সাজাইতে গোছাইতে না পাওয়ার খেদে।

শুধুই তো মাত্র 'একখানি' নিরালা ঘর নয়—অনুপমার যে আরও অনেক কিছু চাই। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, ঠাকুরঘব, গোয়ালঘর—ঘর আর গৃহস্থালী।

মাটিব যে সাজানো খেলাঘরখানা ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে, সেই ঘরের জন্য হয়তো এখনও মন কেমন করে অনুপমার। তাই নিজের ছাঁচে গড়িয়া তুলিবাব জন্য চাই ঘরকন্না। সে ঘরে হীরালাল কেন্দ্র নয়, পরিজন মাত্র! অনুপমার সংসারটি গড়িয়া তুলিবার জন্য একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। বাস্, আর বেশী কিছু নয়। সে ঘর একান্তই অনুপমার। কিন্তু কোথায় সেই ঘর?

২

স্বভাববশে মাঝে মাঝে নিন্দামন্দা, টিকাটিপ্পনি করিলেও মহেশ্বরী দেবী লোক মন্দ নয়। অন্তত ভয়ঙ্কর নয়। ছোটঠাকুমার কাছে বেশ একটু প্রশ্রয় আছে অনুপমার। মাঝে মাঝে মুক্তির আস্বাদও পাওয়া যায় তাঁহার কৃপায়।

নিঃসন্তানা বালবিধবা মহেশ্বরীব সংসাবেব তিন ভাগ খাটুনি খাটিয়া দিযাও অনেক অবসর, কাজেই বাঁধা নিয়মে পাড়া-বেড়ানোটি চাই তাঁহার। মাঝে মাঝে তিনি অনুপমাকে সঙ্গী করেন। হয়তো পাড়ায় কাহারও ঘবে নূতন খোকা হইযাছে, কি কোনো মেয়ে শ্বশুবঘর হইতে আসিযাছে, অথবা কোনো কনেবউ শ্বশুরঘব কবিতে আসিয়াছে, এমনি সব সাধাবণ উপলক্ষ। তবু মহেশ্বরী অনুপমাকে দেখাইতে লইয়া যান।

বলা বাহুল্য ত্রিপুরাসুন্দরী এসব দুচক্ষে দেখিতে পাবেন না, 'বউমানুষ ঘট্ ঘট্ করিয়া পাড়া বেড়াইবে কী', কিন্তু খুড়শাশুড়ীকে নিষেধও করিতে পারেন না মুখের উপর। খুঁতখুঁত করেন, কাজের অজুহাত দেখান, কিন্তু সে সব মহেশ্বরীর উড়াইয়া দিতে দেরি হয় না। স্পষ্ট করিয়া তো আর ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে অনুমতি চাওয়া যায় না, যতই হোক মানমর্যাদা তো আছে তাঁহার। অথচ একেবারে না জানাইয়াও যাওয়া চলে না। তাই গলা তুলিয়া অনুপমাকেই ডাক দেন—অ নাতবউ, যাবে তো চল আমার সঙ্গে, বলেছিলাম না আমার বোনঝির বাড়ি দেখিয়ে আনব? এখানেই তার শ্বশুর বাড়ি। আজ সময় রয়েছে—

ঘরের ভিতর হইতে ত্রিপুরাসুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া মনে মনে বলেন, কবে যে তোমার সময় নেই তাও জানি নে। বউটাকে দিন দিন পাড়াবেড়ানী ধিঙ্গি করে তুলল গো, ছি ছি! এ যেন ইচ্ছে করে শত্তুরতাই সাধা। একে তো গুণের নিধি বউ আমার, তার ওপর আরও দজ্জাল হোক।

মনে মনে অনেক তীব্র তীক্ষ্ণ আর কটু মন্তব্য করিলেও বাহিরে কিছু আর বেশী বিরক্তি প্রকাশ করা ভাল দেখায় না, তাই ত্রিপুরাসুন্দরী নিতান্ত বিরস কণ্ঠে বলেন, তোমার বোনঝির বাড়ি বউমা আর গিয়ে কী করবে? চেনে না, জানে না।

মহেশ্বরী হাসিয়া ওঠেন: মেজবউমার এক কথা। দেখাসাক্ষাৎ হলে তবে তো চেনাজানা হবে। সুধার বড্ড সাধ বউমার সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে।

ত্রিপুরাসুন্দরী বিরক্তি গোপন করিতে অক্ষম হন, বলিয়া উঠেন, তা সেও তো একদিন বেড়াতে এলে পারে! বউমা বউমানুষ, নিত্যি ধেই ধেই করে এখানে ওখানে কী যাবে!

চটিয়া গিয়া কাজ নষ্ট করিবার লোক মহেশ্বরী নয়, তাই আরও একবার হাসিতে হয় তাঁহাকে: বলি সেও তো একটা মানুষের বাড়ির বউ— না কী? তবে হ্যাঁ, আসবে, সেও আসবে। সময় তো পায় না বাছা। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ, শাশুড়ী মাগী চোখে ভাল দেখতে পায় না, অথর্ব, কিছু করে না, সব ওই সুধা।...কই গো নাতবউ, তোমার সেই গোলাপী শেমিজ আর গঙ্গাজলী ডুরেখানা পরে এস। নতুন দেখবে ওরা। চুলটা তোমাদের যেমন ফ্যাশান-ট্যাসান কাটে কেটে নাও। যেমন-তেমন করে লোকের বাড়ি যাওয়া ভালবাসি না।

তা বাসবে কেন, বউ বিবি সেজে পথে পথে রূপ দেখিয়ে বেড়াবে!—অস্ফুট মন্তব্য করেন ত্রিপুরা।

হীরু এবার বাড়ি আসুক, যা হয একটা বিহিত তিনি করবেনই। ছোটখুড়ি যে বউটিকে বিগড়াইয়া দিবেন সেটা কিছু কাজেব কথা নয়। বাড়িতে আরও পাঁচটা বউ আছে, তাঁহাব নিজের নয় বটে, ভাসুরপো-বউ, ভাগ্নে-বউ ইত্যাদি—তাদের জন্য তো মাথাব্যথা নাই ছোটখুড়ির। বলিলে বলিবেন—ও ছুঁড়ীরা উদযাস্ত ব্যস্ত, কুচো-কাচা নেড়ি-গেঁড়ি নিযে কোথায় যাবে? এ বউটারও তো কই এখনো ছেলেপুলে হল না! পনরো-ষোল বছব বয়স হল, কম তো নয়, এ বছরটা দেখি, এব পর মাদুলি দিতে হবে একটা। কোলে কচি না হলে জব্দ হবে না বউ।

বউকে জব্দ করিবার অনেক ফিকির খুঁজিয়া বেড়ান ত্রিপুরাসুন্দরী। কিন্তু সুপারি কাটা, তেঁতুল ছাড়ানো, নারকেল কোরা, চাল ডাল বাছা প্রভৃতি কুঁড়ে কর্ম দিয়াও জব্দ করিতে পারেন না, চক্ষের নিমেষে কাজ শেষ করিয়া ফেলে অনুপমা।

বউ আবার অত চটপটেও ভাল নয়।

ত্রিপুরাসুন্দরী রাগে গস গস করিতে থাকিলেও গোলাপী সেমিজ আর গঙ্গাজলী ডুরে শাড়ি জড়াইয়া দিদিশাশুড়ীর পিছু পিছু টুপ করিয়া বাহির হইয়া যায় অনুপমা।

বেশ খানিকটা দূরে সুধার শ্বশুরবাড়ি।

বড় দীঘির ধার দিয়া যাইতে হয়, বেশ খোলামেলা জায়গাটা। চলিতে চলিতে উৎফুল্ল আনন্দে ঘোমটাটা ঈষৎ সরাইয়া অনুপমা ফিস ফিস করিয়া বলে, ছোটঠান্‌দি, এদিকটা তো দিব্যি। আমাদের বাড়িটা যেন ঘিঞ্জি এঁদো পড়া যায়গায়।

মহেশ্বরী বলেন, তা যা বলেছিস। সুধাদের এদিকটা বেশ।

আচ্ছা ঠান্‌দি, এত জমি পড়ে আছে—এসব কাদের?

এদিকটা মনসা ভট্‌চায্যির। আর ওই দীঘির ওপাড় থেকে চৌধুরীদের। যত দূর দিষ্টি যায় সব ওদের।

অনুপমা বিস্ফারিত চক্ষে যত দূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া বলে, হ্যাঁ ঠানদি, সব ওদের? এত জমি এমনি ফেলে রেখেছে?

তা কী করবে? এ সব তো ধান-জমি নয়। ফলের বাগান ছিল আগে, দেখাশোনার অভাবে সব মরে-হেজে গেছে। কেই বা আছে আর?

ঠান্‌দি!—অনুপমা অকারণ গোপনতায় আরও ফিস ফিস করিয়া বলে, এর থেকে একটুখানি জমি ওরা বিক্কিরি করতে পারে না?

তা কী জানি!—মহেশ্বরী হাসিয়া ওঠেন : কেন তুই কিনবি নাকি?

অনুপমা অপ্রস্তুত ভাবে বলে, বাঃ, আমি কেন? লোকে তো কিনে বাড়ি করতে পারে?

কার গরজ পড়েছে যে এই মাঠের মধ্যিখানে বাড়ি করতে আসবে?

কী যে বল ছোটঠান্‌দি, মাঠের মধ্যিখানে নয় তো পচা ডোবার ধারে বাড়ি করা বুঝি ভাল!

মহেশ্বরী আগাইয়া যান, অনুপমাকেও ব্যস্ত হইয়া সঙ্গ লইতে হয়, কিন্তু পিছন ফিরিয়া দীঘির পাড়ের উঁচু জমিটাব দিকে বাব বার লুব্ধ দৃষ্টি ফেলিতে থাকে। কতটা জমি লইলে একখানি ছোটখাট বাড়ি হয় সেই কথাটা জানিতে বার বার 'বলি বলি' করিয়াও বলিতে পারে না অনুপমা।

কতটুকু জমি? কত দাম? কত কাল লাগিবে অনুপমাব এই ছোট প্রশ্নটুকু করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে?

সুধাদের বাড়ি ঢুকিযাই অনুপমার মনে হইল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। ঠিক এমনি একখানি ছবির মত বাড়িই তাহার ধ্যানের স্বপ্ন নয় কি? ছোট্রখাট্র ধবধবে শান-বাঁধানো উঠান, শাদা পাথরে বাঁধানো সুগঠিত তুলসীমঞ্চ, উঁচু রোযাকের উপর পাশাপাশি দুইখানি ঘর! এদিকে—রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আর চাতাল। শোবার ঘরের দরজা-জানালায় পুরানো রঙিন শাড়ি কাটিয়া পর্দা লাগাইয়াছে সুধা, রোয়াকের উপর পাতিয়া রাখিয়াছে বেতের মোড়া আর নীচু টেবিল। অবশ্য টেবিল বলিলে তাহাকে একটু বাহুল্য গৌরব দেওয়া হয়, তবু চারখানা পায়া তো আছে! শাড়ির পাড় জুড়িয়া একটা ঢাকাও তো দিযাছে তাহাতে! পল্লীঅঞ্চলে এহেন শৌখিনতা দুর্লভ। বিশেষ তো তখনকার আমলে।

নিস্তব্ধ বাড়ি, মধ্যাহ্নকালটি যে বিশ্রামের কাল এটা বোধ করি অস্বীকার করে না এরা। অনুপমার শ্বশুরবাড়ির মত অহরহ হট্টগোল আর অবিশ্রাম কাজের বায়নাক্কা আর কাহাদের আছে, বাবাঃ!

মহেশ্বরী ঝাঁপের বেড়াটা ঠেলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ডাকেন, কই রে সুধা, ঘুমোচ্ছিস নাকি? এই দেখ্‌, কাকে ধরে এনেছি।

পর্দা সরাইয়া ঘরের ভিতর হইতে সুধা বাহির হইয়া আসে।

বাড়ির মতই ফিটফাট ছিমছাম মানুষটি। তবে আসন্ন সন্তানসম্ভাবনায় মন্থর। বয়সে অনুপমার চাইতে কিছু বড় হওয়াই সম্ভব।

এই বুঝি তোমার নতুন নাতবউ রাঙামাসী? ওমা, বেশ বউ তো। এসো ভাই।

সহজ হৃদ্যতায় অনুপমাকে ডাকিয়া লয় সুধা।

কই রে, বেয়ান কই? তোর শাশুড়ী?

তিনি ওই ঘরে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। অথর্ব মানুষ।

যাই, দেখি একবার বুড়ীকে, তোরা গল্পসল্প কর্। নাঃ, দোরে আবার ন্যাকড়ার পর্দা লাগিয়েছে, যত সব বিবিয়ানা! সরা দিকিন বাপু। বুড়ীর ঘরে আবার এসব কেন?

সুধা হাসিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া বলে, বুড়ীর ঘর বলে বাদ দিলে বাড়ির সৌষ্ঠব হবে কেন গো রাঙামাসী? এসব ভাল গো ভাল, আকাচা কাপড়ে ছুঁই না আমরা, উল্টে রাখি তখন।

মহেশ্বরী সরিয়া যাইতেই সুধা অনুপমার গালটা টিপিয়া দিয়া বলে, ইঃ, পাকা ডালিম! বর খুব ভালবাসে তো? কিছু মনে কোর না ভাই,যদিও তুমি মাসীমার নাতবউ, সম্পর্কে এক পৈঠে নীচে, তা হলেও সমবয়সীদের মধ্যে ওসব সম্পর্ক-টম্পর্ক বাছতে পারি নে বাপু।

অনুপমা হাসিয়া বলে, আমিও। আচ্ছা, তোমার শাশুরী তো অথর্ব মানুষ, একলাটি তোমার খুব কষ্ট, না?

সুধা একটু রহস্যময় হাসির সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, এক রকম কষ্ট, আবার এক রকম সুখ। মাথার ওপর কথা কইতে তো কেউ নেই। যা করব আমি। এই যে বাড়িঘব সব আমার পছন্দে, শ্বশুবের তো গেল্লায় একখানা ভাঙা ভিটে ছিল ওই ওদিকে তো—ভাঙাচোরা দেখতে পারি নে বাপু। হ্যাঁ, বনে গিয়ে সন্নিসি হও আলাদা কথা, তবে সংসার যদি করতে হয় সংসার করার মত কর।

অনুপমা ফিকে হাসি হাসিয়া বলে, বরটি তোমার কথা শোনেন, তবে না?

শুনবে না মানে? অমনি নাকি? নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ব না তা হলে? এই তো, দেখছ তো অবস্থা? আগে থেকে বলে দিয়েছি বেতের দোলা কিনে আনবে আর রঙিন মশারি, এই দালানে টাঙিয়ে দেব।

সোহাগে গর্বে টলটল করিতে থাকে সুধা।

গৌরব কবিবার মত ঐশ্বর্য থাকিলেই বোধ করি এত সহজ অমায়িক হইতে পারে মানুষ।

সুধাব উপর কেমন এক ধরনেব হিংসা হয় অনুপমার। মনে হয ওর কথাবার্তার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার, ওর আসন্নমাতৃত্বেব ভারে ভারাক্রান্ত শরীরটাও যেন নিজের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তেমন খোলা মনে আর কথা কহিতে পারে না অনুপমা, শুধু আড়ে আড়ে চাহিয়া সব দিক দেখিয়া লয।

বড় চৌকির উপর ফরসা ধবধবে বিছানা পাতা, ঝালর-দেওয়া বালিশ, মশারিতে রঙিন ঝালর। দেওয়ালেব গায়ে সারি সারি ছবি, গ্রুপ ফোটো, কালীঘাটের পট, একখানা মেলিন্স্ ফুডের খোকার ছবি। সেল্ফের উপর টেবিল-ল্যাম্প, কাচের পুতুল, আরশি চিরুনি, আর কত কী টুকিটাকি।

এ সব তো এবার থেকে সাবধান করতে হবে।—অনুপমা বাঁকা হাসির সঙ্গে অনাগত শিশুর দুরন্তপনার ইঙ্গিত করে।

ইস্, সাবধান করতে হবে বইকি। ছেলে ধরবার লোক রেখে না দিলে রক্ষে রাখব কিনা! তাছাড়া দোতলায় এবার ঘর তোলা হবে।

দোতলায়!—অনুপমা চকিত হইয়া বলে, আর ঘরের তোমাদের দরকার কী?

ওমা, শোন কথা। চিরকাল বুঝি নীচের তলায় পড়ে থাকতে ভাল লাগে? আমি তো বলে

দিয়েছি—এই যাচ্ছি বাপের বাড়ি, ছ মাস পরে আসব, এসে যেন দোতলায় শুই।

তোমার বর কী করেন ভাই?

উনি? কিছু না, ভেরেণ্ডা ভাজেন।—সুধা হাসিয়া ওঠে: আমি তো বলি 'কন্‌ট্রাক্টারি' করাও যা ভেরেণ্ডা ভাজাও তা। তবে হ্যাঁ, কাঁচা পয়সা আছে।

আঠারো বছরের সুধা কথা কয় যেন পাকা গিন্নীর মত।

বাচাল বলিয়া যে এত অখ্যাতি অনুপমার, সুধার কাছে যেন বোকা বনিয়া যায়।

খুব আন্তরিকভাবে না হইলেও গল্পসল্প হয় খানিকক্ষণ। এই বাড়ি করিতে কত খরচ হইয়াছে, দোতলা তুলিতে কত লাগিবে, পুরানো ট্রাঙ্কগুলার নতুন রঙ লাগাইয়া সত্যই নতুনের মত লাগে কি না, এত ছবির ফ্রেম কিনিতে কতগুলি টাকা খসিয়াছে সুধার বরের—এমনি সব নিরেট আলোচনা।

এর চাইতে উচ্চাঙ্গের আলোচনা চালাইবার মত বুদ্ধিবৃত্তি দুইজনের কাহারও নাই।

ফিরিবার পথে অনুপমা যেন কেমন গম্ভীর হইয়া পথ চলে। সংসারের চাপে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় যে বাসনাটা ভোঁতা হইয়া আসিতেছিল সেটা যেন নূতন করিয়া মাথা তোলে। সুধার কথাগুলা দেমাকে ভরা বটে কিন্তু খাঁটি, এটাও মিথ্যা নয়: 'সংসার যদি করিতে হয় সংসারের মতই করা ভাল।'

সুধার ঘর-সংসার গোছানো ফিটফাট বটে, কিন্তু অমন একখানি ছবির মত বাড়ি এমন হাতের মুঠার মধ্যে পাইলে অনুপমা যে আরও কত কী করিতে পারিত তা দেখাইয়া দিবার সুযোগ কবে জুটিবে অনুপমার!

বাড়ি! বাড়ি!

পনরো বছর বয়সের মেয়ে শাড়ি চায় না, গয়না চায় না, স্বামীর সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয় না, চায় কিনা বাড়ি! আশ্চর্য বটে! কিংবা হয়তো আশ্চর্যও নয়, বাড়ি মানে তো কেবলমাত্র একটা ইট-কাঠের সমষ্টি নয়, নিজেকে প্রকাশ করিবার একটা বিশাল ক্ষেত্র, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত মন্দির।

খানিকটা পথ চলিতেই মহেশ্বরী নাতবউয়ের আনমনা ভাব লক্ষ্য করেন, বাক্যবাগীশ অনুপমার হইল কী! বলেন, কী হল্‌-রে নাতবউ? কথা নেই কেন মুখে?

কই ঠান্‌দি, এই তো কথা কইছি। আচ্ছা ঠান্‌দি, 'কন্‌ট্রাক্টারি' করা মানে কী?

ওমা, মানে আবার কী, কাজ একরকম। এইতো সুধার বরই করে। এই ধর্‌, যেমন তোর বাড়ি হবে—সুবোধ কন্‌ট্রাক্ট নিলে, কেমন? সুবোধই মিস্তিরি খাটাবে, দেখাশোনা করবে। মালমসলা কিনবে, তোর কাছে সুধু নগদ দামটি নেবে,বাস্‌। তোর আর কোন ঝামেলা থাকল না। কন্‌ট্রাক্টারি করেই তো সুবোধের এত বাড়-বাড়ন্ত, কাঁচা পয়সা আছে কিনা, নইলে লেখাপড়া আর কী এমন জানে! নে, চল্‌ তাড়াতাড়ি, তোর শাশুড়ী আবার হাঁড়িমুখ করে বসে আছে হয়তো।

শাশুড়ী!

দপ করিয়া যেন সমস্ত আলো নিবিয়া যায়। হায়! সুধার শাশুড়ীর মত অথর্ব শাশুড়ী যদি হইত অনুপমার! যে শুধু খাইত আর ঘুমাইত! কিন্তু শুধুই কি শাশুড়ী? পিসশাশুড়ী জ্যাঠতুতো খুড়তুতো বড় বড় জা ভাসুর, কুচোকাচা গেঁড়িগুগলিতে বাড়ি বোঝাই। সুধার বাড়ির মত শান্ত কোথায়?

আচ্ছা ঠান্‌দি, তোমার বোনঝির বাড়িটি বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা, না?

ঠান্ডা! আ কপাল, ঠান্ডা আবার ভাল? কাচ্চাবাচ্চায় ঘর ভরে যাবে, তবে না সংসার? সুধার তো এই বুড়োবয়সে 'হবে না হবে না' করে এতকালে এই আশা হয়েছে। তা নইলে এতদিনে তিন ছেলের মা হবার কথা। তা তোরও যা ধাত দেখছি—

যাঃ, ঠান্দি যেন কী! চল তো পা চালিয়ে।

শাশুড়ীর হাঁড়িমুখ মনে পড়তেই কল্পনাব ছবি টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়ে। অনুপমার বাড়ির উঠানের তুলসীমঞ্চটা শ্বেতপাথরের হইবে কি কালোপাথরের, দুইখানা ঘর থাকিবে না তিনখানা, চৌকিতে বিছানা হইবে কি বার্নিশ-করা পালঙ্কে—সে সব চিন্তা মুলতুবি থাকে।

সারাদিনের অজস্র কাজের শেষে সেই চিন্তা পাড়িয়া বসে এবং অনেক চেষ্টার ফলে প্রকাণ্ড একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলে হীরালালকে।

আঁকাবাঁকা কাটাকুটি তো বটেই, তা ছাড়া বানানের উপর বর্ণমালার নির্দেশের চিহ্নমাত্র নাই। তা হোক, তবু মনের কথাগুলো তো স্বামীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো গেল। যদিও একুশ বছরের স্বামীর পক্ষে কতটুকু কী করা সম্ভব, সেটুকু আর ভাবিয়া দেখে নাই অনুপমা। দুইটা পাস করিয়া যে তিনটা পাসের পড়া করিতে পারে, সে যে সুধার বরের মত সামান্য-'কন্‌ট্রাক্টারি' টুকুও পারিবে না এটা অবিশ্বাস্য। বিশেষ তো যে কাজে হাতে 'কাঁচা পয়সা' আছে। এই সব কথাই বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় গুছাইয়া লেখে অনুপমা। তা ছাড়া আরও লেখে—এবারে আসিবার সময় যেন 'শান্তনু ও গঙ্গার' একখানা ছবি আনে হীরালাল, আর দুইটা কাচের ফুলদানি। আরও অনেক ছবি অবশ্য চাই, তবে একে একে আনিলেই চলিবে।

হীরালাল কিন্তু না আনে ছবি, না আনে ফুলদানি। অনুপমা পাগল বলিয়া তো আর হীরালাল পাগল নয়। আব জিনিসটা অদৃশ্য করিয়া আনিয়া অনুপমার হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়াও সম্ভব নয়। তা ছাড়া ববিবর্মার আঁকা ছবি টাঙাইবে কোথায় অনুপমা? 'নিজস্ব' বলিয়া যে ঘরখানিতে শুইতে পাইয়াছে সে সেই ঘরকে 'নিজস্ব' বলার মত ধাষ্টামো আর কী আছে? গুদামঘর বলিলেই কি ঠিক বলা হয় না তাহাকে? এই বৃহৎ বাড়িতে ত্রিপুরাসুন্দরীর ভাগে দোতলায় মাত্র এই একখানি ঘর! দোতলা বলিয়াই কিছুটা শুকনা খরা গোছের, নীচের তলার মত অত নোনাধরা নয়। কাজে কাজেই সারা বছরের মুগকলাই ছোলা মটর বস্তাবন্দী করিয়া কোথায় রাখা যাইবে এমন নিরাপদে? সারাবছরের আলুগুলাও রাখিতে হয় অনুপমার চৌকির তলায় বালুকা শয্যা বিছাইয়া। এ ছাড়া তাকের উপর বড়ির টিন আর আচারের বোতলগুলাও না রাখিলেও চলে না। আর বাক্স প্যাঁটরা আলনা দেরাজ ভারী ভারী যা দুই-একটা আছে ত্রিপুরাসুন্দরীর, সেও তো দোতলায় রাখিবার জিনিস।

এযাবৎ নিজেই এঘরে শুইয়া আসিয়াছেন ত্রিপুরাসুন্দরী, ছেলের বিবাহের পর হইতে অধিকারটা ছাড়িয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তকের বোঝা নামাইয়া ছুটিতে যখন বাড়ি আসে হীরালাল, তখন স্ফূর্তির আতিশয্যে তুচ্ছ অসুবিধা তাঁহার চোখেও ঠেকে না। আর অসুবিধাই বা কী, বিছানা পাতিবার মত হাত কয়েক জায়গা থাকিলেই তো যথেষ্ট। বিছানার পাশে মুগকলাইয়ের বস্তা থাকিলে যে কাহারও শয্যাকণ্টক রোগ হয় অথবা দীর্ঘ বিরহান্তে প্রবাসী প্রিয়তমের সোহাগ-সম্ভাষণ নিমপাতার মত লাগে, এ কথা বোঝা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

ছবির কথা শুনিয়া হাসি পাইল বটে, তবে তাহাব হাসির খবরে যে অনুপমার কান্না পাইবে সে কথা বেচারা ভুলিয়াও সন্দেহ কবে নাই। কান্না থামাইতে এবং রাগ ভাঙাইতে এক ডজন ছবিব প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিতে হইল হীবালালকে।

অমূল্য ছুটিটুকুকে তো বেঘোরে যাইতে দিতে পাবে না সে!

আবার ছুটি আসিতে কি আর এই সামান্য আবদারটা ভুলিয়া যাইবে না অনুপমা?

হায়! স্ত্রীকে কতটুকুই বা চিনিয়াছে হীরালাল? প্রত্যেক চিঠিতেই সে কথা একবাব করিয়া স্মবণ করাইয়া দেয় অনুপমা। ভুলিবাব আব সুযোগ দেয় কোথায়! শেষ পর্যন্ত পরের ছুটিতে 'শান্তনু-গঙ্গা' 'দুর্বাসা-শকুন্তলা' 'অশোকবনে সীতা' প্রভৃতি বিখ্যাত ছবির সঙ্গে খানকয়েক কালীঘাটের পট মিশাইযা পুবাপুরি একটি ডজন করিয়াই লইয়া যাইতে হয় তাহাকে। অবশ্য বাড়ি আসিয়া বলিতে হয় নিজের শখ।

তা ত্রিপুবাসুন্দরীও ছেলেব শখে খুশী হন। বাছিয়া খানতিনেক ছবি তিনি ঠাকুরঘবের জন্য লইয়া যান। পিসিমা খুড়িমা ছোটঠাকুরমাব দলও এক-একখানি লইতে ছাড়েন না। ঠাকুর-দেবতার ছবি বলিয়াই লওয়া। হীরালাল আবাব রাগ কবিবে কোন্ মুখে? ববং ধন্য হইয়া যাইবাব কথা তাহার।

ধন্য হইল বটে, তবে সেবাবেব চার-চারটে দিন ছুটি তাহাব মাঠে মারা গেল। কথাই কহিল না অনুপমা।

ছুটির পব ছুটি আসে, ভালয় মন্দয় কাটিয়া যায়। অবশেষে পড়ার পালা সাঙ্গ হয়। বি.এ. পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের স্কুলে হেডমাস্টারের পোস্টটা পাইয়া যায় হীরালাল।

ত্রিপুরাসুন্দরী সত্যনারায়ণেব সিন্নি দেন, কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা পাঠান, বেশ একটু উৎসবেব হাওযা বয় বাড়িতে।

অনুপমা?

এই উৎসবের আনন্দের মধ্যে তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, কে যেন তাহার দীর্ঘদিনের যত্নবর্ধিত ফুলগাছের চারাটিকে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

এক রকম তাই বইকি। কলিকাতায় 'বাসা' করিবার যে ক্ষীণ আশাটুকু এতদিন হীরালালের কাল্পনিক চাকুরির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেটি ধুলিসাৎ হইয়াছে। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন নির্বোধ স্বামীর উপর কতই রাগ করিয়া থাকিবে অনুপমা? কদিন কথা বন্ধ রাখিবে?

মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা কি সাধে হয়? গ্রামের স্কুলের মাস্টারির কাজে অনুপমার যে আপত্তি কিসের, সেটা ঠিক বুঝিবার মত বুদ্ধিও নাই হীরালালের। হীবালাল যদি এই গ্রামের বাড়িতেই কায়েমী হইয়া বসে, জীবনে কি আর মাথা তুলিতে পাইবে অনুপমা!

সিন্নির প্রসাদ পাইতে অনেক লোক আসে, সকলেই ত্রিপুরাসুন্দরীর ভাগ্যের প্রশংসা করে, দুই-একজন আবার বউয়ের 'পয়' সম্বন্ধেও আস্থা দেখায়। বংশের মধ্যে হীরালালই প্রথম বি.এ. পাস করিয়াছে, এটা তো আর কম গৌরবের কথা নয়। তাহার উপর আবার পাস করিতে-না-করিতেই চাকুরি—হাই স্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামের মধ্যে রীতিমত বিশিষ্ট পদ।

বেশী রাত্রে ঘরে আসে অনুপমা।

হীরালাল বলে, সকলেই আমার ভাগ্যের প্রশংসা করছে, শুধু তোমার মুখে হাসি নেই কেন বল তো?

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলে, হিংসেয়।

দেখে শুনে তাই মনে হচ্ছে যে। সত্যি, তুমি কি খুশী হও নি? অথচ বাড়িতে—এই তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকতে পাব বলে কবে থেকে চেষ্টা করেছি এইটার জন্যে।

সকলের সঙ্গে থেকে তো চারখানা হাত গজাবে।—অনুপমা এবার বেশ জোরালো ভাষাতেই নিজের মতামত ব্যক্ত করে, এই জঙ্গলে শেকড় গজালে জীবনেও কি আর আমার সাধ মিটবে?

হীরালাল বিরক্ত হয়, বলে, তোমাব সাধ তো সেই আলাদা হওয়া? নিজের বাড়ি আর একলাব সংসার?

নিশ্চয়ই তো, কেন নয়? নিজের একটা আলাদা বাড়ি না থাকলে কি সুখে সংসার করা যায়? তুমি দেখো, বাড়ি আমি কববই। বাড়ি করব—ইচ্ছামতন সাজাব গোছাব।

তাই কোরো। চাকরি কোরো একটা, মন্দ হবে না। এখন সর, শুই। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ইস্ এখুনি এতো ঘুম পেল?

অনুপমা হাসে।

পাবে নাতো কি। বসে বসে তোমাব কূটকচালে কথা শুনব! কী যে এক গোঁ নিয়ে ঢুকেছিলে এ বাড়িতে!

রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয় হীরালাল, আর মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়ে। সারাদিন বিস্তর খাটুনি গিয়াছে।

বিস্তর খাটুনি সারাদিন অনুপমারও না গিয়াছে তা নয়, কিন্তু ঘুম আসে কই? রাগে দুঃখে আশাভঙ্গের তীব্র ক্ষোভে যেন বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে থাকে।

কিন্তু না—না। আশা সে ছাড়িবে না, কিছুতেই না।

ছবির মত নিজস্ব বাড়ি একখানি সে করিয়া তুলিবেই যেমন করিয়া হোক। দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙাইবে ভাল ভাল ছবি, জানালা-দরজায় রঙিন পর্দা, ভাঁড়ারঘরে একগাদা মাটির হাঁড়ি-কলসীর বদলে সভ্যভব্য টিন আর কাচের বোতল। ভারী ভারী কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি বাতিল করিয়া দিয়া কার্পেটের আসন বুনিবে হীরালালের জন্য, খাগড়াই ফুল-কাঁসার বাসন কিনিবে এক সেট, কাঠের উনানের পাট তুলিয়া কয়লার উনান পাতিবে শহরের মত। অনুপমার বাড়িতে পানের বাটায় চুন-খয়েরের ছোপ পড়িবে না, বিছানায় তেলের দাগ নয়, আলনার কাপড়গুলি পরিপাটি, বাসনগুলি সর্বদা মাজা-ঘষা—দেখিবার মত আর দেখাইবার মত সংসার।

আর, অনুপমার ভিতরের যে অনাগত শিশুর অস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যাইতেছে তাহার জন্য আনিবে অজস্র উপকরণ—বেতের দোলা, দুধের বোতল, রূপোর বাটি, আরও কত কী! এ বাড়ির ছোট ছেলেরা যা চক্ষেও দেখে নাই কোনদিন।

হীরালাল অঘোরে ঘুমায়, আর অনুপমা অগাধ স্বপ্ন দেখে।

সেই বাড়ির কোথায় কী রাখা হইবে, কোন্‌খানে বসিয়া কী কাজ করিবে অনুপমা, সে সব অনুপমার মুখস্থ।

৩

আষাঢ়ের মাঝামাঝি প্রথম সন্তান হইল অনুপমার। কল্পনার খোকা নয়, সত্যকার মেয়ে। ভরা বর্ষা—কচি মেয়ে লইয়া কষ্টের একশেষ হইল সেবার। প্রথম সন্তানের দায়িত্ব সংসারের উপরওয়ালাদের

ভাগ করিয়া লইবার কথা, কিন্তু অনুপমার যে 'বুড়ো বয়সে'র মেয়ে। তিন ছেলের মা হইবার বয়সে একটা—তাও আবার ছেলে নয়, মাটির ঢিবি। কাহার দায় পড়িয়াছে যে তাহার দায়িত্ব লইতে যাইবে? বরং মেয়ের আদিখ্যেতায় যে সে সংসারের কাজে ঢিলা দেয়, এইতেই অসন্তোষের আর অন্ত থাকে না লোকেব।

অনুপমার ছোট জা, অনুপমার বিবাহর দুই বৎসর পরে বিবাহ হইল যাহার, সেও দুইটি খোকা সামলাইয়া সংসাবের কত বায়নাক্কা সামলায়। ছেলেদের লইয়া আদিখ্যেতা তো দূরের কথা, দৃক্‌পাত মাত্র কবে না তাহাদেব পানে।

ছোট জায়ের ছেলেদের দিকে চাহিয়া নিজের মেযেব জন্য আর বেতের দোলনা বায়না করিতে পারে না অনুপমা। জামা কাঁথা ঝিনুক বাটিরই বা এত কি দরকার? জায়ের যে ছেলেটি ঝিনুক-বাটির গণ্ডি কাটাইয়াছে তাহার পরিত্যক্তগুলাতেই যখন কাজ চলিয়া যায়?

ভাগ্যক্রমে আবার অনুপমার মেয়ে কাঁদুনে।

ত্রিপুরাসুন্দরী যখন তখন মুখঝামটা দেন: বাবা! বাবা! মেয়ে নয় তো যেন ভাঙা কাঁসর! বাদ্যি বেজেই আছে। হবে না কেন, মা যেমন বাচাল তেমনি হবে তো মেয়ে। মহেশ্বরীও আজকাল যেন বিরূপ, বরং ঢল নামিয়াছে ছোটবৌ লতিকার দিকে। তাই তিনিও মেয়ে কাঁদিলেই বেজার মুখে বলেন, তোমাব সানাই-বাঁশি থামাও নাতবউ, দোহাই। বাপ বে বাপ! এই তো আরও কটি ছেলে রয়েছে বাড়িতে—টুঁ-শব্দ আছে?

সুবিধা পাইলে হীরালালকে অনুযোগ করে অনুপমা: কেউ তো দেখতে পারে না মেয়েটাকে, তুমিই নাও না। কোলে কবনা একটু।

হীবালাল লাফাইয়া ওঠে: বক্ষে কব। আমি ওসব ছেলেপুলে নিতে পারি না। তা ছাড়া কে কোথায় দেখে ফেলবে!

একালেব ছেলেরা এমন কথা শুনিয়া হাসিয়া ডিগবাজি খাইবে, কিন্তু হীরালালের আমলে বাপের পক্ষে ছেলেমেয়েকে কোলে-পিঠে লওয়া নিতান্ত লজ্জাকর ব্যাপার ছিল।

মেয়েকে ফেলিয়া বাখিয়া বান্নাঘরে চলিযা যাইত অনুপমা, আর কল্পনা করিতো তাহার নিজের বান্নাঘরেব, যাহাব এক পাশে পাতা আছে ছোট্ট একটি নিচু চৌকি—বর্ষার দিনে আর শীতের রাত্রে যাহার উপর ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া এপাশে বসিয়া ছোট ছোট হাঁড়িকড়ায় রান্না করিবে অনুপমা। উনানের আগুনের তাতে গরম থাকিবে ঘর।

অনুপমার মেয়েকে একদিন দেখিতে আসিল সুধা।

শুধু হাতে আসে নাই। দুইখানা কাঁথা আব একটা ঝিনুক-বাটি আনিয়াছে। দুরন্ত দামাল ছেলে কোলে। মোটাসোটা ফরসা ধবধবে ছেলেটি। সুধার সাজপোশাকও চমৎকার। সুধার ছেলের কাছে কালো রোগা লতিকার ছেলের একটা পচা পুরানো জামা পরা অনুপমার মেয়েটাকে এত শ্রীহীন দেখায়, নিজেরই ঘৃণা হয় অনুপমার। রাগও আসে সুধার উপর। মেয়ে দেখা তো শুধু ছুতা, নিজেকে দেখাইতে আসা মাত্র। ওর 'কুমড়োপটাশ' ছেলে কেমন চলে, কেমন বলে, কেমন হাসে শুনিবার জন্য ঘুম ধরিতেছে না মানুষের!

তা শুধু ছেলের কথা নয়, নিজের কথাও বিস্তর কয় সুধা। বাড়িতে সে আরও দুইখানা ঘর তুলিয়াছে। শ্রীক্ষেত্রয় গিয়া রাশিকৃত বাসন কিনিয়া আনিয়াছে, কলিকাতায় বাপের বাড়ি গিয়া স্বদেশী মেলা হইতে চিনামাটির লক্ষ্মী-সরস্বতী পুতুল সওদা করিয়া আনিয়াছে আড়াই টাকা জোড়া দিয়া। বিশেষ করিয়া ছেলের দুধ খাইবার জন্য একটা কালো গরু কিনিবে এবার—এ

সমস্ত কথাই জানাইয়া যায় সুধা। শেষে আরও বলে, বলা উচিত নয়, গুরুজন, বুড়ী মরেছে—না হাড়ে বাতাস লেগেছে। বাবাঃ! এ বাবা দিব্যি আছি। কিছু মনে কোর না ভাই, তোমার মতন এই "রাবণের গুষ্টি"তে পড়লে আমি তো ভাই পাগল হয়ে যেতাম।

অপ্রতিভ অনুপমা ঠিকমত উত্তর দিতে পারে না। মনে মনে বলে, পাগল হওয়া অত সোজা নয়।

৪

দিনের পর দিন কাটে, মেয়ের কোলে পর পব দুইটি ছেলে হয় অনুপমার। আরও দুইজন দেওরের বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের দুইজনেরই ছেলে মেয়ে হইতে শুরু হইয়াছে। ননদরা আসে—কেউ শরীব সাবাইতে, কেউ বা আঁতুর তোলাইতে। 'গোলে হরিবোল' এ কোথা দিয়া যেন, মানুষ হইতে থাকে অনুপমাব মেয়ে ছেলেরা। অনুপমা বড়বউ, তাহার দায়িত্ব বেশী। তা ছাড়া, দেওরদেব কলিকাতায় অফিসের চাকুরি, ডেলি প্যাসেঞ্জারী কবে, তাদের বউ-ছেলের মতন যত্ন-আদর বাড়িতে থাকা মাস্টারেব বউয়ের ছেলেমেয়ের হওয়া সম্ভব নয়।

ছেলেদের বেতেব দোলা, ঠেলাগাড়ি, আর রঙিন নেটের মশারির কথা নিজেরও আর মনে পড়ে না অনুপমার। "শান্তনু ও গঙ্গা'র ছবির শোকে একদিন কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়াছিল, এ কথা ভাবিলে হাসি পায এখন। স্থূল বস্তুর অভাবটাই যে সত্যকার অভাব—এ কথা অনুপমা বুঝিতে শিখিয়াছে আজকাল।

শোবার ঘরের খাটের তলায় তাই স্তূপীকৃত হইতেছে ঘরকন্নার অজস্র উপকরণ—বঁটি কাটারি কুলো ডালার মত স্থূল উপকরণ। অবশ্য দোতলার সেই ঘরখানায় নয়। সে ঘরে আজকাল ছোট জা শোয়: একেই সে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, তা ছাড়া বারো মাস সর্দি-কাশির ধাত, কাজেই দোতলার ঘরটা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া মহেশ্বরীর ঘরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে অনুপমাকে। খালিই পড়িয়াছিল ঘরটা, গেল আশ্বিনে প্রচণ্ড সেই ঝড়ের রাত্রে মারা গেলেন মহেশ্বরী। মারা গেলেন অবশ্য ঝড়ে নয—রোগেই, তবে মার্কামারা দিনটি।

পাঁচটি ছেলেমেয়ে লইয়া এ ঘরে কুলানো সম্ভব নয়, বড় মেয়েটি ঠাকুরমার ঘরে আর হীরালাল বৈঠকখানায় শোয় তাই রক্ষা। একেই ছোট ঘর, তার উপর আবার আধখানা ঘর জুড়িয়া বর্ষার দিনের প্রয়োজনে শুকনো কাঠ জমা করা আছে। মহেশ্বরী আবার শুধু কাঠ রাখিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না—বাড়িসুদ্ধ সকলের টিটকারি সহিয়াও জ্বালনির জন্য রাজ্যের নারকেলের মালা, ডাবের ছোবড়া, আখের ছিলতে আর সজিনা ডাঁটার খোসা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। মহেশ্বরীর মৃত্যুর পর এই তুচ্ছ জিনিসগুলা টানিয়া ফেলিয়া দিতে কেমন যেন মায়া হয় অনুপমার। সবই আছে। মাঝখানে একটা বড় চৌকি পাতিয়া আড়াআড়ি করিয়া শোয় পাঁচজনে। পা ছড়ানো যায় না, সারারাত পা গুটাইয়া শুইতে হয় অনুপমাকে।

ইহারই ভিতর আবার একদিন আধদিন হীরালালও আসিয়া জোটে। ছোট ছেলেটাকে দিয়া চুপি চুপি ডাকিযা পাঠায় অনুপমা। কুণ্ঠিত হীরালাল আসিয়া এদিক ওদিক তাকায়, বলে, বউমারা কোথায় সব?

'বউমারা' অর্থে ভাদ্রবধূরা।

অনুপমা ঝঙ্কার দিয়া ওঠে: যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। কেন, তারা তোমায় ফাঁসি

দেবে নাকি?

না না— ইয়ে—তাই বলছি। কী দরকার পড়ল, ডেকে পাঠালে যে?

কেন, দরকার না পড়লে ডেকে পাঠাতে নেই? পরপুরুষ নাকি?

আঃ, কী যে বল! জিভের আঁট আর কখনও হল না তোমার। গোড়া থেকে সেই 'ভেন্ন' হওয়া নিয়ে শুরু, মনে আছে তো?—হীরালাল হাসে।

মনে! অনুপমার আবার মনে নেই সে কথা! জীবনভোর সেই কথাই তো মনে রাখিয়া আসিতেছে সে। কিন্তু হঠাৎ হীরালাল সেই প্রথম রাতের কথা তুলিতেই কেমন নেশা লাগে অনুপমার, বড় মেয়েটার বয়সের কথা তুলিয়া যে পাত্র খুঁজিবার তাগিদ দিতে ডাকিয়া আনিয়াছে সেকথা ভুলিয়া বলে, হ্যাঁ, সেই অবধি 'ভেন্ন' হচ্ছি, অবশেষে এই তোমার সঙ্গেও 'ভেন্ন'।

লেপের মধ্যে পা ঢুকাইয়া দিয়া জুত করিয়া বসে হীরালাল, বলে, সত্যি তাই দেখছি। দু-একখানা ঘর না তুললে আর—

অনুপমা একটু রহস্যময় হাসি হাসিয়া ওঠে: ঘর তুলতে হলে আর এ ভিটেয় নয়—নিজের জমিতে।

নিজের জমি?—হীরালাল পরিহাস মনে করিয়া হাসিতে থাকে: তা হলে আমার এই টাকের ওপর ঘর তুলতে হয়। নিজের বলতে তো এইটুকুই জমি দেখছি।

ঠাট্টা ভাবছ—চাপা আর উত্তেজিত শোনায় অনুপমার কণ্ঠস্বর: জমি আমি কিনেছি, তা জান?

তার মানে?

মানে আবার কী? কিনে ফেললাম পাঁচ কাঠা জমি। চৌধুরীগিন্নীর অবস্থা তো জানই? মেয়ের বিয়ের ছুতোয় বলতে গেলে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল—আমি কৌশল করলাম, বললাম, খানিকটা জমি বরং আমায় দাও চৌধুরীখুড়ী, আমি একশো টাকা দিচ্ছি।

বল কী? একশো টাকা তুমি পেলে কোথায়?

সে আমার ছিল।

হীরালাল মাথা নাড়া দেয়: অমনি 'ছিল'? পাবে কোথায়? গয়না বাঁধা দিয়েছ নিশ্চয়?

বাঁধা নয়, ওই চৌধুরীগিন্নীকেই বেচলাম। চার ভরির তোলা হারছড়াটা ছিল যে।

হারটা ঘোচালে?—হীরালাল বিরক্তি প্রকাশ করে।

হার! হার নিয়ে আমি কি ধুয়ে জল খাব? গিন্নীবান্নী মানুষের তোলা হারের তো ভারি দরকার।

সোনার আবার দরকার নেই!—হীরালাল 'গিন্নীবান্নী' স্ত্রীর এমন নির্লোভ উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। অপ্রসন্ন ভাবেই বলে, না না, ভারি অন্যায় করেছ। মেয়ের বিয়ের সময় কাজে লাগতে পারত।

অনুপমা জ্বলিয়া ওঠে: কেন, মেয়ের বিয়ের সুবিধে আমি করতে যাব কেন? যে যার নিজের তালে আছে। তোমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা তুমি ভাবো গে যাও। আমার বাড়ির কথা তুমি একদিনের তরে ভেবেছ? না খেয়ে না পরে গয়না বেচে যেমন করে হোক বাড়ি আমি করবই, তুমি দেখো।

সকালবেলা ছোট জা বীণা হাসিয়া বলে, বট্‌ঠাকুর বুঝি আজকাল বাড়ির ভেতরেই শুচ্ছেন দিদি? অতটুকু ঘরে কুলোয়?

হাসি দেখিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে অনুপমার, মেয়ের বিয়ের আলোচনা করিতে করিতে শীতের রাত্রে আলস্যোর বশে আর বাহিরে যাইতে পারে নাই হীরালাল, ছোট জায়ের কাছে এ কৈফিয়তটা দিতে প্রবৃত্তি হয় না। তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া ওঠে, না কুলোলেই বা উপায় কী? বারো মাস তো আর মানুষ 'থানছাড়া মানছাড়া' হয়ে থাকতে পারে না? তোমাদের মতন রসের গল্প না হোক, দুটো দরকারী কথাও কি আর নেই মানুষের?

চটছেন কেন? তাই জিজ্ঞেস করছি, একটা তো মোটে চৌকি—পুরুষ মানুষ, পারেনও তো এত কষ্ট করতে!

বীণা নিজের কাজে চলিয়া যায়। তাকাইয়া তাকাইয়া মনে হয় অনুপমার, বীণা যেন তাকে ভয়ঙ্কর একটা অপমান করিয়া গেল।

পাঁচ কাঠা জমির মধ্যে কাঠা তিনেকর উপর বাড়িখানা তুলিবে সে, ভাল ঘরখানি রাখিবে হীরালালের নামে। আরাম পাইলে যে আরাম করিতেও জানে হীরালাল, তাহার প্রমাণ দেখাইয়া দিবে। বিছানা বালিশ লেপ কাঁথা সব কিছুই তো একটি একটি করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে অনুপমা।

বাঘিনীর মত আগলাইয়া রাখিয়াছে, প্রাণে ধরিয়া একটুকু জিনিস ব্যবহার করে না। এমন কী সেবারে রাসের মেলা দেখিতে গিয়া হীরালালের জন্য যে শৌখিন গড়গড়াটা কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটি পর্যন্ত আনকোরা তোলা আছে। নূতন বাড়ির রোয়াকে বেতের মোড়া পাতিয়া বসিয়া হীরালাল চকচকে নলে তামাক খাইবে বলিয়া।

প্রত্যেকবার ছেলেমেয়েদের নূতন জামাজুতাগুলা তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া ছোট হইয়া যাইবার মুখে পরিতে দিতে হয়! আশায় আশায় আব কতদিন কাটাইবে অনুপমা?

৫

অনেক দিনের পর সেবার সেজ ননদ বাসন্তী বাপের বাড়ি আসিল।

অবস্থা ভাল, পশ্চিমে থাকে, বড় একটা আসাযাওয়া নাই।...বলিল, মা কোন্‌দিন আছেন কোন্‌দিন নেই, এলুম একবার দেখতে।

একঘর ছেলেমেয়ে বাসন্তীর, তবু সব ফিটফাট ছিমছাম। এ অঞ্চলে এমন পোশাক পরিচ্ছদ দুর্লভ। খাওয়াদাওয়ার তরিবৎও বেশী তাহাদের। মুড়ি মুড়কি দেখিলে নাকি হাসিয়া খুন তাহারা!

অবস্থা ভাল তাই আদরও বেশী বাসন্তীর। অথর্ব ত্রিপুরাসুন্দরী চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া তাহাদের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন, অনুষ্ঠানের ত্রুটি ধরিয়া বউদের গালিগালাজ করেন। বাসন্তী আসায় সকলেই তটস্থ। বাসন্তী দুইটা কথা কহিলে সকলেই যেন ধন্য।

শুধু অনুপমারই বসিয়া গালগল্প করিবার সময় নাই। ননদ নন্দাই ভাগ্নে ভাগ্নী আসায় তাহার খাটুনি তো সহজ বাড়ে নাই? সেই তো বড়, সব দায়িত্ব তো তাহারই।

অনুপমা খাটে বেশী, তবু 'মুখের' জন্য কেউই তাহাকে সুচক্ষে দেখে না।

বাসন্তী শুনাইয়া শুনাইয়া বলে, বাবা, বড় গিন্নীর আর দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। একবার একটা কথা কইবারও ফুরসত নেই। বাড়িতে যে একটা মানুষ এসেছে—

অনুপমা জলের ঘড়াটা কাঁকাল হইতে নামাইয়া বলে, মানুষের সঙ্গে 'মনিষ্যত্ব' করবার জন্যে মানুষ তো বাড়িতে ঢের আছে ভাই। গাধা গাধার কাজই করে।

ও বাবা! কী জানি ভাই, কী যে এতো কাজ তোমাদের কে জানে! এই তো আমার সংসারেও তো কাজ বড় কম নয়। বামুন চাকর গোটা কয়েক থাকলে কী হবে, তাদের চরানোও সোজা কাজ নয়। সবই তো করি! তবু বেড়াতে যাই, মানুষ এলে আড্ডা দিই, আর তোমাদের উদয়াস্ত কেবল ভাতের হাঁড়ি।

মুখ্যুর যা দশা।—বলিয়া চলিয়া যায় অনুপমা।

লতিকা ননদের গা টিপিয়া বলে, দেখলে তো? চব্বিশ ঘণ্টা আগুন। সংসারের সঙ্গে দিনরাত যেন 'ঢালে খাঁড়া'য় আছেন। মুখের সামনে এগোয় কাব সাধ্যি!

তা আর জানি নে।—বাসন্তী বলে, বিয়েব কনে এসে বলেছিল—'আলাদা হব'। ও কি সোজা মেয়ে?

লতিকা অগ্রাহ্যভরে মুখ ঘুরাইয়া বলে, তা হলেই পাবতেন? কে মাথাব দিব্যি দিয়ে আটকেছিল? বড়দার মুরোদটাও দেখতে হবে তো।

রান্নাঘরের ভিতর হইতে অনুপমার খুন্তির শব্দটা মাঝে মাঝে থামিয়া যায়।

বাড়তি লোক হইলে, বাসনের অকুলান পড়িলে এ বাড়িতে—শুধু এ বাড়িতে কেন, এ অঞ্চলেই—কলাপাতা কাটিয়া ভাত খাওয়াব প্রথা। বিশেষ তো কুঁচোকাঁচার। বাসন্তীর ছেলেমেয়েরা কিন্তু পাতায় খাইতে নারাজ। বাসন্তী হাঁক দিয়া বলে, ওগো বাড়ির গিন্নীরা, তোমাদের কুটুম্বরা বলছে—'মামার বাড়িতে থালা নেই কেনো, ছিঃ! নাও, এখন মান বাখ নিজেদের।

সেজবউ অপ্রতিভভাবে বলে, থালা তো বেশী নেই ঠাকুরঝি, সেবাবে আবার চুরি গেল একগোছা।

কেন গা, বড়গিন্নীর ঘরের চৌকির তলায় তো ধামাভর্তি ঢের বাসন দেখলাম।

দিদিব ঘরে?—সেজবউ মুখচোখের ভাবে অনেক কিছু ফুটাইয়া বলে, বেল পাকলে কাকের কী? ওসব উনি নিজের টাকা দিয়ে কিনেছেন—গেরস্থর হাত দেবার হুকুম নেই।

মরণ আর কী! বাসন নিয়ে করবেন কী, সগ্‌গে বাতি দেবেন?

না গো না, যখন ভেন্ন হবেন তখন সুখ কববেন। দেখুন গে না উঁকি মেরে—বঁটি কাটারি শিল-নোড়া জাঁতা কুলো থেকে শুরু করে এস্তক ডাল রাঁধার কাঠিটি পর্যন্ত সব মজুত আছে। একটি জিনিসে হাত দিতে যান—দেখবেন।

কী দজ্জাল বউ বাবা! এমনি একলষেঁড়ে স্বার্থপর বউ থাকলে কখনও সংসাবে লক্ষ্মীশ্রী হয়?

অনেক চিপটেন কাটিয়া, অনেক জ্বালাতন করিয়া সেবাব বাসন্তী বিদায় লইল। পরদিনই অনুপমা গেল সুধার বাড়ি।

সুধার বর কনট্রাক্টর, অনুরোধ করিলে সুবিধা সুযোগে অল্প খরচে যেমন-তেমন বাড়ি একটা আরম্ভ করিয়া দিতে পারে সে।

অনেক দিনই 'যাই যাই' করিয়াছে অনুপমা, কিন্তু সুধার 'সেই অমায়িকতার আবরণ দেওয়া অহঙ্কারের কথাগুলা মনে করিলে আর যাইতে উৎসাহ হয় না।

আজ সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল।

ভগবানের কিছু দয়া আছে হয়তো, পথেই দেখা সুবোধের সঙ্গে। অনুপমা যেন বর্তাইয়া

যায়। আগে অবশ্য কথা বলাবলি ছিল না, এখন আর অত মানিতে পারে না। পাঁচ-সাত বৎসর হইয়া গেল জামাই হইয়াছে তাহার, দুইটি নাতি নাতনী, অর্ধেক চুলে পাক ধরিয়াছে, এখন আবার অত বউগিরি কিসের?

বলে, ভালই হল দেখা হল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

কেন বলুন তো? হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, অনেক দিন থেকেই ভাবছি—

অতঃপর অনেক ভনিতা আর অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া নিজের আবেদন জানায় অনুপমা। সুধার চোখের সামনে নয় বলিয়াই পারে। সুধার সঙ্গে সখীত্বের সম্বন্ধ ধরিয়া 'ভাই' বলিয়া কথা কয় না সুবোধের সঙ্গে, মহেশ্বরীর সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়া বলে 'মেসোমশাই'। শেষ পর্যন্ত প্রায় হাতজোড় করে: আমার অনুরোধটি রাখতেই হবে মেসো, 'না' বললে শুনব না। আমার অনেক দিনের সাধ।

বিব্রত সুবোধ জানিতে চাহে, প্রথমে অন্তত কত টাকা ফেলিতে পারিবে অনুপমা। জিনিসপত্রের তো আর আগের মত দর নাই? সবই চড়িয়াছে।

অনুপমা মনে মনে হিসাব করিতে থাকে। সব জিনিসের সঙ্গে সোনারও দর চড়িয়াছে...কুড়ি টাকার সোনা এখন চল্লিশ টাকা। অতএব আট ভরির সেই অনন্ত জোড়াটা বেচিয়া দিলে তিনশো সাড়ে তিনশো হয়, তা' ছাড়া খুচরা জমাইয়া গোটা পঞ্চাশ টাকা হইয়াছে।

বলে, গোড়ায় আমি চারশো দেবো আপনার হাতে—

চারশো? বলেন কী? বনেদ খুঁড়তেই তো বেরিয়ে যাবে ও-টাকা।

কী করব মেসোমশাই, দেখছেন তো ওই মানুষ! জীবনভোর রোজগার করলেন আর পাঁচজনের সংসারে ঢাললেন, কখনও এক পয়সা রাখলেন না। সুবিধে করে আরম্ভ করে দিন, তারপর আপনার আশীর্বাদে আমার বড় ছেলের একটা চাকরির আশা হচ্ছে, ধীরে ধীরে শোধ করে দেব।

অর্থাৎ টাকাটা অনুপমা ধারই চায় সুবোধের কাছে।

অনুপমার মুখ দেখিয়া কি দয়া হয় সুবোধের? না জবরদস্তিওয়ালা সুধাকে লইয়া ঘর করিবার অভ্যস্ত চোখে অনুপমার এই বিনীত কুণ্ঠিত ভাবটা নূতন লাগে! যাই ভাবুক, সুবোধ রাজী হয়।

পুরনো ইঁটকাঠও তো খুঁজিলে মেলে।

মাস দুই পরে অনুপমার বাড়ির বনেদ খোঁড়া শুরু হয়।

বড় ছেলে সুরেশ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনার একটা চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। অনুপমার আর ভাবনা কী?

প্রথমে ব্যাপারটা চুপিচাপি থাকিলেও প্রকাশ হইতে দেরি হয় না।

জা-দেওররা অগ্নিমূর্তি হইয়া ওঠে।

এতদিন সংসারে গিন্নীত্ব করিয়া লুকাইয়া যে অনেক টাকা করিয়াছে অনুপমা, এ সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ থাকে না । ভোলানাথ হীরালালকেও আর ছাড়িয়া কথা কহে না কেউ। তলে তলে সলাপরামর্শ না থাকিলে একলা মেয়েমানুষ আবার এতবড় কাণ্ডটা ফাঁদিয়া বসিতে পারে? এই মতলবই তবে ছিল এতোদিন? গিন্নী বসিয়া বসিয়া সংসারের গোছ করিয়াছেন আর কর্তা

ওদিকে বাড়ির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরা যাই বোকাসোকা ভালমানুষ, তাই কোন সন্দেহ করে নাই। এখন হিসাব দিক হীরালাল, বাড়ি ফাঁদিবার টাকা তার আসে কোথা হইতে?

হীরালাল এদিকে কথা বন্ধ করিয়াছে অনুপমার সঙ্গে।

তিরিশ বৎসর মাস্টারি করিয়া যতই গাধা বনিয়া যাক্, স্ত্রীর উপর তেজ ফলাইবার উপযুক্ত পৌরুষটুকু এখনও বজায় আছে।

কিন্তু অনুপমা আর টলে না। এতদিনে সে দাঁড়াইবার মাটি পাইয়াছে, চারখানা দেওয়াল উঠিয়াছে তাহার নিজের জমিতে। শুধু অনন্ত নয়, বারোমেসে হার আর বালা জোড়াটাও গিয়াছে। তা হোক, শাঁখা-লোহা বজায় থাক্ অনুপমার, তাই ঢের।

সুরেশের টাকা হইতে তিরিশ টাকা করিয়া ধার শোধ দেয় অনুপমা, পনেরো টাকা রাখে ছেলের ট্রেনভাড়া আর জলখাবার বাবদ। তবু যেন আব চলে না। খাওয়াপরায় টান দিয়াও চলে না। হীরালালও যেন আজকাল প্রতিপক্ষ। রাত্রে একদিন দুধ না পাইলে বলে, তা হোক তোমার বাড়ি তো হচ্ছে তা হলেই হল। বুড়ো বয়সে আফিংটা ধরে ফেলেছি তাই যা একটু—মরুক গে. অভ্যাস হয়ে যাবে।

অনুপমার রাগও হয়, দুঃখও হয। সত্যই বড় বুড়া হইয়া পডিয়াছে হীবালাল, পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়সেই যেন সত্তর বছরের মত দেখায় হীরালালকে। আহা, কোনদিন আবাম আয়েস পাইল না মানুষটা। টাকা জমাইবাব ঝোঁকে তেমন ভাল করিয়া একদিন খাওয়ানো মাখানোও করে নাই অনুপমা। ছোট জায়েরা সংসারেব ব্যবস্থা ছাডাও আলাদা পয়সা খবচ করিয়া কত ভালমন্দ খাওয়ায় স্বামীপুত্রকে।

দীর্ঘ চল্লিশটা বছর অনুপমা করিল কী?

অবশেষে সত্যই একদিন গৃহপ্রবেশের দিন দেখা হয়।

অনুপমার বাড়ি একরকম শেষ হইয়াছে।

কল্পনা অনুযায়ী না হোক, তবু তো সত্যকার একটা নিজের বাড়ি। শাক-ভাত খাইলে কেউ টিটকারি দিতে আসিবে না, ঘি-দুধ খাইলে কেউ নজর দিতে বসিবে না। গলা খুলিয়া পাঁচজনের নিন্দা করিবার স্বাধীনতাও কি কম সুখের?

পুরুতবাড়ি লোক পাঠায় অনুপমা পাঁজি দেখাইতে।

কিন্তু—

পুরোহিত আসিবার আগেই হীরালাল আসে কাঁপিতে কাঁপিতে।

বেদম জ্বর আসিয়াছে তাহার।

মহেশ্বরীর সেই ছোট্ট ঘরটাতেই আশ্রয় লইতে হয় তাহাকে। ছেলেমেয়েদের সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তবু ডাক্তার কবিরাজ আসিয়া বসিবার জায়গা পায় না। রায়েদের ভাগ্নে সেই ছোকরা ডাক্তারটি তো মুখের উপরই বলিয়া গেল, এমন করে থাকেন কী করে, আশ্চর্য!

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলিয়াই তো এমনভাবে থাকার বিরুদ্ধে আজন্ম যুদ্ধ করিয়া আসিল অনুপমা। এমন করিয়া থাকিবে না বলিয়াই তো আজ পর্যন্ত এমন করিয়া থাকা।

কিন্তু সে কথা কে বুঝিবে?

হীরালালই তো বুঝিল না কোনদিন। বুঝিল না বলিয়াই তো অনুপমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়া সেই ঘুঁটের ঘরটায় মরিতে আসিল।...

খাট তক্তপোষের উপর মরিতে নাই, কিন্তু মরণ বাঁচন রুগীকে নাড়ানাড়ি করার উপায় না থাকিলে?...সময় ফুরাইলে কে আর নিয়মের অপেক্ষা করিবে?

তাই চৌকী তক্তপোষ বাহির করিয়া ঘর খোওয়া ছাড়াও উপায় থাকে না আর।

একে একে সমস্ত জিনিষ বাহির হইতে থাকে অনুপমার।

গরুর কাজ করিবার ছেলেটি টানিয়া বাহির করিতে থাকে সব...সেই সব বঁটি, কাটারি, কুলো ডালার বিপুল সমারোহ। বস্তাবন্দী বিছানা বালিশ, বাক্স, আর্শি কত কি!...লুকাইয়া পাড়ার লোককে দিয়া, হীরালালের খোসামোদ করিয়া যত কিছু সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে অনুপমা এই দীর্ঘকাল ভোর।...সব আনিয়া টানিয়া উঠানে ফেলা হয়। হীরালালের কুড়ি বছর বয়সে আনা সেই কালীঘাটের পটের দরুণ 'কালীয় দমনের' ছবিখানা পর্যন্ত।...এত জিনিষ এতটুকু ঘরে ধরিয়াছিল কোথায়?...

মরিচাধরা ছাতাপড়া ঘুণলাগা এই সব রকমারি জিনিষের দিকে বোকার মত চাহিয়া থাকে অনুপমা। এই জিনিষগুলাকে যে এতদিন বুক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছিল, কেউ উঁকি মারিতে আসিলে কুরুক্ষেত্র করিয়াছে, সে কথা মনেই থাকে না আর।

কার জিনিষ? কে ঘর বাঁধিবে? অনুপমা?

অদ্ভুত একটা সাজ করিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া যে চাহিয়া আছে সেই অনুপমা?

হীরালালকে বাদ দিয়া একলাই তো সে এতদিন ঘর বাঁধিবার আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। গৌণ হীরালাল এমন মুখ্য হইয়া উঠিল কখন যে—হীরালালের অভাবে সব মিথ্যা হইয়া গেল?

[১৩৫৪]

নবাগতা

দু'ছড়া করে ফুলের মালার যোগান দিতে হয় মালিকে।

নিত্যকার বরাদ্দ।

পুরুষানুক্রমে চলে আসছে এই প্রথা, এর আর ব্যতিক্রম হয় না। মালিরাও পুরুষানুক্রমে এ বাড়ীর খাতায় নাম লিখে রেখেছে। সারা বৎসর ধরে প্রকৃতি দেবীরও যোগান আছে সুগন্ধি-সম্ভারের।—বেল আর মল্লিকা, যুথী আর রজনীগন্ধা, বকুল আর হেনা—কেউ না কেউ আসর বজায় রাখে। নিতান্তই যখন হিমের হাওয়ায় সুবাসিনীদের পাত্তা মেলে না তখন আছেন কুন্দ। গন্ধ না থাক গোড়ে মালার পাটটা থাকা চাই।

অশোকার শাশুড়ীর দিদিশাশুড়ি মধুমালা দেবী, যাঁর পায়ে ছিল বেঁকি মল—আর হাতে বাউটি, নারকোল ফুল, জশম, মুড়কি মাদুলি, তিনিও তিলের তেলে জবজবে চুল 'পেটি পেড়ে' আঁচড়ে 'বেনে খোঁপায়' জড়াতেন মল্লিকার গোড়ে।

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে নারীর রূপচর্য্যার,—'বেনে খোঁপা' থেকে একশো গুছির 'বসন্ত বাহার', তার থেকে কিছুটা আধুনিকা অশোকার শাশুড়ী পরিপাটি করে

বেঁধেছেন ফিরিঙ্গি খোঁপা, টুপি খোঁপা—আর অশোকা খোঁপাই বাঁধে না। ঢল্‌কো করে হাত ফিবিয়ে রাখে, পিঠের ওপর দোলে সেই খোঁপার ভগ্নাবশেষ।—

কিন্তু ফুলের মালাটি ঠিক আছে।

বনেদি বড়লোকের বাড়ী।

দোল দুর্গোৎসব আর বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ করবার নীবেট বনেদি বড়লোক নয়—আরাম আয়েস আব বিলাসিতার বনেদে গড়া বংশ। পৃথিবীটা যে উপভোগের জায়গা এ তথ্যটা যেন বড্ড বেশী জেনে ফেলেছে এরা।

এরা তাই সেকেলে বড়মানুষের মতো মার্ব্বেল পাথরেব মন্দির বাঁধিয়ে দিয়ে ফুলের মালার যোগান রাখতো না পাথরেব বিগ্রহের গলায় দোলাতে।...সুন্দরী তরুণীর কবরীতে পুষ্পমাল্যের বেষ্টনীর যা সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করবাব মতো সৌখিন অনুভূতি ক'জনেব থাকে? সে অনুভূতি এদের ছিল বংশানুক্রমে।

এ বাড়ীর বৌদের সাজ আছে কাজ নেই।

সকাল থেকে কলহ কবে গাল-গল্প কবে, দাসীর হাতের সাজা বাটা-ভর্ত্তি পান খেয়ে, আব পালঙ্কে গড়াগড়ি দিযে দিনটা কাটিযে দেওযা নিযে কথা। বিকেল পড়তেই সাজের পালা।

সবমযদা কপটান, চিরুনি গন্ধতেল, আব ফুল-কোঁচানো সিমলে শান্তিপুরের শাড়ী নিয়ে ব্যস্ততা পড়ে যেতো তখন। সাহায্য কবতে আছে মাথাপিছু খাস ঝি একটা করে। কোলেব ছেলে মানুষ করতে থাকতো আলাদা ঝি—এ শুধু সৌন্দর্য্যের খবরদারী করবার।

অশোকাই প্রথম এ বাড়ীর হাওয়াটা কিছু বদলেছে।

প্রসাধনের নিভৃত নিবালায় একটা কুদর্শন দাসীর সান্নিধ্য ওর অসহ্য। একশো গুছির খোঁপাও বাঁধে না, পানও খায় না বাটা ভর্ত্তি করে।

ওব স্নো পাউডার, লিপষ্টিক কুঙ্কুমেব প্রসাধন ভাণ্ডারে দাসীর প্রযোজন কিসের? নিতান্তই আত্মনির্ভব জিনিষ এখনকাব। তাছাড়া—আবার নিজের হাতে বিছানা না পাতলে ঘুম ভাল হয় না ওর, স্বামীর খাবার পান ক'টি নিজে না সাজলে তৃপ্তি হয় না, খাবাব কাছে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস কবতে না পেলে যেন মনে হয দিনটাই মিথ্যে হযে গেল।

তাই অশোকার চালচলনটা কিছু স্বতন্ত্র।

জেঠশাশুড়ী নীলনযনা দেবী এই "ছোট ঘবের মেয়ের" গরিবীয়ানা চাল দেখে আড়ালে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, আর সামনে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন—"এইবার এ বাড়ীর চালচলন 'হালতি বালতি'র বাড়ীর মতন হতে আরম্ভ করলো।...হবে না কেন, যেমন ঘরের হাওয়া এসেছে বাড়ীতে!"

'যেমন ঘরেব মেয়ে' বলে আইনের প্যাঁচে ফেলতে চান না নিজেকে—যতোই হোক অশোকাই যে বর্ত্তমানে খোদ গিন্নী এটা তো অস্বীকাব করবার উপায় নেই?

কিন্তু হাওয়ার ওপব তো তর্ক চলে না।

কিন্তু বিকেল বেলা—মালাচন্দন ঢাকাই শান্তিপুবী শাড়ীতে সেজে তিনতলার ছাদে কর্ত্তাদের আমলের গাঁথানো পাথরের বেদিতে বসে স্বামীর প্রতীক্ষা করার অভ্যাসটা নিতান্তই এদেরই মতো। ওর মধ্যে আর নতুনত্ব আনতে পারেনি অশোকা।

তা' ছাড়া আর করবেই বা কি?

কর্ম্মলেশহীন অলস জীবনের বাইরে যে আরও কিছু আছে সে কথা কবে শিখলো অশোকা?

পনের বছর বয়সে এ বাড়ীতে এসেছে, লেখাপড়া যা শিখে এসেছিল নাটক নভেল পড়তে পারার উর্দ্ধে নয়, কাজেই সমস্ত মন বুদ্ধি চিন্তা সেই একটি মানুষকে কেন্দ্র করেই ফুটে থাকে সূর্যমুখী ফুলের মতো।

তবে অশোকার ভাগ্য ভালো।

প্রতীক্ষার শেষে—সহনীয় প্রতীক্ষার শেষেই ওর দেবতার দর্শন মেলে।

অসহনীয় প্রতীক্ষার শেষে—খোঁপার মালা খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আছড়ে এসে বিছানায় পড়তে হয় না নিঃসঙ্গ একক বিছানায়।...মধুমালা দেবীর আমল থেকে যা চলে আসছে এবাড়ির বউদের।

দাসী নইলে চলতোই বা কি করে তাদের? সারারাত্রি একলা ঘরে পাহারা দেবে কে—দাসী না থাকলে? অশোকার পাহারাদার প্রদ্যোত নিজে। সন্ধ্যা হ'লে সেই যে তিনতলায় উঠে আসে আর তাকে নামানো যায় না।

প্রদ্যোত এ বংশের ব্যতিক্রম।

পুরুষ-চিত্তের সমস্ত আবেগ ওর নিতান্তই অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করা বিবাহিতা স্ত্রীকে ঘিরে। অশোকাকে ও সেতার বাজাতে শেখায় সারা সন্ধ্যা ধরে। পিতৃপুরুষের রক্তের ধারা কিছুটা আছে বৈ কি, আছে এই সুরের প্রতি অনুরক্তি। কিন্তু হিসেবী ছেলে—পিতৃপুরুষদের মতো সেই অনুরক্তির পেছনে উন্মাদের মতো অর্থব্যয় করবার মতো বোকা নয়। শোনার চাইতে শেখার সখ ওর বেশী ছিল, এখন সখটা সঞ্চারিত হয়েছে শেখানোয়।

নীলনয়না তাই মিনিটে মিনিটে ঘৃণায় লজ্জায় কণ্টকিত হতে থাকেন। বৌয়ের আঁচল-ধরা পুরুষমানুষ যেমন অসহ্য, তেমনি অসহ্য ঘরের বৌয়ের বাইজীর মতো আচার আচরণ।

প্রতি পদে নিজেদের আমলের সঙ্গে তুলনা করে হতাশায় ক্ষোভে ক্ষতবিক্ষত হন নীলনয়না। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপিচুপি সিঁড়িতে উঠে যান, বেহায়াপনা কতোদূর এগোতে পারে তার হিসাব নিতে। তিনতলার ছাদের মাঝখানে ছাতার মতো গড়নের ঢালু ছাদ দেওয়া মার্ব্বেল পাথরের গোল বেদীটায় ওবা দু'জনে বসে—প্রদ্যোত আর অশোকা। যেখানে সারা বিকেল আর সারা সন্ধ্যা একলা বসে থাকতেন নীলনয়না।

প্রসন্ননারায়ণের পায়ের ধুলো?

পড়তো বৈকি! কদাচিৎ কখনো পড়তো না এমন নয়। সেই অনিশ্চিত একদিনের আশায়—আগুনের মতো গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে আগুন-রঙা রেশমী শাড়ী পরে আর 'পদ্মপাতা' খোঁপায় মল্লিকার মালা জড়িয়ে পাথরের মেজেয় ভেলভেটের আসন পেতে বসে থাকতেন নীলনয়না...হালফ্যাসানি মেয়েদের মতো বই খাতা নিয়ে অথবা গানবাজনা নিয়ে সময় কাটাবার উপায় ছিল না, তাই সময় কাটতো দীর্ঘশ্বাসে।...

গোল বেদীর খিলেনে খিলেনে সেই দীর্ঘশ্বাস কি পুঞ্জীভূত হয়ে নেই? হতাশ বিক্ষুব্ধ বেদনামর্মরিত বহু সন্ধ্যা আর রাত্রির সাক্ষ্য! বাগানের আনাচে কানাচে সেই স্তূপীকৃত গোড়েমালার ধ্বংসাবশেষ কি এখনো খুঁজলে মেলে? মধুমালার আমল থেকে যা জমা হচ্ছে?

মধুমালার তবু সন্তান ছিল, সন্তান ছিল তারাসুন্দরীর, গিরিবালার, আর বসন্তমঞ্জরীর, যৌবনের জ্বালা স্তিমিত হয়ে এসেছিল তাঁদের। কিন্তু নিঃসন্তানা নীলনয়নার প্রখর যৌবন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের

মতো জ্বলে নিজেকেই পুড়িয়ে মেরেছে শুধু।

অশোকাও আজ পর্য্যন্ত নিঃসন্তান, তবু একটি স্নিগ্ধ দীপ্তি ওর মুখে! দাহ নয়, দীপ্তি।

ভস্মাবশেষ নীলনয়না নতুন করে পুড়ে মরছেন সেই দীপ্তিতে।...

প্রদ্যোতের হাসি-গল্পে উচ্ছ্বসিত অশোকার কলহাস্য মুখরিত হয়ে ওঠে গোলখিলানের খোপে খোপে...আর সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অবশ হয়ে আসে নীলনয়নার হৃৎপিন্ড।...

অশোকা যেন কি সর্ব্বনাশ করতে বসেছে।

প্রথম দর্শনের আদর সোহাগের পালা শেষ হয়ে যখন সেতারের ঝঙ্কার সুরু হয়, তখন নিতান্ত বিরক্ত হয়েই নেমে যান নীলনয়না। ঘরের বৌয়ের এই বাইজীর মতো আচার আচরণ তাঁব অসহ্য।

তাঁরা এই অসহ্যপনায় সায় দেবার মতো লোকেরও অবশ্য অভাব নেই এতো বড়ো বাড়ীটায়। বয়েসকালে যাদের দিকে কোনো দিন তাকিয়ে দেখেননি নীলনয়না, আজ তাদের ডাক পড়ে তাঁর সান্ধ্যসভায়। এসময়টা যে ওরা কিছুতেই নামবে না—না অশোকা, না প্রদ্যোত, সেটা নিশ্চিত জানা বলেই এখনাকার আসরটা জমজমাট।...

—বৌমা এবাড়ীর মুখ হাসালো।

এবাড়ীব বিরাট মহিমায় মহিমান্বিতা নীলনয়না রূপোর পানের বাটাটা কোলের গোড়ায় টেনে নিয়ে বিষ-হাসি হেসে বলেন—ঘরের পয়সা কেন বাইরে যাবে, তাই খোকা আমাদের বৌকে বাইজী কবে তুলে পযসা বাঁচাচ্ছে।

সভার সদস্যাদের মধ্যে পুরনো আমলের বামুনদিদি আছেন এক সদস্যা। নিরিমিষ ঘরের ভার ছিল তাঁর হাতে, এখন হস্তান্তরিত হয়েছে তাঁর বিধবা মেয়ে নাবাণীর কাছে। বামুনদিদির অবসর এখন প্রচুব।...মানুষটা বোকাগোছের, তাই প্রতিবাদ মরে বসতে বাধে না ওর।

নীলনয়নাব মন্তব্য শুনে বলে—তাই বা কেন বড় বৌঠাকরুণ,...এখনকার তো ঘরে ঘরেই হয়েছে গান বাজনা।

—এখনকাব কথা আব তুলো না বামুনঠাকরুন, যেমন পদে আছো থাকো, বড়ো কথা কইতে এসো না। 'হালতি বালতি' ঘরের মতন চালচলন কখনো চলেছে এ বাড়ীতে? চিরদিন বাজারাজড়ার চালে চলে এসেছে সবাই।—তখনকার কথা একবার ভাবো দিকিনি? বলি কেউ তো আর তোমরা নতুন আস নি? কি জমজমাটের বাড়ী, পুরুষদেরই বা কি বোলবোলাও!...আর খোকা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।...

ঘৃণায় নাক সিঁটকে দু'টো পান আর এক মুঠো দোক্তা মুখে ফেলে দিয়ে নীলনয়না বলেন—খোকা একেবারে হদ্দ কবলো আমাদের! এ বংশে যে এমন মেনিমুখো ব্যাটাছেলে জন্মাবে তা কখনো ভাবিনি! কর্ত্তারা ওপর থেকে দেখে বোধহয় হাসছেন!

জ্ঞাতি ননদ শশীমুখী বলেন—তা' যা বলেছো, কেলেঙ্কারি একেবারে! সেই বিকেল বেলা এসে ওপরে উঠেছে প্রদ্যোত! ও মা কি ঘেন্না!...যাই বলো বড়ো বৌ, পুরুষমানুষের একটু 'বারটান' না থাকলে যেন স্বাদ থাকেনা। ব্যান্ননের স্বাদ করতে যেমন লঙ্কা মরিচের জ্বলুনি একটু চাই।

চিরদিনের আশ্রিতা শশীমুখী, অনেক দিনের অনেক লঙ্কা মরিচের ইতিহাস তাঁর জানা।

—তা'ও যদি তোমার আমার মতো রূপ থাকতো!

'তোমার'টা নিতান্ত অনুপ্রাস হিসেবেই ব্যবহার করেন নীলনয়না।...আদ্দির সেমিজ আর ফরাসডাঙ্গার থানপরা নিভাঁজ নিটোল নিজের শরীরটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে হেসে উঠে নীলনয়না বলেন—ওই রূপেই তদ্‌গত খোকা! দেখতো যদি সেকালের 'কুসুম কীর্ত্তুনী' কিম্বা 'কিশোরী বাইজী'কে? রূপ তো চক্ষে দেখেনি।

বামুনঠাকরুণের কথা কওয়াই চাই—তাই বলে ওঠেন—এ তোমার অসঙ্গত কথা বড়বৌ ঠাকরুণ, খোকার কি পয়সার অভাব আছে? ইচ্ছে করলে কর্ত্তাদের মতন সবই করতে পারে। গুরুর দয়া যে কুপথে মন যায়নি।...

—আবার বক্‌বক্ করে মরছো বামুন ঠাকরুণ। লোকের বাড়ি ভাত রেঁধে দুটো অন্ন জুটিয়ে এসেছো। সভ্যতা-সৌষ্ঠবের জানো কি?

তখনকার মতো চুপ করে যান বামুন ঠাকরুণ। কিন্তু সভ্যতা-সৌষ্ঠব সম্বন্ধে খুব যে অবহিত হ'ন এমন নয়।

নীলনয়নার মাধবী-সন্ধ্যা এখন আর দীর্ঘশ্বাসে মুখর নয়, অনুগত কৃপাপ্রার্থিনীদের কলগুঞ্জনে মুখর।...

কিন্তু বাড়াবাড়ি আর সহ্য হয় না।

প্রদ্যোত নাকি মাষ্টার রাখছে বৌকে লেখাপড়া শেখাতে!

কিন্তু নীলনয়নার কি সব প্রতিপত্তি শেষ হয়েছে? স্বামী না হোক, এ সংসারটা কি একদিন হাতের মুঠোয় ছিল না তাঁর? তবে?...মুখ বুজে এতো অনাচারই বা সহ্য করবেন কেন?

মধ্যাহ্নের আসরে ডেকে পাঠালেন একদিন অশোকাকে।

দিনের ঘুম থেকে উঠে এসেছে অশোকা, নীলাম্বরীর শিথিল আঁচল গায়ে জড়ানো, দুই চোখে জড়ানো গতরাত্রির জাগরণের ক্লান্তি।...

নীলনয়না এমন বুড়ো হননি যে এসব চিনতে ভুল হবে।

সর্ব্বাঙ্গ আর একবার নতুন করে জ্বালা করে উঠলো তাঁর। বললেন—এ সব কি শুনছি বৌমা?

—কি শুনছেন বড়মা?

থতমত অশোকা প্রশ্ন করে।

—এই সব মাষ্টার রাখারাখির কথা? আমি বলে দিচ্ছি এ বাড়ীতে ওসব চলবে না, এখনো আমি আছি।

—কিন্তু বড়মা— লেখাপড়া ভালো করে শিখিনি বলে রাগ করেন যে।

—ঢং আর কোরো না বাছা! 'রাগ করবেন'! রাগ কি আর আছে ওর শরীরে? সে সব ছিল তখনকার আমলের বাবুদের। খোকার হালচাল দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমাদের। ছিঃ ছিঃ! এ বংশের ছেলে হয়ে চব্বিশ ঘন্টা বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকা!

—এ বংশ বলেই তো ভয় করে বড়মা—অশোকা মুখ তুলে পরিস্কার গলায় বলে—এ বংশের ইতিহাস তো আমার শুনতে বাকী নেই।

—তবুও সে ভালো ছিল বাছা, ঢের ভালো! সে তবু পুরুষের পৌরুষ ছিল। যাক্‌গে, আমার এই সাদাকথা—এ বাড়ীতে ওসব চলবে না। বৌ নিয়ে আদিখ্যেতা এ বাড়ীর কেউ কখনো করেনি।

অশোকা ধীরে ধীরে সরে যায়।

নীলনয়না ডাকিয়া পাঠান বাড়ীর সরকারকে।......

—আপনাদেরও বলি সরকার মশাই, বাড়ী যে একেবারে মঠমন্দির হয়ে উঠলো।

সরকার মশাই অবাক হয়ে মাথা চুলকোতে সুরু করেন।

—বলছি আমোদ আহ্লাদ ফুর্ত্তিটুর্ত্তি কি পৃথিবী থেকে উড়ে গেছে? আপনি বিচক্ষণ লোক, কতো আর বোঝাবো আপনাকে? খোকা আমার সুছেলে, আমার ভয়ে মুখটি ফুটতে পায় না, কিন্তু বেটাছেলে—সাধ আহ্লাদ কি নেই? বিশেষ তো এ বাড়ির বেটাছেলে!

মুচকে একটু হাসলেন নীলনয়না।

সরকার মশাই আমতা আমতা করে বললেন—তা'হলে কি করতে বলেন?

কি আবার বলবো? নতুন কিছুই নয়। বাগানবাড়ীটা ঝাড়ামোছা করান—ভালো 'গাউনী কীর্ত্তুনী' নিয়ে এসে দু'দিন জলসা-টলসা দিন—কেবল বাড়ী বসে থেকে থেকে ছেলের আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেল যে।

—কিন্তু বড়মা, খোকাবাবু রাগটাগ করবেন না তো?

—রাগ যাতে না করে সেই কৌশল করবেন। সেটুকু বুদ্ধি আপনার ঘটে আছে আশা করি!...সে আমলে আপনিও তো কম ঘুঘু ছিলেন না।

নীলনয়নে নীলাভ আগুন জ্বেলে উঠে যান নীলনয়না।. .

আর প্রতীক্ষা করতে থাকেন দিনের পর দিন...করে অশোকার প্রতীক্ষা শেষ হবে দীর্ঘশ্বাসে। সে দীর্ঘশ্বাস গোল খিলানের ফাঁকে ফাঁকে জমা হবে অনেকদিনের সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।...

পুরনো বাগানবাড়ীর তালাবন্ধ ঘর আবার আলোয় ঝলমল করে ওঠে, কাঁচের গ্লাসের ঠুনঠুন আওয়াজের সঙ্গে নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কন শোনা যায়।

তিনতলার ছাতে মার্ব্বেলের বেদীতে বসে সে শব্দ কানে আসে।...

কানে আসে শুধু রাত্রি যখন গভীর হয়।...বাইরের আর সব শব্দ কমে আসে।

—খোকার আবার একী হল বৌ? একগাল হেসে প্রশ্ন করেন শশীমুখী।

—আরে ভাই বাঘের বংশে বাঘই হয়।...এত দিন চাপা ছিল বৈতো নয়। ছিল আমারই ভয়ে। এখন যতোই হোক বড়ো হচ্ছে!...

সান্ধ্যআসর মুখর হয়ে ওঠে খোকার নতুন কীর্ত্তির বর্ণনায়।

এই আসরে একদিন অশোকাকে ডেকে পাঠালেন নীলনয়না।

দাসীকে বলে দিলেন—ডেকে আন বৌমাকে।...আহা মরে যাই, বাছা মুখ শুকিয়ে বসে আছে, কাছে এনে দু'দন্ড দু'টো ভালো কথা, ঠাকুর দেবতার কথা বলি। কপাল দেখ না, দু'দিন স্বামী-সুখের আস্বাদন পেয়ে—

অশোকা ডাক শুনে নেমে এলো, না কি আসছিল কে জানে।...সাজ-সজ্জায় যেন একটু বেশী অসাধারণত্ব।...

—এসো বৌমা। কোথায় একলাটি বসে আছো, এখানে এসে বসো খানিক।

—ফিরে এসে বসবো বড়মা।

—ফিরে এসে? যাচ্ছো কোথায়?...অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন নীলনয়না।

—বাগানবাড়ীতে।...বিমলা দেখ তো বাইরে গাড়ী এসেছে কিনা।

—তুমি বাগানবাড়ীতে যাবে!...নীলনয়নার আর কথা যোগায় না।

—যাবো বৈকি বড়মা! এইবেলা সাবধান না হলে আবার ভবিষ্যতে কার সুখের ঘরে আগুন জ্বালাতে যাবো হয়তো।

[১৩৫৪]

বহুরূপী

আট ভাইবোনের মধ্যে নিখিল সকলের ছোট। মায়ের কোলের ছেলে।

শুধু ছোট বলেই নয়, দাদা আর দিদিদের থেকে বেশ কিছু জুনিয়ার। কিন্তু 'কোলের ছেলে' বিশেষণটাব সঙ্গে যে একটা 'আদুবে' ভাব জড়িত থাকে, নিখিলের ভাগ্যে তার একান্তই অভাব।

কারণটা এই—সপ্তম সংখ্যাটিও প্রায় লায়েক হয়ে ওঠার পর হাঁফ ছেড়ে নিশ্বাস নিয়ে, আর গৃহিণীত্বের কোঠায় প্রমোশন পেয়ে—আবার অষ্টমের আবির্ভাব আদৌ প্রীতিকর হয়নি নিখিলের মা বিরজার কাছে। যেন বিবাহিতা মেয়েদের, আর বিবাহযোগ্য ছেলেদের সামনে মুখ তুলতে না পারার মতো অপরাধের একটা সাক্ষ্য নিখিল।

তার ওপর রোগা আর কালো একটা ছেলে। যাকে দেখলে এ পরিবারভুক্ত বলেই মনে হয় না। পরিবারের মধ্যে প্রথম কালো চামড়ার আমদানী করেছে নিখিল।

নিজে বিরজা এ বয়সেও—এতগুলি ছেলেমেয়ের মা হয়েও—টুকটুকে, থুপথুপে। বাজার চলতি বিশেষণে 'লক্ষ্মী ঠাকরুণটি'। নিখিল বাদে বাকি ভাইবোনগুলি যেন কাঁচের পুতুলেব ঝাড়।...ছোট ছোট চোখ, খাঁদা খাঁদা নাক, ঝিকঝিকে দাঁত, আর ফুটফুটে রঙওয়ালা গোলগাল ছেলেমেয়েগুলিকে দেখলেই লোকের পুতুলের নামটাই মনে হ'ত চট করে। ওর বড়দির নামটাই তাই রাখা হয়েছে 'পুতুল'।

তাল মিলিয়ে মেজদি আর ছোড়দি হচ্ছেন ডলি আর লিলি। সত্যি বলতে কি, এত বড় হয়েও ওদের চেহাবার 'পৌত্তলিকতা' ঘোচেনি। প্রতুল, অতুল, অজয় আর অখিল, সবই ওই এক ছাঁচের। এদের ভাইবোনদের সকলেরই গালে টোল খাওয়া আহ্লাদে হাসিটা সমাজে প্রায় বিখ্যাত। গালে টোল প্রত্যেকেরই পড়ে, কেবল নিখিল বাদ।

ও আলাদা—একেবাবে আলাদা। সকলেব থেকে বিপরীত। ওব আড়া ছিপছিপে লম্বা, চোখ নাক আর ধারাল চোয়ালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা চওড়া কপাল, সামনের দাঁত দুটো হয়তো বা একটু উঁচুই। যার জন্যে ওকে দেখলেই কেমন যেন উদ্ধত মনে হয়। ওর বাহুল্যমাংসবর্জ্জিত গালে হাসলে টোল খাওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

তবু—শুধু আকৃতির বিরুদ্ধতা, এতদিনে এই বাইশ বছরের অভ্যাসে অবিশ্যি ভুলে যেতো সবাই, যদি নিখিলের প্রকৃতিটাও না হ'ত সকলের থেকে বিপরীত।

বিরুদ্ধ চেহারা বরং সহ্য হয়, সহ্য হয় না বিরুদ্ধ আচরণ।

অথচ বাইশ বছর ধরে সহ্য করতেও হচ্ছে এঁদেরকে—বিরজাদম্পতি আর তাঁদের ভালো

ভালো ছেলেমেয়েদের!

ওঁরা যখন ভেতরে ঘুণধরা বনেদিয়ানার ওপর জৌলুসহীন জড়োয়া আর রিপু করা শালের পালিশ লাগিয়ে সমাজে চরে বেড়াতে চান, নিখিল তখন পুরনো স্যান্ডেল আর ঘাড়-ছেঁড়া টুইল সার্ট পরে ওঁদের মুখ পোড়ায়।

ওঁরা যখন হঠাৎ অতিথি অভ্যাগত এসে পড়লে ভালো ভালো নতুন গালচেগুলো "তাড়াতাড়িতে" খুঁজে না পেয়ে হাতের কাছে পড়ে থাকা ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া দড়ি-বার-করা গালচেখানাই পেতে দেন তাড়াতাড়ি, নিখিল তখন জাঁকিয়ে বসেই মহোৎসবে বাজার দরের গল্প ফেঁদে আক্ষেপ করে তাদের কাছে, সামান্য এক জোড়া মাদুরের জন্যে কতো অসুবিধে ভোগ হচ্ছে। ছ'মাস ধরে কিনে উঠতে পারা যাচ্ছে না জিনিষটা—মূল্যের দাহিকাশক্তির দাপটে।

দাদারা যে ওর উঁচু দাঁতের ঔদ্ধত্যের ওপর ঘুষি বসিয়ে দেবার প্রবল স্পৃহাকে সামাল করতে পারে—সে তারা নিতান্তই 'টোল খাওয়া গাল'ওয়ালা বলে।

প্রতি পদে এই রকম করবে নিখিল।

ওর চৈতন্যোদয় করতে—আজ পর্য্যন্ত যত ধিক্কার, লাঞ্ছনা, আর সদুপদেশ বর্ষিত হয়েছে—একত্রে জড়ো করলে কতো যে ওজন হ'ত কে জানে। বোধ করি এগুলি উপযুক্ত পাত্রে বর্ষিত হলে দু'এক ডজন বাল্মিকী, বিল্বমঙ্গল, আর জগাই মাধাই তৈরি হতে পারতো।

কিন্তু নিখিলের আর চৈতন্য হলো না।

নিশ্চিন্তচিত্তে ঘুরে বেড়ায়, যা খুসি তাই করে, যার তার সঙ্গে মেশে, এবং অম্লান বদনে দু'বেলা খাবার আসনে এসে বসে। অবশ্য ঠিক সময়মতো এবং সকলের সঙ্গে বসবার অবসর তার হয় না।

বাড়ীর কোনো কাজে তাকে পাবার উপায় নেই। একটা উপকারে শুধু লাগে সে, সেটা হচ্ছে বাড়ীর প্রত্যেকটি সদস্যের রসনা পরিতৃপ্তির সহায়তা করা। মায় ঝি-চাকরটার পর্য্যন্ত।

ভাববেন না—এর জন্যে দেশীবিলাতি কোনো মুখরোচক খাদ্যবস্তুর আমদানী করতে হয় নিখিলকে। কষ্ট করে কিছুই করতে হয় না তাকে, প্রত্যেকের রসনাকে যথেচ্ছ সমালোচনা করবার মধুর তৃপ্তির যোগান দিচ্ছে সে নিজেই, বা নিজের যথেচ্ছ ব্যবহারে।

যাই হোক এতদিন পর্য্যন্ত চলছিল তবু, কিন্তু এবারে যেন নিখিল পরিবারের সকলের মাথায় বাজ ফেলেছে। সেবারে যখন সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে 'হালতি বালতি ঘরের' ছেলেদের মতো দুটো টিউশনি ধরেছিল নিখিল, তখনো সবাই প্রায় বজ্রাহত গোছই হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন? এখনকার ব্যাপারের সঙ্গে তুলনাই হয় না তার। এর পক্ষে সে কিছুই নয়।

ইদানীং যে তার ওপর একটা 'দুরছাই, করুক যা খুসি' গোছ ভাব এসে গিয়েছিল, সেটা নিঃশেষ হয়ে গেলো। "কিছুতেই না" "কখনোই না" গোছের মনোভাব নিয়ে সবাই একবার করে যুদ্ধে নামছে।

নিখিলের মেজ-ভগ্নীপতি কোথা থেকে যেন সন্ধান-সুলুক জেনে নিয়ে দুঃসংবাদটা 'চাউর' করলেন শ্বশুরবাড়ী এসে।

কি একটা সিনেমা কোম্পানীতে নাকি কাজ নিয়েছে নিখিল! অভিনয় করবে। অর্থাৎ এ বংশের মুখ শুধু পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, পোড়ামুখের ওপর আবার চুন-কালি লেগেছে।

এব পরেও কি আর রিপু করা শালের পালিশে আভিজাত্য অটুট রাখা যাবে? ছেলের সিনেমায় নামা!—এ আবার কল্পনা করা যায় নাকি?

বড়দাদা প্রতুলই এসেছিলেন প্রথম হাল ধরতে।

কোন ভূমিকা না করেই সোজাসুজি বললেন তিনি, তোমার মতলবটা খুলে বলবে আমাদের?

বড়বাবুর সামনে ক্ষুদে কেরানীর মতো চেয়ার ছেড়ে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালো নিখিল, হাত দু'টোই যা জোড় করতে বাকী। বড় দাদাদেব দেখলে এই গরুড়পক্ষীর ভঙ্গিটি করবেই ও, তাঁরা এটাকে সম্মান না ভেবে অসম্মান ভাবলেও।

—কি বলছেন বড়দা?

—বলছি না কিছুই, শুধু তোমার মতলবটা জানতে চাইছি।

—আমার মতলব? কই বিশেষ কিছু তো দেখতে পাচ্ছিনে বড়দা!

—তুমি নাকি সিনেমায় নামা মনস্থ করেছো?

—মনস্থ? না তো, এখন আর মনস্থ করছি কই?

প্রতুল থতমত খেয়ে বলে—তবে যে রাসবেহারী বললে, তুমি নাকি কোন সিনেমা কোম্পানীতে—

—'ওঃ, সেই কথা বলছেন? সে তো কন্‌ট্রাক্ট হয়ে গেছে অনেকদিন। নতুন করে আব কিছু মনস্থ করছি না তাই বলছি। না, রাসবিহারীবাবু ভুল বলেননি কিছু।

গম্ভীর ভাবী গলায় দাদা বললেন—তুমি কি ভাবো, যতো ইচ্ছে 'যা খুসি' করবার অধিকার আছে তোমার?

—কি যে বলেন বড়দা—সামান্য একটু হেসে ওঠে নিখিল, গালে টোল খাইয়ে নয়, উঁচু দাঁতের ঔজ্জ্বল্যে। বললো—অধিকারের গণ্ডিটা কী বিশ্রী ছোট আমাদের, ভাবলে তো মাথা ঘুরে যায়।...সামান্য দিয়েই ধরুন—সামনের ওই লালবাড়ীর দরজা দুটো সর্ব্বদাই খোলা থাকে, দেখছেন তো? ওর চৌকাঠে মাথা গলাবার অধিকাব আমার আছে কোনদিনই ভাবতে পারি না এমন কথা।

—ভাবলেই পারো...বলে গটগট করে বেরিয়ে যান প্রতুল। আর কথা বলবার প্রবৃত্তি তাঁর নেই।

তারপর এলেন বাবা।

বললেন—নানা রকমে বংশের মুখ হাসিয়েও আশা মেটেনি তোমার?

—বংশের মুখ হাসাতে পারব এ আশা কোনদিন করিনি বাবা—নিজে না হেসেই বলতে থাকে নিখিল—তার জন্যে তো দাদারাই রয়েছেন। বংশের যদি সত্যিই মুখ চোখ কিছু থাকে, তা'হলে আমার দুর্ব্ব্যবহারে কাঁদাই স্বাভাবিক তাঁর।

—হুঁ! কথার জাহাজ একটি! তোমার মত ছেলেরা বায়স্কোপ থিয়েটার করবে না তো করবে কারা। কুলাঙ্গার হতভাগা!...তবে আমার এই সাফ্ কথা, দুর্মতি যদি না ছাড়ো, এ বাড়ীতে আর জায়গা হবে না তোমার!

নিখিল হাসলো—এ বাড়ীতে বেশীদিন কারই বা জায়গা হবে বাবা? দয়ালহরিবাবুর দয়ায় যে ক'টা দিন থাকতে পারা যায়।

গিরীন্দ্রমোহন রাগে অন্ধকার দেখেন চারিদিক।

চুপি চুপি দয়ালহরি মোক্তারের কাছে বাড়ীটা বন্ধক দেওয়ার কথা কাকপক্ষীতে টের পায়নি, আর ও কিনা সেই খবর যোগাড় করে আনলো? ছেলে তো-নয় চিরশত্রু!

গিরীন্দ্রমোহনের অন্ধকাব দেখার ফাঁকে চোখ তুলে একবার বাড়ীখানার আপাদমস্তক দেখে নেয় নিখিল। বাড়ীখানা প্রকান্ড সন্দেহ নেই, জমি আছে বিস্তর, কিন্তু জীর্ণতার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

ঠাকুর্দার আমলের পর থেকে মিস্ত্রীর হাত পড়েনি।...প্রাচীন দেহে অতীত মর্য্যাদার কিছুটা জীর্ণ সাক্ষ্য নিয়ে মৌন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এতো অবহেলার প্রতিশোধ নিতে হুড়মূড় করে ভেঙে পড়ে না যে একদিন, তাই আশ্চর্য্য!

কিন্তু ভেঙে পড়াই উচিত ছিল। নিখিল ভাবে—তাতে হয়তো ভালো হোতো ওদের। ওর নোনাধরা ইঁটের খাঁজে খাঁজে জড়িয়ে আছে যে নোনাধরা আভিজাত্য, তাকে জীইয়ে রাখবার চেষ্টা শুধু মূর্খতা নয়, অপরাধ!

—মর্টগেজের টাকা তো কোনদিনই শোধ দিতে পারবেন না বাবা, তার চাইতে বেচেই দিন না বাড়ীটা? জমির দরেও যদি কেউ নেয়, অনেক লাভ।

গিরীন্দ্রমোহন রাগে কাঁপতে থাকেন...সত্যিকারের কাঁপা। কাঁপে হাত, পা, ঘাড়। এই ছেলেটাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। অজয় যখন মদ খেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় ইয়ার বন্ধুদের দ্বারা বাহিত হয়ে বাড়ীতে এসে পড়ে, তখনো এমন হাত পা কাঁপে না গিরীন্দ্রমোহনের। কাঁপে না লিলির শ্বশুরবাড়ীর ড্রাইভারের সঙ্গে লিলির নামোল্লেখ শুনেও।

বাক্‌শক্তি ফিরে পেলে বলেন, "টাকা শোধ করতে পাববো না", কেমন? বুড়ো বাপের মুখের ওপর এই ধিক্কার দেওয়াই তো উপযুক্ত ছেলের কর্ত্তব্য! লজ্জা করে না? এক পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই—

—আনবার চেষ্টাই তো করছি, অথচ তাতেই আপনাদের রাগ!

—চেষ্টা, চেষ্টা! থিয়েটার করে, ভাঁড়ামী করে, মুখে রঙ মেখে পয়সা আনা! ভদ্রলোকের ছেলের উপযুক্ত পেশা বটে! তুমি কি ভেবে রেখেছো—তোমার ওই পয়সা পা দিয়ে ছোঁব আমরা?

—কিন্তু মেজদার টাকা তো মাথায় করে নেন আপনারা।

—কেন, কেন, অতুলের কি দোষ হয়েছে শুনি? ওসব কে না করে:?

—করে, তবু রেস্ খেলাকে নিন্দেই করে লোকে।

—করুক করুক, পরিবারের মুখ পোড়ানো নয় সেটা, বংশের গায়ে ধুলো দেওয়া নয়। হতভাগা কুলাঙ্গার! জেনে রেখো, তোমার মত পরিবর্ত্তন না করলে এ বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ তোমার।

—জেনে রাখলাম—বলে হঠাৎ বাপের পায়ে হাত ঠেকিয়ে নমস্কারের মতো কি একটা করে নিখিল।

গিরীন্দ্রমোহন একটু কেমন অপ্রতিভ হয়ে যান সত্যি, কিন্তু না, নিজেকে চেক্ করতে পারেন না তিনি। এই ছেলেটার ওপর একটা জাতক্রোধ আছে তাঁর। ওর ওই বিনীত ভঙ্গীর নীচে লুকোনো যে ঔদ্ধত্য, সেটা অসহ্য।

এলো আরো তিন দাদা।

নিখিলের কাজটা যে তাদের গালে চড় মারার মতো হচ্ছে, এই কথাটা বোঝাতে নিখিলকে শুধু চড় মারতেই বাকী রাখলো তারা।...নিখিল কেবল হাসে। লাঞ্ছনা গঞ্জনায় হাসে—এইটেই সবচেয়ে অসভ্যতা নিখিলের।

নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ীর মোটরে চড়ে দিদিরা এলো।

পুতুলই যা ওকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখে, বরাবর দেখে। শৈশবকালে মায়ের অবহেলার পরিপূরক হিসেবে ওই যা একটু দেখাশোনা করতো নিখিলকে। ডলি তো ছুঁতোই না কালো বলে।

পুতুল একলা ওকে কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক বোঝালো। বললো—তুই ছেলেমানুষ, এখুনি টাকার ভাবনা ভাববার দরকার কি তোর?

নিখিল হেসে ফেলে উঠে দাঁড়ালো, গায়ের শার্টটা হঠাৎ খুলে ফেলে পিছন ফিরলো বড়দির দিকে।

—ইস!...ছি ছি!...এই রকম ছেঁড়া গেঞ্জি পরে তুই...পুতুল যেন শিউরে আপসে উঠলো—আচ্ছা তা আমাদেরও তো চুপিচুপি বলতে পারিস ভাই? আমরা তোর বড়োবোন, ভগবানের দয়ায় কিছুর অভাব নেই—তোকে দশ-বিশ টাকা দিতে পারি না?...তিনজনে মিলে কিছু কিছু দিলেই তো—

—অনায়াসে চলে যায় আমার, কেমন?...সত্যি, কেন যে এই সহজ উপায়টা মাথায় আসেনি তাই ভাবছি গো 'পুতুলরাণী'—

ছোট মেয়ের মত আদর করে বড়দির মাথায় চাপড় মারে নিখিল।...বোকাসোকা এই দিদিটির সঙ্গে যা সাদাসিধে কথা বলে নিখিল, ছোবল মারবার ফিকিরে থাকে না।

—ঠাট্টা করছিস?...চিরদিনের কথা কি আর বলছি? যতোদিন না কিছু সুরাহা হয়। তুই এই রকম হাড়ির হালে কাটাবি, আর আমরা সোনাদানা পরবো! কেমন লাগে আমাদের!...চোখ ছলছল করে আসে পুতুলের—বড়দা মেজদার গায়ে তো দিব্যি সিল্কের পাঞ্জাবি, জরিপাড় ধুতি দেখতে পাই—

—পরতে জানাও একটা আর্ট, বড়দি—

—বৌদিরা তো ঢাকাই শান্তিপুরী ছাড়া পরেন না দেখি—

—বোধ হয় বাপের বাড়ীর!

—হ্যাঁ! বারোমাস বাপের বাড়ীর কাপড়ে চলে!...এই যে আমরা বছরে মোটে একখানা কাপড় পূজোয় পাই, তাও শ্বশুরবাড়ীর লোকের সামনে খুলে পরতে লজ্জা করে এমন শাড়ী—

—এই তো ভুল করলে বড়দি! ওদের বাপের বাড়ীর সঙ্গে তুলনা তোমাদের? কিসে আর কিসে!...

—তুলনা করবো না? ওঃ, কেন শুনি?...এ বাড়ীর যা নামডাক ছিল তার সিকিও আছে ওদের? এখনই না হয় অবস্থা পড়ে গেছে—

অবিরত উল্টোপাল্টা কথা অম্লান বদনে বলে যেতে পারে পুতুল। নিজের কাছে অসঙ্গতিটা ধরা পড়ে না।

পুতুল যেমনি বোকা, তেমনি চালাক ডলি।

ও এসে যা বললো সে সব একেবারে কাটা কাটা ছাঁকা ছাঁকা। নিখিলের এ হেন কুৎসিত কাজে শ্বশুরবাড়ীতে ওদের মুখ দেখানো যে ভার হবে সেই কথাটাই বললো শুধু অসংখ্যবার।

—তোমাদের 'মুখ দেখানোর' দায়িত্বটা যে আমার ওপর ছিল সেটা তো আগে জানতাম না মেজদি—নিখিল হাসতে থাকে—তা'হলে কন্ট্রাক্ট করবার আগে একবার নয় পরামর্শ করতে যেতাম—সেজদার এক সেট পোষাক ধার করে।

—কেন, তোর কি ভদ্রবকম একটা জামাজুতোও নেই? ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ডলি—সবই বাড়াবাড়ি! এদিকে তো দাদা মেজদার মেয়েদের স্নো পাউডারের খরচা দেখি মাসে তিরিশ টাকা।

—আহা বেচারারা! নিখিল উদাস সুরে বলে—কতো উঞ্ছবৃত্তি করেই যে ওই টাকাটা সংগ্রহ কবতে হয় মেয়েগুলোকে...আরো ওদেব জন্যেই—

থেমে যায়।

লিলি এসেছে।

লিলির কথাবার্ত্তা যেন সুরবাঁধা তাবের যন্ত্র। কথা কইতে ভাবতে হয় না, ঠোকর খেতে হয় না ওকে।

—তুই কি মনে করিস বিশ্রী একটা কিছু করাই খুব বাহাদুরি? কেন যে তুই এ বাড়ীতে জন্মেছিলি তাই ভাবি অবাক হয়ে।...একবার ভাবিস না তোর এই রকম নীচ কাজে বাবা কি বকম আঘাত পাবেন? বাবার যে রকম হাই ব্লাড প্রেসার, জানিস আকস্মিক একটা আঘাতে হঠাৎ হার্টফেল করাও বিচিত্র নয়!

নিখিল এবার গম্ভীর হয়ে বলে—বনেদী হাড়ের মধ্যে সুরক্ষিত হার্ট অতো পল্‌কা হয় না ছোড়দি। ছেলেমেয়েদের নীচতা দেখে ফেল কববাব মতো পল্‌কা হার্ট হ'লে অনেক আগেই ফেল করতো।

মাকে ঘবে ঢুকতে দেখেই দুই হাত জোড় কবে উঠে দাঁড়ালো নিখিল, বললো—দোহাই মা, তুমি আব মিথ্যে খাটতে এসো না, এমনিতেই তো বামুনঠাকুবকে ছাড়িয়ে দিযে যথেষ্ট খাটুনি বেড়েছে তোমার!

—ছাড়িয়ে দিযে কি আবাব—বিরজা রেগে ওঠেন—দেশে গিযে যে আব আসছে না সে শয়তানটা!

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো বটে! আমার আবাব সব সময় মুখস্থ থাকে না কথাগুলো।...যাক্‌গে—বলছি তুমি আমাকে মানুষ করাবার চেষ্টা আর কোবো না মা। দেখলে তো কিছুতেই কি পারলে! হেরেই মরলে।

—না বাবা, তোমাকে মানুষ করার সাহস আর আমাব নেই, শুধু বলছি—কী বলেছিস লিলিকে? সে একেবারে জলস্পর্শ না করে চলে গেল!

—আমি আর কি বলবো—উদাসভাবে বলে নিখিল, বোধ হয় তোমাদের ওই আটার হালুয়া গলা দিয়ে গলবে না বলেই গলাবার চেষ্টা করেনি ছোড়দি!

—আটার হালুয়া? মেয়ে জামাই এলে তাই দিই বুঝি আমি?

—দাও না ? তবুও ভালো, শুনে স্বস্তি পাচ্ছি যে এনামেলটা এখনো জায়গায় জায়গায় আটকে আছে, আগাগোড়া চটা উঠে যায়নি।—কিন্তু তোমার আদরের ছোট মেয়েকে আমি কিছুই বলিনি মা! কেউ যদি কিছু বলে থাকে, সে বোধ করি ওর আত্মজ্ঞান।

—তোমার কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না বাছা, মনে রেখো তোমার দিদি ও।

—শুধু ওইটুকুই মনে রাখলে চলবে মা? ওর বরের ব্যাঙ্কের খাতাটা মনে রাখতে হবে

না?—কলকাতায় ক'খানা বাড়ী আছে ওদের! কটা গাড়ী আছে! এসব অমনি ভুলে গেলেই হলো?

রাগ করে উঠে যান বিরজা।

এক সময় এসে উদয় হন বড়ো বৌদি। এঘরে কদাচিৎ পা পড়ে তাঁর!

—এই যে আসুন! বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ওঠে নিখিল।

—ঢং কোরো না ছোট্ঠাকুরপো, আমি তোমার চাইতে দশ বছরের বড়ো, তা জানো?

—জানতাম না, তবে জানলাম—দশ নয় বিশ।

—তার মানে?

—মানে—দশটা বছর কি আর হাতে না রেখেছেন?

—থাক্, ঢের হয়েছে! বাজে কথা থাক—বলতে এসেছি—

—যা বলতে এসেছেন সব জানি আমি, কেন আর পরিশ্রম করবেন।.....আমি যেন উচ্ছন্ন না যাই, এই উচ্চবংশের চাঁদমুখে যেন কালি না মাখাই, পিত্রালয়ে আপনাদের মুখ দেখাবার পথ বন্ধ না করি, ইত্যাদি, ইত্যাদি, কেমন তো?

—হয়েছে হয়েছে! রাণু রেখার বিয়ের কথাটা একবার ভেবেছো? কাকা বায়স্কোপ করে শুনলে ভালো ঘরে বিয়ে হবে ওদের?

—সেটা না করলেই কি বিয়ে হবে আপনার আশা হয়?

—হবে না? কেন হবে না তাই শুনি? ওরা কি এতোই খারাপ দেখতে—

—সর্ব্বনাশ! তা' বলছি না দোহাই আপনার, শুধু বলছি ভালো ঘরের দক্ষিণাও তো ভালো? বাবার না হয় 'সর্ব্ব টর্ব্ব' কিছুও ছিল, মেয়ে তিনটিকে ভালো ঘরে দিতে 'স্বান্ত' হয়েছেন—কিন্তু বড়দার—

—ওই তো, ওই জন্যেই তো সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায় আমার! নিজের মেয়েগুলিকে লাট-বেলাটের ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের দফা শেষ করেছেন তোমার বাবা।......আমি ওসব জানি না, ভিটে বিক্রি করিয়েও রাণু রেখার ভাল বিয়ে দেবো আমি।

—তাহলে এরপর অমল কমলের বৌদের রাতদিন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলবে।

—বয়ে গেল।....কিন্তু তুমি ছোট্ঠাকুরপো, মেয়েদের বিয়ের আগে আর বেলেল্লাপনা কোরো না কিছু।

—এমনও তো হতে পারে, তাতেই সুবিধে হয়ে যাবে বিয়ের। অর্থকৌলীন্য বলে একটা কথা আছে তো?

—কি? তুমি ভেবেছ, তোমার ওই টাকা পা দিয়ে ছোঁবেন তোমার দাদা? চেনো না মানুষটিকে?

—টাকার গায়েও দাগ পড়ে নাকি বৌদি?

—ঘেন্না ধরিও না ছোট্ঠাকুরপো....

মেজোবৌ সরাসরি কিছু না বলে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে— টাকার জন্যে যদি সবই করা যায় দিদি, তো বলুন না ছোট্ঠাকুরপোকে, আমরাও ষ্টেজে গিয়ে দাঁড়াই তবে? সংসারে কিছু টাকা আসুক!

—ওই তো মুস্কিল, সেটি হবার যো নেই! অথচ এতো চমৎকার ষ্টেজ-ফ্রী আপনারা, আর এমন সুন্দর অভিনয়-কুশলী!

—দেখছেন তো দিদি, ওই জন্যেই তো কথা কইতে যাই না আমি। গুরুলঘুজ্ঞান এ বাড়ীতে কারুর নেই। আমাদের ওখানে—

—মাটি করেছে!.........বৌদি, আমার চা'টা হয়ে থাকে তো দিয়ে দিন চট করে, ওখানের দৃষ্টান্ত শুরু হয়ে গেলে উঠতে পারা যাবে না।

মেজবৌ রাগ করে চলে গেল।

শুধু ভাইঝিরা।

তারাই যা হঠাৎ চিরঅবজ্ঞাত ছোটকা'কে অলৌকিকত্বের কোঠায় উঠতে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছে। সত্যিকার নিজেদের একটা মানুষের ছবি পর্দ্দায় উঠবে, এটা অলৌকিক ছাড়া আর কি?

সিনেমা দেখার অভাবটা যে ঘুচলো, এবার থেকে সেটা সুনিশ্চিত। একটু তোয়াজ করতে পাবলে বেশকিছু আদায় করাই কি যাবে না ছোট্‌কার কাছে? শাড়ি, ব্লাইজ, প্রসাধন দ্রব্য। পুরানো শাড়ী কেটে নতুন ফ্যাসানের ব্লাউজ সেলাই করে, আর মুচিকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে ছেঁড়া জুতা লুকিয়ে সেলাই করিয়ে নিয়ে আব তো চলে না। দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে জীবন! টাকা হাতে থাকলে দেবেই, এ আস্থা আছে নিখিলের ওপর। ওর টিউশানির সামান্য টাকা থেকেই তো তবু দিচ্ছে দু'পাঁচ টাকা।

চুপি চুপি ছোট্‌কার কাছে এসে পড়ল ওরা।

—ছোট্‌কা, "পাশ" দেবে তো সিনেমার?

—এবার কিন্তু পূজোর সময় টিসু সিল্কের শাড়ী—

টিসু সিল্কের পরে যে আরো কত ফ্যাসান এলো গেলো ওরা জানেই না।

—রেস্টুরেন্টে একদিন খাইয়ে দাও না ছোট্‌কা—

—আচ্ছা আচ্ছা, সব হবে- -

তিনটে মেয়ের মাথা একসঙ্গে ঠেকিয়ে ঠুকে দিয়ে হেসে ওঠে নিখিল।

এই দারিদ্র্য, এই নিরাবরণ দৈন্য অসহনীয়! তাই এর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা নিখিলের। রসাতলে যাক্ আভিজাত্য, টাকা চাই।....অনেক টাকা—কেরানীগিরির টাকা নয়, স্কুল-মাস্টারির টাকা নয়—অনেক বেশী টাকা। ভদ্র অভদ্র যে কোন উপায়েই হোক—আনতেই হবে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে পকেটে পুরে।

কোথা দিয়ে যে কি হয়—চঞ্চলা লক্ষ্মী কোন পথ দিয়ে যে ঢুকে পড়ে আটকা পড়ে যান কে জানে।....কিছুদিন পর থেকেই চেনাশোনা বন্ধু-বান্ধব দেখে অবাক হয়ে যায়—হরদম গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিখিল।...অতি বিখ্যাত একটি হোটেলে ওর বর্ত্তমানের ঠিকানা।

নিখিলও যে বিলাসিতা করতে জানে তাতে আর সন্দেহ থাকে না এখন।

গিরীন্দ্রমোহনের হুকুম অবিশ্যি ও গোড়ায় মানেনি, বাড়ীতেই ছিলো। হুকুম মানলো সেই দিন, যেদিন প্রতুল ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলো মেয়েদের জন্যে কেনা টিসু সিল্কের শাড়ীগুলো।

নতুন ওই শাড়ীগুলো পরে ছোট্‌কার ছবির প্রথম রজনীতে যাবার কথা ছিল ওদের। শাড়ীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবার সময় প্রতুল বেশী কথা না বলে শুধু ধিক্কার দিয়ে গিয়েছিল—এতো বেহায়া মানুষ হয়! আশ্চর্য্য!

সেদিন থেকে বাড়ী ছেড়ে এই হোটেলে বসবাস নিখিলের।

লক্ষ্মী তো ধরা দিচ্ছেন, কিন্তু কি করবে নিখিল লক্ষ্মীকে নিয়ে? কত খরচা করবে একা একা?

কি হবে টাকায়—যদি রেখা, রাণু, শিপ্রারা এখনো পুরনো শাড়ী কাটা ব্লাউস পরে? কি হবে—যদি অমল কমল স্কুলে টিফিন নিয়ে যেতে পায় না বলে অসুখের দোহাই পেড়ে মান বজায় রাখে সহপাঠীদের কাছে?....রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দিলেই বা ক্ষতি কি সে টাকা—যে টাকায় বিরজার সংসারের নিরুদ্দিষ্ট বামুন-চাকরকে ফিরিয়ে আনা যাবে না? আনা যাবে না একটা ডাক্তার—শয্যাশায়ী গিরীন্দ্রমোহনের জন্যে?...

সে টাকা নিয়ে কি করবে নিখিল—যদি টাকার অভাবে বিয়ে বন্ধ থাকে রাণুর, অথচ তার টাকা থেকে খরচ করা যায় না এক পয়সা?

বাড়ী যাবার ইচ্ছেটা কি খুব প্রবল নিখিলের?

কই, তেমন বুঝতে পারে না সে। শুধু গাড়ীটা নিয়ে বেরোলেই কেমন ইচ্ছে হয় ওই পথটা চক্কর দিয়ে আসতে।.....

কী সাংঘাতিক রকমের খুসি হত রাণু, রেখা, শিপ্রারা! কী হৈ-চৈ করতো খোকন, বুলু আর টুলু নিজেদের—সত্যিকার নিজেদের—একখানা গাড়ী পেলে!

শুধু নিজের জন্যে গাড়ীর কোন দরকার হয় নাকি? দু'আনা পয়সা ফেললেই তো চলে যাওয়া যায় কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

ঘাড়-ছেঁড়া টুইলসার্ট, আর কাঁটি ওঠা স্যাণ্ডেলেই তো চলছিল দিব্যি।

টিফিনের সময় অমল-কমলের স্কুলের ধারে যেতে পারলে মাঝে মাঝে খবর পাওয় যায় বাড়ীর। গিরীন্দ্রমোহন যে আর উঠতে পারেন না বিছানা থেকে, বিরজার চোখে ছানি পড়েছে, অজয় বৌ ছেলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করছে কিছুকাল থেকে, আর অখিলের বৌ শোবার ঘরের বাবান্দায় তোলা উনুন পেতে আলাদা রান্না করে নিজেরা কয়জন খায়—এ সবই কমলের মুখে শোনা। অমল চোখ পাকিয়ে শাসালেও বলে ফেলে কমল।

মাঝে মাঝে সময় পেলেই ওই স্কুলেব কাছটায় যাবার ইচ্ছেটা কেমন দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠে—দেশী বিদেশী খাদ্যবস্তুর বেশ একটি সংগ্রহ নিয়ে।

অমল-কমল আগে নিতে চাইত না, এখন নেয়।

আজ লোলুপ দৃষ্টিতে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা চিঠি দিলে কমল—মা দিয়েছেন।

—মা? তোর মা?

—হাঁ।

খুলে পড়লে, ছোট্ট চিঠি—সময় লাগবার কিছু নেই। নিখিলকে একবার যেতে লিখেছেন বৌদি। বিশেষ নাকি প্রয়োজন। শেষের দিকে মাথার দিব্যও দিয়েছেন।

অনেক ভেবে ভেবে গিয়ে হাজির হলো পরদিনই। দোরের কাছ থেকেই বড়বৌ ছুটে এসে ওর হাত ধরলো—কি ভাই, বড়মানুষ হ'লে কি এমনি করেই মায়া কাটাতে হয়? কেউ মরে গেলেও একদিন খোঁজ নিতে ইচ্ছে হয় না?

অবাক ছাড়া আর কি হবে নিখিল?

—কিন্তু—কি যেন বলবেন?

—বলবো আর কি। কতো কথাই তো বলার আছে। লোকমুখে শুনি দিনরাত গাড়ী চড়ে বেড়াও, দামী সুট ছাড়া পরো না, পাঁচ-সাতশো টাকা হোটেলে খরচা করো—ওই কানেই শুনি।

এবারে একটু হাসলো নিখিল, হয়তো কঠিনই একটু।

—শুনতে হলে তো কান দিয়েই শুনতে হয় বৌদি!

—তাই বলে একেবারে পর করে দেওয়া! যাকগে ভাই, আসল কথাই বলি—রাণুর একটা ভালো বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে—

—হয়েছে? ভালোই। আমার নামটাম শুনে ফেলেনি তো তারা? তাহলেই হয়তো ভেস্তে যাবে।

—বোকো না। বরং সে ছেলে নাকি তোমার ভীষণ ভক্ত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, পাত্রপক্ষের বড্ডো 'খাঁই'। ছ'সাত হাজারের কমে কিছুতেই হবে না।

নিখিল একটা বোকার মত প্রশ্ন করে বসলো—তা'হলে আর কি করে হবে?

—সেই তো কথা! ভরসা ছিল বাড়ীটা, এখন শুনছি এ বাড়ী কোনকালে নাকি দেনার দায়ে 'ও কর্ম্ম' হয়ে আছে। ভাড়া দিয়ে থাকতে হয়। শুনে কী বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো ভাবো?

বজ্রাঘাত কি নিখিলেরও হল নাকি, নইলে অমন স্তব্ধ হয়ে গেলো কেন! কিছুই যে বলছে না।

বড়বৌ ওর একটা হাত ছেড়ে দু'টো হাত ধ'রলো, বললো এখন তুমিই ভাই ভরসা!

—আমি?....আমি কি করতে পারি?

আস্তে আস্তে হাত দু'টো ছাড়িয়ে নিলো নিখিল।

—ইচ্ছে করলে সবই পার ভাই, পাঁচ-সাত হাজার তো শুনেছি এখন কিছুই নয় তোমার কাছে।

হঠাৎ হেসে উঠল নিখিল—কিন্তু আমি কেন দেবো?

—তুমি কাকা......মেয়েটার যদি একটা হিল্লে হয়, সেটুকু করবে না? তোমার দাদা অনেক আশা করে চিঠিটা লিখতে বললেন।

কে জানে নিখিলই কি পাগল হলো? তাই স্বচ্ছন্দে বললো, পাগল হয়েছেন? ....পাঁচ সাত হাজার টাকা কি খোলামকুচি? আছে বলেই দিতে হবে?

সর্পাহত বড়বৌ অনেক কষ্টে একটা ক্ষীণ প্রশ্ন করলো—চলে যাচ্ছো?—দেখা করবে না কারুর সঙ্গে?

—কি দরকার?

ঝট্ করে নেমে গিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিলো নিখিল।

ওপরের জানালার দিকে তাকালে না সাহস করে।

[১৩৫৪]

হেমদার স্বভাবটা যতই ভালো হোক, 'চরিত্রটা' যে খারাপ এ কথা আড্ডার কারুরই অজানা নেই। সে প্রসঙ্গ নিয়ে হেমদার আড়ালে যে রসাল আলোচনা আব হাসাহাসি চলে, সেটা কানে গেলে বোধহয় ভদ্রলোক তাঁর এই সব সাবালক কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মুখদর্শন করতেন না।

তবে মুখোমুখি আক্রমণ কেউ করে না।

করবে কি, হেমদার সামনাসামনি থেকে যে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না, লোকটার নৈতিক জীবনটা দুর্নৈতিক।

অথচ অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেবারও উপায় নেই, প্রত্যক্ষ প্রমাণিত সত্য। অতএব ঘটনাটাকে "মানুষের দুর্বলতা" বলে মেনে নিয়েছে সবাই।

আড্ডার মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে বড়, এবং সকলের থেকে ওজনেও ভারি, হেমদার ওই দুর্বলতাটুকু, কারুর রাগও বাড়ায় না, ঘেন্নাও আনায় না, জোগান দেয় হাসাহাসির খোরাক।

বড় জোর কোন কোন দিন কেউ হয় তো ভারি ভালমানুষের মতো বলে—'হেমদা', কাল রাত্তিরে পাড়ায় কি মশাব উপদ্রব, ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

—ঘুম হবে না? হেমদা হাই তুলে বলেন—ঘুমের ব্যাঘাত শত্রুর হোক! মশার জন্যে যাদের ঘুম বন্ধ হয়, তারা যে মশামাছিরও অধম রে! আন না একটা তাকিয়া আন! দেখিয়ে দিচ্ছি সাধা বিদ্যে কি বস্তু। মশা! হুঁ!

হয়তো কোনদিন কেউ বলে—হেমদা, কী তোমাব বাজখাঁই নাকডাকা, উঃ! কাল বাত্তিরে কি জন্যে যেন তোমার বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, কত রাত হবে—বোধহয় পৌনে বারটা। উঃ, সে কি শব্দ! দোতলার ঘব থেকে রাস্তা পর্যন্ত শব্দ আসছে। উঁচু নীচু সরু মোটা কত রকম। মনে হচ্ছিল যেন ঘবের মধ্যে দু দশ জন লোক কথা কইছে বুঝি।

হেমদা নস্যির ডাবরে হাত পুরে এক মুঠো নস্যি নাকে ঠুসতে ঠুসতে বলেন—তবু ভালো যে 'দু দশ জন' মনে হচ্ছিল। 'দু জন' মনে হলেই হয়েছিল আর কি!

কথাটা যে তুলেছিল, সে মনে মনে বলে, 'ঘুঘুলোক।'.....মুখে হাসে। নস্যির ডাবরটার জন্যে হাতও বাড়ায়।

তবে মজা এই, এই সব আজেবাজে কথা বললেও 'চওড়াপাড় শাড়ির' প্রসঙ্গটা স্পষ্টাস্পষ্টি কেউ তুলতে পাবে না।....ঠিক ওই জায়গাটাতেই যেন হেমদার একটা নীরব নিষেধ আছে।....মুখেব ওপরেই আঁকা আছে সেই নিষেধেব নোটিস।

কাজে কাজেই "শাড়ি নিয়ে গবেষণা" আড়ালের জন্যে। চরিত্রহীন হেমদা, তাঁর স্বভাব-সুন্দর দরাজ হাসিটি নিয়ে সগৌরবে আড্ডাঘর উজ্জ্বল করে বসে থাকেন। আর তাস নিয়ে কাঁচা জোচ্চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে চেঁচামিচি করেন।

অবশ্য আরও কাঁচামি আছে হেমদার, আড্ডাঘরের চায়ের চাহিদা মেটাবার ভার তাঁর স্কন্ধে। যথেচ্ছ চা চালাও আপত্তি নেই হেমদার।

ব্যবস্থাটা প্রথম কবে থেকে চালু হয়েছিল, কার প্ররোচনায় হয়েছিল মনে পড়ে না আর এখন। পাশের একটা চায়ের দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে। তারা মাসিক বিল কাটে হেমদার নামে। তবে যে যখন চায়ের অর্ডার দেয়, তখনই তাকে একবার করে গঞ্জনা না

দিয়ে ছাড়েন না হেমদা।

—আবার এক্‌খুনি?....তা' খাবি বৈকি, 'বামুনের ভাতে আছি, বালামের দর কে রাখে', কেমন? গাঁটের কড়ি খরচ করতে হলে বুঝতাম কেমন দণ্ডে দণ্ডে গলা শুকোতো। নে গিলে নে যা পারিস! এই চলতি মাসটা পর্যন্ত—ব্যাস!

কমলকেষ্ট চা খায় না।

সে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে বিরক্তি অবজ্ঞা আর ঘৃণা সংমিশ্রনে গঠিত একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বোধ করি ভাবে—ধন্য নির্লজ্জ বটে! জিভে তোমাদের ছ্যাঁকা লাগে না? অমন চা খাওয়ার কপালে আগুন!

কমলকেষ্ট নতুন।

কবে যেন কাকে ডাকতে এসেছিল এখানে, বসে খানিকক্ষণ খেলা দেখে গেল। তারপর থেকে নিয়মিত সদস্য। বয়সে আমাদের অনেকের চাইতেই ছোট, তা ছাড়া নতুন। ঠিক করা হয়েছিল হেমদা এবং শাড়ি সম্পর্কিত সরস আলোচনাটা ওর সামনে করা হবে না।

কিন্তু হাত দিয়ে কে আগুন ঢাকতে পারে?

হেমদা যদি নিজের দুর্নীতির নজির লোকের নাকের সামনে ঝুলিয়ে রাখেন, আমরা আর কত সামলাব?

কমলকেষ্টই একদিন এসে বললো।

শুধু 'বললো' বললে ঠিক হয় না, রীতিমত নাটকীয় বীররসের ভঙ্গীতে উচ্চারণ করলো আপনাদের হেমদা না বিপত্নীক?

আমরা মুখ চাওয়াচায়ি করে ঠাণ্ডা গলায় বললাম—হ্যাঁ তাই তো জানি। মানে—বিধবা বেটাছেলেকে তো তাই বলে।

—রেখে দিন আপনাদের ইয়ার্কি।...শুনতে পাই নাকি দ্বিতীয আব কোন আত্মীয়া নেই হেমদার বাড়ি, একটা চাকর মাত্র ভরসা কবে থাকেন?

আমি আরও শান্ত গলায় বলি—শুধু তাই? সে বেটা আবার বোবাকালা। হেমদাতে আর সেটাতে যখন হাতমুখ নাড়ানাড়ি চলে, দেখলে—

—কথার মাঝখানে ডাবকাটা দায়ের কোপের মতো মন্তব্যের ওপর একটি সজোর কোপ মারে কমলকেষ্ট—থাক থাক শশাঙ্কবাবু, আর বলতে হবে না, এইবার বুঝেছি। জগতে আর লোক খুঁজে পাননি। বোবা-কালা চাকর! যার কাছ থেকে ঘুষ দিয়েও কথা আদায় করতে পারবে না কেউ! কিন্তু এই জবাবটা দিন দিকি আমায, যার বাড়িতে দুটো বেটাছেলে ছাড়া আর তৃতীয় প্রাণী নেই, তার বাড়িতে ছাতের আলসেয় হাতীপাড় শাড়ী শুকোয় কেন?

আমি ঈষৎ বিস্মিত ভাবে বলি—শাড়ী? ওঃ—হ্যাঁ, দেখি বটে মাঝে মাঝে, কি জানি কেন?

—শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকবেন না শশাঙ্কবাবু, খুব হয়েছে! ছিঃ ছিঃ, এই আপনাদের আদর্শ? এই আপনাদের নীতিজ্ঞান? 'হেমদা' 'হেমদা' করে তো আপনারা সকলেই পাগল দেখি। অথচ হেমদার চরিত্র সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখেন না!

—চরিত্র? আমি আলগা ভাবে বলি—না, কই? তেমন করে খোঁজ কে রাখছে? তাস খেলেন ভালো, তাই জানি। চরিত্র ভালো কি না—

—তা জানেন না, কেমন? কমলকেষ্ট একটু ক্রূর হাসি হাসে—জানবেন কোথা থেকে?

চায়ের দোকানের মান্থলি টিকিটটি বন্ধ হয়ে যাবে যে তাহলে! গোড়া থেকেই এইটা লক্ষ্য করেছি আর ভেবেছি—খামকা কেন লোকটা এই ঘুষটা দেয়! এখন পরিষ্কার হলো! চা ঢেলে জিভ বন্ধ করে রাখা!.....কিন্তু আমি এসব সহ্য করবো না শশাঙ্কবাবু!

—কি করবেন? আমি সবিনয় প্রশ্ন করি—হেমদার ছাতার আলসেয় আপনার হাত পৌঁছবে কি করে বলুন যে শাড়ি শুকাতে দেওয়া আটকাবেন?

—কায়দার কথা আমি বুঝি না মশাই, আমি হচ্ছি সোজা কথার লোক।...সোজা বলে দিচ্ছি—ওই আপনাদের হেমদার এই ক্লাবে আসা চলতে দেওয়া হবে না আর! আমার মতে ওসব লোককে প্রশ্রয় দেওয়া—সমাজের শত্রুতা করা।

হেসে বলি—সামান্য একখানি শাড়ির পাড় দেখে অত উতলা হচ্ছেন কেন কমলবাবু? হেমদার কোন আত্মীয়া বেড়াতে আসতেও তো পারেন?

—না স্যার! সে বিষয়ে অবহিত হয়েই বলতে এসেছি। প্রত্যেক দিন শুকোয়। ঠিক ওই দক্ষিণের কোণটায়। রাস্তার ওই মোড় থেকে চোখে পড়ে। আপনারা যদি বলেন—আপনাদের চোখে পড়েনি কোনদিন, মুখের ওপর বলবো মিথ্যে কথা বলছেন আপনারা। স্ত্রীলোকহীন বাড়িতে প্রত্যহ কেন শাড়ি শুকোয়? এ ধাঁধার মীমাংসা করবার চেষ্টা আপনারা করেন না কেন সেইটাই আশ্চর্য।....হেমদা সকলের চোখের মণি! হেমদা না থাকলে আড্ডা অন্ধকার! ধিক্! ধিক্ আপনাদের!

কেউ রাগলে ভারি মজা লাগে আমার, উদাসীন ভাব দেখিয়ে বলি—এমনও তো হতে পারে, বাসনমাজার জন্যে কোন ঝি-টি আছে, আমরা ঠিক জানি না।

আর ঠেকানো যায় না কমলকেষ্টকে, রেগে তিনখানা হয়ে ওঠে একেবারে—ঝি! বাসনমাজা ঝি! বাসনমাজা ঝিয়ের মতো কাপড়ই বটে!...জরিপাড়ের, কল্কাপাড়ের, হাতীপাড়ের ঢাকাই শান্তিপুরী সিমলে ফরাসডাঙ্গার শাড়ি ভিন্ন দেখলাম না কোনদিন। ও শাড়ি যদি ঝিয়ের হয়, তা হলে সেই ঝিই গিন্নী!.....

বলে দুম দুম করে চলে যায় কমলকেষ্ট।

কমলকেষ্টর রাগ দেখে কৌতুক বোধ করি। আমরা তো বরাবরই দেখি, কই, রাগ হয় না তো? আগে কৌতূহল হতো, এখন হয় কৌতুক।

বরাবর দেখে আসছি, ছাতের আলসের বিশেষ ওই জায়গাটিতে শাড়ি শুকোয়। প্রত্যহই শুকোয়।....রাস্তার মোড় থেকে দেখা যায়। কমলকেষ্ট বর্ণিত জরিপাড় কল্কাপাড় জাতীয় দামী দামী শাড়ি!

ওই নিয়েই আমাদের হাসাহাসি। দলের কারুর সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই হয়তো প্রথম কথা হয়—"আজ লাল কস্তাপাড়!"...."কস্তাপাড় উঠে গেছে, কালো কল্কাপাড় দেখছিরে?"

বেশি হাসি—হেমদার বুদ্ধির ঢিলেমি নিয়ে।....অপরাধ করছিস বাপু কর, মানুষের স্বধর্ম! কিন্তু অপরাধের জ্বলন্ত প্রমাণটা পাড়াপড়শীর চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখা কেন!.....

তবে শাড়ির মালিকানী যে বিশেষ সাবধানী তাতে আর সন্দেহ নেই। পড়শী মহিলাদের অনেক উঁকিঝুঁকি ব্যর্থ হয়েছে তার সাবধানতার কাছে।....কোনোদিন দেখা যায় না তাকে।

আসলে অন্যমনস্কতা। তিনতলার ছাতের আলসেয় যে কারুর নজর পড়বে এটা খেয়াল হয়নি আর কি!

এরপর দিন তিন চার কমলকেষ্ট আসেনি। আজ হঠাৎ হাঁসফাঁস করতে করতে এলো।

—মহাত্মা এখনও আসেননি বুঝি?

—মহাত্মা! আমরা সচকিত হয়ে উঠি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের পরম পূজনীয় হেমদা।

—কই আসেননি তো এখনো!

আজ কিন্তু আমি মুখোমুখি ক্রস্ করব শশাঙ্কবাবু, আপনারা চটুন আর যাই করুন।.....পর্শুদিনে নিজের চক্ষে দেখলাম—"বসন্তষ্টোর্সে" কর্তা ভুঁড়ি এলিয়ে বসে শাড়ি বাছছেন। আর চান কিছু?....তাও আপনারা 'কার জন্যে কিনছেন কি বিভ্রান্ত' বলে উড়িয়ে দেবেন ভেবে চুপচাপ ছিলাম। হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে গেলো সেই শাড়ি আজ ছাতে দুলছে!....এখন আমায় ধরে মারুন! প্রতিজ্ঞা করে এসেছি আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করে ছাড়বো!

অস্বস্তি বোধ করে বলি—আচ্ছা কমলবাবু, আপনারই বা এত রাগ কেন? কার বাড়িতে শাড়ি শুকোয়, কার বাড়িতে গামছা শুকোয়, তাতে আমাদের কি? তাস খেলতে আসি, খেলি—চুকে গেল।

—আর কি! চুকে গেল! সামাজিক শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না, কেমন? কমলকেষ্ট তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে—পাড়ার মধ্যে বসে উনি যা খুসি করবেন, আর আমরা চোখ-বুজে থাকব!

আমি উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যাই।

দরজায় স্বয়ং হেমদা!

কমলকে দেখেই তার ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরে বলেন—কি হে, হঠাৎ চুপ মেরে গেলে কেন? খুব তো তড়পাচ্ছিলে এতক্ষণ! কিসের কথা?

কমল ঘাড় সরিয়ে নিয়ে বুনো ঘোড়ার মতো গোঁজ হয়ে থাকে।

—কি ব্যাপার হে শশাঙ্ক?

আমি হাসি চেপে বলি—কমলবাবু বলছিলেন আপনি নাকি "বসন্তষ্টোর্সে" ভুঁড়ি এলিয়ে বসে কাপড় কিনছিলেন, ওটা দুর্নীতি!

—থামুন শশাঙ্কবাবু! কমল হঠাৎ ছিটকে ওঠে—স্পষ্টই বলছি আমি, হেমবাবুর মুখের ওপরেই বলছি, স্ত্রীলোক-আত্মীয়-হীন বাড়িতে শাড়ির আনাগোনা আমরা দুর্নীতি বলেই মনে করি।

শুনেই প্রথমটা হেমদার মুখটা একটু মলিন হয়ে যায়, তার পরেই হেসে উঠে বলেন—ও! তাই আজ ক'দিন দেখছি কমলকেষ্ট যখন তখন আমার বাড়ির ধারে কাছে ঘোরাঘুরি করছে!.....তা' আর কিছু আবিষ্কার করতে পারলে না বুঝি? বড় তো মনঃক্ষুণ্ন হলে কমলকেষ্ট?...আহা!

জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি হেনে কমলকেষ্ট গম্-গম্ করে বেরিয়ে যায়।

লোকটার স্বভাবই এই, চটে গেলে দাঁড়ায় না সেখানে।

কথাটা যখন এতদূর এগিয়ে এসেছে, আমাদেরও কৌতূহল দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। একদিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আর একদিকে হেমদার অপাপবিদ্ধ ভঙ্গী, আমাদের কম যন্ত্রণা দেয় না তো!

সহাস্য-মুখে যেন কিছুই নয় এইভাবে বলি, ব্যাপার কি হেমদা?

হেমদা গম্ভীর হাস্যে বলেন, শুনতে চাস্?

—বললে শুনি।

—ব্যাপারটা কি জানিস? ইয়ে অবিশ্যি আমার এক রকম পাগলামিই বলতে পারিস। কিম্বা নেশাই ধর!

হেমদা একটু থামেন।

সর্ব-শরীর কণ্টকিত হয়ে আসে আমার। না জানি কি শুনতে হয়।

হেমদা ফিকেফিকে হেসে বলতে থাকেন—হয়েছে কি জানিস, তোদের বৌদির ছিল ভীষণ শাড়ির সখ! কেবল শাড়ি কিনবে আর সর্বদা সেই ভাল ভাল শাড়িগুলো আটপৌরে পরবে! কম বকুনি দিয়েছি তার জন্যে? শুনতো না। মেয়েলি মুখ নাড়ার বহর জানিস তো? হাত-মুখ নেড়ে বলত—"কবে আছি কবে নেই, শাড়িগুলো সতীনের জন্যে রেখে যাব নাকি?".....সকলের মুখের ওপর একবার চোখটা বুলিয়ে নিয়ে কেমন একটা বোকা-বোকা অপ্রতিভ হাসি হেসে বলতে থাকেন হেমদা, ছাতের ওইখানে একটা দড়ি টাঙিয়েছিলো, শাড়িগুলো মেলে দিতো আর বলতো "পাড়ার লোকে দেখে চক্ষু সার্থক করুক"—বেজায় ফাজিল ছিল কিনা! পাড়ার লোকের যেন খেয়েদেয়ে কাজ নেই! দেখলে আমিই দেখতাম! মানে আর কি দেখতে পেতাম। অফিস থেকে ফিরতে—মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ত।....তা সত্যি বলতে কি, শুনে হাসবি তোরা—শাড়িটা চোখে পড়তেই মনে হতো যেন বাড়ি এসে গেছি। ইয়ে তোর বৌদির সঙ্গে যেন দেখাই হয়ে গেল।.....তারপর তো শাড়ি শুকোনো ঘুচে গেল। এদিকে—আমাব ওই এক বদ-অভ্যেস হয়ে গেছে! মোড় ঘুরে ছাতের দিকে চাইলেই—প্রাণটা কি রকম যেন খাঁ-খাঁ করে আর বুকটা এমন ধড়-ফড়িয়ে ওঠে, বাড়ি এসে তার জের মিটতে ঘন্টা কেটে যায়! অভ্যেস জিনিষটা বড় পাজি! যতো ভেবেছি তাকাবো না—পড়বেই চোখে।—শেষে ওই বুদ্ধি খাটালাম, ভোরবেলা চুপিসাড়ে এক ফাঁকে ছাতে উঠে একখানা শাড়ী মেলে দিয়ে আসি। ঝুলতে থাকে সারাদিন, বাতাসে উড়ে এলোমেলো হয়ে কার্নিসে লুটোপুটি খেতে থাকে—ঠিক তেমনি—আগের দিনের মতো, চোখে পড়লেই মনে হয় যেন সব ঠিক আছে। অফিস থেকে ফিরতে তাকাতে তাকাতে আসি।—লোক হাসানো আর কাকে বলে—অ্যাঁ কী বলিস?

[১৩৫৪]

ছেঁড়া তার

—তারাপদ!

কর্তার উচ্চ চীৎকারে ছুটিয়া আসিলেন তারাপদ নয়, লাবণ্যপ্রভা। বিরক্ত মুখে কহিলেন—ভর সন্ধ্যেবেলা পাড়া মাথায় করছো কেন?

—করছি আমার খুশী, সে হতভাগা গেল কোথায়?

—তাকে পাঠিয়েছি আমার কাজে, তোমার এমন কি দরকার পড়লো শুনি?

লাবণ্যপ্রভার কথার ভঙ্গীই ওইরকম। বিনয় মল্লিক খুব বেশী বিচলিত হন না, একটু উদ্বেগযুক্ত কণ্ঠে কহেন—ও বাড়ীর ছোট খুড়োর উঠোনে আলো দেখলাম মনে হ'ল, লণ্ঠন নিয়ে কে যেন—

—হ'ল, তা'র হয়েছে কি?

হয়েছে তোমার মাথা! গোলা ভেঙে ধান ক'টা বের করে নিয়ে যাক্, এই তুমি চাও বোধহয়?

লাবণ্যপ্রভা বিদ্রূপহাস্যে. মুখ বাঁকাইয়া উত্তর করেন—সন্ধ্যেরাত্তিরে আলো জ্বেলে তোমার গোলায় ডাকাত পড়তে এলো! কথা শুনে আর বাঁচিনে! দিনরাত চোরের ভয়ে চমকে চমকেই

কোনদিন হার্টফেল করবে দেখছি। চোর নয়, চোর নয়, মানুষ।

লাবণ্যপ্রভার হিসাবে বোধ করি 'চোর' মনুষ্য পদবাচ্য নহে। তা বিনয়বাবুও চোব নয় 'মানুষ' শুনিয়া কিঞ্চিত নিরুদ্বেগ হ'ন।—মানুষ? কার দরকার পড়লো ওখানে? পূবের কোঠাটা তুলবো বলে ক'গাড়ী চুন সুরকি এনে ঢালিয়েছি উঠোনটায়—

—তাও চুরি যাবে? তোমার যথাসর্ব্বস্ব যে রকম চুরি যেতে বসেছে আজকাল, আমাকেও না কোনদিন—লাবণ্যপ্রভা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলেন।

—হয়েছে—ইয়ার্কি রাখো, কে গেছে ও বাড়ী?

—ছোট খুড়োর মেয়ে এসেছে যে।

—বিনয় মল্লিক হঠাৎ যেন একটা হোঁচোট খান, কথাটা বুঝিতে কিছু সময় লাগে।

—ছোট খুড়োর মেয়ে? কোন মেয়ে?

—কথার দশা দেখো, মেয়ে আবার ওঁর ক'গণ্ডা? মণি ঠাকুরঝি—মনোরমা—ভুলে গেছো নাকি?

—ভুলবো কেন? কিন্তু এতকাল পরে কি মতলবে?

—মতলব আবার কি? জন্মভূমি, বাপের ভিটে, আসতে নেই? ভাসুর মারা গেছেন, ভাসুরপোরা মানে না—চলে এসেছে এখানে বাস করবে বলে।

—বটে? খুব সাধু সঙ্কল্প, তা বাসটি করবেন কোথায় শুনি? কার বাড়ীতে?

—কেন? ও বাড়ীতেই করবে, তাতে তো তোমার বাড়ী ক্ষয়ে যাবে না। আমি বলেছি থাকতে।

বিনয় মল্লিক হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া ওঠেন, বড় কাজ করেছ, বাড়ী তোমার 'ইয়ের' কিনা? আমায় একবার বলা কওয়া নেই—

—তোমাকে বলতে কইতে কাছারিবাড়ী ছুটবো নাকি? চারটের গাড়ীতে এসেছে। দু'ঘন্টা আমার এখানে বসে, তোমার আর দেখা নেই। তেতেপুড়ে এসেছে, গা হাত ধোবে, কাপড়চোপড় ছাড়বে—তারাপদকে লণ্ঠন আব চাবি দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। মুখেব উপর তো বলতে পারিনে, 'দেনার দায়ে তোমার বাপের ভিটেখানা আমরা নীলাম করে নিয়েছি।' চোখের ওপর দু'খানা চামড়া আছে আমার।

'চোখের চামড়ার' উল্লেখটা প্রীতিকর ইঙ্গিত নহে—বিনয় মল্লিকেব স্বব উচ্চ গ্রামে চড়িতে থাকে—বলতেই বা হবে কেন? জানে না? ন্যাকামি? "দেনার দাযে বাড়ী বেচে খেযেছি"—ছোট খুড়ো মেয়েকে এ খবরটুকু জানিয়ে মরতে পারেনি? উড়নচণ্ডে হতভাগা!

লাবণ্যপ্রভা বিরক্তিগম্ভীর কণ্ঠে কহেন, মবা মানুষকে গাল দিও না বলছি! বাড়ী তো তিনি বেচে খাননি, তুমিই সাইলকেব মতন সুদের সুদ কষে অন্যায় করে দখল করেছ। আমার আর জানতে কিছু বাকী নেই।

—হুঁ। বড় বাক্যি হয়েছে তোমার। রোসো আগে পাপ বিদেয় করে আসি—তারপব তোমায় দেখে নেব। আব্দার কত? দু'দিন পাঁচদিন নয়—একেবারে বাস করতে এসেছেন। এইবেলা উচ্ছেদ না করলে রক্ষে আছে? কথায় বলে উচ্ছের ঝাড়।

লাবণ্যপ্রভা ঘৃণায় মুখটি যথাসম্ভব কুদর্শন করিয়া বলিয়া ওঠেন—তবে আর দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও গে? একাদশীর উপোস করে আধমরা হয়ে এসেছে, গায়ের জোর বেশী লাগবে না, চাই কি শত্রুর শেষ হয়ে যেতেও পারে। উঃ, কি পিশাচই

হয়ে গেছ! বলি রাঘব বোয়ালের হাঁ নিয়ে অনেক বিধবার সম্পত্তি তো গ্রাস করেছ, এটা আর নাই করলে? স্বামী-পুত্তুরহীনা বিধবা,নানা জ্বালায় জ্বলে বেচারা এখানে জুড়োতে এসেছে—তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে? পুরুষের বীরত্ব কত! আপনার বোন না হোক—জ্ঞাতির মেয়ে তো বটে, 'দাদা' বলে ডাকেও তো?

একাদশীর উল্লেখে বোধ করি বিনয় মল্লিক মনে মনে কিঞ্চিৎ নরম হইয়াছিলেন—তবে কিনা লাবণ্যপ্রভা যতই দজ্জাল মেয়ে হোক, বিনয় মল্লিকও সহজ ছেলে নয়, তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন—হ্যাঁ! অমন জ্ঞাতি সবাই দেখেছে সেই যে বলে না—"ধনে সম্পর্কে পোয়াল মাসী"। এ তাই। ছোট খুড়ো মরল, তেরাত্তির অশৌচ হ'ল আমাদের, বলি সেটাও তো আর ভোলোনি? এই তোমায় বলে রাখছি—আজ রাতটা পড়ে থাকে থাক, কাল সকালে এক ঘটি জল গিলে যেন আমার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে বিদেয় হয়ে যায়। দখল করে বসলে কি আর ছাড়তে চাইবে? ও বড় সোজা মেয়ে নয়—

কে সোজা মেয়ে নয় বিনয় দা? আমি?

সহসা বিদ্যুতাহতের মত ছিটকাইয়া কয়েক হাত দূরে সরিয়া যান বিনয় মল্লিক। উঠানটা অন্ধকার—বিধবার সাদা থানের ঈষৎ আভাস ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। নিঃশব্দে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কে জানে? কি সর্বনাশ! কোন্ কোন্ কথাগুলা তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে?

পা দুইখানা টানিয়া লইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়া ভিন্ন আর কোনো চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না।

মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া বলে—বেশ মানুষ যা হোক! অসাক্ষাতে মিথ্যে অপবাদ কেন? কবে তোমার কোন জিনিষ দখল পেয়ে ছাড়তে চাইনি শুনি বিনয়দা? পালাচ্ছো যে? বলে যাও!

লাবণ্যপ্রভা সপ্রতিভভাবে বলেন—খুব যে তড়পাচ্ছিলে—'হ্যান্ করেঙ্গে' 'ত্যান্ করেঙ্গে'—কই, সামনাসামনি বলে যাও? তোমায় কি বলবো ঠাকুরঝি, ঘেন্নায় আমার বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করে। 'পয়সা পয়সা' করে লোকটার মনুষ্যত্ব বলে আর কিছু রইল না। চানটান করেছ তো ভাই? এমন পোড়াদিনে এলে—এক ফোঁটা জল মুখে দেবার জো নেই। তেতে পুড়ে এসে—

মনোরমা কথার মাঝখানে হাসিয়া ওঠে—সেই একেবারে বিদেয়কালে এক ঘটি জল গিলে তবে যাবো বৌদি, দুঃখ কোরো না। সেটুকু অনুমতি আছে—

মা বসুন্ধরা বোধ করি পুরুষের আবেদনে কর্ণপাত করেন না। তাই একাজোড়া কান সমেত আস্ত শরীরটা লইয়া চৌকীর উপর কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় একজনকে।

লাবণ্যপ্রভা একটা হ্যারিকেন আনিয়া দাওয়ায় বসাইয়া সস্নেহে অনুরোধ জানান—উঠে এসো ঠাকুরঝি, বসো—

মনোরমা উঠিয়া আসে না, দাওয়ার একধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়ে। বলে—এত কথা তো জানতাম না বৌদি, ধানের গোলা দেখে অবাক হয়ে জিগ্যেস করাতে তোমার চাকরটা সব বললো। ভালই হয়েছে—বিনয়দার হাতে পড়লে বাড়িখানার তবু একটু ছিরিছাঁদ ফিরবে। তবে বহুকাল পরে এসেছি, পাড়ার সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করবার বড় সাধছিল। আর মা চণ্ডীকে একবার দর্শন করা—তোমার এখানে যদি দুটো দিন থাকতে দাও বৌদি, মনের ইচ্ছেটা মেটে।

পরিহাস না সত্যই মিনতি? লাবণ্যপ্রভাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তবু উত্তর দিতে

হয়—ওমা, সেকি কথা! থাকবে বই কি, দুটো দিন কিসের? যতদিন ইচ্ছে 'গাঁট্' হয়ে বসে থাকো তুমি। দেখি কে তোমায় নড়ায়? তোমার দাদাকেই নয় মতিচ্ছন্নে ধরেছে, আমায় তো ধরেনি। কতদিন পরে দেশে আসা হ'ল—

—হ্যাঁ, এই আঠারো বচ্ছর পরে। বাবা যতদিন কাশীবাস কর্চ্ছিলেন ততোদিন আর কি। কতবার ভেবেছি আসবো একবার, হয়ে ওঠে না। আমার কপালটাই বড় মন্দ, বুঝলে বৌদি? বাবার অসুখ শুনে ছুটতে ছুটতে কাশী গেলাম, যাওয়া আসাই সার—শেষ দেখাটাও হল না। এখানে চলে এলাম ভাসুরপোদের ওপর তেজ করে—শেষ পর্য্যন্ত 'ধাষ্টামো'। যাচ্ছি তা'হলে শুয়ে পড়িগে, শরীরটা এইবার ছুটি চাইছে। এসেছিলাম বিনয়দার সঙ্গে দেখা করতে—তিনি তো আমায় দেখলেন, না ভূত দেখলেন! কই গো বিনয়দা, ঘর থেকে একবার বেরোও, পায়ের ধুলোটা নিয়ে যাই? না কি দর্শনেও বঞ্চিত?

বিনয়দা না রাম না গঙ্গা কোনই উত্তর দিলেন না।

অবশেষে মনোরমা চলিয়া গেল।

লাবণ্যপ্রভা হাতের কাজ সারিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিলেন—তোমার কি আক্কেল গা? মানুষটা 'দাদা দাদা' করে চৌদ্দবার ডাকলো—দুটো কথা কইতে পারলে না? এত হিংসে দ্বেষ কিসের?—কই কোথায়? অ্যাঁ!

অন্ধকারে বিছানার মাঝখানে পড়িয়া থাকা বালিশটাকে কর্ত্তা মনে করিয়া অযথা যে কথাগুলি ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার জন্য হাসিয়া ওঠেন লাবণ্যপ্রভা।

অসময়ে আবার কোথায় গেল মানুষটা? নিশ্চয় প্রাণের বন্ধু মুরলীধর বিশ্বেসের বাড়ী, কুমতলবের গুরু যেটি। তারাপদকে পাঠাইয়া এখনি ডাকাইয়া আনা প্রয়োজন।

কিন্তু বিনয় মল্লিক বাড়ীতেই ছিলেন, নিজের বাড়ীতে উপরকার ছাদে। ঘরের ভিতর প্রাণটা কেমন হাঁফাইয়া আসিতেছিল: প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। রাশীকৃত জমাট অন্ধকারের মাঝখানে যে মৃদু আলোকশিখাটুকু দেখা যাইতেছিল, অন্যমনস্ক ভাবে তাহারই পানে তাকাইয়া আলশের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কিন্তু ছাদেও গরম, বাতাস যেন পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে।....দক্ষিণের ঘরটায় শুইয়াছে মণি? কোথায়? জানলার নীচে মাথা রাখিয়া? বাতাস থাকিলে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারিত, কিন্তু সারা পৃথিবীতেই যে আজ গুমোট। হয়তো জাগিয়া আছে, বসিয়া আছে জানলায়! কতদিন পরে আসিয়াছে বাল্যকালের আশ্রয়ে। কত কথা ভাবিতেছে হয়তো। ঘরের আলোয় কি দূরের জিনিষ চোখে পড়ে? এই ধরো—বিনয় মল্লিক এখানে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিতে পাইতেছে? পাগল! এই তো মণিকে, ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে কি?

...দীর্ঘদিন পরে ওবাড়ীতে আলো জ্বলিয়াছে। যদিও বড় মৃদু, তবু আলো তো? স্তূপীকৃত মৃত্যুর মাঝখানে ক্ষীণ একটু জীবনের রেখার মত। কাল আর জ্বলিবে না, ভাঙ্গা বাড়ীখানা জমাট অন্ধকারের পিণ্ডের মত এতদিন যেমন পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া থাকিবে।

....এত অপমানের পর কে থাকিতে পারে? মণি তো নয়ই। কি অভিমানীই ছিল ছেলেবেলায়! আচ্ছা তাহাকে কি ভাবিল মণি? পাগল? না পাষণ্ড? কিন্তু এতদূর পাষণ্ড মানুষে হয় নাকি? নিজের কথাগুলা একবার মনে মনে উচ্চারণ করিতে গিয়া সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসে বিনয় মল্লিকের। সত্যই কি বলিয়াছিলেন নাকি? মিথ্যা করিয়া—লাবণ্যকে চটাইবার জন্য নয়

তো? মণি কি সব শুনিয়াছে?

....আচ্ছা এমনও তো হইতে পারে, সমস্ত ব্যাপারটাই সে পরিহাস মনে করিয়াছে। সেইটাই সম্ভব নয় কি? বিনয়দা মণিকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দিবে এটা কিছু আর বিশ্বাস করার কথা নয়...

তবে?

....তবে আর দুশ্চিন্তার কি আছে? এইটুকু শুধু বুঝাইয়া আসা মণিকে—ব্যাপারটা কিছুই নয়, শুধু পরিহাস। কি আশ্চর্য্য, এতক্ষণ এই সহজ কথাটা মাথায় আসে নাই কেন?

...এখনই যাওয়া যায় না? কতই বা রাত? 'কই রে মণি' বলিয়া একবার ডাক দিলেই তো সব গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। ছেলেবেলাতেও কতদিন কত ঝগড়া হইত, 'কথা কহিব না' বলিয়া কালীর দিব্যি দিত মণি, আবাব যাচিয়া আসিত—'দুটি পায়ে পড়ি' বলিয়া খোসামোদ করিত। আর হয় না? তেমন সহজভাবে?

....ছোট খুড়ো লোকটা কি বদমাইসই ছিল! মিছামিছি বদনাম দিয়া একদিন কি অপমানটাই না করিয়াছিল বিনয়কে, সহসা একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠে বিনয় মল্লিকের মুখে। হাসিটা হয়তো অদ্ভুত নয়, অন্ধকারে অদ্ভুত মনে হয়।

....ছোট খুড়ো তাড়াইয়া দিয়াছিল, বাড়ী ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছিল! তাই বিনয় মল্লিক শোধ লইল তাহার মেয়ের উপর দিয়া?

আচ্ছা বাড়ীর দলিলখানা ফিরাইয়া দিলে কেমন হয়? মণির জিনিষ মণিরই আছে, চিরকাল থাকিবে এইটুকু বলিয়া! মণি খুসি হইবে তো? হওয়া তো উচিত! অন্ততঃ যতটা পাষণ্ড বিনয়দাকে মনে করিয়াছিল, ততটা নয় দেখিয়া?

....লাবণ্য?

....লাবণ্য আবার কি ভাবিতে পারে? সে নিজেই তো—

....দলিলখানা বাছিয়া বাহির করিয়া একবার শুধু রাস্তায় পা ফেলা—এক মিনিটের পথ বৈ তো নয়। কিন্তু মণি ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো? অসম্ভব।...ঘুম আজকার রাতে আসিতে পারে? তাছাড়া ভারী গরম যে, এই তো বিনয়ভূষণ, কবে আবার ছাদে বেড়াইতে আসেন? এত গরম কখনো হয় না কি? বাতাস যেন ভারী হইয়া বুকে চাপিয়া বসিতেছে।

অনেকদিনের কথা...আর একদিন বাতাস এই রকম ভারী হইয়া উঠিয়াছিল, দম আটকাইয়া যাইবার ভয়ে বিনয় মল্লিক একলা ছাদে উঠিয়া আসিয়াছিলেন মাঝরাত্রে।

....কি মাস এটা? আষাঢ়?

সেটাও আষাঢ় মাস ছিল—হ্যাঁ, আষাঢ়ই তো! পরদিন মণির বিয়ে ছিল—২২শে আষাঢ়। স্পষ্ট মনে আছে—ও বাড়ীতে আটচালার নীচে গ্যাসের আলো জ্বালিয়া ময়রারা ভিয়ান বসাইয়াছিল আর বাতাসে আসা ঘিয়ের গন্ধ কি অরুচিকরই লাগিতেছিল। কি বিরক্তিকর লাগিতেছিল চারিদিকের নিস্তব্ধতার মাঝখানে ছোট খুড়োর হাঁকডাক চেঁচামেচি।

অনেকদিন আগের কথাও এক এক সময় স্পষ্ট মনে থাকে। বিয়ের পরদিন গাঁটছড়া বাঁধা বর-কনেকে লইয়া গাড়ীখানা যখন চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল, কি অদ্ভুত একটা ইচ্ছাই জাগিয়াছিল! ঠিক ইচ্ছাও নয়, একটা যন্ত্রণার মত। নিজের হাতপাগুলা কামড়াইতে পারিলে যেন শান্তি হয়, নিজের মাথাটা পাথরে ছেঁচিলে আরাম হয় যেন।

অবশ্য কিছুই করা হয় নাই, আপনিই স্থির হইয়া গিয়াছিল সে যন্ত্রণা। সত্যি উনিশ বছর

আগে তো আর পাগল ছিলেন না বিনয় মল্লিক! ইচ্ছা? অমন কত অদ্ভুত ইচ্ছাই তো মানুষের হয়।

মণি এখনো অমনভাবে হাসে কেন? হাসিতে পারে কেমন করিয়া? মেয়েদের কি বয়স বাড়ে না?

হয়তো বাড়ে না, তাই দরজা খুলিবার পর আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া মুখের উপর অমন হাসিয়া উঠিতে পারিল মনোরমা।

কি গো বিনয়দা, মন কেমন করলো বুঝি? নাকি বৌকে লুকিয়ে?

কি সর্ব্বনাশ, এখনো এই সুরে কথা কয় মণি? বরং ভাষাটা আরো স্পষ্ট আরো তীক্ষ্ণ। কথা যেন অন্ধকারকে কাটিয়া কাটিয়া খান্ খান্ করিয়া ছড়াইয়া পড়ে।

—কি গো, কথা নেই কেন? এই দণ্ডে দূর করে দিতে এলে নাকি? আর সবুর সইছে না? রাতটুকু পড়ে থাকবার কথা ছিল যে গো! দোহাই বিনয়দা, এখন এক পাও নড়তে পারছি না, বড্ড ঘুম পেয়েছে।

খামোকা এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন বিনয়ভূষণ, উঁচু করিয়া আলো ধরা ডান হাতখানা মণির, অলঙ্কারহীন কৃশ হাতখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরেন।

—মণি!

মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া যায় মণি, স্তব্ধ আর শান্ত। আস্তে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া স্নিগ্ধ গলায় বলে—বাড়ী যাও বিনয়দা, আজ তোমার মন ভালো নেই।

—যাবো, তুই এটা নে।

—কি ও? বাড়ীর দলিল! ও নিয়ে আমি কি করবো ভাই? কি দরকার আমার?

—আছে রে আছে, দরকার না থাকে ছিঁড়ে ফেল—যা খুসী কর, শুধু আমায় একটু হাল্কা হ'তে দে—

—কিন্তু এর তো দরকার ছিল না বিনয়দা, কালকেই তো চলে যাবো আমি। থাকলে কি চলে? কত বড় সংসার আমার ঘাড়ে! মিছামিছি বৌদিকে ঠাট্টা করেছিলাম। আর তোমার বাড়ীতে থাকতেই যদি আসি কখনো, সত্যি কি তাড়িয়ে দিতে পারবে?

—পারি—পারি—সব পারি আমি, আমার অসাধ্য কাজ নেই। শুনলি না তোর বৌদির কাছে? এই নে ধর, তোর সম্পত্তি ঠকিয়ে খাবে, তোর বিনয়দা এত পাষণ্ড হয় নি এখনো। তোর জিনিষ তোরই আছে, তোরই থাকবে—

অকস্মাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া যান বিনয় মল্লিক। আর বাইরের খোলা হাওয়ায় আসিয়াই মাথার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসে।

কি সর্ব্বনাশ! এ তিনি করিয়া বসিলেন কি? ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল? না নেশা করিয়াছিলেন? নিজের উপর ধিক্কারে সর্ব্বশরীর মোচড় দিতে থাকে, নিজের হাতপাগুলা কামড়াইতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় মাথাটা পাথরে ঠুকিতে। অনেকটা যেমন মণির বিয়ের পরদিন বরকনে বিদায়ের সময় হইয়াছিল।

জমি জায়গা সমেত সাত আট হাজারের কম হইবে না বাড়ীখানা! ভুলাইয়া আবার ফিরাইয়া লওয়ার কোনো উপায়ই কি আর নাই?—

[১৩৫৪]

অপচয়

—মনীষা দেবী! মনীষা দেবী!

ছোট্ট এই মফঃস্বল সহরটিতে সকলের মুখে মুখে গুঞ্জন করে ফিরছে এই নাম! মনীষা দেবী আসছেন!...সশ্রদ্ধ কৌতূহল আর ঔৎসুক্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে লোকে। মনীষা দেবী এখানে আসছেন! এই ছোট্ট সহরটুকুর পক্ষে কম গৌরব নয় সেটা।

মনীষাদেবী কে?

এ প্রশ্ন করলে আপনাকে হাস্যাস্পদ হ'তে হবে। মনীষাদেবী যে 'কে', সে কথা জানেনা কে? দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের 'অ আ ক খ'-ও যে পড়েছে তার জানতে বাকী নেই মনীষা দেবীর ইতিহাস।

কি নয় মনীষা দেবী? স্বাধীনতার সংগ্রামে কি না করেছেন? সত্যাগ্রহ করেছেন—করেছেন আইন অমান্য আন্দোলন।...জেলে গিয়েছেন বার বার! সেখানে সরকারী দুর্নীতির প্রতিবাদে সুরু করেছেন অনশন।...

সাড়া পড়ে গিয়েছে দেশে।...উদ্ধত কর্ত্তৃপক্ষকে একাধিকবার মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়েছে ওঁর দাবী।...তারপব? দেশের হাওয়া গেছে ঘুরে...''মাদুলী তাবিজ জলপড়া ঝাড়ফুঁকে" বিশ্বাস হারিয়ে নবজাগ্রত জনগণ অস্ত্রোপচার করতে চেয়েছে বৃটিশ শাসনরূপ দুষ্টক্ষতের উপর!...জ্বেলেছে আগুন!

মনীষা দেবী বিনা দ্বিধায় পড়েছেন সেই জ্বলন্ত আগুনে।

আগষ্ট আন্দোলনের অসাধ্যসাধিকা কর্ম্মী মনীষা দেবী। প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ রাজশক্তি একদা টলমল করেছে এঁর প্রতাপে। পাঁচ বৎসর আত্মগোপনের পর পাদপ্রদীপের আলোকে আবার দেখা গিয়েছে তাঁকে।...বিপ্লবীর বেশে আর আবির্ভাব নয় তাঁর, আবির্ভাব ঘটলো শান্তিজল হাতে।

দাঙ্গাবিধ্বস্ত এই সহরে মৈত্রীর বাণী প্রচার করতে আসছেন মনীষাদেবী। দলবল সহ।

আমাদের ওপর ভার পড়েছে তাঁদের অভ্যর্থনার।

বাড়তি কোনো বাড়ী—মানে খালি বাড়ী পাওয়া দুষ্কর, তাই 'রমলা গার্লস হাই স্কুলে' স্থান দেবার ব্যবস্থা হয়েছে! সাতদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেওয়া হ'ল মেয়েদের। আর ছুটিই তো চলছে। গত আগষ্ট থেকে বর্ত্তমানের সেপ্টেম্বর এই তেরোমাসের মধ্যে তেরো সপ্তাহ যদি ক্লাস হয়ে থাকে তো ঢের।

স্কুলের কেরানী সুরেশবাবু আর আমি স্টেশনে যাচ্ছি তাঁদেরকে আনতে। বললাম—আপনার কি মনে হয় সুরেশবাবু?....সাঙ্গপাঙ্গো সমেত ক'জন আন্দাজ হবে?

আমাকে স্কুলের সেক্রেটারী বলা হয়— কাজেই আমার জেঠামশাইয়ের কাছাকাছি বয়সী সুরেশবাবু আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে যেন বিনয়ে ভেঙে পড়েন একেবারে।....

দু'হাত কচলে বলেন—আঁজ্ঞে আমার তো ধারণা—জন আষ্টেক দশ হবেন....ইয়ে—আপনি কি বলেন?

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক যে ক'জন আসছেন তাঁদের জন্যে ভাবি না, ভাবনা

হচ্ছে—ভদ্রমহিলাদের নিয়ে।....

সুরেশবাবু আবার হাত কচলাতে সুরু করেন—আঁজ্ঞে তা' যা বলেছেন। ঝঞ্ঝাট তো ওনাদের নিয়েই! তবে এঁরা সব 'স্বদেশী করা' মেয়ে, জেলটেল খেটেছেন, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'লে বোধ হয় ততো দোষ ধরবেন না। সে যদি বলেন—আমাদের গেরস্থঘরের মেয়েদের কাণ্ড। আমার মেয়ের বিয়ের সময়ের কথা বলছি—মেয়ের মামারবাড়ীর গুষ্ঠি ঝেঁটিয়ে এলো—জায়গা দিই কোথায়? ভাগ্যক্রমে একখানা খালি বাড়ী পেলাম কাছাকাছি, তাঁদের তো ঘটস্থাপনা করা হ'ল সেখানে। তারপর স্যার, সে কী ফৈজৎ।....চব্বিশ ঘণ্টা তাঁদের 'এটা চাই', 'ওটা চাই', 'এ নইলে হবে কি করে' 'ও নইলে টিঁকবো কি করে'—এই কমপ্লেন্ শুনতে শুনতে সন্নিসী হয়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'লো। নতুন কুটুম্বরা মাথায় থাক্, বড়ো কুটুম্বদের নিয়ে অস্থির!...এ বাড়ী ও বাড়ী করতে করতে স্যার পায়ের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল।...

হাসি চেপে বলি—দেখুন এখন স্বদেশীমেয়েরা আমাদের কী হাল করেন!...চাকরটা আসবে তো?

—আসবে তো আশা করছি। বলে এসেছি, এখন আমার হাতযশ। ওই গাড়ী এসে গেল। চলুন স্যার একটু তাড়াতাড়ি।...আচ্ছা আপনি চেনেন তো তাঁদের?

—চিনি?...হেসে বলি—চিনি যেমন আপনি চেনেন। কাজের মধ্যে দিয়ে পরিচয়, খবরের কাগজ দিয়ে চেনা।....

—চাক্ষুস দেখেননি তা'হলে?...আপনিও খদ্দর-টদ্দর পরেন কিনা, তাই বলছি।...শুনেছি বিলিতি মেমের মতন নাকি চেহারা।

মনে মনে হাসি।

'বিলিতি মেম' সম্বন্ধে কতটি উচ্চ ধারণা সুরেশবাবুর, শ্রদ্ধা-বিগলিত কণ্ঠস্বরেই ধরা পড়ে।...কতোদিন লাগবে এ মোহ কাটতে?

পরিচয় না থাকলেও বিশেষ একটি 'দল'কে খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

তিনটি ভদ্রমহিলা আর জনাচারেক পুরুষ। অবশ্য চারটি ছেলে বললেও চলে। নেহাতই তরুণ। টপ্ টপ্ করে প্রথমেই নেমে পড়লো তারা...তারপরই নামলেন মনীষা দেবী।

পিছনে যে দুটি ভদ্রমহিলা নামলেন, তাঁদের আর দেখিনি ভালো করে। সত্যি কথা বলতে কি, মনীষা দেবীর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরানো শক্ত।...কিন্তু সুরেশবাবুর আইডিয়ার সঙ্গে মিল নেই কোথাও।...এঁর মধ্যে থেকে 'বিলিতি মেম'কে আবিষ্কার করা যায় না।

কিন্তু মনীষা নাম না হয়ে বিদ্যুতলতা নাম হওয়াই উচিৎ ছিল না কি? 'শরীরিণী বিদ্যুতশিখা' গোছের কী একটা উপমা আছে যেন কাব্যশাস্ত্রে! সেইটাই বার বার মনে হতে থাকে।

অথচ খুব বেশী ফর্সা কোনোমতেই বলা চলে না।

ফর্সা নয়—ঔজ্জ্বল্য। উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুই চোখ। বিদ্যুতের দীপ্তি প্রতিটি কথায় আর ভঙ্গীতে।...এ মেয়ে যে অসাধ্যসাধন করতে পারে, তাতে আর সন্দেহের কি আছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এতো কম বয়েস!

নাকি কম দেখায়? খুব সম্ভব তাই। নইলে বয়েসের সঙ্গে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না কর্ম্মজীবনের সামঞ্জস্য! কতোগুলি বছর তো সরকারী অতিথিরূপেই গেছে কেটে।

—আপনারাই বুঝি আমাদের কর্ণধার?

প্রশ্নে চমকে উঠি....বলি—যা বলেন। ট্রেনে খুব বোধ হয় ভীড়?...কেন যে বলি কে

জানে, বোধ করি বলবার মতো কিছু কথার অভাবে।

—ভীড়! হবে। কিন্তু ভীড়ে এখনো ভয় করেন নাকি? পৃথিবীটাই তো ভীড়ে ভরে গেছে। কোনোগতিকে পথ করে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া।...যাক্; তা'হলে আমাদের আশ্রয় দিচ্ছেন কোথায়?

মাথা নেড়ে বলি—চলুন। কিন্তু জানেন তো—আজকালকার দিনে বাড়ীর অবস্থা কি রকম ঘোরালো! একটা মেয়েদের স্কুলে ব্যবস্থা কবা হয়েছে! অবশ্য অসুবিধা খুবই হবে—

মনীষা দেবী হেসে ওঠেন—আপনি যে রকম বিনয় সুরু করেছেন, মনে হচ্ছে ভোজ খাওয়ার নেমন্তন্ন করে এনেছেন আমাদের।...ইস্কুল-বাড়ী? সে তো দেদার জায়গা। চারখানা দেওয়াল আর একখানা ছাদ থাকলেই যথেষ্ট।....

প্লাটফরম থেকে বেরুতেই গাড়ী অপেক্ষা কবছিল....উঠিযে দেওয়া হ'ল ওঁদের। পিছনের ভদ্রমহিলা দুটিকেও দেখলাম এবারে। নীরস নিস্পৃহ মুখ'। কর্ম্মী মেয়েদের যেমন হয় সাধারণতঃ। অথচ মনীষা দেবীর মুখ কী সুন্দর প্রাণবন্ত! বড়ো হওয়া অমনি নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাণশক্তি নিয়ে না জন্মালে বড়ো হওয়া যায় না।

আমাদের গাড়ী পিছন পিছন চললো।...নামবার সময় বললেন—কী চমৎকাব পথ! কী সুন্দর শান্ত আবহাওয়া!...ভাবতে ইচ্ছে হয় না যে এখানে দাঁড়িয়ে মানুষ রক্তারক্তি করে।....আচ্ছা এখন অবস্থাটা কি রকম?

বললাম—ঠিক আমাদের এ অঞ্চলটায় বিশেষ কিছু হয়নি। হয়েছে সহর ছাড়িয়ে একটু দেহাতের দিকে। এখন থেমে গেছেই বলা চলে। নিরক্ষর অশিক্ষিত সব লোক, যে যা বুঝিয়েছে তাতেই তেতে উঠেছে। এদের স্বভাব কি জানেন, জ্বলে উঠতেও যেমন দেবী লাগে না, নিভতেও তেমনি সময় লাগে না।

—ওইটাই মানুষের সাধাবণ স্বভাব। অবিরাম জ্বলতে পারে এমন আগুন আব ক'জনের মধ্যে আছে?

সাহসে ভর করে একটা উত্তর দিয়ে বসি। দেখবার আগে মনীষা দেবী সম্বন্ধে যেমন একটা সুদূরবর্ত্তী ভাব ছিল মনের মধ্যে, সেটা যেন সহজ হয়ে আসে...বলি—ধরুন আপনাদের মতো?

হেসে উঠলেন।

কলকণ্ঠ হাসি। ওঁর বিরাট মর্য্যাদার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না বলেই বোধ হয় এতো সরল আর মিষ্ট লাগে হাসিটা।...আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, পশ্চাদ্বর্ত্তিনীদের একটা অস্ফুট মন্তব্য কানে এলো—"এই হল আরম্ভ গল্প!...সারারাত্রি ট্রেন জার্নি, স্নানটান করে বাঁচা যাক্, তা' নয়—"

অর্থাৎ বোঝা গেল মনীষা দেবীর স্বভাবটি গল্পপ্রবণ, এবং সে স্বভাবটা এঁদের খুব প্রিয় নয়।...তাড়াতাড়ি বলি—চলুন, আপনারা টায়ার্ড হয়ে এসেছেন।...চাকরটা এসেছে কি না খোঁজ করি।

অনেক কাজের মধ্যেও মনের ভিতর ঝঙ্কৃত হতে থাকে সেই হাসির সুর।... আসল কথা—বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে থাকে একটি বিস্ময়কর ভাব, প্রত্যেক বিষয়েই অসাধারণত্বের আশা করি। তাই তাঁদের মধ্যে সহজ ভাবের বিকাশ দেখলে আমাদের আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই।...অবশ্য সকলে কিনা জানি না, হয়তো সুরেশবাবু তাতে হতাশ হয়ে উঠবেন।...

সুরেশবাবুর ভাষায় তখনকার মতো 'ঘটস্থাপনা' করে ফিরে এলাম। বিকেলের দিকে আবার গেলাম কার্য্যতালিকা আলোচনা করতে।....শুনলাম উষানাম্নী ভদ্রমহিলাটির নিদারুণ মাথার যন্ত্রণা,

তেনি উঠতে অক্ষম। তৃতীয়াটি থাকবেন তাঁর কাছে। সেই তাজা তরুণ ক'টি আর মনীষা দেবী বললেন—চলুন—আপনাদের দেশটা একটু বেড়িয়ে আসি। কোনো কিছু কাজ করবার আগে জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা ভালো, কি বলেন?

বললাম—নিশ্চয়ই। আচ্ছা তা'হলে তৈরি হয়ে নিন—আমি গাড়ীর ব্যবস্থা করে আসি।

—গাড়ী? গাড়ী কি হবে?...কি শিশির, তোমাদের গাড়ী লাগবে?

—না না, বাঃ! আমাদের আবার কি দরকার—

শিশির প্রমুখ চারজনই আপত্তি করে ওঠে। সদ্য গৃহচ্যুত মুখচোরা ছেলে...নিতান্ত ভাবের ঘোরে 'দেশের কাজে' নেমেছে। 'কাজ' সম্বন্ধে ধারণা কিছুমাত্র আছে এ সন্দেহ করি না, তবে ইচ্ছাটা অকপট তা' বোঝা যায়।

দেখো বাপু, এরপর যেন বোলো না 'আপনি আমাদের লোকসান করালেন'।...

অতঃপর পদব্রজে যতোটুকু যাওয়া যায়।

চলতে চলতে অনেক কথা হ'লো। বললেন—আমরা এসেছি বটে, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন—দু'চার দিন হৈ হৈ করে সভা করে শান্তির বাণী বিতরণ করায় স্থায়ী কাজ বিশেষ কিছু হয় না। এর জন্যে চাই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অনলসকর্ম্মী অজস্র লোক। তারা ছড়িয়ে থাকবে সহরে, গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে।...ভাড়াটে প্রচারক নয়, আপনাদের মধ্য থেকেই খুঁজে বার করতে হবে তাদের। মঞ্চ খাড়া করে একদিন বক্তৃতা দিয়ে যাওয়া নয়, নিজের জীবনের আদর্শ দিয়ে প্রচারকার্য্য করা।...বাইরে থেকে এলে হবে না।...এতে হয়তো লোকে উত্তেজিত হবে বেশী, সাময়িক ফল একটা পেয়ে যাবেন চট করে, কিন্তু সেটাই শেষ নয়।...বললেন আরো অনেক কিছু।...সব কথা মনে নেই, কিন্তু রাত্রে ঘুমের ঘোরেও মনে পড়তে লাগলো একটি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ আর জড়তালেশশূন্য পরিষ্কার কণ্ঠ।...ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয় না যাকে, ঝরঝর করে ঝরে পড়ে কথা।

পরদিন সকালে গেলাম আবার।

উষা দেবীর মাথা ধরা ছেড়েছে। বিরস মুখে বসে আছেন চায়ের টেবিলে। তৃতীয় ভদ্রমহিলা—যাঁর নাম জানি না—তিনিই চা ঢালছেন...তরুণ ক'জন ত্রস্তব্যস্ত। শুনলাম চাকর আসেনি। তাই সকলেই চিন্তিত বিষণ্ণ।

শুধু মনীষা দেবীই অনুপস্থিত।

অনুপস্থিত ভৃত্যের ওপর ভদ্রভাষায় কিছু কটূকাটব্য করে, এবং দেশের বর্ত্তমান নানা সমস্যার মধ্যে এটাও যে একটা বিশেষ সমস্যা, সেটার বিশদ আলোচনা করে অবশেষে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এইভাবে বলি—আচ্ছা ওঁকে দেখতে পাচ্ছি না? আপনারা কোন দিক থেকে কাজ আরম্ভ করবেন সেটা ঠিক হয়ে গেলে—

উষা দেবী নীরস কণ্ঠে বলেন—সে আর আজকে কি করে হবে, মনীষাদেবী না আসা পর্য্যন্ত—

অবাক হয়ে বলি—উনি কোথায় গেছেন?

—গেছেন দিল্লী।...এখানে আসার সব ঠিক, হঠাৎ চলে গেলেন দিল্লী, প্লেনে করে।...আমাদের মতন চুনোপুঁটি তো নয়!

গভীর অন্ধকার হাতড়ে বলি—আসবেন কবে?

—খুব সম্ভব কাল! তবে পর্শুও হতে পারে। পর পর দু'দিনই স্টেশনে লোক রাখতে বলেছেন।

হতাশভাবে—কি বলছি না বুঝেই বলি—মনীষা দেবী তা'হলে আসেন নি আপনাদের সঙ্গে?

পাগল অথবা "ইডিয়ট প্যাটার্ণের" লোকের মুখের দিকে যে ভাবে তাকায় লোকে, সেই ভাবে তাকান উষাদেবী আমার মুখের দিকে।...শুধু 'দেবু' নামক ছেলেটি রীতিমত হেসে ওঠে—বেশ; বলেছেন তো? বাঃ! তাঁকে কি আমরা লুকিয়ে রেখেছি?

উষাদেবী তেমনি বিরক্ত নীরস কণ্ঠে বলেন—দয়া করে চাকরটার একবার খোঁজ করবেন। কাল একবার মূর্তিটা দেখিয়ে গেল, ব্যস্। দোষের মধ্যে বলা হয়েছিল—রান্নাটা অখাদ্য!

ব্যস্ত হয়ে বলি—তাই তো, ভারী মুস্কিল। আচ্ছা আমার বাড়ী থেকে যদি খাবারটাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করি?

যদিও খুব দুঃসাহসে ভর করেই বলে ফেলি কথাটা, তবু তেমন আমল দেন না উষাদেবী। বলেন—তাই কি আর সম্ভব?...যাক্ হবেই যা হয়, আপনি শুধু একটা ভালো তোলাউনুনের ব্যবস্থা করে দেবেন।

ব্যস্ত হয়ে বলি—কেন, এখানে রান্নার ক্লাসের মেয়েদের তো সব সরঞ্জাম আছে?

—আছে তো—তেমনি বিরক্ত বিরস কণ্ঠ—শুনছি সে সব কাজের অযোগ্য।...শিশির, দেখোগে তো—কমলার রান্না চাপলো কিনা।...বললাম নির্ম্মলবাবু আসুন, চাকরের ব্যবস্থা হোক—তা' নয়, সর্দ্দারী করে গেলেন রান্না চাপাতে।

কমলা!

'মনীষা'র মতো না আছে গাম্ভীর্য্য, না আছে মর্য্যাদা।...কমলা! যে নাম বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ঘর খুঁজলেই দু'একটা বেরোবে।...ঈশ্বর রক্ষা করেছেন গতকাল, 'মনীষা দেবী' বলে উল্লেখ করিনি কোন সময়!...করিনি তো? ঠিক তো?...ভাবতে চেষ্টা করি।

পর পর দু'দিন আর গাড়ী পাঠাতে হ'ল না, পরদিনই এলেন মনীষা দেবী। নামের মতোই চেহারায় আছে গাম্ভীর্য্য, আছে মর্য্যাদা। কমলার সঙ্গে ভুল করেছি শুনলে লোকে হাসবে না কাঁদবে?...

মনীষাদেবী! শাঁখের মতো সাদা গায়ের রং, আভিজাত্যপূর্ণ গম্ভীর মুখশ্রী, ততোটুকুই ভারিক্কী গড়ন—যার বেশী হলে মোটা বলা চলে—না হলে নয়। মহিমান্বিত মূর্ত্তি! দেশনেত্রী বলতেই যে রূপ ফুটে ওঠে চোখের উপর, তেমনি মহিমাময় রূপ।

অসাধারণ হওয়া এঁকেই সাজে, সে কথা অস্বীকার করতে পারি না।...

অস্বীকার করতে পারি না যথার্থ কর্ম্মী বলে।

সারারাত ট্রেন জার্নি করে প্রয়োজন হয় না বিশ্রামের, প্রয়োজন হয় না স্নানাহারের। গাড়ী থেকে নেমেই তলব করলেন উষা অরুণা আর কমলা দেবীকে। চাকর পাওয়া গেছে কি না, ভালো তোলাউনুন যোগাড় হয়েছে কি না, অথবা রান্না করছে কে, এসব প্রশ্নের জন্য নয়...বললেন—ম্যাপটা তৈরী করিয়েছো তো?

—ম্যাপ!

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।...বোঝা গেল স্মরণ মাত্র ছিল না কারুর।

—হয় নি তা' হলে? তিন দিন হ'ল এসেছো না তোমরা? আশ্চর্য্য! আগে চলে আসবার

প্রয়োজন কি ছিল তবে, এ দু'দিন কলকাতায় থেকে গেলেই পারতে? আমি তোমাদের এই তিন দিনের কাজের রিপোর্ট চাই।...নির্ম্মলবাবু, যতো তাড়াতাড়ি পারেন একটা ম্যাপের খসড়া করিয়ে দিন। অবাক হয়ে তাকাচ্ছেন যে?...পল্লী অঞ্চলের পথঘাটের একটা মানচিত্র! যে জিনিষটা দেখে একটা 'সফর তালিকা' প্রস্তুত করতে হবে।...শান্তি প্রচার তো আপনাদের এই সহরটুকুর মধ্যেই নয়—যেতে হবে গ্রামে।...কিন্তু সে যাওয়াটা অন্ধের মতো নয় নিশ্চয়ই।...কোন দিক থেকে আরম্ভ করলে সুবিধে হবে, স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সে বিষয়ে পরামর্শ করা দরকার।...উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নামের লিষ্ট দিন দিকিন আমায়।...আর চারদিকে প্রচার করে দিন আমাদের আসার সংবাদ।...বিকেল চারটের সময় বেরোবো আমরা।

সসঙ্কোচে বলি—আজকেই?

—কেন নয়? আপত্তিটা কি?

—না না, আপত্তির কিছু নয়, টায়ার্ড হয়ে রয়েছেন আজ। দিল্লি থেকে ফিরেই—

—টায়ার্ড! আজই বেরোতে হবে।...গাড়ী ক'খানা দিতে পারবেন? দু'খানা তো আমাদের চাই-ই—একখানা লরি-টরি যোগাড় করতে পারেন ভালোই, স্থানীয় ছেলেমেয়েরা যোগ দিতে পারবে।...অবশ্য শোভাযাত্রাও বার করতে হবে একদিন, তারিখ ফেলে নোটিশ দিতে হবে—

প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে পরিষ্কার উচ্চারণ করে যাচ্ছেন মনীষা দেবী, ঝরঝর করে ঝরে পড়বার মতো এলোমেলো অপ্রয়োজনীয় কথা নয়। ভালো করে কান পেতে শোনবার মতো কথা। ভুলে গেলেই সর্ব্বনাশ!

আমরা এক মাসে যা করে উঠতে পারবো কি না সন্দেহ, ইনি এক দিনেই তা' করিয়ে নেবেন আমাদেরই দিয়ে।....

এমন নইলে লীডার।

তাকালাম উষা অরুণা আর কমলা দেবীর দিকে।

ভীত চকিত অপ্রতিভ মুখ!...কোনো তফাৎ নেই উষার সঙ্গে কমলার, কমলার সঙ্গে অরুণার। এদের একজনকে মনীষা দেবী মনে করে মুগ্ধ হচ্ছিলাম—কিসে আর কিসে!

সূর্য্যের কাছে যেমন মাটির প্রদীপ। যে প্রদীপ আলো দেয়, কাজ চলে যায়—সেও মিথ্যা নয়, কিন্তু সূর্য্যের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কতো সহজে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

কি বিশ্রী বোকা আর নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে কমলা দেবীকে।

অনেক কিছু কাজ মাথায় নিয়ে চিন্তিত চিত্তে ফিরছি—স্কুলের পিছনের দরজা থেকে ডাক এলো—শুনছেন! একটু কম জোরে হাঁটবেন।

চমকে তাকাই...দরজায় দাঁড়িয়ে কমলা দেবী।

সেই হাসি-ঝলসানো দীপ্ত মুখ।

সত্যিই অবাক হই, অবাক হয়ে বলি—কিছু বলবেন?

—বাঃ বলবো না তো ডাকলাম কেন? ভয় পাবেন না—খাল বিল খানা ডোবার মানচিত্র চাইছি না! চারটি পলতাপাতা জোগাড় করে দিতে পারেন?

—পলতা!

—হ্যাঁ, পলতা—পটলের পাতা...চমৎকার বড়া খাওয়া যায় যার। চাকরটাকে বাজারে পাঠালাম, পেলো না।

একটু হেসে বলি—এই সব বাজে কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবেন? আর উনি যখন সারাদিনের

রিপোর্ট চেয়ে বসবেন?

—হেঁটমুণ্ডে অপরাধী-মুখে দাঁড়িয়ে থাকবো।

—তাতে লাভ?

—লাভ না থাক, লোকসান কম। থাক্, পলতাপাতা যদি পারেন তো যোগাড় করে আনুন। ভাতের সঙ্গে তেতো তরকারি না থাকলে ওঁব আবাব অম্বল হয়।

—'যাচ্ছি পাঠিয়ে দিচ্ছি'—বলেও এক মিনিট দাঁড়াই।

—দাঁড়ালেন যে?

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলি—না, ইয়ে আব কিছু লাগবে কি না—

—ভালো কথা মনে করেছেন—কিছু স্পিরিট চাই।

—স্পিরিট! অমূল্য জিনিষ চেয়ে বসলেন যে—পাবো কি?

—পেতেই হবে—বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে দুই চোখে—না পেলে চলবেই না—স্টোভ জ্বালতে হবে! শেষরাত্রে চা না খেলে ওঁর আবার মাথা ধরে। আচ্ছা নমস্কার। উনি আবার আড্ডা দেওয়া পছন্দ করেন না।

চলে আসছি—হঠাৎ মনে হল মনীষা দেবী না এলেই বা ক্ষতি কি ছিল? সূর্য্যের প্রয়োজনীয়তা আছে—তাতে ভুল নেই, কিন্তু বিদ্যুতই কি ফেল্না? হাজার বাতির আলোটাকে দুপুর রোদে মাঠের মাঝখানে জ্বেলে রেখে লাভ কি?...অথচ অহরহ এমনি ভুলই তো ঘটছে আমাদেব জীবনে!

[১৩৫৪]

ছিন্নমস্তা

গাছের মাথা হইতে রোদ নামিয়া উঠানের কোণে পড়িয়াছে...এইমাত্র স্কুল-বাড়ীর ঘণ্টা পড়ার শব্দ শোনা গেল। দশটার গাড়ীতে বর-কনে আসিবার কথা। স্টেশন হইতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে খুব জোর আরও আধ ঘণ্টাই হোক, তার বেশী তো নয়।

অতএব সময় আর নাই।

জয়াবতী তাড়া দিতেছিলেন: 'আলপনা দেওয়া যে তোর আর এগোচ্ছে না মণ্টি? বৌ এসে কি কাঁচা পিটুলিতে পা দেবে?...আলপনা শুকিয়ে ফুট্‌ফুট্ করবে, তবে না 'বৌছত্তরে'র বাহার।'

মণ্টি কলিকাতায় মামার বাড়ী থাকিয়া স্কুলে পড়ে।

সম্প্রতি রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে আলপনা আঁকিয়া নাকি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য তাহার সহপাঠিনী মল্লিকা ঘোষ নাকি সমস্ত ক্রেডিট্‌টা মণ্টির চাঁপার কলির মতো আঙুলের ডগাগুলিকেই দেয়, কিন্তু সেটা একটা ধর্ত্তব্যের কথা নয়।

কন্যাগুণগর্ব্বিতা মণ্টি-জননী মণ্টিকে লইয়া জয়াবতীর বাড়ী আলপনা দেওয়াইতে আসিয়াছেন। একমাত্র ছেলে জয়াবতীর, বিবাহান্তে বৌ লইয়া বাড়ী আসিতেছে আজ।

কিন্তু স্কুলের বিদ্যাটা যেন খুব বেশী কাজে লাগিতেছে না আজ মন্টির।

এতো বড়ো উঠান দেখিয়াই হাঁপাইয়া উঠিয়াছে বেচারা।

স্কুল-বাড়ীর দোতলার হলের পালিশ করা মেঝেয় তুলি বুলানো এক, আর এই প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো উঠান ভরাট করিয়া লতা-পদ্ম আঁকা আর এক।

'চাঁপার-কলি' ঘষিয়া ক্ষয় হইয়া 'চাঁপা-কলা'য় পরিণত হইতে বসিয়াছে। তাহার উপর আবার জয়াবতীব তাড়া। মায়ের উপর রাগে হাড় জ্বলিয়া যাইতেছিল মন্টির!

জয়াবতীর উপরও কম নয়, 'বলা খুব সহজ, নিজে করিয়া দেখুন না একবার'—এই গোছের মনোভাবটা লইয়া একই নক্সার পদ্ম সর্ব্বত্রই আঁকিতে থাকে শেষ পর্য্যন্ত। আধুনিক অতি-আধুনিক যাবতীয় আলপনার নক্সা জানা ছিল তার, কিছুই আর মনে পড়ে না।

এদিকে হাত নিসপিস করিতেছে জয়াবতীর।

মন্টির মতো আঙুলের ডগায় চাঁপার কলির সাদৃশ্য না থাকিলেও শিল্পচাতুর্য্যে খ্যাতি জয়াবতীরও বড়ো কম ছিল না। আশেপাশের পাড়া হইতে আমন্ত্রণ আসিত তাঁহার পূজা-পার্ব্বণে, বিবাহ-উৎসবে। সমারোহের বিবাহে ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাইতে, ছানার হাঁস, ক্ষীরের মাছ, মাখনের পদ্ম, মুগের ডালের ময়ূর ইত্যাদির গঠন-নৈপুণ্যে কুটুম্ববাড়ীর লোককে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিতেন জয়াবতী।

নূতন জামাইয়ের জলখাবারেব ফলের রেকাবিতেই কি কম কারুকার্য্য করিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত?

তা' ছাড়া, আলপনা! পীঁড়ির আলপনা তো বটেই, মেঝের আলপনাও।

সত্যই প্রশংসা করিবার মতো কাজ ছিল। কতো বাড়ীতে গোবর-মাটি-লেপা মেটে উঠানে এমন 'বৌ-ছত্র' আঁকিয়াছেন যে, দর্শকমাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে, জয়াবতীর নিপুণ করস্পর্শে নির্জীব উঠানও যেন 'হাসিয়া উঠিয়াছে'।

আর এ তো শানবাঁধানো উঠান—যে উঠান ছেলেব ম্যাট্রিক পাশের বছর নূতন করিয়া বাঁধাইযাছিলেন জযাবতী, বৌ আসিযা দাঁড়াইবার আসন্ন মধুর কল্পনায়।

কিন্তু ছেলেবেলা হইতে পবের বৌয়ের বৌ-ছত্র আঁকিয়া আঁকিয়া হাত পাকাইলেও নিজের ছেলের বৌ আসার সময় আর শুভ কাজে হাত বাড়াইবার অধিকার রহিল না জয়াবতীর, সে হাতে বিধাতা কোপ মারিয়া দিয়াছেন।

ছেলের কৈশোরকাল হইতেই ছেলের বিবাহ লইয়া স্বামীর সহিত কতো জল্পনাকল্পনা পরামর্শে, কতো সোহাগ কলহে রাত্রি কাটিয়াছে! একটিমাত্র সন্তানকে ঘিরিয়া দুইটি মানুষের আশার আর শেষ ছিল না। সব আশায় ছাই দিয়া দিব্যি কাটিয়া পড়িলেন দেবনাথ।

জয়াবতীর জন্য রহিল আনন্দহীন গুরুদায়িত্বের বোঝা।

ছেলের বিবাহ আজ আর রঙীন কল্পনা নহে, কঠিন কর্ত্তব্য। ভালোয় ভালোয় কাজটা মিটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা নাই তাঁহার।

বৌ-বরণ করিবার জন্য জ্ঞাতি-জা কনকলতা একখানা খসখসে নূতন বেনারসী শাড়ী জড়াইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছিল। বিমলেন্দুর জলপানির টাকায় সাধ করিয়া এই শাড়ী কিনিয়া রাখিয়াছিলেন জয়াবতী বিমলেন্দুর বৌ বরণ করিতে।

সিন্দুক খুলিয়া সেই শাড়ী বাহির করিয়া দিয়াছেন কনকলতাকে।

কনকলতা কাপড়ের আঁচল সামাল করিতে করিতে দুধে-আলতার পাথরখানা আনিয়া বসাইয়া দিয়া তোষামোদের সুরে বলে : 'এ কি আর তোমার হাত মেজদি, যে এক দণ্ডে হয়ে যাবে?'

জয়াবতী মন্টির মার অপ্রতিভ মুখখানার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠেন : 'ছোট বৌয়ের

যেমন কথা! বুড়োমাগীর সঙ্গে ওই ছেলেমানুষের তুলনা? এই যে অতোখানি করেছে এরই মধ্যে তাই ঢের। গাড়ীর সময় হয়ে গেল তাই তাড়া দেওয়া।'

কনকলতা বাতাসের গতি আঁচ করিয়া কথার মোড় ঘুরায়—'তা তো বটেই, তা তো বটেই! তুলনা নয়,—এমনি বলছি। যেমন অদৃষ্ট! চিরদিন পাঁচজনের করে এসে এখন নিজের ঘরে চোর। আজ কোথায় তুমি নিজে এই চেলির শাড়ী প'রে বৌ-ছেলে বরণ ক'রে ঘরে তুলবে!

'থাক্ ছোট বৌ ওসব কথা। দেখো দিকিন, দুধ ওথ্‌লানোর কি হলো? বৌ দোরে পা দেওয়া মাত্র যেন উথ্‌লে ওঠে।'

সস্তার করুণ বস আমদানি করিয়া অন্তর্নিহিত গভীর বেদনাকে খেলো করিবার প্রবৃত্তি নাই জয়াবতীর।

গোছগাছ্ করিতে করিতেই বরকনে আসিয়া পড়ে।

'কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান-ধারণায়'—কবিগুরুর লেখনী-নিঃসৃত এই প্রেমিকের উক্তিটি অনায়াসেই বাঙালী ঘরের শাশুড়ী-বৌ-সম্বন্ধে খাটানো যায়। অধিকাংশ পুত্রবতী জননীরই কি জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ গড়িয়া ওঠে না পুত্রের বিবাহ-কল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া? সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত পুত্রের মাতার ধ্যানের মূর্ত্তি কি একটি ডানাবিহীন পরীমূর্ত্তি নয়?

কল্পনার তো রাশ টানিতে হয় না, তাই সেই ধ্যানের মূর্ত্তিকে লইয়া লীলায়িত হইয়া ওঠে কতো স্বপ্ন, কতো সুষমা! নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয় আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে। পরের মেয়েকে কেমন করিয়া আপন করিতে হয়, দেখাইয়া দিবেন তিনি। করুণা হয় তাহাদের উপর যাহারা ছেলের বিবাহ্ দিয়া 'বৌ-কাঁটকী-শাশুড়ী' নাম কিনিয়াছে। কৃপা হয় তাহাদের উপর যাহারা কালোকোলো খাঁদাবোঁচা বৌ ঘরে আনিয়াছে। পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে একটি সুন্দর মুখ দেখিলেই কৌতূহল প্রবল হইয়া ওঠে, তাহার কুল, জাতি, গোত্রের পরিচয় জানিতে।

বিশেষত জয়াবতীর মতো মাত্র এক সন্তানের মার। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া ছেলেকে সংসারী করিয়া দেওয়াই যেন জীবনের চরম ও পরম কর্ত্তব্য এঁদের।

কিন্তু ধ্যানের ধারণা যখন সত্যই মূর্ত্তি হইয়া আসিয়া ধরা দেয়?

না, কথাটা বলা ঠিক হইল না,—ধরা দিলে অনেক সমস্যাই মিটিত। আধুনিক মেয়েরা স্বামীকেই বড়ো ধরা দেয়—তা আবার শাশুড়ীকে! ধরা দেয় না, 'শুধু মূর্ত্তি ধরিয়া' আসিয়া দাঁড়ায়। নিজমূর্ত্তি।

পরবর্ত্তী ঘটনাটা, ধরিবার চেষ্টা, আর ধরা না দিবার আক্ষেপ-বিক্ষেপের সমষ্টি।

তবু বিমলেন্দুর বৌয়ের মতো, বিয়ের কনে আসিয়াই নিজ মূর্ত্তি ধরার দৃষ্টান্ত আধুনিক মহলেও কম। শহুরে মেয়েকে বাগ মানাইতে পারিবেন কিনা, এই সন্দেহে পল্লী অঞ্চলের মেযে আনিয়াছিলেন জয়াবতী, প্রতিভা আসিয়া শহরকে টেক্কা দিল।

বিয়ের কনে কে কবে শাশুড়ীকে শুনাইয়া বরকে মুখনাড়া দেয় : 'এই যে শুনেছিলাম, এতো ভালো অবস্থা—তত ভালো অবস্থা,—তার খুব দেখছি বটে! বাড়ীতে এমন একখানা বড়ো আয়না নেই যে দাঁড়িয়ে চুলটা বাঁধি! ঘরসংসার গুছিয়ে তবে ভদ্রলোকের মেয়ে ঘরে আনতে হয়—বুঝলে? বাহারের মধ্যে দরজা-জানালায় ছেঁড়া-কাপড়ের পর্দা ঝোলানো! দেখলে হাসি পায়।'

দালান ঝাঁট দিতে দিতে কথাটা কানে গেল জয়াবতীর।

ধাক্কাটা প্রথম, তাই চলন্ত হাতটা হঠাৎ যেন অবশ হইয়া আসে। এ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে 'সাজুনে-গুছুনে-সৌখীন' বলিয়া খ্যাতি ছিল জয়াবতীব। জয়াবতীর ভাঁড়ারে প্রত্যেকটি টিন রং-করা, মফিক-সই। শেলফ্, আলমারি বোতল, কাচের জারের প্রাচুর্য্যে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে। জয়াবতীর ঘব-দোব ছিমছাম ফিটফাট. ট্রাঙ্ক-বাক্স সিন্দুক-দেরাজ—সব শাড়ীর পাড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা, বিছানা ফরসা, বালিশের ওয়াড়ে ঝালর। এ-সব আবার এগ্রামের ক'জনের আছে?

সম্প্রতি বৌ আসিবে বলিয়া নিজের পুরনো আমলের ভয়েল শাড়ী কাটিয়া সমস্ত জানালা দবজায় পর্দ্দা লাগাইয়া তো পাড়ার লোকের ঈর্ষাভাজনই হইয়াছেন। লোকে বলে ; বৌ আসছে বৈ তো রাণী আসছে না, অতো বাড়াবাড়ি কিসের!'

জয়াবতীব সেই সাধেব গৃহসজ্জা দেখিয়া বড়োমানুষের মেয়ের নাকি হাসি পায়! বিমলেন্দু কি উত্তব দেয, শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলেন জয়াবতী, কিন্তু গলা শোনা গেল না তার।

জলপানি-পাওয়া গ্র্যাজুয়েট ছেলে জয়াবতীর, ক্লাস নাইনের দাপটে বোবা বনিয়া গেল নাকি?

তা' বোবা ছাড়া আর কি? বারে বারে প্রতিভার কণ্ঠস্বরই তো কানে আসে : 'এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে হবে মনে করলেই তো আমার আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হয়ে আসছে! কি বললে,—আমাদের হুগলীও পাড়া-গাঁ? বেশী বোকো না! কিসে আর কিসে! হুগলীতে কী নেই শুনি? কলের জল, লাইট-ফ্যান,—কিসের অভাব? বাবার যেমন কাণ্ড! বিয়ে দেবার আর দেশ পেলেন না—ত্রিবেণীতে বিযে!...আবার তো শুনছি, সাংঘাতিক ম্যালেরিয়াও আছে। মববো আর কি!'

চিরদিনের শান্তশিষ্ট জয়াবতীর শীতল রক্তে হঠাৎ যেন আগুন ধরিয়া যায়। যে ছেলেকে কোনও দিন উঁচু কথাটি বলেন নাই, তাহাব সম্বন্ধে একটা তীব্র কটূক্তি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া বসেন।

জিভ কি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইযা গিয়াছে বিমলেন্দুর? তাই একটাও উত্তর জোগাইল না?....কি করিবেন, পর্দ্দা ঠেলিযা জয়াবতী নিজে তো আর ছেলে-বৌয়ের ঘরে ঢুকিয়া উচিতমতো উত্তর দিতে পারেন না।

পারেন না বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি কথার সমুচিত উত্তর অবিরত মনের ভিতর পাক খাইতে থাকে।

পরিপাটি করিয়া ঝাঁটপাট দিয়া ঝক্‌ঝকে মাজা ঘড়াটি লইয়া ঘাটে যাইবার সামর্থ্য ও স্পৃহা দুইই চলিয়া যায় যেন।

এই বৌ হইল বিমলেন্দুর!

জয়াবতীর দীর্ঘ তপস্যার ফল? প্রায় আজীবনের আশার কুসুম?

তবু মুখোমুখি কিছুই বলা চলে না। ব্যবহারে ঊনিশ-বিশ করাও শক্ত। বিমলেন্দুকে যে বলিবেন কিছু, তাই বা সম্ভব কোথায়?

বিমলেন্দুই যদি উল্টা বলিয়া বসে: 'ছেলে-বৌয়ের ঘরে কি তুমি আড়ি পাততে গিয়েছিলে?' তখন?

অতএব মনের রাগ মনে চাপিয়া প্রত্যহের মতোই বৈকালিক জলযোগ সাজাইয়া লইয়া স্নেহ-পূর্ণ কণ্ঠে ডাক দিতে হয় বৌকে। অল্পাহারের কথা তুলিয়া অনুযোগ-অভিযোগও করিতে হয়।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত কিছু তিক্ত বিরস হইয়া থাকে। বৌকে আপন করিয়া লইবাব সাধু সঙ্কল্প এই একটিমাত্র ঝাপটায় কোথায় উড়িয়া যায়।

দিন বারো-চৌদ্দ পরে বধূকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল বিমলেন্দু।

জয়াবতী যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

কিন্তু কেন এমন হইল? বিমলেন্দুর জন্য প্রাণ কেমন করিল না কেন জয়াবতীর? বিমলেন্দুব বিদায়-বেদনাটা যেন ভাসা-ভাসা ঝাপ্‌সা। উৎসব শেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বিদায় লওয়ার মতোই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। নূতন বৌয়ের মতো বিমলেন্দুও যেন একজন অভ্যাগত মাত্র।

অথচ বিমলেন্দুর পাঠ্যাবস্থা হইতে এই বিদায়-পর্ব্বটা কী এক শোকাবহ ঘটনার সামিলই করিয়া তুলিতেন জয়াবতী! তিনদিন আগে হইতে কান্না সুরু হইত তাঁহাব। এজন্য স্বামীর কাছেই কি কম তিরস্কার খাইয়াছেন?

উঠিতে বসিতে উপচাইয়া-পড়া সেই অশ্রুসমুদ্র কোথায় শুকাইয়া গেল আজ?

বত্রিশ নাড়ীর যে বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াও মাতা-পুত্রকে কোথায় যেন অদৃশ্য ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এতদিন, তেমনি কোনো অদৃশ্য আঘাতেই কি নির্ম্মূল হইয়া গেল সেই বন্ধন!

ক'দিনের অগোছালো সংসারটাকে গুছাইয়া লওয়াই কি এতো বড়ো দরকারী কাজ হইল জয়াবতীর যে ছেলে-বৌ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাইতে না ডিঙাইতেই আগাগোড়া ওলট-পালট করিয়া গুছাইতে সুরু করিয়া দিলেন?

মুক্তি জিনিসটা কাম্য হইতে পারে, কিন্তু বেশ সহজপাচ্য কি?

পরিপাক করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়?

মাস দুই পরে আবার নিজে হইতেই তো বৌ আনার কথা তুলিতে হইল। কিসের যেন একটা ছুটিতে সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছিল বিমলেন্দু। জয়াবতীর মনে হইল—ছেলে যেন ভার-ভার, মনঃক্ষুন্ন।

মায়ের দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিতেছে, সে কি অভিযোগের নয়?

বরাবর বাড়ী আসিলেই মায়ের সঙ্গে যতো গল্প হয় তাহার রাত্রে খাওয়ার সময়। সারা পাড়া নিশুতি হইয়া যায়, শুধু জয়াবতীর ঘরে তিন দিনের খরচের কেরোসিন একদিনে পোড়ে।

এবারে পাঁচ মিনিটে খাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল বিমলেন্দু, মাকে একবার বলিয়াও গেল না। জয়াবতী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন ছেলের গমন-পথের পানে।

অনেক রাতে যখন নীচের কাজকর্ম্ম সারিয়া জয়াবতী উপরে উঠিলেন, তখন ছেলে ঘুমে অচেতন। মাথার কাছে চিঠির প্যাড আর ক্যাপ্-খোলা ফাউন্টেনপেনটা পড়িয়া আছে। হ্যারিকেনের সামনে একটা বই আড়াল করিয়া দিয়া দিব্যি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

চিরদিনের ঘুম-কাতুরে ছেলে, পরীক্ষার পড়ার সময় যেমন হ্যারিকেনে বই আড়াল করিয়া দিয়া খাতাপত্র ছড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িত! জয়াবতী আসিয়া আলোটাকে মাথার কাছ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া পরম যত্নে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতেন বই-খাতাপত্র।

আজ শুধু বিনাবাক্যে আলোর শিখাটা একটু কমাইয়া দিয়া পাশের ঘরে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়েন। ওঃ বৌকে চিঠি লেখা হইতেছিল বাবুর! তাই মায়ের সঙ্গে একটা কথা বলারও ফুরসৎ হইল না!

পরদিনই ছেলের কাছে বৌ আনার কথা তুলিলেন জয়াবতী।

বিমলেন্দু যেন আলগোছ হইয়াই ছিল। চক্ষুলজ্জার খাতিরেও একবার বলিল না 'থাক্ না আরো কিছুদিন, এতো তাড়া কি?"

বিয়ের কনে এবার ঘর করিতে আসিল।

ঘর করিতেই যে আসিয়াছে, সে দাবীর ভাব প্রতিভার ব্যবহারে ষোলোআনা ছাপাইয়া আঠারো আনায় ওঠে। এ বৌ লইয়া ক'দিন সদ্ব্যবহার রাখিতে পারে লোকে? নতুন বৌ একটু কুণ্ঠিত, একটু নম্র, একটু সলজ্জ হইবে না? কেন, আর কারো বাড়ীতে কি বৌ কোনোদিন দেখে নাই প্রতিভা?

প্রতিভার কথাবার্তা 'চ্যাটাং চ্যাটাং', হাঁটা-চলা দুমদাম, কাজকর্ম্ম বেপরোয়া। এই তো বৌ আনার পর পাঁচ দিনও যায় নাই, শনিবারে বাড়ী আসিয়াছে ছেলে, বিমলেন্দুকে জলখাবার দিবেন বলিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া আসিতেছেন জয়াবতী, রান্নাঘরে ঢুকিয়া অবাক!

প্রতিভা চায়ের জল চাপাইয়া দিয়া নিমকির ময়দা মাখিয়া বেলিতে বসিয়াছে!

মিনিট খানেক স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জয়াবতী কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন : 'আকাচা কাপড়ে ছিষ্টি ভাঁড়ার ছুঁলে বৌমা?'

প্রতিভা খুন্তির কোণ্ দিয়া নিমকির গায়ে ঠোক্কর মারিতে মারিতে তীক্ষ্ণস্বরে বলে : 'আকাচা কাপড় মানে? আপনার সামনেই তো কাপড় কেচে এলাম দেখতে পেলেন না?'

'দেখবো না কেন, কানা তো নই? পরলে তো সেই তোমাদেব ঘবের আলনার জামা-কাপড়? আর সেই অবধি তো বিছানায় বসে ছিলে!'

'আপনার সংসারে বুঝি কাচা কাপড় পরলে একপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়? জানতাম না তা'—বলিয়া চাকি, বেলুন ছাড়িয়া আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়ায় প্রতিভা। ফর্সা রং, এতটুকু এদিক ওদিকেই লাল হইয়া ওঠে।

চায়ের জলটা উথলাইয়া উথলাইয়া উনুনের গায়ে পড়িতে থাকে। জয়াবতী বোকার মতন দাঁড়াইয়া থাকেন। করিবেন কি? বৌকে খোসামোদ করিয়া ডাকিয়া আনিবেন, না নিজেই তাহার পরিত্যক্ত কাজটা শেষ করিবেন?

দুইটাই যে সমান অসম্ভব।

হঠাৎ এক সময় চোখ পড়িল, চা খাবার না খাইয়াই বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল বিমলেন্দু। বোধ করি জীবনে এই প্রথম।

বৌ যে 'সাতখানা করিয়া' লাগাইয়াছে গিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

দিন যায়।

কেমন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে ছেলে, আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে বৌ, নিরুপায় আক্রোশে শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখেন জয়াবতী।

প্রত্যেক শনিবারে বাড়ী আসে বটে বিমলেন্দু, রবিবারে থাকিয়া সোমবার ভোরের গাড়ীতে কলিকাতায় ফেরে, কিন্তু ক'টি কথা কহিতে পান জয়াবতী? চোখে দেখিতে পান ক'বার?

বাড়ী আসিয়া ঘরে ঢুকিবার আগে যা দুই একটা মামুলী কুশল-প্রশ্ন করে, নিতান্তই দায়-সারা গোছের সেটা। তারপর সেই যে 'ইষ্টদেবী'র মন্দিরে গিয়া ঢুকিল, আর পাত্তা পাওয়া যায়

না ছেলের!

রাত্রি দশটায় জয়াবতী যখন বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে আহারের জন্য ডাক দেন, তখন নামিয়া আসে বিমলেন্দু, চুপ করিয়া খাইয়া উঠিয়া যায়।

চির-অভ্যাসের বশে ছেলের রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যবস্তুগুলার আয়োজন করেন ঠিকই, কিন্তু কাছে বসিয়া মাথার দিব্যি দিয়া সবগুলি ছেলের উদরসাৎ করাইবার স্পৃহা যেন আর নাই।

ভালো করিয়া না খাইলে শুধু রাগই বাড়িয়া ওঠে।

একদিন তো ফস্ করিয়া বলিয়াই বসিয়াছিলেন : 'এবার থেকে তুই বাড়ী এলে বৌমাই যেন রাঁধে, নইলে তো তোর খেয়ে পেটও ভরে না, ভালোও লাগে না দেখি।'

বিমলেন্দু কিন্তু অপ্রতিভ হওয়ার পরিবর্তে মায়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানিয়া স্বচ্ছন্দে বলিয়া গেল : 'তোমার মনটনগুলো আজকাল কী সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! আশ্চর্য্য!'

অপমানাহত কালো মুখ লইয়া বসিয়া থাকিলেন জয়াবতী, উত্তর যোগাইল না। উত্তর দিবেনই বা কাকে? ছেলে ততক্ষণ উপর-কোঠায়।

পাড়াগাঁয়ে পাড়া বেড়াইবার প্রথাটা রীতিমতই আছে, বিশেষত একটা উপলক্ষ্য জুটিলে কারোবাড়িতে নতুন বৌ আসা তো একটা বড়দরের উপলক্ষ্য। বৌ কেমন হইল—এই কৌতূহল লইয়া পাড়া ঝাঁটাইয়া মহিলার দল বেড়াইতে আসেন জয়াবতীর বাড়ী।

অপরের কাছে জয়াবতী খেলো হইতে রাজী নন, তাই বৌয়ের তিনি প্রশংসাই করেন। কিন্তু অন্তঃসারহীন কৃত্রিম সেই ভাষা বুঝিয়া ফেলিবার মতো বুদ্ধি এ দেশের বারো বছরের মেয়েটিরও আছে।

জয়াবতীর কাছে জ্ঞাতব্য তথ্য সব সংগ্রহ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা আবার উপরে উঠিয়া বৌয়ের ঘরেও উঁকি মারিতে যান। সেখানেও তথ্যসংগ্রহ হয় কিছু।

পাড়ার লোকে বেড়াইতে আসিলে তাঁহাদের সম্মানার্থে যে নীচে নামিযা আসিয়া আসন পিঁড়ি দিবে—এতো গরজ পড়ে নাই প্রতিভার। তবে উপরে কেউ উঠিয়া আসিলে গুছাইয়া গল্প করিতে আপত্তি নাই তাহর। জয়াবতীর দুর্ব্ব্যহারের পরিচয দিবার জন্যও তো শ্রোতার প্রয়োজন?

শ্রোতারাও অবশ্য শুনিতে অরাজী নয।

শুনিয়া আবার জয়াবতীর কাছে আসিয়া গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের অভিনয় করিতেও তো মজা আছে।

'বৌয়ের তো খুব সুখ্যাতি করিস্, শুনেছিস তোর বৌয়ের কথা?'

কথাটি বলিয়া লাহিড়ীদের বড়ো গিন্নী আঁচলের কোণ খুলিয়া দোক্তার কৌটাটি বাহির করেন।

জয়াবতী নিস্পৃহ ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলেন : 'কেন, কি বললে?'

'শুনলে তুই রেগে মরবি মেজবৌ, তবে আমাদের শুনলে কষ্ট হয়। আহা, একটা মাত্তর ছেলের বৌ,—মনের মতন না হলে কি কম দুঃখের কথা!'

জয়াবতী উদাসভাবে বলেন—'আর দিদি, মনই নেই, তা মনের মতন! সেই একজনের সঙ্গে সবই চিতায় গেছে। এখন ওরা ভালো থাকলেই ভালো।'

'আহা, তা তো বুঝলাম, তবু বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই। বেটার বৌ এসে কোথায় একটু দেখবে শুনবে—তা নয়, বৌ যেন মানোয়ারি গোরা! আমি কোথায় ভালোমানুষি করে বললাম—হ্যাঁ গা বাছা, আজ একাদশীর দিন ঝি আসেনি, শাশুড়ী মাগী খেটে মরছে, তুমি

ববং বাসন ক'খানা মাজলে পারতে,—মুখঝামটা দিয়ে বললে কি—"কে জানে, কবে কি তিথি-নক্ষত্র পড়ছে, পাঁজী-পুঁথি নিয়ে তো বসে নেই। আমার কাজ ওঁর পছন্দ হলে তো!"—শোনো দিকি কথা!'

জয়াবতী অবশ্য অনেক শুনিযাছেন, তবু অপবেব সামনে দোষারোপে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন—'হ্যাঁ, এখন তো ওই বদনামই হবে। আমাব ভ্যাডাকান্ত ছেলেকেও তাই বুঝিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে চব্বিশ ঘন্টা ওপরতলায বসে আছেন। কুটোটি নাড়েন না। পছন্দ-মতন কাজ করলেই পছন্দ। কাজ দেখলে গা জ্বলে যায!'

চেষ্টাকৃত ভদ্রতার আবরণ খসিয়া পড়ে।...কেন কি দায় পড়িয়াছে জয়াবতীর বৌয়ের সুনাম বাখিতে? বৌ যদি পাডার লোকেব কাছে নিন্দা কবিয়া বেড়ায় তাঁহাব?

লাহিড়ী-গিন্নী গভীব পবিতাপেব ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়া বলিয়া ওঠেন—'হ্যাঁরে, বিমল যে তোব সোনাব ছেলে! সে কিছু বলে না?'

'তেমন স্যাকবাব হাতে পড়লে সোনাও লোহা হযে যায় দিদি!'

'কি জানি বাবা! কলিকাল আর কাকে বলেছে! আহা পাঁচটা সাতটা নয়—একটা ছেলে, বৌ ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে পর করে নিলে! মবে যাই, চিবদিনের ভালোমানুষ, তোর কপালে এতো দুর্ভোগ!'

লাহিডী-গিন্নী বোধ হয সহজে থামিতেন না, এমন মনোহর পরিবেশটি গড়িয়া উঠিয়াছিল! আসব মাটি কবিয়া দিল নাতনী লাবণ্য আসিয়া : 'দিদিমা, শীগগির চলো, বাবা এসেছে, মামিমা তোমায ডাকছে।...'

যতো মুখরোচক আলোচনাই হোক, জামাই আসিয়াছে শুনিয়া আর বসিয়া থাকা চলে না। লাহিড়ী-গিন্নী উঠিয়া পড়েন।

উঠিতে পারেন না জয়াবতী।

হাতের ঘড়া-ঘটিটার মতোই নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকেন।

আবরণ জিনিসটা একবার খসিয়া গেলে অবস্থাটা হইয়া ওঠে মারাত্মক।...চক্ষুলজ্জার বালাই আর থাকে না কোন পক্ষেরই।

জয়াবতী প্রায় প্রত্যহই কাঁদিয়া কাটিয়া পাড়ার কারুর না কারুর বাড়ী বেড়াইতে যান, আর মনের ভার লাঘব করিয়া আসেন। প্রতিভা বাড়ীতেই সমব্যথী জুটাইয়া আনিয়া সারাদিন 'শাশুড়ী-চরিত' আলোচনান্তে পড়ন্ত বেলায় উঠিয়া চুল বাঁধে, গা ধোয়, পরিপাটি করিয়া সাজিয়া ছাদে গিয়া বসে, নয়তো বরকে চিঠি লেখে।

জয়াবতী আসিয়া দুমদাম করিয়া সংসারের কাজ করেন আর বৌকে শুনাইয়া শুনাইয়া রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকেন,...বৌ কখনো অগ্রাহ্যভরে ঠোঁট উল্টায়, কখনো পাল্টা একটা কটু মন্তব্য করে।

তবু সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না বিমলেন্দুর পরিবর্তন।

আজকাল আর মায়ে-ছেলের কথাবার্তা নাই বলিলেই চলে, গুম হইয়াই থাকে বিমলেন্দু। অথচ বৌয়ের সঙ্গে যে গল্প ফুরাইতে চায় না, সেটা তো চোখে পড়ে অহরহ।...

মা বলিয়া সমীহ করে না কেউ।

তা'ছাড়া আর একটি বদ-অভ্যাস সৃষ্টি হইয়াছে জয়াবতীর—ছেলে-বৌয়ের ঘরের জানলার ধারে-কাছে কোন একটা কাজের ছুতায় দাঁড়াইয়া পড়া।

হায়! কেন জয়াবতীর এতো অধঃপতন!

সুখ তো তাহাতে নাই-ই, বরং দুঃখই বাড়ে।...ঘরের জানলায় কান না পাতিলে কি একথা শুনিতে পাইতেন জয়াবতী : 'আসল কথা হিংসে! হিংসে! বিধবারা ভারি হিংসুটে হয়, বরাবর জানি আমি। নিজেদের সাধআহ্লাদ সব ঘুচে গেছে কিনা, তাই পরের সুখ দেখলে হিংসেয় প্রাণ ফাটে। এই যে—তুমি আমার কাছে একটু বসো কি দু'দণ্ড গল্প করো—সহ্য হয় না। বুক ফেটে যায়।'

হয়তো বিমলেন্দু ক্ষীণ একটু প্রতিবাদ করে, কিন্তু সে এমনই ক্ষীণ যে জয়াবতীর কানে আসে না।...বৌয়ের পরবর্তী উত্তরটাই কানে আসে : 'আহা, তুমি আর বুঝবে কি? তোমার সামনে তো ভিজে বেড়ালটি।...বলি পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে ছড়ায় কি বাতাসে উড়ে গিয়ে? বাড়ীর লোক না রটালে? এতো বলি মরে যাচ্ছি, কলকাতায় নিয়ে চলো আমায়—'

'আমিও তো খুঁজে মরে যাচ্ছি গো প্রতিভারাণী। বাড়ী পাচ্ছি কই?'

কে বলিল কথাটা?

বিমল?

জয়াবতী বাঁচিয়া আছেন তো?...সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে? আরো বাঁচিবার প্রয়োজন আছে?

তবু ভাত বাড়িয়া খাইতে ডাকিতে হয়।

এই দুর্গতি জয়াবতীর। বাড়ীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই যে ডাকিয়া দিবে।...অবশ্য ডাকেন বলিয়া যে সে ডাক স্নেহে বিগলিত এমন নয়। স্বভাব-বহির্ভূত স্বরে কথা কহিতে দেখা যায় আজকাল জয়াবতীকে—'কি গো, বড়মানুষের মেয়ের ভাতটাত খাওয়ার ফুরসৎ হবে? নাকি বাঁদী হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে বেলা বারোটা অবধি?'

তা' এহেন সম্বোধনে যাকে ভাতের থালার গোড়ায় আসিয়া বসিতে হয়, মেজাজ তাহারই-বা ভালো থাকিবে কোন্ হিসেবে?

প্রতিভাও সশব্দে আসে, ভাত-তরকারি ফেলিয়া ছড়াইয়া যথেচ্ছভাবে খায়। উপকরণের ত্রুটি ধরিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে।...তাহার বাপের বাড়ীতে নাকি তিন রকম মাছ রান্না না হইলে পাতের কাছেই আসে না কেউ, ভাতের চাইতে তরকারির পরিমাণ বেশী না হইলে যে আবার খাওয়া যায়, বিয়ের আগে নাকি জানাই ছিল না প্রতিভার, ইত্যাদি।

এমনি কি একটা মন্তব্যের পরদিন জয়াবতী প্রতিভার ভাত বাড়িয়া দিয়া থালার পাশে একটি কাঁসি সজনে খাড়ার চচ্চড়ি আনিয়া বসাইয়া দেন।

'এটা কি হলো?'

প্রতিভার তীক্ষ্ণ প্রশ্নে আজকাল তেমন আহত হন না জয়াবতী, সমান তীক্ষ্ণ সুরে তিনিও বলেন—'তরকারির অভাবে কষ্ট করে খাবার তো দরকার কিছু নেই বৌমা, বেশী খেলেই রাঁধবো বেশী বেশী।'

প্রতিভা হাতের উল্টোপিঠের সাহায্যে পাত্রটা খানিকটা দূর ঠেলিয়া দিয়া বলে—'তা বলে বিধবা বুড়ীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এতো সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে! আপনার লোভের জিনিস!'

'কী! কী বললে বৌমা!!'

আহত জন্তুর মতো একটা বিকৃত চীৎকার বাহির হয় জয়াবতীর কণ্ঠে। দুঃসহ স্পর্দ্ধার এই নূতন রূপ দেখিয়া সমস্ত শরীর যেন থরথর করিয়া ওঠে।

প্রতিভা অবশ্য দমে না তাহাতে, মুচকি হাসির সঙ্গে বলে—'মিথ্যে আর কী বলেছি? কাঁসি-ভর্ত্তি চচ্চড়ি তো খান বসে বসে। দেখেছি বলেই বলছি।'

কথাটা যদি মিথ্যা হইত, তবে বোধ করি জয়াবতীর সর্ব্বাঙ্গে এমন আগুন ধরিয়া যাইত না।...মিথ্যা নয়, বড়ো বেশী সত্য। এই সজিনা খাড়ার ওপর আজীবন দুর্ব্বলতা জয়াবতীর। বাড়ীর উঠানেই গাছ, ফলও ধরে অজস্র। আর প্রত্যহ রাঁধা চাই জয়াবতীর।...এই লইয়া দেবনাথ কতো হাসিতেন! হাসিতেন বটে, আবার দেবনাথ কোনোদিন জিনিসটা একটু কম আছে দেখিলে নিজেই গাছ ঠেঙাইয়া পাড়িয়া দিতেন।

শুনিতে হাসির কথা—কতো সময় একা হাতে জয়াবতী ইচ্ছার অনুরূপ কুটিয়া উঠিতে না পারিলে পেন্সিলকাটা ছুরি লইয়া ছাড়াইয়া দিয়াছেন রাশি রাশি।

জয়াবতী অনুযোগ করিলে বলিতেন—'তা হোক্, হাসুকগে পাড়ার লোকে। ডাঁটা-চচ্চড়ির বহর কম হলে মহারাণীর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে যে! তখন উপায়?...কেন, ছাড়ানো কিছু খারাপ হচ্ছে না কি? দেখো না!'

বিমলেন্দুও কতো দিয়াছে ছেলেবেলায়।

জয়াবতীর সজিনাখাড়া প্রীতি পাড়ার লোকেরও অবিদিত নয়। তাঁর নিজের বাড়ী গাছ থাকা সত্ত্বেও, যে যার গাছের ডাঁটা উপহার দিয়া যায় প্রত্যেক বছর।

প্রীতির সেই দুর্ব্বলতাকে 'লোভ' বলে নাই কেউ কোনোদিন। হেনস্থার চোখে দেখে নাই ব্যাপারটা। আদরের ছিল।

আজ বিমলের বৌ আসিয়া সেই বস্তুটার খোঁটা দিল এমন নির্লজ্জ ভাষায়!

অনেক মুখরা হইয়াছেন আজকাল জয়াবতী, তবু আজিকার এই আঘাতটা যেন মূক করিয়া দিল তাঁকে।...কিভাবে যে তিনি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন, কিভাবে ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, সে আর মনে নাই।

হঠাৎ কোনো আক্রমণের মুখোমুখি হইয়া গেলে মানুষ যেমন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ছুটিতে থাকে আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক প্রেরণায়, তেমনি আত্মরক্ষার ভাবই যেন ছিল জয়াবতীর পলায়নে।

কিন্তু অমন আছড়াইয়া পড়িয়া নালিশ জানাইলেন তিনি কাহার কাছে?

ঘোর সংসারী জয়াবতী এমন আকুল হইয়া কবে ডাকিয়াছেন ঠাকুরকে?

আজই কি এতো প্রয়োজন পড়িয়া গেল দর্পহারী মধুসূদনকে? তাই অনবরত মাথা কুটিতে থাকেন তাঁহার উদ্দেশে!

কিন্তু মধুসূদনের এতো প্রখর শ্রবণশক্তির প্রমাণই বা কবে কে পাইয়াছে? বধির বলিয়াই তো চিরদিনের দুর্নাম তাঁহার। আজ জয়াবতীর আবেদনটাই এতো তাড়াতাড়ি কানে ঢুকিয়া গেল?...আর আশ্চর্য্য, প্রতিভার মতো একটা তুচ্ছ প্রাণীর দর্পচূর্ণ করিতে একেবারে গদাটারই প্রয়োজন হইল বীরপুরুষের!

বিরাট সেই গদাটা যে প্রতিভার দর্পের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারিণীর পাঁজর ক'খানাও চূর্ণ করিয়া বসিবে, সে বোধও রহিল না? এমনি বেহুঁশ?

না কি জয়াবতীর কাণ্ডজ্ঞানহীন আবদারে নিতান্তই বিরক্তচিত্তে বেপরোয়া ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন মারাত্মক অস্ত্রটাকে? আচমকা সেই ধাক্কাটা লাগিল গিয়া বিমলেন্দুর গায়ে?

তা নয় তো—যে বিমলেন্দু নিত্য দুই বেলা ট্রামের ফুটবোর্ড হইতে লাফাইয়া রাস্তায় পড়ে, সেইদিনই বা সে সোজাসুজি রাস্তার বদলে রাস্তায় চলন্ত বাসের তলায় পড়িল কেন?

সেদিনের মাথা-কোটার মাত্রাটা কি বড়ো বেশী হইয়া গিয়াছিল জয়াবতীর? তাই নিজেও তিনি বিমলেন্দুর নিস্পন্দ মূর্ত্তিটার মতোই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন হাসপাতালের খাটখানার সামনে? বিমলেন্দুর মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ডের জন্যও মাথা কুটিবার শক্তি আর খুঁজিয়া পাইলেন না?

পাড়ার লোকে বলাবলি করিয়াছিল—'এ ধাক্কা সামলাতে পারবে না মাগী, পাগল হয়ে যাবে—'.

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল—পাগল হওয়া অতো সোজা নয়।

দুই চোখের কোলে কালির রেখা আর গালের হাড় দুইটা একটা উঁচু দেখানো ছাড়া বিশেষ আর কোনো পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না।

আবার একদা দেখা গেল—শীত পড়িতে না পড়িতেই চির-অভ্যাসবশে রোদে পিঠ দিয়া বড়ি দিতেছেন জয়াবতী, আলাদা আলাদা পাত্রে তিল পোস্ত আর ছাঁচি কুমড়োর বড়ি। নৈপুণ্যের ঘাটতি কিছু নাই।

দেখা গেল—শীতের শেষের দিকে নাড়াচাড়া করিতেছেন কোটা আমসি আর কুলের আচারের পাথর লইয়া।

দেখা গেল—কূয়োর জলে ডাল আধ-সিদ্ধ থাকিবার ভয়ে মাজা চকচকে পিতলেব ঘড়াটা লইয়া 'ঘাটের জল' আনিতে।

এই তো উঠানের মাচা হইতে লকলকে কুমড়ো ডাঁটার ডগা কাটিয়া কাটিয়া চুপড়ি বোঝাই করিতে দেখিলাম আজ!

অতএব অনায়াসেই কল্পনা করা যায়—ভাঙা পাথুরিখানায় করিয়া সর্ষে-বাটা, লঙ্কা-বাটা আর পোস্ত-বাটা সাজাইয়া লইয়া দিব্য গুছাইয়া রান্না করিতে বসিয়াছেন জযাবতী।

তা পৃথিবীর নিয়মই তো এই—

পাঁজর ভাঙিয়া গেলেও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না মানুষের।

এখনো অবশ্য প্রতিভার ভাত বাড়িয়া আহারে তাগিদ দিতে ডাকাডাকি করিতে হয় জয়াবতীকেই—তৃতীয় প্রাণী আর কই? তৃতীয় প্রাণী আবির্ভাবের সমস্ত সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তো মুছিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে বিমলেন্দু।

চকচকে কালো পাথরের বড়ো থালায় পরিপাটি করিয়া সাদা ধবধবে আতপ চালের অন্ন বাড়িয়া রাখিয়া জয়াবতীই ডাকেন—'বৌমা, অ বৌমা, নেবে এসো মা, মুখে দুটো দিয়ে যাও।'

কণ্ঠস্বরে মমতার মাত্রাটা বড়ো বেশী পরিস্ফুট হইয়া ওঠে না? আশেপাশে জ্ঞাতিদের বাড়ী হইতে শুনিতে পাওয়া যায়...অবাক হয় তাহারা জয়াবতীর মমতা আর মহানুভবতার পরিচয়ে!

স্নেহ-বিগলিত করুণ স্বর করুণতর হইয়া ওঠে অনুরোধ-উপরোধের সময়!...পাখা হাতে করিয়া কল্পিত মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে বলেন—'খেতে পারছি না—বললে চলবে কেন মা? শরীরটাকে তো রাখতো হবে? ভালো জিনিস খাওয়ার বরাত তো ঘুচিয়েছেন ভগবান, পোড়া বিধবার গুচ্ছির শাক-পাতা ডাঁটা-চচ্চড়ি না খেয়ে উপায় কি? ভাত ক'টা ফেলে উঠো না মা, বরং আর দু'গাছা ডাঁটা দিই।'

মহিলা-সমাজের চিত্ত-জগতে প্রতিবেশীর ঘরের সদ্য-বিবাহিতা বধূর আচার-ব্যবহার যতোটা কৌতূহলকর, সদ্য-বিধবার আহার-বিহারটা তার চাইতে কিছু কম নয়, হয়তো বা বেশীই।...কাজেই—প্রায়ই ঠিক আন্দাজমতো সময়ে জয়াবতীর বাড়ীতে আবির্ভূতা হন কনকলতা,

লাহিড়ী-গিন্নী, মন্টির মা।...

ইহাদের মুখপানে চাহিয়া করুণ নালিশ জানান জয়াবতী : 'এস দেখো ভাই, খাওয়ার দশা! তাই তো বলি বৌমাকে, মরবার তো পথ নেই মা, বেঁচে থাকতেই হবে চিরকাল। বিধবার পরমায়ু মার্কণ্ডের পরমায়ু, না খেলে চলবে কেন? কচু, ঘেচু, শাকপাতাই খেতে হবে গুচ্ছির। যেমন কপাল!'

সমস্বরে সায় দেন সমাগতার দল।

জয়াবতীর দুঃখেই শুধু বিগলিত হ'ন না তাঁরা, বিগলিত হ'ন জয়াবতীর করুণ হৃদয়ের পরিচয়ে।...আর কেউ হইলে হয়তো বা "অপয়া" রব তুলিয়া বিদায় করিয়াই দিতো বৌটাকে।

আচ্ছা—জয়াবতীর কণ্ঠস্বরটাই শুধু কানে ঢোকে তাঁদের, দৃষ্টি পড়ে না মুখচ্ছবির পানে?...কণ্ঠস্বরে মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তাহার স্নিগ্ধচ্ছায়া?...আছে চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণের অতি সূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিষাক্ত হাসির আভাসে?

[১৩৫৪]

সাগর শুকায়ে যায়

তিনি আমাকে অসাধ্য সাধন করাইয়া ছাড়িল। কবিতা লিখিতে বসিয়াছি! আমার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে ব্যাপারটা যে কতদূর বেখাপ্পা সে আমিই ভালো জানি, তবু উপরোধে মানুষ কি না করে? অতিবড় একটা বৃহৎ বস্তুও অনায়াসে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে, এ তো সামান্য একটা কবিতা লেখা!

তাছাড়া হাতে প্রচুর সময়। এমনিতেই—মানে এই বুড়ো বয়সেও—'কি যেন চাই কি যেন পাইনি' গোছের ভাব জাগিতেছিল। কাজেই কলম লইয়া বসিতে বিশেষ মন্দ লাগে নাই।

বহুকাল হইতে পাওনা ছুটি পচিয়া ভূত হইতেছিল, লইবার সাহস হয় না। কর্ত্তাদের মুখ চাহিয়া নিজেও একমনে পচিতেছিলাম। বাড়ির ভিতরের অবিশ্রাম তাড়নায় মরিয়া হইয়া একদিন ছুটির দরখাস্ত করিলাম। ঈশ্বরকৃপায় তিন সপ্তাহের ছুটি আদায় করিয়াছি।

ভরসা হইল—আঃ কিছুদিন অন্ততঃ 'বেঙ্গল টাইমের' হাত এড়াইব। এই নূতন শীতের আমেজ, বেলা দিন দিন ছোট হইতে থাকে, এ সময় ছত্রিশ মিনিট আগে বিছানাটি ছাড়িয়া ওঠা যে কী মারাত্মক—সে কেবল আমার মত আজীবন নিদ্রা-অতৃপ্ত নিদ্রাবিলাসী বা নিদ্রাভিলাষীরাই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবেন।

ভোররাত্রের সেই মনোরম সময়টিতে উষ্ণ শয্যার অর্দ্ধাংশ শীতল করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনীকে বিদায় দিতেই বা কেমন হয়? অথচ 'হাঁড়ি চড়ানো'র সমস্যাটাও কম প্রবল নয়। যদিবা স্নান হইয়া ওঠে, আহারের সময় থাকে না, আহারের উপযুক্ত সময় হাতে থাকিলে হয়তো সেইদিনই ভাত জুটিতে বিলম্ব।

আসল কথা বরাত।

অন্য-অন্যবার ছুটিছাটা পাইলে এখানে ওখান ঘুরিয়া আসি, এবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।' স্রেফ বাড়ী বসিয়া খাইব আর ঘুমাইব, ঘুমাইব আর খাইব। কাজের মধ্যে—দেখিয়া

শুনিয়া বুঝিয়া দর-কষাকষি করিয়া ইচ্ছামতন বাজার করিব। ব্যস্, একুশটি দিন একুশটি রবিবারের মত অনাহত মধুরছন্দে কাটিয়া যাইবে।

কাটিলেও দিনচারেক, হঠাৎ একদিন—"নির্ঝরিণী উপলখণ্ডে বাধা" পাইল। ভিতর হইতে 'কমপ্লেন্' আসিল—"বাজারেব ছুতোয় চাকরটাকে দু'ঘণ্টা আটকে রাখলে তো গেরস্থর চলে না বাবু, আচ্ছা জ্বালা হয়েছে।"

ভাবিলাম—মরুকগে আর বাজারে কাজ নাই, গেরস্থর জ্বালা বাড়াইয়া এবং চাকর ছোঁড়ার ন্যায্য উপার্জ্জনে বাধা হইয়া শাপমন্যি কুড়ানোয় লাভ কি? সকালের ঘুমটা আর একটু টানিয়া লম্বা করিয়া আনিতে পারিলেই ও নেশা সারে।

পরদিন আবার নূতন অভিযোগ। নেপথ্য হইতে কানে আসে।—"বেলা দশটা অবধি বিছানা ছড়িয়ে ঘর আগলে রাখা—সময়ে বিছানা ওঠে না—বাসি ঘরে ঝাঁট পড়ে না— ভাল জ্বালা হয়েছে।"

জ্বালা বাড়াইবার অসদভিপ্রায় কখনোই নাই, স্থির করিলাম —ঘুমের মাত্রা কমাইয়া সকালে একখানা 'অমৃতবাজার' কিনিয়া বাহিরের ঘরে বসিব। অতিনিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকরও বটে।

কাগজখানা খুলিয়া ধরিয়াছি, আর বিনি আসিয়া এই কবিতার জন্য ধরিয়া পড়িল। তাহাদের কলেজে নাকি 'বঙ্গনারী' সম্বন্ধে একটা কবিতা প্রতিযোগিতা ছিল, আজ তাহার শেষদিন, অথচ আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই তাহার। ব্যর্থ চেষ্টায় হতাশপ্রাণা বিনীতা দেবী শেষ পর্য্যন্ত সবিনয়ে দাদার দরবারে আসিয়া হানা দিয়াছেন।

অল্প বয়সে উক্ত দুষ্কর্ম্মের অভ্যাস কিছু কিছু ছিল, কিন্তু এ বয়সে কবিতা লেখা? কি জানি দেখাই যাক্। ছুটিতে অনেকে অনেক কিছুই করে জানি। আমাদের শ্যামলবাবু একবার সাতদিনের ছুটি লইয়াছিলেন—শুনিলাম সারা ছুটিটা নাকি ছেলেদের সঙ্গে লুডো খেলিয়া কাটাইয়াছিলেন। যতীনবাবু তো একবার আস্ত একখানা কাঁথাই সেলাই করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমিও না হয় কবিতা লিখিয়া—

তাছাড়া তোষামোদে হিমালয়ে টলে, আর তুচ্ছ আমি!

বেচারা বিনীতা, বিপদগ্রস্ত বিনীতা, আমার "দুটি পায়ে পড়িবার" করুণ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। দুইখানি পা-ই মাত্র সম্বল তাই! চারখানি থাকিলেও যে তাহার আপত্তি ছিল এমন মনে হয় না।

গরজের বাড়া বালাই নাই।

আমিও অগত্যা স্নেহের গরজে ফাউন্টেনে কালি, কৌটায় নস্য এবং পেটে চা ভরিয়া গুছাইয়া বসিয়াছি।

আজ পর্য্যন্ত 'নারী' সম্বন্ধে কোন গবেষণা করিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না। নারী অথবা বঙ্গনারী। মা বোন, স্ত্রী কন্যা—আরো দূরে গেলে মাসী, পিসি, দিদিমা, ঠাকুমা সবই যেন আলো বাতাসের মত অবশ্যপ্রাপ্য সাধারণ বস্তু। "ধরণীর ধূলি ধুয়ে—দেখি তা'রে দূরে থুয়ে"—এমন ইচ্ছা কই? কখনো তো জাগে নাই।

যাই হোক—তবু 'মহিয়সী' 'গরীয়সী' 'স্বর্গের সুষমা' 'সুধার নির্ঝর' 'অমরাবতীর আলো' 'মর্ত্ত্যের মাধুরী' প্রভৃতি ভালো ভালো মালমসলা লইয়া কাজে নামিলাম।

শোনা ছিল সাঁতার দিতে শিখিলে নাকি লোকে জীবনেও ভোলে না। কবিতাও কি একই পর্য্যায়ে পড়ে? বেশ ভাব ধরিতেছে। মনটা সেই নির্য্যাতিতা অবহেলিতা পদানতা বঙ্গনারীর

বেদনায় বিগলিত-প্রায়। আহা সেই বঙ্গনারী! সেই "শাঁখা সিন্দূর আলতাপরা পর্ণকুটির আলোকরা" সেই "হাসি মুখে আধপেটা খায়"—সেই "স্নেহবিহুল করুণা ছলছল—" বাংলার মেয়ে।

চিন্তাস্রোতে তুফান তুলিয়া বঙ্গনারীর একটি বিশিষ্ট নমুনা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

—সকালবেলা কি হচ্ছে বসে বসে? সংসারের একটু কাজের ভয়ে বৈঠকখানায় আড্ডা গাড়া হয়েছে? ও সর্ব্বনাশ, এ যে কবিতে! বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ!

সঙ্গে সঙ্গে অধরোষ্ঠের এমন একটি ভঙ্গি করিলেন, যাহা অন্যে করিলে আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইত, অথচ এক্ষেত্রে—আপাদমস্তকে একটি পুলকের হিল্লোল খেলিয়া গেল।

গোপন করিব না—একটা বয়সানুচিত গর্হিত কর্ম্ম করিয়া বসিলাম।

—আহা ঢং দেখে আর বাঁচিনে। ছুটি পেয়ে একেবারে দিন দিন কাঁচাচ্ছেন। বলি পাঁচ পাঁচটা দিন তো এলিয়ে গড়িয়ে কাটলো—ক'দিন আর আছে ছুটির?

জোড়হাত করিয়া বলি—অয়ি নিষ্ঠুরে, ওকথা আর মনে করিয়ে দিও না। শুধু জেনো—'আমি কারো দাস নহি—নহি টাইপিস্ট, তুচ্ছ এক বেনের দোকানে।'

—রকম দেখ একবার। মদ খেয়েছ নাকি সক্কালবেলা?

—মদ বটে, কিন্তু নহে হীন ধেনোমদ। পান করিয়াছি প্রিয়ে, সুরা আনন্দের।

ভাবিলাম—প্রিয়া-মুখচন্দ্রমা যেরূপ কৌতুকস্মিত হইয়া উঠিতেছে, একটা উপযুক্ত উত্তর পাইব। কিন্তু মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে যে শব্দবাণ বাহির হইল তাহাতে আর যাই হোক প্রাণ শীতল হইয়া যায় না।

—আচ্ছা গো মশাই খুব রসিকতা হয়েছে, এখন একটা কাজের কথা হো'ক দিকিন।

—কি?

—বলি এত বড় ছুটিটা কি এমনি 'নয়ছয়' করেই কাটাবে?

ঈষৎ গম্ভীর হইয়া যাই। 'এত বড় ছুটি'—হায় ভগবান! যাক্। বলি যে—'এর চাইতে ভাল করে কাটানের উপায় তো কিছু জানা নেই।'

—তা জানা থাকবে কেন? তোমাদের আর কি, ছুটি পেয়েছো—খাচ্ছো দাচ্ছো ঘুমুচ্ছো আড্ডা দিচ্ছ, ব্যস্ চুকে গেল। আর আমাদের? সেই যে ঘাসজল সেই ঘাসজল। ছুটি! হুঁঃ। পোড়া শরীরে রোগও নেই যে দু'দিন বিছানায় পড়ে আরাম করবো!

বিরক্ত যদি হই, খুব কি অন্যায় হয়? হই বটে কিন্তু প্রকাশ করি না, সহজভাবেই বলি—বেয়ারামটাই আরাম, কেমন?

—সে আর তোমরা বুঝবে কি, বারোমাস সংসার ঠেলতে হলে বুঝতে।

বুঝিব না সত্যই! 'সংসার ঠ্যালা' বস্তুটা যে কি, বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সংসারই আমাদের ঠ্যালে, অহরহ ঠ্যালা দেয়।

কবিতা ঠেলিয়া, ফাউন্টেনে ক্যাপ্ পরাইয়া নিরাপদে সরাইয়া গুছাইয়া বসিলাম।

—বক্তব্যটা কি বল তো? সক্কালবেলা রণসাজ কেন?

—আমার আবার বক্তব্য! পোড়াকপাল আর কি! আজ পাঁচ বছর কোনো চুলোয় নড়িনি—(আমিই যেন নাড়িয়াছি) ভেবেছিলাম এই সময় একবার হাজারিবাগ ঘুরে আসবো। মা এই সমানে ভুগছেন—(বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর বাহাল তবিয়তের সংবাদ কি কখনো পাইয়াছি? কই মনে তো পড়ে না)—ক'ঘন্টারই বা রাস্তা, এ আর যাওয়া হয় না।

একটা চাল মারিলাম।

—হাজারিবাগ? তাই তো—আহা-হা, দু'দিন আগে যদি বলতে—আমাদের আফিসের একজন চেঞ্জে গেলো সেদিন ফ্যামিলি নিয়ে—তা'দের সঙ্গে অনায়াসে—

বলাবাহুল্য সংবাদটি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মাত্র।

ভাবিলাম এই লইয়া বার দুই হায় হায় করিলেই কথাটা এখনকার মত চাপা পড়িবে। কিন্তু দূরদর্শী রামপ্রসাদ বহুকাল পূর্ব্বে গাহিয়া গিয়াছেন—'আর কারো দোষ নয় মা শঙ্করী, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।'

শ্লেষ-মধুর উত্তরে ভুল ভাঙ্গিল।

—তা' আর যাবে না কেন চেঞ্জে, ফ্যামিলির ওপর দরদ থাকলেই নিয়ে যায় লোকে। এই হতচ্ছাড়া লোহা বাঁধানো শরীরে কখনো চেঞ্জে যাবার দরকারও হল না—কখনো দরদও পেলাম না।

বেশী উত্তপ্ত নয়—'কুসুম কুসুম গরম' সুরে বলি—বার বার খুঁড়ছো কেন নিজেকে? রোগ হ'তে কতক্ষণ? শৈল তো ছুটিতে বাড়ী যাবে, ইচ্ছে হয়—যাও না তার সঙ্গে হাজারিবাগ।

—আর কি? আপদ বালাইয়ের মতন বিদেয় করতে পারলেই বাঁচো। আমি বলে তোমার এই ছুটিটাব আশায় হা-পিত্যেশ্ করে বসে আছি। দু'জনে যাবো—মাকেও দেখা হবে, একটু বেড়ানোকে বেড়ানোও হবে, কেউ কিছু বলতে পারবে না। আর কোথাও যাবো বললেই তো তোমার ভাই চলুক, বোন চলুক, ছেলে মেয়ে সব চলুক, মা বুড়ো মানুষ কোথায় থাকেন তিনিও চলুন। রক্ষে কবো বাবা, বেড়ানো না গতরপেষা...মধুপুরে গিয়ে সেবার নাকে কানে খৎ দিয়েছি। খরচের খরচান্ত অথচ সুখের ষোলোকলা।

এবার আর বিরক্তি গোপন করি না। বলি—কি কবা যাবে বলো, ওদেবও তো আপদ বালাই বলে দূর করতে পাবি না।

আর যায় কোথা!

—হ্যাঁগো হ্যাঁ, তাই বলেছি যে আমি। এ সংসারে এসে পাঁচজনের 'কন্না' করতে করতে গায়ের রক্ত জল করলাম, এখন তো এই কথা শুনতে হ'বে! তা নইলে আর কলিকাল বলেছে কেন। তোমার মা বোনের মন রাখতে চব্বিশ ঘণ্টা হাড় ভাজা ভাজা ; দুটি ঠোঁট কখনো এক করিনি—নেহাৎ সাধ হয়েছিল—দুদিন হাঁফ ফেলে বাঁচবো—তা খুব মিটলো। (চক্ষে অঞ্চল প্রদান, বহির্গমন।)

কবিতা তো দুই ঠ্যাং তুলিয়া প্রস্থান করিয়াছে, অথচ ফিরাইয়া না আনিলেই বা কেমন হয়? কথা দিয়াছি মেয়েটাকে, আশা করিয়া আছে দাদা তাহাকে বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিবে।

অগত্যা লিখিতে থাকি—

আপনা বিস্মৃত প্রেমে বিলাইছ আপনারে
কি মধুর সুখে।
সুধু স্নেহ, সুধু সেবা, সুধু প্রাণভরা প্রীতি
ভরা আছে বুকে।
মমতার ছবিখানি—

—বাবা, আমায় একটু পড়াবে? পুত্র আসিয়া দরজায় উঁকি মারে। হাতে খান তিন চার মলাট ছেঁড়া বই ও ফাটা শ্লেটখানি। স্পষ্ট শুনিয়াও কথাটা ঠিক বোধগম্য হয় না। সহাস্য কৌতূহলে প্রশ্ন করি—কি রে ভোলা?

—বলছিলাম কি, আমায় একটু পড়াবে? জেঠিমা বললেন যে...একটু ঢোক্ গিলিয়া চুপ করিয়া যায় ছেলেটা।

রহস্যের মীমাংসা হয়। ভুলুবাবু স্বেচ্ছায় পড়া জানিতে আসিয়াছে? সূর্য্য কি পশ্চিমে উঠিয়াছে? জেঠিমার তাড়না।

বলি—কি বললেন জেঠিমা?

—বললেন যে—'যা না, বাবার কাছে পড়্‌গে যা না। চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো কুমড়োপটাশ হয়ে গেলো তোর বাবা'। হ্যাঁ বাবা, ঘুমোলে কুমড়োপটাশ হয়?

—হুঁ—হয়। আর কে কি বলেছে বে ভোলা?

—কি বলেছে?

—এই আমার কথা।

—ও—খুড়িমা বলছিলেন যে—'বট্‌ঠাকুরের ছুটি হয়ে আমরা তো মারা গেলাম বাবা, বেলায় খেয়ে খেয়ে অম্বলের রোগ জন্মে গেল'। হ্যাঁ বাবা, অম্বলের রোগ কি?

—ও একটা রোগ, তুই এখন যা ভোলা, পরে পড়াবো।

ভোলা অবশ্য বই শ্লেট লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে তিলার্দ্ধ দেরী করে না, সুযোগের অপব্যবহার কবিবার ছেলে সে নয়। আপন মনে বকিতে বকিতে যায়......অম্বলের রোগ, চচ্চড়ির রোগ, সুক্তুনীর রোগ, ভাতের রোগ, ডালের রোগ। হাসি আসিলেও হাসিতে পারি না, সর্ব্বাঙ্গে কেমন দাহ অনুভূত হয়। বিনীতার কবিতা যে আজ কম্‌প্লিট করিতে পারি এ ভরসা নাই। কলম লইয়া শুধু হিজিবিজি কাটিতে থাকি।.......

কতক্ষণ কাটিয়াছে কে জানে, চমক ভাঙ্গিল মার ডাকে।

—গৌর আছিস নাকি?

—মা? কি বলছো?

—বলছিলাম একটা কাজের কথা।—আর ক'দিন ছুটি আছে তোর?

হৃদয় স্পন্দিত হয়।—এই দিন ষোলো।

—হ্যাঁ আমিও তাই বলছিলাম—পাঁচ-পাঁচটা দিন তো ঘুমিয়েই কাটালি, দেশের বাড়ীখানার কিছু করবি না?

—দেশের বাড়ী?

—হ্যাঁ। অমন আকাশ থেকে পড়ছিস কেন? পৈতৃক ভিটে—দালান-কোঠা পড়ে যাচ্ছে. ঠাকুরঘরে কুকুর ঢুকছে, এটা কি ভালো হচ্ছে? আজ পাঁচ বছর তো বাড়ীতে হাত পড়েনি।

কথাটা সত্য, দাদা বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া থাকা ইস্তক ওমুখো হই নাই। দেশের বিষয় বলিতে তো ঠাকুরদার আমলের একখানা হাড়-পাঁজরা বার করা বাড়ী, আজীবন মেরামত করিবার অর্থ আর সামর্থ্য জড় করিলে একখানা নূতন বাড়ী উঠিত, কিন্তু সে কথা কে বলে? দেশের বাড়ীর উপর কী যে অমানুষিক ভক্তি মার, জুড়ি মেলা ভার। বৌ-ছেলের হৃদয়ে সেই অগাধ ভক্তির কণিকামাত্রেরও অভাব দেখিয়া গভীর অশান্তিতে দিন কাটান। পিত্রালয় সম্পর্কিত একটা অপোগণ্ড পুষ্যি থাকিলে মেয়েরা যেমন তাহার বিরুদ্ধে এতটুকু কথা সহিতে পারে না, ফোঁস্ করিয়া উঠে, শ্বশুরের ভিটেখানা লইয়া মার প্রায় সেই জ্বালা।

কথাটা জানি কিনা তাই আন্তরিক ভাব অন্তরে রাখিয়া মৌখিক উৎসাহে বলি—আমিও তো তাই ভাবছি ক'দিন, কিন্তু—করাই বা যায় কি? যা বাজার পড়েছে, এক ফুট তার চারটি

পয়সা, সামান্য কাঁটাপেরেকের দাম—

—ওসব কথা আর আমায় শুনিয়ে কি হবে বাছা—নিতান্ত বিরস মুখে অভিমত প্রকাশ করেন মা,—বাজার আক্রা বলে বন্ধ যাচ্ছে কোনটা? পান থেকে চুনটুকু রদ হয় না—ও একটা ওজর বই কিছু নয়। তোমাদের বাপ-দাদার ভিটে, রাখলে রাখবে ফেললে ফেলবে, আমার কি? তবে—'নিশ্চয়' করেছিলাম, এত বড় ছুটিটা পাচ্ছো, আক্কেল করে একবার যাবে। নিদেন একটা ছুতোর ডেকে কপাটগুলো আটক করলেও তো শেয়াল কুকুরেব পথটা বন্ধ হয়? ওমা—উচ্চবাচ্যই নেই। অধৈর্য্য হয়ে শেষটায় মনে করিয়ে দিতে এলাম।

জপের মালার উপর দিয়া আঙ্গুলের ডগা সলম্ফে ছোটে।.....

হায় ঈশ্বর! মাত্র পাঁচটি দিন—পাঁচটি দিন জীবনসমুদ্রের অগাধ তরঙ্গের মধ্যে একটি বুদ্বুদ—অলস আনন্দে কাটাইয়াছি—তাই এত বাক্যজ্বালা।

এইসব স্নেহময়ীর দল, 'অবিশ্রম খাটিয়া যে আমার সোনার শরীর কতটা কালি হইল তাহারই আলোচনায়, এবং কেমন করিয়া আমার প্রাণটা রক্ষা হইবে তাহারই দুর্ভাবনায় পেটের ভাত চাল করিতেছিলেন। হরিহে! তুমিই সত্য।

বেশ, আমিও আর কাহারও নই। পরিষ্কার জানাই—আমার অত পয়সা নেই, ভাঙা ইটের গর্ত্তে ঢেলে দিয়ে আসবার মত।

—তা থাকবে কেন?—মা সরোষ মন্তব্য করেন—পাঁচশো টাকা খরচ করে জামাই-তত্ত্ব করবার পয়সা আছে, বৌকে একেলা ওবেলা ঢাকাই জামদান কিনে দেবার পয়সা আছে, নেই শুধু পৈতৃক ভিটেখানার সংস্কার করতে। ঘোর কলি আব বলেছে কা'কে। ঝাঁটা মাবো এখনকার পাশ করা বিদ্যের কপালে।

সজোরে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মাতৃদেবীর প্রস্থান।

পরমুহূর্ত্তেই বিনীতা আসিয়া হাজির।

—দাদা, হয়েছে?

—না।

—না বইকি? আহা এই তো—ওমা কী চমৎকার হয়েছে দাদা? আবার বলা হচ্ছিল "হবে না। ভুলে গেছি"—কি করে লিখলে দাদা?

বৈকুণ্ঠের কণ্ঠ হ'তে হেথা কি পড়েছে খ'সে—
পারিজাত ফুল?
অথবা এ মর্ত্ত্যলোকে অমৃতের নির্ঝরিণী—
বিধাতার ভুল।
এনেছো কি ধরণীতে স্বর্গের অম্লান আলো—
ভরি স্বর্ণ ঝারি?
ফুলের সুষমা দিয়ে গড়া ও কোমল হিয়া,
তুমি নারী, তুমি বঙ্গনারী।
আপনা বিস্মৃত প্রেমে—

—ও দাদা, কী ভীষণ ভালো হয়েছে! মার্ভেলাস! আমি বাবা ফার্স্ট প্রাইজ! আর কেউ এ রকম লিখে আনবে না, গ্যারান্টি। কী মজা। শেষটা হয়নি দাদা? কতটুকু বাকী আছে? আর কিন্তু সময় নেই.....ও কি, ও কি.....

সহসা একটা অসম্ভব কাণ্ড করিয়া বসি—কাগজখানা ফ্যাঁস্ করিয়া টানিয়া নিয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলি।

বেচারার বিহ্বলভাব কাটিতে কিছু সময় লাগে।

আমি সক্রোধ গর্জ্জন করি—যা যা আর রেসিটেশান করতে হবে না, কলেজেও যেতে হবে না, চুপ করে বসে থাক্‌গে যা।

—হুঁ, আমি একটা প্রাইজ পাবো, তা' সইল না। নিশ্চয় মেজ বৌদি বারণ করে গেছে। আমার হিংসেতে যে ও মরে যায় একেবারে। তাই তখন বলছিল—"পরের লেখা দেখিয়ে বাহাদুরি করে লাভ কি?" বেশ বেশ, দেখে নিলাম। আমি বলেছি কিনা—বৌদি বললে দেখতাম! ছিঁড়ে ফেলা হ'ল—

কুড়ি বছরের ছোট বোন, আমার বিবাহকালে যে ঠেলাগাড়ী চড়িয়া বেড়াইত—সেই কি-না আমার নাকের সামনে সজোরে আঙুল নাড়িয়া সশব্দ পদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেল!

নিথর চিত্তে বসিয়া আছি...সময়ের জ্ঞান নাই.....ডাক পিওন চিঠি দিয়া গেল....মেয়ের চিঠি। লিখিয়াছে—

"বাবা, কত দিন যে তোমাদের দেখিনি, বড় মন কেমন করে। শুনলাম—তুমি খুব লম্বা ছুটি পেয়েছ। এই সময় একবাব এসে আমায় নিয়ে যাও। আশা করে রইলাম".....শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার ধৈর্য থাকে না, টেবিলে ফেলিয়া রাখি।

চোখের সামনে কয়েকটি 'পারিজাত ফুলের' আসল নমুনা ভাসিতে থাকে।

উপসংহারে কিছু বলা আবশ্যক। বেচারা বিনিকে এমন নিষ্করুণ নির্ম্মমতায় পথে বসানোয় হয়তো অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রবোধের জন্য বলিয়া রাখি—ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রা হইতে উদ্ধার করিয়া কমপ্লিট কবিতা যথাসময়েই তাহার হাতে পৌঁছাইয়াছি।

বলা যায় না—ফার্স্ট প্রাইজটা মারিয়া লইতেও পারে।

ছুটির বাকী ষোল দিনের গোটাসাতেক দিন পুণ্য পিতৃভিটায় কাটাইয়া আসিয়াছি। মিস্ত্রী লাগাইয়াছি, কয়েকটা শনিবার যাতাযাত করিলেই কতকটা কাজ আগাইবে।

সস্ত্রীক হাজারিবাগে যাইতেও কসুর করি নাই। পুরা ছয়টি দিন পূজ্য মাতৃচরণ দর্শনে তৃপ্ত গৃহিণীকে গৃহে ফিরাইয়া রাত্রেই দিনাজপুরগামী ট্রেন ধরিয়াছিলাম।

এই ফিরিলাম—কন্যা ও নাতনীকে সাবধানে নামাইয়া দিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে স্নান-আহার সারিতেছি। বেঙ্গল টাইম!

[১৩৫৩]

অবলা

অপরাধের মধ্যে দরজার মাথায় একটা 'টু লেট' লটকাইয়াছিলাম। নিজের বাড়ী নয়, ভাড়াবাড়ী, তবু সাবলেট হিসাবেই এই উদ্যোগ। বাড়ীখানায় সুবিধা অনেক। এখানে উঠিয়া আসা অবধি বাড়ীর ভিতর হইতে অভিযোগ অনুযোগ শুনিতে শুনিতে অস্থির হইতে হয় নাই। এটা কম সৌভাগ্যের

কথা নয়।

গৃহ পাইয়া গৃহিণী খুসী এ ব্যাপার বলিতে গেলে দুর্লভ-ই।

ভাড়াবাদে—সত্যই বাড়ীখানা সবদিকেই পছন্দ-সই। ট্রাম কাছে, বাজার কাছে, পাশে বস্তি নাই—যাত্রা পার্টি নাই; এমনকি প্রকাণ্ড এক তিন-চারতলা বাড়ী জগদ্দল পাথরের মত দক্ষিণ চাপিয়া বুকের উপর বসিয়া নাই।

দক্ষিণের অগাধ দাক্ষিণ্য।

মাসের তেসরা তারিখ হইতে ত্রিশ তারিখ পর্য্যন্ত দখিন হাওয়া গায়ে লাগাইয়া স্বর্গসুখ পাই; কিন্তু দোসরা তারিখের সকাল বেলায়ই যখন বাড়ীওয়ালার গোঁফছাঁটা বখাটে ভাগনেটা দাঁত বাহির করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়—সেই দক্ষিণ হাওয়াই বিষের মত ঠেকে। অথচ এ বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া? ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়।

বরং ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ, কিন্তু মনের মত একখানি বাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া? অসম্ভব বলিলেই হয়।

কাজেই ওই দোসরা তারিখের অসুবিধাটুকু অপেক্ষাকৃত সহনীয় করিয়া লইবার আশায় ভাবিয়া চিন্তিয়া, একখানা জুতার বাক্সের উল্টোপিঠে 'টু লেট' লিখিয়া দড়ির সাহায্যে বারান্দা হইতে ঝুলাইয়া দিলাম।

নীচের তলার তিনখানা ঘরের মধ্যে একখানা "বৈঠকখানা" নামের গৌরব বহিয়া উদয়াস্ত খিল লাগাইয়া বসিয়া থাকে, অন্য দুইখানা একরকম পড়িয়াই আছে।

উহারাই আয়বৃদ্ধির লক্ষ্য।

ঘর দুইখানা একেবারে খালি পড়িয়া অবশ্য নাই। সুধাময়ী তাহাতে তাঁহার নিজের ভাষায়—সংসারের "ডেয়ো-ঢাক্না" রাখিয়াছেন।

"টু লেট্" দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। হইবেনই জানিতাম।

কহিলেন—ভাড়া যে দেবে—এত জিনিষপত্রের গতি কি হবে? থাকবে কোথায়?

সবিনয়ে মাথা পাতিয়া স্থান নির্দেশ করিয়া দিলাম—সুফল ফলিল না। সুধাময়ী সুধাহাস্যের পরিবর্ত্তে ভ্রূকুটি করিলেন।

অগত্যা বুঝাইয়া বলিলাম—ও-সব বাজে জিনিষ জড় করে রেখে জঞ্জাল বাড়িয়ে লাভ কি? দাও না দূর করে!

—বাজে জিনিষ? কোন্‌টা বাজে শুনি?

—তা বটে!—

এই সব—টেবিলের পায়া, চেয়ারের হাতা, বেতের মোড়া, চেঁচাড়ির দোলা, পেরাম্বুলেটারের চাকা, ছাতার শিক, ডালাবিহীন বাক্স, ভাঙা ছবির ফ্রেম, আর পুরানো বইয়ের গাদা, কোনোটাকেই বাজে বলা চলে না—সুধাময়ীর হিসাবে, সবগুলিই সমান প্রয়োজনীয়।

কথার পিঠে দুইচারি কথা কহিতে কহিতে একরকম বচসাই হইয়া গেল।

যাইবার সময় ভারী গলায় জানাইয়া দিয়া গেলেন—আমার সংসার—আমি ইচ্ছা করিলে যথাসর্ব্বস্ব টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে পারি—তাঁহার আর কি। আমার কাছে "যথা এবং সর্ব্বস্ব" কি, সে সব তত্ত্ব বুঝাইবার সময় তখন নয়, আফিসের সময় হইয়াছে। ভালমানুষের মত খাইতে বসিয়া অযথা ভাত চাহিয়া খাইলাম ও ইচ্ছা করিয়া পান লইতে ভুলিলাম। লোভ দমন করিতে একটু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু মনস্তত্ত্ব পড়িয়াছি।

ডিবা খুলিয়া দেখিবার পর সুধাময়ীর কোমল প্রাণ সারাদিন ধরিয়া 'করকর' করিবে সন্দেহ নাই এবং তাহার ফাঁকে ফাঁকে অনুপস্থিত আমার জন্য যে মমতা সঞ্চিত হইতে থাকিবে তাহার মূল্য বড় কম নয়।

হিসাবের ভুল হয় নাই—বাড়ী ফিরিয়া দেখি ঘর দুইখানি ধোয়া মোছা, সেই পর্বতপ্রমাণ জিনিষ কোন্ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়াছে ঈশ্বর জানেন। বোকার মত অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতেও যাই নাই।

আহারের পর দুইটি পানের পরিবর্ত্তে ডিবাভর্ত্তি সযত্নরচিত টাট্‌কা পান পাইলাম।

বুদ্ধির জোরেই করিয়া খাই। অতএব নির্ব্বিবাদে 'টু লেট' ঝুলিল।

কিন্তু জানিতাম না কলিকাতা সহরের লক্ষ লক্ষ লোক এতদিন নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছিল আমার ওই ঘর দুইখানারই জন্য।

সকাল হইতে কড়া নাড়ার আর বিরাম নাই। রাশি রাশি লোক আসিতেছেই—আসিতেছেই—তাহাদের আপ্যায়িত করিয়া বসাইতে হয়, আদর করিয়া ঘর দেখাইতে হয়, আবার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গেলে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিতে হয়।

সুধাময়ীর আবার 'মদ্র' ও 'পূর্ব্ববঙ্গে' আপত্তি। বারে বারে তাঁহার বিপক্ষাচরণ করিতে পারি না! জলে বাস করি, কুমীরকে চটানো মূর্খতার পরিচয়।

আমি অবশ্য সারাদিন বাইরেই কাটাই—ঝামেলা সহিতে হয় ভায়াদের। তাহারা এমনই চটিয়াছে যে, নেহাৎ বয়সে বড় ও সম্পর্কে গুরুজন হই বলিয়াই বোধ করি জিজ্ঞাসা করিলে মারিয়া বসে না। তাহাদের স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়াও করুণায় বিগলিত হইয়া বলেন,—"আহা সত্যিই তো ওদের কি কাজকম্ম নেই?"

'কাজ-কম্ম' মানে একজন গ্র্যাজুয়েট হইয়া অবধি আজ তিন বৎসর যাবৎ কাজকর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতেছেন, আর অপরটি সেকেণ্ড ইয়ারে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া ললিত-কলার চর্চ্চা করিতেছেন। সিনেমা সাপ্তাহিকগুলার জ্বালায় বাড়ীতে টিঁকিবার জো নাই। ফিল্ম এক্‌ট্রেস্‌দের ছবিতে দেয়াল ভরিয়া গেল।

কিন্তু সে যাক্, গুণগ্রাহী বৌদিদি ওকালতী করিতেছেন—"তাই দিনরাত তোমার গরু তাড়াবে? পারবে না বাবু। নিজে তো নটা বাজতেই মজা করে পালাবে! সারাদিন যে কত ঝঞ্ঝাট—ভুগতে হলে বুঝতে!"

কি উত্তর দিব?

সেই ধূলিমলিন বিরাট ফাইলের স্তূপগুলা স্বচক্ষে দেখিলেই কি তিনি 'মজা' সম্বন্ধে মত বদলাইবেন?

তা' যখন নয়, বিনা প্রতিবাদে অপবাদ গায়ে মাখিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় কি?

বড়দিন উপলক্ষে চারদিন ছুটি পাইয়া সুধাময়ীর খেদ মিটাইয়াছি। ভাবিবেন না—একাদিক্রমে চারদিন এই গুম্ফবহুল "চাঁদমুখখানি" দেখিয়া দেখিয়া সর্ব্বদা না দেখিতে পাওয়ার খেদ মিটিয়াছে।

সেদিন আর নাই।

এখন ছুটির গন্ধ পাইলেই কাছে আসিয়া একগাল হাসিয়া বলেন—"তুমি আজ একবার বাজার যাও না গো? ঠাকুরপোরা ছেলেমানুষ, রোজ করছে—" এবং আমার মুখে উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করিলে কণ্ঠে মধু ঢালিয়া যোগ করেন—"তুমি নিজে যেমন গুছিয়ে বাজারটি

করে দাও, ওয়া কি তেমন পারে? ছাই! ওই দুটো আনলে তো তিনটে ভুলে গেল।”

চারদিনের ছুটি। আনন্দে গদগদ হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—“এই ক’দিনে লেপ দু’খানা করিয়ে ফেল, বুঝলে গো? ছোট ঠাকুরপোর তোষোকখানাও ছিড়েঁ এসেছে, একসঙ্গে হয়ে যায় তো ভাল হয়! ছুটি রয়েছে। আর দেখ—ঘেন্টুটাকে নিয়ে একবার যাও না দোকানে—সোয়েটাব একটা না কিনলেই নয়।”

যেন এসব ব্যাপারে ছুটি ছাড়া আর কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না।

হিসাব কষিতেছি—আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলেন—“দেখ, শুনছো? বেড়াতে বেড়াতে যাও না একবার শান্তির ওখানে, অনেকদিন খবর পাইনি—গেলে কত আহ্লাদ করবে অখন।”

শান্তি আমার শ্যালিকা-রত্ন।

দক্ষিণেশ্বরে তাহার শ্বশুরবাড়ী। টালিগঞ্জ হইতে দক্ষিণেশ্বর “বেড়াইতে বেড়াইতে” যাওয়া বৈ তো নয়!

ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় আমার কান বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া স্বগতোক্তি করেন—“ঘরগুলোয় কি ভয়ানক ঝুলই জমেছে, মাথায় এসে ঠেকছে যেন—কবে যে ঝাড়তে সময় পাবো।”

অগত্যা—কিন্তু যাক্! এখানে সে কথা অবান্তর।

তবে ঝামেলার কথা সুধাময়ী বড় মিথ্যাকথা বলেন নাই। চারদিনে সত্যই অতিষ্ঠ হইয়া, টান মারিয়া ‘টু লেট’খানা ফেলিয়া দিয়া, পরদিন নিশ্চিন্ত মনে অফিস গেলাম। উঃ—দেখিলাম সাংসারিক বুদ্ধিতে এখনো পর্য্যন্ত শিশু ছিলাম।

বাড়ী ভাড়া দিতে বসিলে যে এত কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কে জানিত।

আলাদা রান্নাঘর নাই কেন—কলতলায় ভিজিতে হয় কেন—চৌবাচ্চা না থাকিলে ভদ্রলোক বাস করিবে কিরূপে? দরজার গায়ে কড়া ও শিকল দুইই থাকা উচিত। মেজের সিমেন্টের রং কালো না হইয়া লাল হইলে ভাল হইত—ছাদে উঠিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ইত্যাকার নানাবিধ মন্তব্য।

যথেষ্ট হইয়াছে বাবা আর ‘বাড়ীওয়ালা’ হইয়া কাজ নাই।

কিন্তু যথেষ্ট হয় নাই; কয়েক দিন পরেই হঠাৎ শুনিলাম, ঘরভাড়া হইয়াছে। এমন কি ভাড়াটে ইতিমধ্যে জিনিষপত্র লইয়া ঘর দখল করিয়া বসিয়াছে।

বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা, বয়স হইয়াছে,—একলাই থাকিবেন।

সন্দিগ্ধ মন—বলিলাম—আগাম ভাড়া দিয়ে ঢুকেছে তো? এরকম লোকের কাছ থেকে নিয়মমত ভাড়া পাওয়া—

সুধাময়ী পরমোল্লাসে কহিলেন—“দেন নি—দেবেন পরশু। ভাইপোর কাছ থেকে মাসোহারা আসে কি-না? তা আমার ভালই হ’ল, একলাটি থাকি—খাসা গিন্নি-বান্নি মানুষ, কথা কয়েও সুখ আছে, ‘মাসিমা’ বলে ডাকছি।”

আমি কিন্তু বিশেষ সুখ অনুভব করিলাম না, সেই পরশু তারিখে উঠিয়া আসিলেই বা কি ক্ষতি হইত জানিতে চাহিলাম। প্রেয়সী বিরক্তস্বরে কহিলেন—“সে বাড়ী, বাড়ীওলা ভেঙ্গে দিচ্ছে তাই আজই ছেড়ে দিতে হ’ল। মানুষকে অত অবিশ্বাস করো না বাবু। ভাইপো পশ্চিমে বড় চাকরি করে, পয়লা তারিখে টাকা পাঠায়, দেবেন অখন কাল পরশু।”

চুপ করিয়া গেলাম, ভাইপো পশ্চিমে বড় চাকরি করে সেটা একটা সান্ত্বনার কথা বটে।

আগে ভাবিয়াছিলাম ভাড়াটে আসিলে অধিক ঘনিষ্ঠতা করিতে নিষেধ করিব। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে 'মাসিমা' পাতানো হইয়া গিয়াছে। আর কিছু বলিবাব নাই। মাসিমা মানে মাসশাশুড়ী।

সখের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না।

সকালবেলা কল খুলিতেই—ওদিকের গলি হইতে মাসিমার সস্নেহ স্বর ভাসিয়া আসিল—"বৌমা,—অ-বৌমা—বলি জল কি তোমরা সবটাই নেবে বাছা? এদিকে যে কল কাঠ মেরে গেল—বন্ধ করো মা বন্ধ করো।"

বন্ধ করিতে পথ পাইলাম না।

এবং অতঃপর তাহারই পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকিল। এদিকের কল খোলার শব্দ পাইলেই কাতরকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন—"বৌমা,—অ-বৌমা, কলটা কমাও একটু, দোহাই মা, ভাড়া দিয়ে থাকি, অমনি তো নয়? এ-কী চোরদায়ে ধরা পড়া?

'ভাড়া দিয়া থাকেন'—মানে পশ্চিমের ভাইপো মাসোহারা পাঠাইলেই দিবেন।

দুই মাস বাহির হইয়া গিয়াছে একটি পয়সাও পাই নাই। মানুষকে অবিশ্বাস করিতে নাই তাই বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছি।

তা'ছাড়া ভাইপোর খবর না পাওয়ায় মাসিমার মন খারাপ, এ সময় টাকা চাহিতে যাওয়া পাষণ্ডের কাজ। ক্রমশঃ এমন দাঁড়াইতেছে যে, চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছি যেন আমিই।

এদিকের রোয়াক ভরিয়া মাসিমার ঘুঁটে, কয়লা, নারিকেলের ছোবড়া, কাঠের কুচা প্রভৃতি শুকাইতে থাকে। এক পাশে তোলা উনানে বান্নাও চলে। কারণ ধোঁয়ায ঘর নষ্ট কবেন না—আমারই ভালর জন্য।

ঘেণ্টু মণ্টুর নীচে নামাই বন্ধ, দেখিলেই বলিবেন—"এসেছেন ঘাড়ে পড়তে—মরণ আর কি! তোদের ওপরে কি হয়েছে রে? ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, বাপের জন্মে এমন ছেলে দেখিনি—কি দস্যি কি দস্যি!...বৌমা ছেলে লেলিয়ে দিয়ে বামুনের মেয়ের খাওয়াটা আর নষ্ট করো না মা। সামাল করো মা, সামাল করো।"

রোষ-কষায়িত লোচনে কিছু বলিতে উদ্যত হইলেই ঘেণ্টু-জননী হাত চাপিয়া ধরিয়া বাধা দেন—"যেয়ো না রাগের মাথায়, কি বলে বসবে বামুনের মেয়েকে। গিন্নি মানুষ, বললেই বা দু'কথা—নিজের মাসী-পিসি থাকলে সইতে হ'ত না?"

যুক্তির সারবত্তা আছে, স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু দুর্ভোগ তো তাঁহারও কম নয়। ছাদে মাসিমার কাপড় শুকায়—বড়িটা আচারটা প্রায়ই থাকে, কাজেই তাঁহার ছাদে ওঠা নিষেধ। কি জানি, অনাচার করিয়া দিতে কতক্ষণ?

তাই সিঁড়ির দরজায় মাসিমার তালা ঝুলিতে থাকে। রাশিকৃত কাঁথাকাপড়, বিছানা-বালিশ লইয়া সুধাময়ী কোথায় যাইবে, সে কথা তাঁহার জানিবার নহে।

সুধাময়ীর "হাতী ছেলে" আহ্লাদেপণা করিয়া নিত্য বিছানা ভিজাইবে বলিয়া মাসিমা তো তাহার দায়িক হইতে পারেন না।

'ভাল-মন্দ' খাওয়ার পাটই উঠিয়াছে—বাড়ীতে ম্লেচ্ছখানার গন্ধ উঠিলেই বেচারা ব্রাহ্মণকন্যা নাকে কাপড় দিয়া ওয়াক্ তুলিতে তুলিতে নাজেহাল হইয়া পড়েন। চোখে দেখিয়া কোন রাক্ষস

আর উক্ত বস্তুতে লোভ করিবে?

মেজবাবু চোখ পাকাইয়া বলেন—দেখ দাদা, ভাল হচ্ছে না কিন্তু, এর একটা বিহিত করা দরকার।

ছোটবাবু ঘুঁসি বাগাইয়া বুড়ির দাঁত কয়টা ভাঙ্গিয়া দিবার সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করে।

সুধাময়ী নির্ব্বিরোধী মানুষ—কাঁদিয়া কাটিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে চায় মাত্র।...

অথচ পরদিনই হয়তো দেখি তসর শাড়ী পরিয়া ভিজা চুলে মাসিমার বড়ির ডাল বাটিতে বসিয়াছে।

হায়, এই অগাধ চক্ষুলজ্জার এককণাও যদি আমার জন্য থাকিত!

নীলকণ্ঠ হইয়া সমস্ত বিষ পান করিতে হয়, কারণ—আমিই নাকি "খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছি।"

অর্থাৎ 'টুলেট' লটকাইয়াছিলাম।

সকাল সকাল বাড়ী ফিরিতেছি। অফিস নামক অতিকায় দৈত্যের কবল হইতে যে ঘণ্টাখানেক সময় চুরি করিয়া আনিয়াছি, কি উপায়ে সেটুকু মধুর এবং রমণীয় হইয়া উঠিতে পারে মনে মনে তাহার খসড়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে ঢুকিয়াই দেখি, দালানের মাঝখানে সুধাময়ী ও তাঁহার পরমবন্ধু ছোট ঠাকুরপোর বাক্যযুদ্ধ চলিতেছে। হাসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম—ব্যাপার কি?

ব্যাপার কিছুই নয়—সেই মাসিমা। নাম শুনিয়াই পিত্ত জ্বলিয়া গেল, কারণ শুনিয়া সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিল। ক্ষণপূর্বের রঙিন আভাটুকু নিমেষেই উধাও হইয়া গেল।...

সুধাময়ী প্রমুখাৎ মাসিমা কানুকে একজোড়া কাপড় আনিতে দিয়াছিলেন—কাপড় আসিয়াছে কিন্তু নগদ দাম পাইবার শর্ত্তে কানু কাপড় হাতছাড়া করিতে চায়। অপর পক্ষের উহাতেই ঘোরতর আপত্তি।

চড়িয়া উঠিয়া বলিলাম—কেন, এতে চক্ষুলজ্জার কি আছে? বলগে "কাপড় এনেছি, দাম দিন।"

"আহা তাই আবার বলা যায় নাকি মানুষকে? বলেছেন টাকা এলে দিয়ে দেবেন।" অপ্রতিভভাবে একটু ফিকা হাসি দিয়া কথাটা শেষ হইল।

তলে তলে কখন যে শিয়রের গোড়ায় সিঁদকাটা হইতেছে বিন্দুবিসর্গ জানিতাম না—কানু বোধ করি ইচ্ছা করিয়াই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিল।

"ওই আনন্দেই থাকো বৌদি! সে যদি পাও তো আমার কান কেটো। তোমার পূজনীয়া মাসিমাটিকে চিনতে আর বাকি নেই, দিচ্ছেন যে রোজ দাম! মিছরি, বাতাসা, দই, মিষ্টি ঘি, হরদমই তো আসছে—পেয়েছো একটি পয়সা? সে দিনের গামছাখানার দাম পেলে আজ পর্য্যন্ত? ধোবার আর গয়লার জন্যে কত যায়—হিসেব করেছ কোন দিন? হুঃ, পশ্চিম থেকে টাকা আসবে না হাতী! ভাইপো-টাইপো সব কাঁচকলা, বুঝলে!"

সুধাময়ী বোধ হয় এত অপ্রতিভ জীবনে হয় নাই এবং সেইটা ঢাকিবার জন্যই চটিয়া বলিয়া গেল—আমাদের মত চক্ষু চর্ম্ম হীন হইতে, সে তিন জন্ম ঘুরিয়া আসিলেও পারিবে না।

উঃ, মমতাময়ী বটে! সর্ব্বদাই লক্ষ্য করি, জগতের লোকের উপর করুণার আর অন্ত নাই, অভাব শুধু এই হতভাগ্যের বেলায়।

এ ব্যাপার আর বাড়িতে দিলে গৃহ-বিবাদ অনিবার্য বুঝিয়া মাসিমার দরজায় গিয়া হানা দিলাম।

একটু চড়া সুরেই বলিলাম— ভাড়াটা ক'মাস পড়ে রয়েছে, দিয়ে দেবেন, অসুবিধা হচ্ছে—

মাসিমা আমার মুখের পানে নিষ্পলক নেত্রে মিনিটখানেক তাকাইয়া থাকিয়া স্তম্ভিত ভাবে বলিলেন—ভাড়া চাইছো! চাইতে তোমার একটু লজ্জা হ'ল না বাছা?

এবার স্তম্ভিত হইবার পালা আমার।

—লজ্জা?

—তা' না তো কি? এ্যাঁ, এই যে আজ পাঁচ-পাঁচটা মাস মাসোহারা বন্ধ রয়েছে—কি করে চলছে অন্তর্যামীই জানেন, তা একবার ডেকে মুখের কথাটি শুধিয়েছ যে—কি করে পেট চলছে তোমার!' ভদ্দরলোক বলে তো বড়াই করো— উচিত ছিল কি না বল তো বাছা! সেখানে ছেলেটার কি হ'ল ভেবে ভেবে দিনরাত বুকের ভেতর তোলপাড় করছে—(অদৃশ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্দেশে শুষ্কচক্ষে অঞ্চল প্রদান) অবলা মানুষ তোমার আশ্রয়ে রয়েছি—দেখা চুলোয় যাক্, ভাড়া চাইতে এসেছো মুখ নেড়ে! হরি মধুসূধন! হরি মধুসূধন!

জেদ চাপিয়া গেল—বলিলাম—আচ্ছা দিন না আপনার সেই ভাইপোর ঠিকানা, টাকা আনাবার ব্যবস্থা করছি।

ভদ্রমহিলা ক্ষুদ্ধ বিরক্তিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ও মা গো। তার কাছ থেকে তুমি আনাবে টাকা? বলি এত তাগাদা কিসের? তোমার ওই বারোটা টাকা নিয়ে দেশত্যাগী হবো নাকি?

বারো টাকা ভাড়া যে পাঁচ মাস বাকী পড়িয়া বারো টাকাই থাকে এমন সোজা হিসাব জানা ছিল না। মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলাম—ও সব জানি না—আমি অন্য ভাড়াটে পাচ্ছি, আপনি আসছে মাস থেকে ঘর ছেড়ে দেবেন।

—বটে বটে, তা' তো বলবেই, একটা অবলা মেয়েমানুষকে রাস্তায় বার করে না দিলে বীরত্ব কিসের? তা' দিও, পুলিশ এনে দিও বার করে—আমি এক পাও নড়ছি না, রইলাম এই গ্যাঁট হয়ে বসে, দেখি কি করে তাড়াও?... হরি মধুসূধন! হরি মধুসূধন! জয় গুরু, শিব গুরু!

মেজ ভাই পুলিশ ডাকিতেই চাহিয়াছিল, নিবৃত্ত করিয়াছি। ছোট ভাই বুড়ির দাঁত কয়টার উপর দুর্নিবার লোভ প্রকাশ করিয়াছিল, বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিলাম। কেলেঙ্কারিকে বড় ভয় করি।

একাদশীর দিন মাসিমা সারাদিনটা কালীঘাটে কাটান। সেই অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়ীখানা ছাড়িয়া দিলাম। মনের মত বাড়ীখানা!

জিনিষপত্র লইয়া দুই ভাই আগেই রওনা হইয়াছে। ঘেণ্টু মণ্টু ও সুধাময়ীকে লইয়া সর্ব্বশেষে আমি যাত্রা করিব। সুধাময়ী তো সকাল হইতেই চোখ মুছিতেছেন। ছাড়িয়া যাওয়ার এমনি মায়া! স্বামী পুত্র সব লইয়া চলিয়াছে তবু নির্জ্জীব বাড়ীখানার জন্যও চোখে জল আসে। গাড়ীতে উঠিতেছি, বাড়ীটার পানে একবার করুণ নয়নে চাহিয়া সুধাময়ী যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—বেরোবার সময় পাঁচপোয়া মিশ্রীর কথা বলেছিলেন। ঠাকুরপোরা চলে গেল, বলা হল না।

যাহার জন্য এত যন্ত্রণা, তাহাকে মিশ্রী খাওয়াইবার ইচ্ছা আর যাহার থাক আমার ছিল না। বলিয়া উঠিলাম আর মিশ্রীতে কাজ নেই, নাও এখন চল, তিনি উদয় হবার আগে সরে পড়া যাক।

সুধাময়ীকে অগত্যা 'দুর্গা' বলিয়া গাড়ীতে উঠিতেই হইল। ঘেণ্টুর মণ্টুর নূতন বাড়ী সম্বন্ধে

কৌতূহলের আর অন্ত নাই। গাড়ীতে বসিয়াই যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইতে চায়। তাহাদের এলোমেলো প্রশ্নের উত্তর দিয়াই চলিয়াছি, সুধাময়ী জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন—রোদনারক্ত মুখ, দৃষ্টি ছলছল।

হঠাৎ এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটা বড় গোছের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীবে কহিলেন—বামুনের মেয়ে মুখ ফুটে বললেন, কাল দ্বাদশীর দিন মিছরীর পানা খেতেন—ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়—

ফিরিয়া আসা ছাড়া উপায় কি?

নূতন বাসায় উহাদের নামাইয়া দিয়া, কানুর সাইকেলখানা লইয়া চলিয়া আসিলাম।

পাঁচপোয়া মিশ্রী কিনিয়া মাসিমার দরজার গোড়ায় রাখিয়া চোরের মত চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিলাম।

[১৩৫৩]

অপদস্থ

'পটাশিয়াম সায়নাইড্' যারা খায়—কোথায় পায় তারা? সমস্যাটা গুরুতর।

বালিশের উপর ভিজাচুল ছড়াইয়া দিয়া রৌদ্রে পা মেলিয়া, ছুটির দুপুরের চার ঘণ্টা সময় বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া যখন কিছুই মীমাংসা করা গেল না অগত্যাই ললিতা বিরক্তভাবে উঠিয়া বসিল। শুইবার সময় রৌদ্র গায়ে ছিল এখন সরিয়া দেয়ালে উঠিয়াছে, রৌদ্রে পড়ন্ত বেলাব একটা লালচে আভা। আঃ, শীতের বিকালটা কী বিশ্রী!

অলসভাবে এলোচুলগুলা হাতে জড়াইয়া ললিতা উঠিয়া আসিয়া আর্শীর সামনে দাঁড়াইল। মা বাড়ী নাই তাই রক্ষা, না হইলে ডাকাডাকির জ্বালায় এতক্ষণ অস্থির হইতে হইত।

নিশ্চিন্ত চিত্তে দুইদণ্ড চিন্তা করিবারই কি 'জো' আছে বাড়ীতে?

যাক, ভাবাভাবির শেষ হইয়াছে—মৃত্যু ভিন্ন উপায় নাই ললিতার। এখন বাকী শুধু 'উপায়টার'।

'কেরোসিন প্রথা'টা অতি জঘন্য ও নেহাৎ সেকেলে—ভাবিলেই গা কেমন করে।...

গলায় দড়ি-ফড়ির কথা ছাড়িয়াই দাও, পচা রাবিশ।...লেকে ডুবিয়া মরার রেওয়াজ তত পুরানো হয় নাই বটে, তবে সে-ও তো সেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া এক বিটকেল কাণ্ড! বিনা আয়াসে এবং চেহারার বিকৃতি না ঘটাইয়া মরিতে হয়—তো পটাশিয়াম সায়নাইডই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আধুনিকও। কিন্তু যোগাড় করাই যে দুষ্কর।

আহা বছর দুই আগে এ সুমতিটা হইলে! দাদা যখন এম এস্-সি পড়ে, নিজে মুখেই বলিয়াছে—"ওঃ ভারী তো! দেদার আনতে পারি মুঠো মুঠো! কত চাস?"

তখন সংগ্রহ করিয়া রাখিলে আজ আর ভাবনার কিছু থাকিত না।

অথচ না মরিয়া উপায় কি?

এযাবৎ যত উপন্যাস পড়িয়াছে ললিতা, হতাশ প্রেমের ব্যাপারে প্রায় সকলকেই মরিতে দেখিয়াছে। অনেকেই অবশ্য প্রাণের ব্যথায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া থাইসিসে মরে। কিন্তু নিজের আঁটি

স্বাস্থ্যসম্পন্ন নিটোল তনুখানি—এ বিষয়ে তাহাকে কোনোই ভরসা দেয় না।

তা' ক্লাস 'নাইনে'র ছাত্রী বলিয়া যে ললিতা প্রেমে পড়িতে পাইবে না এমন কোন মাথার দিব্য নাই। পনের বছর বয়সটা 'ফেলনা' নয়।

গত কিছুদিনই না হয় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের ''তরুণী''র দল সাহিত্য-কাননে হানা দিয়া বেচারা চৌদ্দ-পনেরদের একদম কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই বেচারারা বাধ্য হইয়া 'ইনোসেন্ট গার্ল' সাজিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চকোলেট খায়। আর দিদির প্রেমের সাহায্য করে।

কিন্তু পিছন ফিরিলেই দেখিবেন পূর্ব্বতন 'ললিতারা' তের ও পনের বৎসর বয়স লইয়াই অমব হইয়া আছে; চিরকাল থাকিবেও। তাহারা আত্মহত্যা করে নাই—কারণ প্রয়োজনই হয় নাই। এ ললিতার কথা স্বতন্ত্র।

সেই নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন ব্যক্তি তাহাকে ভালোবাসা তো দূরে থাক রীতিমত অগ্রাহ্য করে! বলিতে গেলে ইচ্ছা করিয়াই যেন যখন-তখন অপদস্থ করিয়া বসে। এমন অবস্থায় মরাই ভাল ললিতাব।

উপন্যাসের মত বলিলে—'সে যখন বুঝিবে কী গভীর মর্ম্মবেদনা লইয়া বেচারা ললিতা অকালে প্রাণ হারাইয়াছে, তখন কী তাহার চোখে দুইটি ফোঁটা জলও ঝরিবে না?'

তাহার কী হইবে ঈশ্বর জানেন, আপাতত নিজের মৃত্যুশোকে ললিতার নিজেরই চোখ দিয়া ঝব ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

ড্রেসিং টেবলের উপর খুঁটিনাটি কত কি জিনিষ সাজানো, প্রসাধন-দ্রব্যই আঠার রকমের, কম করিয়া।

অন্যমনস্কভাবে এটা সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বিশ্বের বৈরাগ্যমাখা হৃদয় লইয়া ললিতা ভুলিয়া খানিকটা স্নো তুলিয়া গালে ঘষিতে লাগিল।

ভাল শাড়ীটাড়ীগুলা পরিয়া ফেলাই ভাল, পরে কে পরিতে আসিবে!

ড্রয়ারের ভিতর রাশিকৃত কাঁচের চুড়ি, বর্ণসমারোহের বিচিত্র সমাবেশ। দেখিলে মন কেমন করে বৈকি! এত শীঘ্র মরিতে হইবে জানিলে—

ঘর হইতে বাহির হইতেই মার সঙ্গে চোখাচোখি। বোনের বাড়ী হইতে এইমাত্র ফিরিতেছেন—কোথা যাচ্ছিস রে ললি!

সাজটা বাড়াবাড়িই হইয়া গিয়াছে বটে—ললিতা অপ্রস্তুতভাব ঢাকিতে তাড়াতাড়ি বলিল—কোথায় আর, সুলোচনাদির বাড়ী—

কেন সন্ধ্যেবেলা সেখানে কি দরকার?

—অঙ্ক জেনে নেবো।...ভাগ্যে নামটা মনে পড়িয়াছিল সুলোচনাদির।

—বাবা তারই এত সাজের ঘটা, যেন নেমন্তন্নয় যাচ্ছিস। ঠাকুরকে ভাঁড়ার বের করে দিয়েছিস?

—এ্যাঁ—না তো!

—ধন্যি মেয়ে বটে, অত করে গুছিয়ে বলে গেলাম! এসে দেখি উনুন জ্বলে যাচ্ছে, ঠাকুর গজগজ করে মরছে। চব্বিশ ঘণ্টা বেহুঁস হয়ে কি যে ভাবিস!

ললিতা নতমুখে বলিল—দেব মা এখন?...অবশ্য কি যে দিতে হইবে কিছুই মনে ছিল না।

মা বাঁচাইলেন—থাক, আমি এসে পড়েছি আর কাজ নেই—যেখানে যাচ্ছ যাও। একলা যেও না—সীতু যাক সঙ্গে, রাত করো না। যত বড় হচ্ছ ততই ধিঙ্গি হচ্ছ।

ললিতা মনে মনে হাসিল—হায় মা! জান না তো এই দিনরাত বকুনির জন্য কত অনুতাপই তোমায় করিতে হইবে।

কথা রাখিবার জন্য মরিতে হাঁড়িমুখ সুলোচনাদির বাড়ীতেই হয় তো যাইতে হইত—দাদা আসিয়া উদ্ধার করিলেন; সেই হাড়জ্বালানে বন্ধুটি সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছেন কিনা।

আসিলেই তাঁহার চায়ের অর্ডার।

মানুষকে চা করিয়া খাওয়ানো তো আনন্দেব কথা কিন্তু 'চিপ্‌টেন' কাটা কথাগুলি শুনিলে? খামোকা হয়তো বলিয়া বসিবেন—'চায়ে যত ইচ্ছে চিনি ঢাললেই চা ভাল হবে এ ধারণাটা ছাড় না ললিতা। খেয়ে এক গ্লাস জল খেতে হয়।'

পরদিন কম দিলে স্বচ্ছন্দে বলিবেন—'ললিতা ভাবে উইদাউট্ চিনিতেই মিষ্টি করবার মত গুণ ওর হাতের আছে। এতটা আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া ঠিক নয় কিন্তু।'

এ ছাড়া—"অবহেলাভরে ঠাণ্ডা 'জল' করিয়া দেওয়া" ও "ক্রোধভরে জিভ পুড়াইয়া দিবার" অপবাদ তো আছেই।

নেহাৎ দাদার সামনে কিছু শুনাইয়া দিবার সাহস হয় না তাই।

সাধে রাগ ধরে! সাতজন্মে ফিরিয়া চাহিতে দেখা যায় না, আজই কি না এমন লক্ষ্য পড়িল যে—স্বচ্ছন্দে বলিয়া যাওয়া হইল—ঘুঁটেওলির মত একগাদা কাঁচের চুড়ি পরেছ কেন?

আধুনিক হালচালের খবর জানার-নাম নাই, মন্তব্যটি করিবার বেলায় বেশ আছেন।

এমন কিছু সুযোগ পাওয়া যায় না যে, জব্দ হয় লোকটা?... জব্দ? মনের ভিতর একটা মতলব খেলিয়া গেল। আচ্ছা এই সুব্রতবাবুকে বলিলে কি হয়? কেমিষ্ট্রির প্রফেসর না কি হইয়াছেন যে? পটাশিয়াম সায়নাইড লইয়া হরদম নাড়াচাড়া করিতে হয় নিশ্চয়। ঠিক কথা—নিজের নাম করা হইবে না অবশ্য। কোনো বন্ধুর নাম করিয়া চাহিলেই চলিবে।....কিন্তু দাদার সামনে কথা পাড়া যায় না, আড়ালে—একলা।....হায় কোথায় যে একলা পাওয়া যায়! দাদাটি তো ছিনেজোঁকের রাজসংস্করণ—ছাড়িলে তো?

চা রাখিতে গিয়া ললিতা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিল, টেবিলের বইগুলা নাড়াচাড়া করিয়া কিছু সময় ব্যয় করিল, কিছু সুরাহা হইল না।

দাদাকেও বলি, সারাদিনের পর বাড়ী আসিয়া কি হাতমুখ ধুইতে ইচ্ছা হয় না? কি যে ছাইপাঁশ গল্প ভগবানই জানেন।

লাভের মধ্যে মাতব্বর প্রফেসর পণ্ডিতি করিলেন, তাও কি ভাল করিয়া দেখিয়া? গল্প করিতে করিতে অন্যমনা হইয়া যেন বাজার দরের কথা হইতেছে—এই ললিতা, চা খাও তো মুখটা ভাল করে ধুয়ে ফেলো আগে—লিপ্‌ষ্টিকগুলো সব সময় যে নির্দ্দোষ হয় তা' নয়।...হ্যাঁ, কি বলছিলে অজিত? প্রফেসর চৌধুরী তোমায় বলেছেন একথা? তা হলে—

দূর ছাই, ওকথা ললিতার শুনিবার দরকার নাই। বটে, নিজে সুন্দর হইলে এই রকম অহঙ্কারী হইয়া 'ধরাকে সরা' দেখিতে হয় নাকি? কালোরা মানুষের মধ্যে গণ্য নয়? যখন-তখন তাহাদের এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে হয়? কট্‌কট্ করিয়া উত্তর দিতে পারিলে তবে না মনের জ্বালা মিটিত?

যাক কাজ নাই সে সবে, সেই জিনিষটা যোগাড় করিতে পারিলেই সকল জ্বালা জুড়ায়।

দয়ালু ভগবান সুযোগ মিলাইয়া দেনও। দুইজনে হৈ হৈ করিয়া বাহির হইয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ

পরেই সুব্রত ফিরিয়া আসিল—ফাউনটেন পেন ফেলিয়া গিয়াছে।—পেলিকান্ পেন একটা, লাল রঙের—কিনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, ললিতা দেখ তো কোথায় ফেলে গেছি।

ললিতা অবশ্য খুঁজিয়া পাইল না।

বাধ্য হইয়াই সুব্রতকে আসিয়া খুঁজিতে হয় এবং এমনভাবে খোঁজাখুঁজি চলিতে থাকে যে, মনে করা যাইতে পারে কলমটার দুইখানা ডানা, অথবা চারিখানা পা গজাইয়াছে নিশ্চয়। চেয়ারে উঠিয়া আলমারীর মাথা ও গদী উল্টাইয়া বিছানার তলা পর্য্যন্ত দেখা হইয়া যাইবার পর সুব্রত প্রায় হতাশ হইয়াই যেন বলে—যাকগে ও আর এখন পাওয়া যাবে না দেখছি, যদি পাও তো তুমিই নিয়ে নিও না হয়।

—আমি? কেন?

—এত খাট্‌লে কলমটার জন্যে।

রাগে ললিতার কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করিয়া আসিল—উপহার নয়, পরিশ্রমের পুরস্কার? কেন ললিতা কি এতই হ্যাংলা?..."লালরঙের পেলিকান্ পেন"—এই রকম একটার জন্য দাদার কাছে অনেক দিন উমেদারী করিয়াছে বটে, কিন্তু সে তাহার নিজের দাদা, দিক না দিক অপমান নাই। পরের কাছে তো সে চাহিতে যায় নাই? তা'ছাড়া কোথায় পথে-ঘাটে ফেলিয়া শূন্যের উপর দাতাগিরি!

অনেক কষ্টে রাগ চাপিয়া মরিয়া হইয়া মতলবমত প্রস্তাবটা করিয়া ফেলে।

সুব্রতর একটা স্বভাব, কাহারও কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলে বক্তার মুখের ভাব উত্তমরূপে পাঠ করিয়া তবে কথা কয়।

ললিতার কথা শুনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ দেখিয়া লইয়া ধীরভাবে বলে—পটাশিয়াম স্যানাইড? কেন, কার দরকার? কে খাবে?

—এই আমার একটা—ইয়ে, বন্ধু।

—কি হল তাঁর?

—ও, তার দাদারা ভীষণ একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে তাই বলেছে তার চেয়ে মরা ভাল।

গল্প বানানোই ছিল। পরীক্ষায় ফেল হওয়ার কথাটা একবার মনে আসিয়াছিল; এটা তার চাইতেও শুনিতে হৃদয়-বিদারক বলিয়া মনে হইল।

—বটে! তা কবে চাই?

—এই যত শিগ্‌গির হয়।

—ভাল! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি ধরা পড়ি আমারই ফাঁসি হয়ে যেতে পারে জান তো?

—কখনো না—কিছুতেই ধরা পড়বেন না। পেলে তার দারুণ উপকার হবে—বুঝলেন ?

—আচ্ছা দেওয়া যাবে এনে, একটা লোকের যখন দারুণ উপকার হচ্ছে। কাল—না, পরশু দিন আনবো।

আশ্চর্য্যের বিষয়, চলিয়া যাওয়ার পর দেখা গেল কলমটা টেবিলের উপরই রহিয়াছে খবরের কাগজের তলায়। অত খোঁজাখুঁজি হইল, চোখ এড়াইল কেমন করিয়া?

পরের পরদিন। দুইদিন ধরিয়া ললিতা বিস্তর কাঁদিয়াছে, বিস্তর খাটিয়াছে।

ছাড়িতে বসিলেই দেখা যায় মাটির পৃথিবীর অনেক বন্ধন। গত বৎসর শীতকাল হইতে

সীতুর জন্য একটা সোয়েটার বোনা চলিতেছে, এ শীতেও গায়ে ওঠে নাই, রাত্রি একটা পর্য্যন্ত খাটিয়া সেটা শেষ করিতে হইল।

মায়ের সেমিজ, বাবার ফতুয়া, এটা ওটা কত কি কাটা পড়িয়া ছিল সেলাইয়ের জন্য। শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সারিয়া যাইতে হয়।

দাদার জন্য ঘরটা গুছাইয়া দেওয়া ছাড়া কিছু করিবার নাই। পিসীমা বহুদিন যাবৎ মাদুলী পরিতে একটা পশমের দড়ি বিনাইয়া দিবার উমেদারী করিয়া করিয়া হতাশ হইয়াছিলেন, অযাচিত পাইয়া চমৎকৃত হইলেন। এমন কি মায়েব পানেব বাক্সটা গুছাইয়া—(কারণ পান সাজিয়া দিতে ললিতা থাকিবে না) রাশীকৃত সুপারি কাটিয়া জমা করা হইল।

প্রত্যেকের জন্য এখন মন কেমন করিতেছে—কে জানিত বাড়ীব পুরানো ঝিটাকেও আব দেখিতে পাইবে না বলিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িবে!

নিজের কাজগুলাই খালি বাকী পড়িয়া আছে। নূতন ক্লাসেব বই-টই কেনা হইয়াছে মাত্র, দেখাও হয় নাই। থাক্, তাহাকে তো আর পরীক্ষা দিতে হইবে না।...মীনার বিবাহে পরিবাব জন্য সখ করিয়া যে নীল সিল্কের ব্লাউজটায় সলমাচুমকীর কাজ করিতেছিল সেটার গায়ে স্নেহ-ভরা হাত বুলাইয়া তুলিয়া রাখিবার কালে ললিতা চোখের জল চাপিতে পারিল না। খোলা আলামারীব তাকে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বেশ এক পালা কাঁদিয়া লইল।

তাহার স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিয়া মা-বাবাব কত কষ্ট হইবে ভাবিয়া দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছে।

পিছন হইতে আর্শীর উপর ছায়া পড়িল। সুব্রত আসিয়াছে—এই যে ললিতা, বাড়ীতে কাউকে দেখছি না যে? মা, পিসীমা, কোথায় সব?

—মা? বড় মাসীর অসুখ বলে রোজ দেখতে যান।

—সীতু?

—সীতুর সঙ্গেই গেছেন।

—তাই নাকি? খুব লায়েক হয়ে গেছেন তো সীতুবাবু। হ্যাঁ—এই যে তোমার সেই জিনিষটা এনেছি। দেখ আমার পক্ষে এটা খুবই অন্যায় হচ্ছে; তবে নাকি কার মরণ-বাঁচন সমস্যা, পেলে উপকার তাই। খুব সাবধানে রেখো। যেখানে সেখানে ফেলো না। অজিত আসবে তো এখুনি? বসছি আমি ওঘরে।

ললিতার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আবক্ত মুখ, রুদ্ধ স্বর, মুঠার ভিতর কাগজের মোড়কটা চাপিয়া অন্য হাতে ড্রয়ার হইতে কলমটা বাহির করিয়া দিল,—এই নিন, টেবিলেই পড়েছিল।

—ওঃ পেয়েছ নাকি? পেলে তো তোমার নেবার কথা ছিল, থাক তোমার কাছে।

—আমি কি করবো?

সুব্রত বেশ বিজ্ঞভাবে বলিল—মেয়েরা আর কাগজ-কলম কি করে—বরকে চিঠি লেখে। পরে কাজে লাগবে।

—না, আমার দরকার নেই।

অনেক কথাই গলার কাছে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে, মুখে যোগায় না।

সুব্রত অনুরোধ উপরোধের পাত্র নয়, বলিল, বেশ—নিলে না—ঠক্‌লে। রাখো যাবার সময় নিয়ে যাবো।

ললিতা ভাবে—কি অভদ্র লোক! একবার বলিল না—'তোমায় না হয় উপহারই দিলাম।'

ললিতার অবশ্য এখন পাওয়া না-পাওয়া সমান, তবু মানুষের ভদ্রতা বলিয়া কিছু থাকা উচিত তো?

যাক! এখন ললিতার ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর মাত্র এই সাদা গুঁড়াটুকু।

খাইয়া ফেলা মাত্র একটা বিকট স্বাদে পেটের ভিতর পর্য্যন্ত পাক দিয়া আসিল।

ওঃ, এইজন্যই লোকে তিক্তস্বাদের তুলনা দেয় বিষের সহিত?

মনে মনে বাবাকে ও মাকে প্রণাম করিয়া ললিতা ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। চারিদিক অন্ধকার। কানের ভিতর যেন লক্ষ করতাল ঝম্ ঝম্ করিতেছে। গলার কাছে কী যেন পাক খাইতেছে।

আলোকময়ী ধরণী, বিদায়—চির-বিদায়।

অর্দ্ধলুপ্ত চৈতন্যের ভিতর কানে আসিল—কই কলমটা দেখি...একি ললিতা, এভাবে শুয়ে কেন? অসুখ করলো নাকি হঠাৎ?

ললিতা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল—

—কি হ্ল তোমার? অমন বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছো কেন? এ কাগজের টুক্‌রোটা পড়ে যে—তুমিই খেলে নাকি সেটা! কি কাণ্ড! ব্যাপারটা কি?

নির্ব্বাক ললিতার চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

সুব্রত কাছে আসিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—হঠাৎ এ ইচ্ছে হ'ল কেন ললিতা? কেন এমন করলে? বল—জবাব দাও।

বালিশে মুখ লুকাইয়া প্রায় রুদ্ধস্বরে উত্তর করিল ললিতা—জানি না।

—কিন্তু ধর—যদি ওটা সত্যিই বিষ হ'ত?

—'সত্যিই বিষ হ'ত'—মৃত্যুপথযাত্রী মরণ-যন্ত্রণা ভুলিয়া, বিদ্যুতাহতের মত উঠিয়া বসিল—বিষ নয়? কি তবে ও?

—ওটা? ওঃ, ও তো কুইনাইন। র-পাউডার।

বেচারা ললিতা হৃদয়ভার-প্রপীড়িতা কিশোরী মাত্র। তীব্র মর্ম্মবেদনার উপর এই নিদারুণ অপমানের আঘাতে কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া পড়া ছাড়া নূতন আর কি করিতে পারে?

এলোচুল বালিশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ললিতা উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে।

সান্ত্বনা দিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সুব্রত সারা ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। টেবিলের উপরকার বইগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, আর্শীর সামনে দাঁড়াইয়া গায়ের শালখানা আরো একটু পরিপাটি করিয়া লইল, চুলের উপর অকারণ একবার চিরুনিটা চালাইল, 'টুকিটাকি' জিনিষপত্রগুলা তুলিয়া তুলিয়া লেবেলগুলা নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করিল। বোঝা যায়—কেমিষ্ট্রীর প্রফেসর একথা জানে যে ক্রন্দনাবেগ কমিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কাঁদিতে দেওয়াই ভাল।

কিন্তু এই সময় নীচের তলায় সীতুর কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিতেই সুব্রত ঈষৎ চঞ্চলভাবে সরিয়া আসিয়া "শয্যাগতা'র মাথাটা একটু নাড়া দিয়া মৃদুস্বরে কহিল—এই ললিতা, অত কাঁদে না—মুখের এনামেল উঠে যাবে যে!

সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে তো?

ললিতা এক ঝটকায় মাথাটা সরাইয়া লইয়া বিছানা হইতে নামিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—

আপনি যান, এখুনি চলে যান। কি করেছি আমি আপনার? কেন, কেন আপনি সব সময় অপদস্থ করতে আসেন আমাকে?

চকিতে বাহিরটা একবার দেখিয়া লইয়া সুব্রত আরো কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ভালই করি ললিতা, নইলে আরো অপদস্থ হতে—আর আমাকেও করে ছাড়তে।

তা অপদস্থ হইবার কপাল হইলে এই রকমই হয়। ফুলশয্যার রাত্রে রীতিমত একটা কাব্যিক পরিবেশের মধ্যে নব-পরিণীত ব্যক্তি মধুর আলাপের পরিবর্তে প্রথম নম্বর বলিয়া বসিল—কি ললিতা, পটাশিয়াম সায়নাইড খেতে ইচ্ছে হচ্ছে?

নাঃ, ললিতা এখন আর তেমন বোকা নেই। গ্রীবা দুলাইয়া মধুর একটি ভঙ্গি করিয়া স্বচ্ছন্দে উত্তর দিল—হচ্ছেই তো ইচ্ছে, পেলেই খাই।

কিন্তু ছিঃ, খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক—আড়িপাতাটা বড় সেকেলে।

[১৩৫৩]

মুস্কিল আসান

কার্তিকের প্রথমেই হারাণবাবু মাফ্‌লার বাহির করিয়াছেন। হইলে কি হয় মনে স্বস্তি নাই ভদ্রলোকের। দুই চার জায়গায় যেন পোকায় কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না?

হারাণবাবুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে পারে, তাই বলিয়া এত বড় একটা শোচনীয় ক্ষতির বিষয় দেখিতে ভুল করিবেন? না, দেখিয়াছেন বৈকি। ঠিকই দেখিয়াছেন, বুনুনির মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম কয়েকটি ছিদ্র। জানালার মুখে আলোয় ধরিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে কীটদষ্ট স্থানগুলি পরীক্ষা করিতে থাকেন হারাণবাবু।...

আবার একটা কিনিতে হবে হয়তো। এই ডামাডোলের বাজারে ঠিক এমনটি না হোক যেমন তেমন একটা কিনিতেও কম পড়িবে না। যুদ্ধের ওজর দেখাইয়া দোকানদারগুলা তো গলায় ছুরি বসাইতে চায়। পশম জাতটা যে আবার অতি ছোটলোক কিনা—পড়শির ঘরে এতটুকু ছিদ্র দেখিয়াছে কি বাড়াইতে সুরু করিয়াছে—আপনাকে বিসর্জন দিয়াও! পরের যাত্রাভঙ্গ করিতে নিজের নাক কাটা যায় যাক।

এই দুই চারিটি ছিদ্রই যে অদূর ভবিষ্যতের অসংখ্য ছিদ্রের অগ্রদূত, সে অভিজ্ঞতা হারাণবাবুর আছে।

অথচ হারাণবাবুর এই শরীর। ফট্‌ করিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইতে কতক্ষণ? এই কার্তিক হইতে অন্ততঃ চৈত্রের প্রথম দিক পর্য্যন্ত সে বিষয়ে যথেষ্ট কেয়ার লইতে হয়।

আর হয় নাই বা কখন? নির্ভাবনায় গায়ে হাওয়া লাগাইবার মত সময় মানুষকে দিয়াছেন ভগবান? কই? এই তো কার্তিক পড়িতেই শীতের আমদানী—হতচ্ছাড়া সময়, "ভদ্রলোকের অখাদ্য" সময়। আবার শীত কমিল কি বসন্ত বাতাস। কবিদের প্রাণ নাচিয়া উঠিতে পারে, গেরস্থ লোকের প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। হরিতকী বীজের মাদুলী, আসল বীজের টীকা, আর ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্রের জোরে কোনোমতে যদি "মায়ের অনুগ্রহের" হাত এড়াইতে পারিলে তো যথেষ্ট। আবার গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বোন মাসীর বিভীষিকা।

তাহার পরই বর্ষা নামিলেন—সাজিয়া গুজিয়া। বাত, বেরিবেরি, অজীর্ণ, আমাশয়, কাহাকে

রাখিয়া কাহার নাম করা যায়? এ ছাড়া ভাদ্রের কাঁচা হিম আছেন, আশ্বিনের নতুন রোদ আছেন, কম কেউই যান না।

এতগুলি আততায়ীর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় দুঃখী হারাণবাবুকে। কাজেই যে সকল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই দুরূহ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়, তাহাদের মধ্যে সহসা কেহ নোটিশ দিয়া বসিলে—চিন্তার কারণ আছে কিনা?

যথাসময়ে ন্যাপথলিন কালোজিরার ব্যবহারের অভাবেই যে মাফ্‌লারটা অযথা সময়ে নোটিশ দিয়া বসিল এই আক্ষেপে নিজেকে নিজে চড়াইতে ইচ্ছা হয় তাঁহার।

এমন কটু সময়ে সুখেন আসিয়া বসিল। যেমন গুছাইয়া বসিল মনে হয় বিশেষ কিছু বক্তব্য লইয়া আসিয়াছে। হারাণ অবশ্য তাহাতে কটাক্ষপাত করেন না। নিজের তালেই থাকেন।

কিন্তু সুখেন যে ইহাতে অপমান বোধ করে এমন মনে করিবার হেতু নাই, মামার ইচ্ছাকৃত অবহেলাকে অবহেলা করিয়া সহজ স্বরে প্রশ্ন করে—মাফ্‌লারটা ছিঁড়ে গেল মামা?

—ছিঁড়ে গেল? কে বলেছে ছিঁড়ে গেল? সকাল বেলা এমন সুখবরটি দিলে কে শুনি?...হারাণ খেঁকাইয়া ওঠেন।

—কেউ না। এমনি মনে হল বুঝি ছিঁড়ে গেছে, পশমের ঘর গুণছিলেন বুঝি? যাককে—বলছিলাম কি আমাদের নীচের তলাটা তো এমনি পড়ে রয়েছে মামা, ভাড়া দিলে হয় না?

বক্তব্য এক নিঃশ্বাসে বলিয়া লইতে হয়! ভণিতা হারাণবাবুর অপছন্দ, অসহ্যই একরকম।

—ভাড়া দিতে হবে? কেন, কিসের জন্যে? ভাত জুটছে না? ঘর ভাড়া দিয়ে খেতে হবে?

পরিষ্কার ব্রেন, অপরের জিভ নড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেনের কাজ সুরু হয়, কাজেই উত্তর পাইতে বিলম্ব হয় না। কোন সময়ই না।

সুখেন আধখানা জিভ দাঁতের বাহিরে আনিয়া ফেলে—ক্ষেপেছেন মামা, টাকার জন্যে ভাড়া! রাম বল। বলছি—আজকাল বাজার খারাপ, চোর-ছ্যাঁচোরের উপদ্রবটা শুনছি সাংঘাতিক বেড়ে গেছে, অতগুলো ঘর বেওয়ারিশ পড়ে থাকে—কে কখন আড্ডা গাড়ে। এই তো সেদিন ওদের নীরেনের সাইকেলখানাই চুরি গেল বৈঠকখানা থেকে।

—চুরি গেল? কবে গেল? এই যে খানিক আগেই দেখলাম ইয়ার ছোক্‌রা চলেছেন ডানা উড়িয়ে সাইকেলের ঘাড়ে চেপে!

—যাচ্ছিল নাকি?...কথাটা সুখেন তাচ্ছিল্যের সুরে উড়াইয়া দেয়। বলে, যাক্‌গে মরুক্‌গে, যার যা খুসী করুক। আমার বলার উদ্দেশ্য...অতগুলো ঘর—'হরিঘোষের গোয়াল' হয়ে পড়ে থাকে—বছরে একদিন ঝাঁট পড়ে কিনা সন্দেহ, কেবল নারাণের তাসের আড্ডার ঘটা। তুমি তো কিছু বলবে না—আমাকে কেন মানবে বল? আমি একটা বাইরের লোক বইতো নয়?

বুদ্ধিমান সুখেন মামার 'হৃদয়দীঘির' গভীরজলে ছিপ ফেলে।

হারাণবাবুর সহ্যশক্তি এত প্রবল নয় যে, ইহার পরেও নারাণের টিকি ধরিয়া টানিয়া আনিবেন না।

সগর্জনে ডাকেন—এই নারাণ, নারাণে, এই উল্লুক!

উল্লুক হন্তদন্তভাবে ছুটিয়া আসে।

—এই শূয়ার, তাস খেলিস কেন? ঘর ঝাঁট দিস না কেন? দাদাবাবুর কথা শুনিসনি কেন?

নারাণের ব্রেন পরিষ্কার হইলেও হারাণের মত তত নয়, কাজেই একবার বাবুর ও পরক্ষণে বাবুর ভাগিনেয়ের মুখপানে বিহ্বলদৃষ্টি ফেলে।

—জবাব দে রাস্কেল, খেলিস তাস?

—আজ্ঞে আর খেলব না।

—খেলবি না? তোর ঘাড় খেলবে। খেলবি, একশোবার খেলবি, সিঁড়ির তলায় খেলবি।

—তাই খেলব। বলিয়া নারাণ প্রস্থানোদ্যত হয়।

—চলে যাচ্ছিস যে? তোর মুখ দেখতে ডাকলাম? যা— নীচের তলাটা সমস্ত ধুয়ে ফেলগে যা। যা শীগ্‌গির...অমনি চলে যাচ্ছিস?—বলি ধুবি কি দিয়ে রে স্টুপিড?

—ঝাড়ু দিয়ে, আবার কি দিয়ে।

—ঝাড়ু দিয়ে—তোমার গুষ্টির মাথা দিয়ে। ঝাড়ু একগাছা আনো দিকিন, তোমায় ঝেড়ে দিই। ব্যাটা শয়তান।

—শয়তান শয়তান বলবেন না বাবু। নারাণ ভৃত্যভাব ত্যাগ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ' করিতে থাকে।

হারাণবাবু তাহাতে দমেন না, সমান তেজে বলেন—না, শয়তান বলব কেন—রামকেষ্ট পরহমহংস, বিবেকানন্দ স্বামী বলবো। যা ব্লীচিং পাউডার ঘষে ধুয়ে দিগে।

—ও পাউটার-ফাউটার দিতে পারব না বাবু, হাত ছেঁদা হয়ে যায়।

—'হাত ছেঁদা হয়ে যাবে', বটে? নবাব খাঞ্জা খা। তোমার খুলিতে ছেঁদা করব আমি। কেন, ফিনাইল নেই বাড়িতে? পাউডার না দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? যা সুমুখ থেকে।

নারাণ বাহিরে যাইতেই হারাণবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়েন।

—উঃ, প্রেসারটা বেড়ে উঠল—চড় চড় করে বেড়ে উঠল—তোমার জন্যে এইটি হ'ল বাপু। (সুখেনের দিকে সরোষে চাহিয়া) সকাল থেকে আমার পেছনে লাগতে আসা—যাও এখন পরেশ ডাক্তারকে ডাক দিকিন একবার, দেরি কর না যাও। উঃ, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে।

সুখেন বিনাবাক্যব্যয়ে উঠিয়া যায় এবং মিনিট পাঁচেক পরেই পরেশ ডাক্তারকে লইয়া ফেরে সাইকেলের পিছনে বাঁধিয়া।

হারাণবাবু মিতব্যয়ী বটে, তাই বলিয়া ডাক্তারের ফি ফাঁকি দেন না, পড়শি হইলেও না। বেগারের রুগীর বেলায় ডাক্তারের চিকিৎসাশাস্ত্র ভুলিয়া যায়, এই ধারণা হারাণবাবুর বদ্ধমূল। কাজেই হারাণবাবুর ডাকে পরেশ ডাক্তার এক পায়ে চটি গলাইয়া ছুটিয়া আসিবেন এটা কিছু বিচিত্র নয়।

যথারীতি ঔষধ ও যথোচিত উপদেশ দান করিয়া দুইটি টাকা পকেটস্থ করিয়া পরেশ ডাক্তার হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে প্রস্থান করেন। পিছন পিছন সুখেনও নামিয়া আসে।

ডাক্তার কার্যনিরত নারাণের পানে চাহিয়া থামিয়া দাঁড়ান—এই যে, ঘরদোর সাফ হচ্ছে দেখছি, উনি ভাড়া দিতে রাজী হয়েছেন তাহলে?

—আর বলেন কেন? ও খেয়াল। সেই কথার এফেক্ট তো এই ব্লাডপ্রেসার।

কথাটা বলিয়া সুখেন হাত দুইখানা উল্টাইয়া একটা হতাশ ভঙ্গী করে।

—তাই তো—তা এক কাজ কর না—উল্টো গাইতে সুরু করো।

—উল্টো? তা বলেছেন মন্দ নয়। ঘরটরগুলো দেখে যাবেন?

—না! দেখবার কি আছে—রোজ দেখছি। তুমি বাবা চেষ্টাটি ছেড়ো না।

—না না, সে কি কথা? আপনার একটা সামান্য অনুরোধ—

চেষ্টার পিছনে নিজেরও যে 'গভীর তেষ্টা' লুকানো আছে সে কথাটা আর খুলিয়া বলে না সুখেন।

রাত্রের আহার সারিয়া মামা-ভাগিনেয়ে আলাপ হয়, রোজই হয়, আজও হইতেছিল....কোন একটা শুভ মুহূর্তে সুখেন 'উল্টা গাওয়া' পালা সুরু করে—'ইয়ে বাবুর' কথাটা একবার শুনলে মামা? বাজারের মোড়ে দেখা আমার সঙ্গে, বলেন কিনা— "তোমার মামা নাকি একতলাটা ভাড়া দিচ্ছেন হে?" স্রেফ বলে দিলাম—না। বললে—"সে কি হে, শুনলাম যে?" আমি চটে গেলাম, বললাম—ভুল শুনেছেন। উত্তরে ভদ্রলোক স্বচ্ছন্দে বললেন কিনা, "আমিও তাই ভাবছি, কলকাতা শহরের ভাড়াটে চরিয়ে খাওয়া কি তোমার মামার কর্ম? গোবেচারা ভালমানুষ।"

হারাণবাবুর ধৈর্য্য আবার বাঁকিয়া বসে, গর্জিয়া উঠেন—কে বলেছে একথা, নামটা শুনি তার?

—ওই যে আপনাদের ইয়েবাবু—কি যেন নামটা? আঃ—সেই যে কাঁচাপাকা গোঁফ, টলফিগার, অথচ বেয়াল্লিশ ইঞ্চির বেশী পরে না কখনো—নামটা? আশ্চর্য্য! মেমারিটা আজকাল বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তোমার মনে পড়ছে না মামা? তোমার তো খুব মেমারি—সেদিন অত বড় যোগটা মুখে মুখে করে দিলে—

মামা ভাগিনেয়-বর্ণিত গৌরব হ্রাস করিতে চান না, কল্পিত 'টলফিগারের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বলেন—মনে আবার পড়ছে না? খুব পড়ছে, নাম করতে চাইনে, পয়লা নম্বরের বদমাইস একটা—দেখে নেব তাকে আমি। ভাড়াটে চরাবার মুরোদ আমার নেই—তার আছে? বড় আস্পর্ধা হয়েছে সব। নারা-ণ, পিজবোর্ড আন একটা।

ঠাকুরের আহ্বানে রান্নাঘরের পথে যাইবার ব্যগ্রতার মুখে বাধাপ্রাপ্ত নারাণ বিরক্তি কুণ্ঠিত মুখে বলে—রাতদুপুরে পিজবোর্ট কোথা পাবো বাবু?

—কোথা পাবে? বিলেত যাও বাবা বিলেত যাও, পাবে। বলি জুতো আসে না বাড়ীতে? বাক্স নেই তার?

জুতো অবশ্যই আসে তবে কোন শুভ মুহূর্তে কে জানে। বাক্স পাওয়া যায় না। অনেক অনুসন্ধানে কোণভাঙা একটা ঢাকনি পাওয়া যায় বাক্সের।

হারাণবাবু তৎক্ষণাৎ কালির দোয়াতে আঙুল ডুবাইয়া তাহার উপর মোটা হরফে 'টু লেট' লিখিয়া দোতলার জানালা হইতে নেকড়ার ফালি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেন।

পরদিন শেষরাত্রি হইতেই ভাড়াটে আসিতে সুরু করে। অনেক কৌশলে সেই 'বিরাট বাহিনীদের' ঠেকাইয়া—বা খেদাইয়া পরেশ ডাক্তারের ভগিনীপতিকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় সুখেন।

হইয়া—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। এখন তাহার বুদ্ধি আর বরাতজোর।

ভাড়াটে যখন আসে হারাণবাবু বাড়ী ছিলেন না, না থাকিবারই কথা, সেইরূপই সময় ঠিক করা ছিল।

হারাণ আসিয়া চড়া সুরে প্রশ্ন করেন—সুখো, নীচের ঘরে আলো জ্বলছে কেন রে?

—ভাড়া এসেছে মামা।

—এসে গেছে? আজকেই? বলি রাস্তায় বসেছিল নাকি? ওরকম হতচ্ছাড়া লোককে বাড়ী ঢুকতে দিলি অমনি? খোঁজখবর নিয়েছিস কিছু? জিনিসপত্র এনেছে? না দুটো ফুটো বালতি নিয়ে এসে ঢুকলো—আর তুই—

—আস্তে মামা, ভদ্রলোক আমাদের ডাক্তারবাবুর ভগ্নীপতি। ছ'মাসের এগ্রিমেন্ট করেছেন, এক মাসের ভাড়া দিয়েছেন আগাম। এই যে—

পকেট হাতড়াইয়া চারখানা আস্ত নোট বাহির করিয়া দেয় সুখেন।

ডাক্তারবাবুর ভগ্নীপতি ও অগ্রিম ভাড়া, উভয় শব্দ হারাণবাবুর টেম্পারকে কতকটা নামাইয়া আনে।

—কি জানি, বাড়িখানা এখন আস্ত থাকলে হয়—শয়তান শয়তান এক ডজন ছেলে এনেছে তো?

—পাবে কোথা? কর্তা গিন্নি, বাচ্চা একটা ছেলে, আর মেয়ে একটা বুঝি।

—মেয়ে? কত বড় মেয়ে?

—তা' বেশ বড়ই হবে বোধ হয়, কে অত লক্ষ্য করেছে! ভাড়া দিলে—রসিদ দিলাম, চুকে গেল।

—'চুকে গেল' বললেই চুকে গেল? বাড়িতে এসে আড্ডা গাড়বে—বলি বিনুনি ঝোলানো না সিঁদুর পরা—সেটুকু দেখতে পারোনি?

'বিনুনি ঝোলানো' মেয়েদের সম্বন্ধে হারাণবাবুর আতঙ্ক ও অভিমত সুখেনের অজ্ঞাত নয়। উড়াইয়া দিবার ভঙ্গীতে মুখ বাঁকাইয়া বলে, কে জানে—সিঁদুর পরাই মনে হল যেন। বিনুনি কই দেখলাম না তো!

মামা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তচিত্তে নিজের কাজে যান।

বিনুনি ঝোলানো মেয়ে দেখিলে মামার হৃৎকম্প হয়। গায়ে জ্বর আসে।

পরদিন সকালে। মামা শালপাতার ঠোঙায় দুইখানি বেলের মোরব্বা কাছে লইয়া পাতিলেবুর রস গুলিয়া চা পান করিতেছেন, মনটা ঈষৎ হৃষ্ট। প্রেসারটা যেন কিছু কম।

সুখেন ব্লেড সানাইতেছে।

সহসা নির্মেঘ আকাশে বজ্রপাতের মত নীচের তলায় হারমোনিয়াম বাজিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের গান—অথবা আর্তনাদ—যাহাই বলুন—

"মাধবী রাতে-এ-এ—মম মন বিতানে—
মল্লিকা মঞ্জরী গুঞ্জরে—হা—য়।"

হারাণবাবু চমকিয়া ওঠেন, চা চলকিয়া পড়ে।

—সুখো? তবে যে বললি সিঁদুর পরা?

সুখেন চমকায় না। সহজভাবে বলে—কেন? কি হল?

—এ যে গান গায়?

—গান? ও—! গাইছে বুঝি?

মনে হয় গানটা যেন আগে কানে ঢোকে নাই তাহার।

—'গান? ও'—মানেটা কি হল সুখেনবাবু?

—বলছি—গাইছে গাকগে না—

—গাইবে? গান গাইবে? আমার বাড়িতে গান? দুপুরে ডাকাতি? সুখো—এ নির্ঘাত বিনুনির কাজ।

—হতে পারে—আশ্চর্য্য কি?

সুখেন ব্লেড রাখিয়া গালে সাবান ঘষে। নির্বিকারভাবে ঘষিতেই থাকে।

হারাণবাবু সুখেনের ঔদাসীন্যে মর্মাহত হন।

—হতে পারে? আশ্চর্য কি? স্বচ্ছন্দে বলে দিলি? যথেষ্ট আশ্চর্য। আমার বাড়িতে গান? আমার বাড়িতে বিনুনি? চলবে না—চলতে পারে না। সুখো, বারণ করে আয়, এখুনি যা—

—বারণ করবো কি গো মামা? পাগল বলবে যে। ভাড়া দিয়েছে—রাইট নেই বাড়িতে? বাড়ি বিক্রী করবে না—বাঁধা দেবে না ব্যাস। তা ছাড়া সবই করতে পারে। গান তো গান, গিরিশবাবুর ভাড়াটে নাচের ইস্কুল খুলেছে বাড়িতে।

—খুলেছে? তবে যাও তোমার আদরের ভাড়াটেকে ডেকে আনো, আমার টাকের ওপর নেত্য করুক এসে!

'আর্তনাদ' তখন হাহাকারে পরিণত হইয়াছে......

"সে তোমারে চায়, সে তোমারে চাঁ—য়।"

—সুখো, এ সহ্য করবো না আমি।—হারাণবাবুও প্রায় আর্তনাদ করিয়া ওঠেন।—ভদ্রলোকের মেয়ে—'চায়' মানে? কি চায়? কা'কে চায়? উঁহু, এসব ভালো কথা নয়! সুখো, যাও শিগগির, বলো গে আমার মামার ব্লাডপ্রেসার—

হারাণবাবু মোরব্বা দুইখানি লইয়া রসগোল্লা বোধে নিংড়াইতে থাকেন।

সুখেন এখন সন্তর্পণে গালে ক্ষুর চালাইতেছে।....

গানের ভাষা স্পষ্ট ভাসিয়া আসিতেছে....কণ্ঠ তীক্ষ্ণ।

"জোৎস্না বিভ—ল মধুর রাতি—
উন্মনা ম—ন খুঁজিছে সাথী...ঈ...ঈ।"

—সুখো, দাড়ি রাখ, আগে যা, বলগে মামার গান শোনা বারণ, ডাক্তারের বারণ—

মোরব্বা পিষ্ট হইয়া হারাণবাবুর আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে বাহির হইয়া আসে।

—মামা, ওটা রসগোল্লা নয়, ও তো ডাক্তারের ভাগ্নী।

—ভাগ্নী ব'লে পেসেন্ট খুন করবে? তাই এ্যালাউ করবে পরেশ? সুখো, আমার প্রেসারটা বেড়ে উঠলো। দে একবার সেই হতভাগাকেই কল দে—

—ডাক্তারবাবু দেশে গেছেন কাল। দেখি এদেরই বলে দেখি, কি হয়?

কামাইবার বহুবিধ সরঞ্জামগুলি ধীরে সুস্থে গুছাইয়া তুলিয়া, ওল্টানো চুলের উপর সাবধানে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুখেন নীচে নামিয়া আসে।

ডাক্তার নাই শুনিয়া হারাণবাবু হতাশভাবে মোরব্বা মাখা হাত চাটিতে থাকেন।

বলা বাহুল্য নীচের কর্তা বাজারে গিয়াছেন। গিন্নি রান্নাঘরে, মরিবার ফুরসৎ নাই তাঁহার,—মেয়েটিই আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, সিঁড়ির তলার যে দরজাটা ভাড়াটের আব্রু রক্ষা করিতে বন্ধ করা ছিল।

সিঁদুর সিঁথিতে নাই, কপালে আছে—লুডোর ঘুঁটির মত প্রকাণ্ড এক টিপ, কানপাশার সাইজ ক্যারম ঘুঁটির কাছাকাছি। লম্বা একহারা অজন্তা স্টাইলের মেয়ে, পিঠে বিনুনি ঝোলানো—'ট্যাসেল'

সমেত গজখানেকের কম নয়।

সুখেন আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে চাপা গলায় বলে—খুব গান হচ্ছিল যে?

'বিনুনি'ও সহাস্যে উত্তর দেয়—কেন? বারণ করছেন নাকি?

—তাই কি হয়? পাগল। খুব অভ্যাস করবে—তোমার স্টকে এ রকম গান আর কত আছে?

—কত চান?

—বেশীর দরকার নেই, একটাতেই অনেকটা এগিয়েছে। ডাক্তারবাবু কবে আস্‌ছেন?

—রবিবারে না কি বলছিলেন।

—শুক্কুর শনি রবি—ওতেই হবে। হরদম চালিয়ে যেও।

—আমার বুঝি লজ্জা করে না?

—ইঃ, লজ্জা? প্রাণের দায়ের কাছে আবার লজ্জা। তা ছাড়া মাস্টারের টাস্ক।.....

উপরে আসিয়া বলে—রাজী হল না মামা, বলে পয়সা খরচ করে মাস্টার রেখেছি—গান না শিখলে বিয়ে হবে না মেয়ের।....

মামা অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন আর হাত চাটিতেছেন।...

সন্ধ্যায় মামা আসিতেছেন—রিক্সায়। আকর্ণ মাফলারে ঢাকা, গায়ের র‍্যাপার টানিয়া পা ঢাকিয়াছেন, যদিও মোজা আছে—তবে অল উল নয় তাই এত সাবধানতা।

মন বিষণ্ন—বিকেলেব দিকে দুইবার নাকি হাঁচিয়াছেন। বাড়ি গিয়া ফুটবাথ লইবেন কিনা, চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনাভাবে দরজা পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছেন......সহসা পশমের ঢাক্‌নি ভেদ করিয়া কানের গোড়ায় বাজিয়া ওঠে—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান—
তার বদলে আমি—"

ফুটবাথের বদলে মাথার রক্ত ফুটিয়া ওঠে হাবাণবাবুর। সোজা উপরে উঠিয়া যান, দরাজ গলায় হাঁক দেন—সুখো?

সেই মাত্র বেড়াইয়া ফিরিয়া সুখেন সদ্য পাটভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবিটির তদ্বির করিতেছিল। মামার ডাকে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসে।

—মামা ডাকছো?

—ডাকছি—নীচে যাও, নোটিশ দিয়ে এসো। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ।

—আবার কি হল?

—শুনতে পাচ্ছ না কি হল?

সুখেন শুনিতে পায়—

"সেই কথাটি কভু পড়বে তোমার মনে—
বর্ষামুখর রাতে—ফাগুন সমীরণে—"

—ওঃ, গান?

যেন সেইমাত্র এ বিষয়ে অবহিত হয় সুখেন।

—কিন্তু মামা, নোটিশ তো চলে না, এগ্রিমেন্ট করেছে যে?

—এগ্রিমেন্ট? কি সর্বনাশ! কদ্দিনের?

—ছ' মাসের মামা।

—সুখেন, এই নাও ধরো, বসিয়ে দাও মাথায়, একঘায়ে শেষ করে দাও—

হাতের মোটা লাঠিটা ভাগিনেয়ের দিকে বাড়াইয়া ধরেন মামা।

রবিবার আসিল। শেষ পর্যন্ত পরেশ ডাক্তারও আসিয়াছেন। মামা 'কল' দিয়াছেন তাঁহাকে। সুখেন লাঠির ব্যবহারে রাজি নয়, অগত্যাই টিকিয়া থাকিতে হইয়াছে মামাকে, তবে মৃতপ্রায় অবস্থা। গত তিন দিন অর্ধাহার অল্প নিদ্রা এবং অতি মানসিক বিপ্লবে মামা চিঁচিঁ করিতেছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া একবার উঠিয়া বসিয়াছেন মাত্র। না বসিলে নাকি নাড়ী দেখা ঠিক হয় না।

—কি হারাণবাবু, ভালো তো?

—ভালো হলে তোমায় ডাকবো কেন ডাক্তার? টাকা তো আমার কামড়াচ্ছে না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই—প্রেসারটা বুঝি আবার—

—ব্লাডপ্রেসার নয় ডাক্তার, নতুন রোগ।

—বটে? কি হয়েছে বলুন তো?

—বলছি—তোমার ভাগ্নীর বিয়ে হয়েছে, পরেশ?

—কই আর হচ্ছে? মেয়েটাকে নিয়ে ভগ্নীপতি তো—

—পাগল হতে বসেছে—কেমন? হতেই হবে—পাগল করানো মেয়ে যে। বলি আমার ভাগ্নেকে তোমার পছন্দ হয় ডাক্তার?

—বলেন কি? বিলক্ষণ। তার আবার কিছু—

—কথা থাক ডাক্তার, মাথা ঘুরছে—বলছি—তোমার ওই ওস্তাদ ভাগ্নীটিকে আমার হতভাগা ভাগ্নেটার সঙ্গে জুড়ে দাও—বিনুনি ঝোলানো বন্ধ হোক ওর।

নাড়ী না দেখাইয়াই ধপাস করিয়া শুইয়া পড়েন হারাণ।

পাত্রী আশীর্বাদের আসরে, সাবধানে বালাপোষের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া ধানদুর্বা তুলিতে তুলিতে হারাণবাবু দরাজ গলায় বলিয়া ওঠেন—দেখো বৌমা, তোমার বাবাটি অতি ধড়িবাজ, অতি ফিচেল লোক—বুঝলে?

বৌমা কি বুঝিল কে জানে, ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা—

গানের গলায় নয়, মৃদু গলায় 'বৌমা' উত্তর করেন—জানি, গান গাইব না আর—

—গাইবে না? কেন গাইবে না? আলবৎ গাইবে—একশোবার গাইবে, কিন্তু ওই ছাইপাঁশগুলো গেয়ো না বাছা, ভালো ভালো গান নেই? ধরো যেমন—

"কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিসনে ফেলে।"

[১৩৫৩]

বর বাসর থেকে উঠে এসে বন্ধুদেব এগিয়ে দিতে ফুটপাত পর্য্যন্ত গেলো। অবশ্য আরও একটা কারণ ছিল, একটা বদঅভ্যাসের প্রয়োজন হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে, কিন্তু শাস্ত্রপালার সমস্ত ফৈজৎ না চুকতে তো আর কেউ বরকে ছেড়ে দেবে না? তা' সে হাওয়া খেতেই হোক আর ধোঁয়া খেতেই হোক।

দেশলাইটা রমেনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গলাটা যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ রাখবার চেষ্টা কবে বর অমিতাভ বলে—তাবপব কি রকম দেখলি বৌ? আমি তো ভাই ও-সব চেলির পুঁটুলিব মধ্যে থেকে কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না।

অমিতাভ মিথ্যাবাদী নয়—কিন্তু বর্ত্তমানে তাকে খুব সত্যবাদীও বলা চলে না, কারণ একেই তো আজকালের দিনে "চেলির পুঁটুলি" কথাটা বাতিল অভিধানে ছাড়া আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ, তা' ভিন্ন তার নিজের চোখ-মুখই বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সুধাকান্ত মুখ খিঁচিয়ে বললে—তোমার সেই অনাবিষ্কৃত আইল্যাণ্ডের আমরাই প্রথম দর্শক বলতে চাও?

—চটছিস কেন খামোকা? দোষের কথা কি বলেছে বেচারা?—সুকুমার বলে।

—ন্যাকামি দেখতে পারিনে আমি, সম্প্রদান-সভায় তাকাচ্ছিলি না প্যাঁট্ প্যাঁট্ করে? কে না দেখেছে? আহ্লাদে তো আটখানা হয়ে যাচ্ছিস দেখছি। কিসের যে এত ফুর্ত্তি বুঝি না।

অমিতাভর চটে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজকের দিনে ওর বন্ধুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করবাব ইচ্ছে নেই, মনে উদারতার হাওয়া বইছে। সুধাকান্তর পিঠে একটা ছোট থাবড়া মেবে বললে—বুঝবে হে বন্ধু, বুঝবে—সে শুভদিন আসুক।

—দরকার নেই অমন বোঝায়। বিয়ের মন্তর পড়তে না পড়তে যে মানুষ কি করে এমন অধঃপতনে যায় আশ্চর্য্য!

—অধঃপাতের কি দেখলি শুনি? রূপের কথা তো অস্বীকার করতে পারবি না? এবং সুন্দরী স্ত্রীলাভে খুসী হয় না—এমন লোক জগতে আছে কিনা—

—থাক হয়েছে, আর জগৎকে নিয়ে টানাটানি করতে হ'বে না! বিয়ের আগে পর্য্যন্ত কি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলি, মনে নেই? সব ভুলে মেরে দিয়ে সুন্দরী স্ত্রীলাভে ধন্য হয়ে—সুন্দরী শ্যালিকাদের অঞ্চল ধরে দিব্যি গিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকলি?

দীপক বিস্মিত ভাবে বললে—ব্যাপারটা কি হে? কিসের প্রতিজ্ঞা? ভ্যাবাকান্ত আগুন হয়ে উঠলো কি জন্যে?

অমিতাভ হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—বালিস কেন? সুধা বলেছিল—বাসরে বসবে গানবাজনা করবে, অথচ—

—থাক্ বাবা, তোর কালোয়াতীর কস্‌রতি আর নতুন কুটুম্ববাড়ী প্রকাশ করতে হবে না—নিত্যানন্দ বলে,—বাসরে বসবেন! আশা কত! বরযাত্রীদের বাসরে ঢুকতে দেবে—এত মাইডিয়ার কন্যেকর্ত্তা আর এখন নেই রে—সে ছিল সেকালে। বর-যাত্রী এসে কন্যেকর্ত্তার মাথাটা নিয়ে ডাংগুলি খেলতে চাইলেও আপত্তি করাবার সাহস পেতো না। এখন এক পাত খেতে দিয়েই মনে করে যথেষ্ট করলাম। জায়গা কমের দোহাই দিয়ে মুখের উপর স্পষ্টই নোটিশ দেয়। যেমন অমিতাভের

ওই খুড়শ্বশুরটি দিলেন, ঝানু লোক—ঘুঘু!

অমিতাভ গম্ভীর ভাবে বলে—এই, ও-রকম বলতে নেই—যতই হোক আমার শ্বশুর তোদেরও—

—শ্বশুর? কেমন?—সুধাকান্ত দ্বিতীয়বার খিঁচিয়ে ওঠে—দেখিস, গুরুনিন্দেয় দেহত্যাগ করে বসিস্‌নে? চল চল, আমরা বিদেয় হই, মনে হচ্ছে বাসরের আকর্ষণ ওর কাছে মাধ্যাকর্ষণের চাইতেও বেশী।

বলা বাহুল্য, এত বড় খোঁটা খেয়েও অমিতাভকে খুব বেশী বিচলিত হ'তে দেখা গেল না, পাইকারী দরে প্রত্যেকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিদায় গ্রহণের বিলম্বিত সুরে বলে—আচ্ছা, আবার দেখা হবে পর্শু আমার ওখানে। যাচ্ছো তো সবাই? নিশ্চয়ই?

সুকুমার হাতের জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে হাত বাড়িয়ে বোধ করি বন্ধুকে 'গুডনাইট্' করতেই যাচ্ছিল—কিন্তু অমিতাভ তখন পিছন ফিরেছে, এবং জ্বলন্ত কাঠিটা ছিটকে গিয়ে ঢুকে পড়েছে সুধাকান্তর কোঁচার ভাঁজে।

লাফালাফি করে অগ্নিদেবকে জুতোর তলায় নিষ্পিষ্ট নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে ফেলতে সুধাকান্ত বলে—খবরদার সুকুমার, হয় সাবধান হ'তে শেখ, না হয় সিগারেট খাওয়া ছাড়। এখুনি দফা সেবেছিলি কাপড়খানার, প্রাণ গেলে প্রাণ হবে বাবা, ধুতি গেলে ধুতি হবে না।

—প্রায় সেই রকমই—নিত্যানন্দ বলে—তবে একপিস্ ধুতি তোমায় আমি যোগাড় করে দিতে পারি। আমার সেজ খুড়শ্বশুর—

—ফের খুড়শ্বশুর? চুপ করে থাক নিতাই. খুড়শ্বশুর মহিমা শোনবার ধৈর্য্য আমার বেশীক্ষণ থাকবে না—

—সুধার মেজাজটা আজ এত খাপ্পা কেন রে সুকুমার?

নিতাইয়ের প্রশ্নে সুকুমার হো হো করে হেসে উঠে বললে—শুধু আজ? মেজাজটা কোনো দিন মোলায়েম ছিল এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না যে রে।

—তবু আজ যেন 'রণং দেহি' হয়ে রয়েছে—কি বে সুধা, বিয়েবাড়ীতে কনের কোনো "তুতো বোনের" সঙ্গে প্রেমে-টেমে পড়ে যাসনি তো?

—রাবিশ! দুনিয়ায় শিখেছ খালি ওই "প্রেম আর পেরণয়"—নুইসেন্স। আসলে ও তোমাদের প্রেমটি হচ্ছে স্রেফ্ ঘোড়ার ডিম, চিরকালই চলছে—কিন্তু কোন কালেই নেই।

হঠাৎ দীপক চঞ্চলভাবে রিষ্টওয়াচ্‌টার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বললে—কি সর্ব্বনাশ! এগারটা পঁয়ত্রিশ? যাঃ, এখন উপায়? মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও বাস পাওয়া যাবে না—সিওর। ওই সুধাটার জন্যেই এত গণ্ডগোল—

—কেন? হঠাৎ এ গরীবের কি অপরাধ পেলে শুনতে পাই?

—জানি না। রাত্তির দশটা না বাজতেই দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার মিটে গেলো—যে যার নিজ নিজ খোঁয়াড়ে ফিরে যাবি বাবা, ল্যাটা চুকে যাবে—তা' নয়, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এখন প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করতে বসলো। আমি এখন কি করি? তোদের আর কি, সবাই কলকাতার বাসিন্দা—হণ্টন, ঠুনঠুন, যাতে করে হোক পৌঁছে যাবি, আমাকে যে এখন আট মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে হবে।

—তুই আজকাল কালীঘাটে উঠে গেছিস না?

—তাই তো—নইলে আর ভাববার কি ছিল? উঃ, বৌটা যে কি ভাবনায় পড়ে যাবে। তার আবার হার্ট উইক, একটু ভাবনা-চিন্তা করলেই—

—ফিট হয়—কেমন? আর তোমার বাড়ী ফিরতে বিলম্ব দেখলেই তাঁর হার্ট প্যালপিটেশন সুরু হবে না? আশ্চর্য্য! বৌগুলো তোদের চাইতে কোন না আট-দশ বছরের ছোট হবে—কি রকম বেকুব বানিয়ে রেখেছে দেখেছিস? তুমি হতভাগা—হয়তো আফিসে ওভারটাইম খেটে রাত্তির ন'টার সময় টায়ার্ড হয়ে বাড়ী ফিরলে—তিনি ততক্ষণে তিনবার চা খেয়ে দু'মুঠো ডালমুট চিবিয়ে রেডিওর চাবি খুলে—নয়তো পাতানো ঠাকুরপোদের সঙ্গে সিনেমার গল্প করে সন্ধ্যাটুকু কাটিয়ে ঠিক সময় বুঝে হাত পা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। কি না দুশ্চিন্তা! নাও কোটের বোতাম না খুলেই তাঁর মুখে জল দাও বাতাস করো, নাড়ি ছাড়লো কি না দেখো। সত্যি, পয়সা খরচ করে যে এতদিন লেখাপড়া শিখেছিলি সব বাজে? একটি একটি প্রকাণ্ড গাড়োল বনবাব জন্যে?

—সুধা, তোর বক্তিমে রাখ, বিয়ে তো করিসনি, নারীরহস্য বুঝবি কি? কেন যে মানসিক গোলমালে ওরা অতটা কাতর হয়ে পড়ে তার কারণ জানিস?

—জানতে চাইনে বাবা, তোদের রহস্য তোদেরই থাক—কিন্তু আমি বেট্ ফেলে বলতে পারি দীপক, তুই যদি রাত্তিরে না ফিরতে পারিস, তোর বৌ হার্টফেলও করবে না মুর্চ্ছাও যাবে না—এমন কি ঘুমের ব্যাঘাতও হবে না। স্রেফ কাঁচালঙ্কার ঝাল ঝাল মাছচচ্চড়ি দিয়ে এক কাঁসি ভাত সেঁটে একখানি 'মোহন সিরিজ' নিয়ে বিছানায় লম্বা হবেন—এবং ঘুম পেলে—"ঠাকুর, বাবু এলে দোর খুলে দিয়ো" বলে নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমিয়ে পড়তে দ্বিধা করবেন না।

দীপক অবিশ্বাসভরে মাথা নেড়ে বলে—তুই তাকে চিনিস না, মোটেই সেরকম নয়, খাবে না শোবে না—বারান্দা কি জানালার কাছ থেকে নড়বে না—যতক্ষণ না আমি ফিরবো তার স্বস্তি নেই। না ফিরলে? হুঁ! —দীপক কথাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে হাসলো।

—একেবারে রাহুর প্রেম—সুধাকান্ত হতাশ ভঙ্গীতে দুই হাত উল্টে বলে—ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকলে কে তাকে আলো দেখাতে পারে। এক্সপেরিমেন্টাল তুই একদিন দেখ—এই তো কাছেই আমার মেস। চল, শুয়ে পড়বি—

—পাগল হয়েছিস? অসম্ভব। বাবা মা এলাহাবাদ গেছেন, ও একা আছে, বাড়ি আমাকে ফিরতেই হবে। হেঁটে—রিক্সয়—ঠেলাগাড়ী—ট্যাক্সি—এনিথিঙ—

সুধাকান্ত নীচের ঠোঁটটি উল্টে একটা অবজ্ঞাসূচক মেয়েলি ভঙ্গী করে বললে—কলির বিল্বমঙ্গল! উচ্ছন্ন যাবার আর বাকী কিছুই নেই—কিন্তু এখনো দেখ দীপক, একটা রাত....পরীক্ষার জন্যেও অন্ততঃ। টাকাটা মেকি কি না সাত বার বাজিয়ে নিস, আর সারা জীবন যার সঙ্গে ঘর করবি সেটা খাঁটি কি না বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

—তাহলে কি করতে বলিস আমায়?

—কিছু না, সোজা আমার মেসে ঠেলে ওঠো, আদ্দির পাঞ্জাবিটি আলনায় ঝুলিয়ে রেখে সটান লম্বা। তারপর যা করবার আমিই করবো। সুকুমার, তুমি রাজী আছো?

—কি বিষয়ে?—সুকুমার আশ্চর্য্য হয়ে তাকালো।

—কাল ভোরবেলা ফার্ষ্ট ট্রামে কালীঘাটে দীপকের বাড়ী তুই আর আমি গিয়ে ওর বৌকে বলবো, রাত্রে নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরবার সময় দীপক বাস্ এক্সিডেন্ট হয়ে মেডিকেল কলেজে আছে—অবস্থা খারাপ, বৌকে দেখতে চাইছে।

দীপক চটে উঠে বললে—এই খবরদার সুধা, ও সব বদ মতলব ছাড়, আচম্কা ওরকম

সাংঘাতিক খবরে হঠাৎ একটা কিছু হয়ে গেলে তখন?

—বেশ গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, তোর বৌ হার্ট ফেল করলে আমি এক মাসের মধ্যে আবার বিয়ে দিয়ে দেব—গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে সিনেমা আর্টিষ্ট যা চাস্।

—নরকে যাও তুমি—বলে দীপক হন্‌হন্‌ ক'রে এগিয়ে চলে। সুকুমার দাঁড়িয়ে কৌতুক দেখছিল, হেসে উঠে বলে—এই সুধা, কি যা-তা বললি? চটে গেল বেচারা—

—সবই 'বেচারা', শুধু এই সুধা অভাগাই সাহারা রয়ে গেল। ব্যাটাছেলে—জোয়ান মদ্দ—বেচারা কি রে? শুন্‌লে ঘেন্না করে। আরে বাবু তো গটগট্ কবে চলেছেন—হেঁটেই যাবেন নাকি?

—যাব যেমন করে হোক।—বলে সুকুমার চলে যাচ্ছিল—রমেন আর নিত্যানন্দ ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছে—সুধাকান্ত খপ্ করে ওর পাঞ্জাবির পিছন ধরে টান মারলো—এই শোন্—ওকে যেমন করে হোক ফেরা, করাই যাক এক্সপেরিমেন্ট, তোর কি মনে হয়? শোক সংবাদ শুনে কখনো কাউকে হার্টফেল করতে দেখেছিস্?

—কি জানি ভাই, অনেক হার্টের খবর রাখি না—একটি মাত্র চিনি, বড় বেশী ষ্ট্রং, জ্বর হলে সাবুর বাটি মাথার কাছে বসিয়ে রেখে পাড়া বেড়াতে চলে যায়।

—চমৎকার! এই তো চাই। বাঙালীব মেয়েরা সবাই যেদিন এ রকম হতে পারবে সেদিন যদি ছেলেগুলো 'পুরুষ' হয়।.....কিন্তু ছোট্ ছোট্, ও যে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

শেষ পর্য্যন্ত ওরা দীপককে ফেরালো—বললো—বেশ, অতদূর নয়, একসিডেন্ট থাক্, বলা যাক্—ম্যালেরিয়া জ্বর; চারখানা লেপ চাপা দিয়ে পড়ে আছে, মাথায় আইস্‌ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে, চলুন।

টানাটানিতে অগত্যাই ফিরতে হ'ল দীপককে। সুধাকান্তর মেসে গিয়ে উঠলো। সুধাকান্ত ওর ঘড়ি পার্স জুতো পাঞ্জাবি সমস্ত হস্তগত করে শুযে পড়লো মেঝেয় বিছানা পেতে, নিজের লেপ বিছানা ছেড়ে দিলে দীপককে।

বলা বাহুল্য, মুহূর্ত্তের মধ্যেই দীপকের নাসিকা গর্জ্জন করে উঠলো।

—বিরহ!—বলে মুচকি হেসে সুধাকান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সুকুমারের বাড়ী বেশী দূরে নয়—তাকে ডেকে তুলে দুজনে যখন দক্ষিণ কলিকাতাগামী ট্রামে চড়ে বসলো তখনো ভালো করে ফর্সা হয়নি।

সুকুমার সিগারেট-কেসটা সুধাকে এগিয়ে দিয়ে হেসে বললে—শীত করছে কিন্তু—অদ্ভুত খেয়াল তোর! সুখে থাক্‌তে ভূতের কীল খাওয়া—নেহাৎ বৌ বাপের বাড়ী গেছে তাই—এই ভোরবেলা বিছানা ছাড়লাম।

—কিন্তু এই খালি ট্রামে চড়ার সুখ? এটাও কম নয়। দেখলি ত বিরহের বহর? দীপক বাবুর অত ভাবনা চিন্তা—যেমন শোয়া তেমনি ঘুম। যে পাশে শুয়েছিল সেই পাশে আছে।

দীপকের বাড়ীর কাছাকাছি এসে সুকুমার বলে ওঠে—আমার কিন্তু ভাই বড্ড ভয় করছে—ধর যদি বাড়ীর আর কেউ জেরা করে?

—বাড়ীতে আর আছে কে? ওর বাপ তো এলাহাবাদ গেছেন শুনলি—চল না ভয় কি?

কিন্তু ওদের ভাগ্যক্রমে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলো দীপকের বৌই। বোধ হয় সেইমাত্র ঘুম ভেঙ্গে উঠেছে—উস্কোখুস্কো চুল, মুখ-চোখ ভারী ভারী—মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে একটু সরে দাঁড়ালো।

সুকুমার পিছন থেকে সুধাকান্তকে ঠেলা দিল—এবং সুধাকান্তও মুখ-চোখ যথাসম্ভব করুণ করে বললে—দেখুন বৌদি, মানে আমরা এসেছি একটা সংবাদ—মানে দুঃসংবাদ নিয়েই........(নেপথ্যে)—এই সুকুমার, কি বলবো জ্বর না একসিডেন্ট? যাকগে থাকে ফাঁড়া খণ্ডে যাক্,.....হ্যাঁ দুঃসংবাদ তো বটেই—তবে বেশী ঘাবড়াবেন না—আপনার আবার শুনেছি হার্ট উইক, দীপক কাল রাত্রে বিয়েবাড়ী থেকে ফেরবার সময়—

এই সময় ও একটু থামলো শ্রোত্রীব মুখভাব পরীক্ষা করতে—খুব বেশী বিচলিত বোধ হল না।

—হ্যাঁ, ফেরবার সময় একটা এক্সিডেন্ট, রীতিমত আহত হয়ে পড়ে—মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে হয়—জ্ঞান ছিল না—শেষরাত্রেব দিকে জ্ঞান হয়েছে—আপনাকে খুঁজছে—

মনে করেছিল অন্ততঃ বসে পড়বে, কিন্তু আভারাণী মাথার কাপড়টা আরো একটু টেনে দিয়ে ধীরভাবে বললে—আপনারা আমাকে নিতে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা তা হলে একটু বসুন দয়া করে—আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

পরনে ছাপাছিটের শাড়ী ব্লাউস রাত্রিবাসের জন্যে যেটুকু ভাঁজ পড়েছে সেটা পথে বার হ'বার নিতান্ত অনুপযুক্ত নয়।

সুধাকান্ত আর একবার নেপথ্যে কথা কইলো—(বোধ হয় পাউডার মাখবে, কি বলিস্?)

—নিন তাড়াতাড়ি—

আভারাণী আর একটু চুপ কবে থেকে বললে—রাত্রে এরকম ব্যাপার হয়েছে অথচ এখন খবর দিতে এলেন?

—কি করবো তখন বাস-ট্রাম বন্ধ—

—বাস্ এক্সিডেন্ট বললেন না? বাস্ তো চল্‌ছিলই—

—হ্যাঁ তা বললাম বটে কিন্তু তখন ওকে নিয়ে কলেজে যাই, না খবর দিতে আসি—

—পরে ট্যাক্সি করে এলে পারতেন—

রীতিমত জেবা।

সুধাকান্ত ভাবল বলে বসে—যে-বকম ব্যস্ততা দেখছি তাতে কাল সকালে এলেও ক্ষতি ছিল না—অনেক করে ধৈর্য্য ধরে বললে—তা'তে কি লাভ হ'ত বলুন, আপনার আবার কাঁচাঘুম ভেঙ্গে শরীর-টরীর খারাপ হ'তে পারতো—

—একজনের প্রাণের চাইতে আমার ঘুম বড় নয় নিশ্চয়ই?

সুধাকান্তর ধৈর্য্যের সীমা অনন্ত নয়।

বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—কিন্তু আপনার তর্কটা বড়। যাবেন কি না তাই বলুন, আমাদের দাঁড়াবার সময় নেই।

—যেতে হবে বৈ কি, আমায় খুঁজেছেন যখন—আচ্ছা আপনারা সারারাতই ওখানে ছিলেন?

—তাই তো, চারজন ডাক্তার, আমরা দুজন বন্ধু, নার্স সব ঠায় জেগে।

—আশ্চর্য্য! আপনারা এই বেশেই বিয়ে-বাড়ী গিয়েছিলেন নাকি?

সুকুমার সুধার পাঁজরে প্রবলভাবে কনুইয়ের গুঁতো দিলে (সুধা তুই থাক আমি চললাম—ওর নাকি আবার হার্ট উইক?)

বাস্তবিক—তার নিজের পরণে একটা ছেঁড়া টুইল সার্ট, আর সুধাকান্তর গায়ে আধময়লা

খদ্দরের পাঞ্জাবি। শোককাতর ভাব ফোটাবার জন্য বরং ইচ্ছে করে চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে এসেছে, কিন্তু এ মেয়ে বলে কি?

সুধাকান্ত হঠাৎ অপ্রতিভ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দৃঢ় স্বরে বললে—আমরা কোন্ বেশে নেমন্তন্ন গিয়েছিলাম সেইটাই বড় কথা নয়—মেয়েদের মত সর্ব্বদাই সাজবার দরকার আমাদের না-ও হতে পারে—আপনি যদি বিশ্বাস করে আমাদের সঙ্গে না যেতে চান ভালো কথা। চললাম—তবে দীপকের নাকি, আপনি ভাবছেন ভেবে—মরেও সুখ হচ্ছে না—তাই মুমূর্ষু বন্ধুকে ফেলে আপনাকে খবরটা দিতে এসেছিলাম।

—খবরটা কিন্তু আমি আগেই পেয়েছিলাম।

—তার মানে? কে দিলে?

—আপনাদের মুমূর্ষু বন্ধুই—বলে মুখ টিপে একটু হেসে আভারাণী সরে দাঁড়ালো।

পিছনে দীপক।

—দীপক?—শুধু নামটুকু ছাড়া আর কোন কথা বেরোল না সুধাকান্তের মুখ থেকে।

—হ্যাঁ ভাই, আমি। প্রেতাত্মা নই—জলজ্যান্ত।

—কখন এলি?

—কাল রাত্রে! তুমি যেই ঘুমিয়ে পড়লে।

—অথচ তুমিই আগে ঘুমোলে।

—সেটা নকল। তুমি ঘুমোতেই বালিসে লেপ চাপা দিয়ে রেখে কেটে পড়লাম।

—দশ টাকা ট্যাক্সি-ভাড়া দিলি?

—কোথায় ট্যাক্সি? মিলিটারীর জ্বালায় পাবার জো আছে? সোজা হণ্টন।

—আগাগোড়া? শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট?

বিস্ময়ে বেশী কথাও ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

দীপক লজ্জিত ভাবে বলে—কি করবো ভাই, না এলে রক্ষে ছিল? একলা রয়েছে—

—এই খালি পায়ে গেঞ্জি গায়ে আট মাইল রাস্তা হেঁটে এলি?

—কি আর করা যাবে—রাস্তায় লোক ছিল না বেশী, চলে এলাম এক-রকম করে। কিন্তু রাগ করিসনে ভাই, ও তোদের চা খাওয়াবে বলে ঠিক করেছে, আয় বাড়ীর ভেতর।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার দীপকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে সুধাকান্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে—সুকুমার, খাবি চা?

—আপত্তি কি?

—জাহান্নমে যাও!

ঝড়ের মতন বেরিয়ে গেল সুধাকান্ত।

এদের সঙ্গে যে এতদিন বন্ধুত্ব রেখে এসেছে কি করে—এই ভেবে নিজেই অবাক হয়ে গেছে সে। দীপক পিছু পিছু আসছে—আসুক, চলন্ত ট্রাম আছে সামনে।

[১৩৫৩]

বেঁটে ছাতা, 'বাটা'র দুই রঙা হাই হীল সু, শান্তিনিকেতনী ভ্যানিটি ব্যাগ, আর বিদঘুটে রঙচঙে ছাপা শাড়ী, সব মিলিয়ে মিস অণিমা ঘোষ। অণিমা ঘোষ আছেন—অথচ এসব নেই এ দেখবেন না আপনি।

প্রমাণ পেতে চান?—পার্কের ওই উত্তর পূর্ব্ব কোণটায় নজর করুন—লোহার বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে আছেন মিস ঘোষ, কোলের উপর পোষা বিড়াল ছানাটির মত সযত্নে শোয়ানো আছে 'বাটিকের' কাজ করা ভ্যানিটি ব্যাগটি, বেঁটে ছাতাটি আছে রেলিঙের গায়ে হেলানো, আর অদ্ভুত রঙদার ছাপা শাড়ীখানা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে আছে অণিমা ঘোষের খাটো খাটো নীটোল দেহখানিকে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে—যে কোন দিন ইচ্ছে—দেখে আসতে পারেন। প্রত্যহ অফিস ফেরৎ একঘণ্টা করে হাওয়া খেয়ে যাবেন তিনি, এই নিয়ম। আগে বোধ কবি কোন মেয়ে-স্কুলের 'দিদিমণি' ছিলেন, যখন 'দিদিমণি' হওয়া ছাড়া সত্যিই আর গতি ছিল না মেয়েদের' এখন চাকুরী নিয়েছেন—'বেকারের বারাণসী' সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে।

মিস অণিমাঃ ঘোষের বয়স জানতে চান? ওটা চাইবেন না, ভারী চটে যান ভদ্রমহিলা, আর রাগ করেই বলে ফেলেন,—"ত্রিশ পার হতে চললো তো—" নিন্দুকে কিন্তু অন্য কথা বলে।

একটি কাজের ঝি আর একটি ভাইঝি, এই তাঁর সংসার। আজীবন এইরকম নিঃসঙ্গ কাটালেন বেচারা।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তার জন্যে মুসড়ে পড়েননি কোনদিন। চোখের কোণে আর ভ্রূর উপর সরু তুলির একটু আঁচড়, ফ্যাকাসে ঠোঁটে একটু লালিমার প্রলেপ, স্নো ক্রীম আর পাউডারের সুরুচিসম্মত নির্ভুল ব্যবহার কৌশল, এর ব্যতিক্রম ঘটে না কোন দিন— দিনের পর দিন বছরের পর বছর।

বেশ চলছিল, হঠাৎ বাচ্চা ভাইঝিটা বাধিয়েছে গোল। ও নাকি কিছুতেই আর ফ্রক পরতে রাজী নয়, শাড়ী না ধরে ছাড়বে না। কিন্তু শাড়ী ধরালে 'চৌদ্দর গণ্ডীর' ভিতর আটকে রাখা চলে কি করে? সত্যি—মা-বাপ-মরা মেয়ে, যাকে তিনিই হাতে করে মানুষ করলেন সে হঠাৎ সাবালিকা হয়ে উঠলে তিনি কোথায় গিয়ে ঠেকেন? প্রায় চার বছর ধরে যাকে 'চৌদ্দ' বলে চালিয়ে আসছেন—খাটো ফ্রক আর আঁটো বডিসের দৌলতে—শাড়ী ব্লাউজ দিলে সে যে একদিনেই আঠারো বছরের হয়ে বসবে, এও তো কম ভাবনার কথা নয়।

কেন যে এই অদ্ভুত সখ!

মিস অণিমা ঘোষ ভাবেন—আরো কিছুদিন করুক না ছুটোছুটি লাফালাফি ফ্রক প'রে আর চুলে 'বো' বেঁধে। বড় হওয়ার সাধ! আশ্চর্য্য! মেয়েদের এই পাকামী তাঁর দু'চক্ষের বিষ। হঠাৎ একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসেন মিস ঘোষ।

সামনের বেঞ্চে সেই ছোকরা এসে বসেছে।

কিছুদিন থেকেই তিনি লক্ষ্য করছেন এটা, ঠিক এই সময় সামনের ওই বেঞ্চে এসে বসবে

ছোকরা, ঘন ঘন তাকাবে মিস ঘোষের দিকে, উসখুস করবে, নড়বে, রুমাল নিয়ে হাওয়া খাবে, অথচ শেষ পর্য্যন্ত উঠে যাবে কিছু না বলে।

প্রথম প্রথম তিনি আমলে আনেন নি এটা, কিন্তু এখন ক্রমশঃ এমন দাঁড়িয়েছে যে ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করা চলে না। লক্ষ্যবস্তু যে মিস ঘোষ, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এর পর কয়েক দিন মিস অণিমা বাড়ী ফিরেই আয়নার সামনে দাঁড়ালেন...নীটোল গোলগাল মুখ, বয়সের রেখা পড়েনি কোথাও, যতটা পথ পার হয়ে এসেছেন তার চিহ্ন নেই কোনোখানে।

আজ একটু অবহিত হয়ে বসলেন মিস ঘোষ, অসম্ভবই বা কি? পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কথাটা সত্যই আছে নাকি? ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস—চোখের কোণে একটু সলজ্জ প্রশ্রয়—ক্ষতি কি তা'তে?

লীলাচ্ছলে ক্ষুদে রুমালটি নেড়ে বাতাস খাবার একটা অভিনয় করে সশব্দ মন্তব্য করলেন—উঃ, কী গরম!

ও পক্ষ নীরব।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো।

উসখুসনি আরম্ভ হয়েছে ছোকরার, মুখ চোখে কিছু একটা 'বলি বলি' ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।...হ্যাঁ, আজই সে বলে ফেলবে যা থাকে কপালে, প্রেমের ক্ষেত্রে ভয় আর লজ্জা করে কে কবে জয়ী হয়েছে?...উঠে দাঁড়িয়ে—একটু কেসে, একটু পা ঘষে এগিয়ে এল মিস ঘোষের কাছে।

দাঁড়ালো মুখোমুখি।

—কয়েক দিন থেকে আমি এখানে আসছি...।

—যা গরম বাড়ীতে টেঁকা দায়, কথাটা বলে নিজে বেঞ্চের এক পাশে সরে বসে—পাশে বসতে বলার প্রায় স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন অণিমা ঘোষ।

ছোকরা একটু ইতস্ততঃ করে বসেই পড়ে।

মিস অণিমা ঘোষের আটত্রিশ বৎসরের পাকা হার্টও একটু কেঁপে ওঠে।

—আপনাকে রোজই দেখি।

—আমিও তো দেখি—অণিমা ঘোষ খিলখিল করে হেসে ওঠেন।

ছোকরাও অপ্রতিভ হয়ে হেসে ফেলে।

হাসিটি চমৎকার। অণিমা ঘোষ ভাবেন।

—আপনার ব্যাগটি চমৎকার তো।

—হ্যাঁ, আমার একটি বন্ধু—মানে বান্ধবী আমার জন্মদিনে প্রেজেন্ট করেছিল।

কথাটা অবশ্য কাল্পনিক হওয়া বিচিত্র নয়—কিন্তু যাক।

—আপনার বন্ধুর—মানে বান্ধবীর টেষ্ট আছে। মেয়েদের যে কোন্ জিনিষটা কাজে লাগে মেয়েরাই বোঝে—আমরাই পড়ি মুস্কিলে উপহার নির্ব্বাচনের সময়।

—ওর আর কি—মিস ঘোষ আশান্বিত হয়ে ওঠেন—কীই বা কাজে লাগে না মেয়েদের? কেন শাড়ী? সবচেয়ে সোজা।

—তা, বটে—আপনি বুঝি 'এইট-এ'তে আসেন?

—হ্যাঁ—এতেই আমার সুবিধে।

কি চমৎকার লাজুক ছেলে—মিস অণিমা ঘোষ মনে মনে ভাবেন—আজে-বাজে কথা কইছে,

অথচ—।

—কুপার ষ্ট্রীটের মোড়ের ওই সাদা বাড়ীটার দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন তো আপনি?

এবার চমৎকৃত হ'ন অণিমা ঘোষ নিজেই।...এতদূর?

—কী আশ্চর্য্য! আপনি জানলেন কি করে?

ঈষৎ অন্তরঙ্গ হয়ে বসেন তিনি।

ছোকরা কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে কোণ ঠেসে বসে।

—প্রায়ই দেখি কিনা—ওই বাড়ী থেকে বেরোন। একলাই থাকেন বুঝি?

—একরকম একলাই।

মুখখানি করুণ করে তোলেন মিস অণিমা ঘোষ—শুধু একটা বাচ্চা ভাইঝি—নেহাৎই বাচ্চা—মাত্র সেইটুকুই আমার জীবনের অবলম্বন। এত শিশু আর মিষ্টি মেয়েটা—ও যদি না থাকতো—উঃ।

—ও—ইয়ে মানে—কিছুদিন থেকেই ভাবছি আপনার সঙ্গে আলাপ করবো কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারছি না।

—এতে আর সাহসের প্রশ্ন কেন? আমি তো ভয়ঙ্কর একটা কিছু নই? কি বলেন, ভয়ঙ্কর নাকি?

—না না, সে কি, আপনাকে আমার খুব ভাল—মানে বেশ লাগে।

নাঃ, সন্দেহের আর কিছু নেই।

মিস অণিমার কুমারী হৃদয় আবেগে দুলে ওঠে। হয়তো বা গালের ওপর দেখা দেয় ঈষৎ লালের ছোপ।

—আপনাকে একটা কথা বলবো—মানে বলতে চেষ্টা করছি—যদি আপনি ভরসা দেন—মানে একটা প্রস্তাব—।

এবার অণিমা ঘোষও ঘেমে ওঠেন।

একেবারেই বিবাহের প্রস্তাব! কি সুন্দর আবেগপ্রবণ সরল হৃদয়!...

আচ্ছা পড়ন্ত বেলার সোনালী আলোটা ঠিক মুখের ওপরই পড়েছে বোধ হয়? বাঁকা সিঁথিতে—আঁকা ভুরুতে—আর রাঙানো অধরে?...

ছাপা শাড়ীগুলো চমৎকার জিনিষ—পরলে অন্ততঃ পনের বছর বয়স কম লাগে।...

ছোকরা কোঁচার খুঁটটা তুলে নিয়ে আঙুলে জড়াতে সুরু করেছে। কি মিষ্টি এই লজ্জার ভঙ্গীটুকু!...সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন মিস।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষায় কাটলো।

—কি মুস্কিল, কি বলতে চান বলুন না? অপাঙ্গে একটু হেসে শিথিল ভঙ্গীতে ডান হাতখানা সামান্য এগিয়ে দিলেন মিস অণিমা। বুকের ভিতর দস্তুরমত 'টিপ টিপ' সুরু করেছে।

কবিরা বোধ করি একেই 'পুলক নর্ত্তন' বলে থাকেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য লজ্জা ছেলেটার, পুরুষমানুষ হয়ে। কোনো নভেলে ও কি কখনো পড়েনি এক্ষেত্রে কি বলা উচিত অথবা কি করা? করপল্লবের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে উঠেই দাঁড়ালো? মিস অণিমা ঘোষকেই কি ফরোয়ার্ড হ'তে হবে?

—আপনার মত লজ্জা তো দেখিনি।

—না, লজ্জা নয়—মানে লজ্জা আর কিসের, আপনি যখন ভরসা দিচ্ছেন। বলেই ফেলছি—ইয়ে মানে আপনি— মানে আপনাকে অর্থাৎ আপনার কাছে একটা—।

—কি? বিয়ের প্রস্তাব করতে চান—এই তো?

বিলম্বিত প্রতীক্ষায় আর থাকতে পারেন না মিস অণিমা ঘোষ, এই সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষার শেষে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ—খুসীতে উপচে পড়ে ছোকরা—আপনার ভাইঝি ঠিকই বলেছিল যে, "পিসিমা কক্খনো অমত করবেন না—" মিনাকে—মানে আপনার ভাইঝিকে আমি—মানে তার সঙ্গে আমার—।

—থাক্ মানে—ব'লে বেঁটে ছাতাটি তুলে নিয়ে—(না, মেরে দিলেন না) গট্ গট্ করে চলে যান মিস ঘোষ, ভ্যানিটিব্যাগটি ভুলে ফেলে রেখে।

[১৩৫৩]

সভ্যতার সংকট

চায়ের টেবিলে ঝড় উঠলো। রমা দজ্জাল মেয়ে নয়, বরং ভালোমানুষই বলা যায়—তবু এক-আধ দিন এমন হয়। কারণটা খবরের কাগজ।

জানালা দিয়ে 'টুক্' করে 'অমৃতবাজার'খানা পড়লেই রমাতে আর আমাতে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। রমা চায় কাগজের প্রথম ভাঁজ খুলবে ও, অথচ আমারও চাহিদা একই। একই জিনিস দুইজনের কাম্য হ'লে সাম্য থাকে না, এটা কে না জানে?

বলতে পারেন—যেহেতু আমি পুরুষ, অতএব শিভাল্‌রি জ্ঞান থাকার প্রয়োজন আমারই, কিন্তু ভাবুন—বর্তমান দিনে সকাল বেলা সংবাদপত্র খুলে কলকাতার কোন্ কোন্ রাস্তায় কতো ক'টা করে 'কারফিউ' আদেশ বলবৎ আছে এবং গত কালকের আহত ও নিহতর সংখ্যা কি, সেটা না দেখেই যদি কেউ 'চিত্রায়' কি চলছে, 'রূপবাণীর' পুরনো ছবিটা উঠে গেল কিনা, 'পূর্ণ' আর 'বিজলীতে' নতুন কি আসছে ইত্যাদি তথ্যানুসন্ধান করতে বসে, কতোক্ষণ শিভাল্‌রি দেখানো যায়? কতোদিন?

সংবাদপত্রের ভিতর থেকে কেবলমাত্র এই সংবাদগুলি চয়ন করে নেয় রমা। শহর এবং শহরতলির সর্বত্র কি কি সিনেমা হাউস আছে, কোন্‌দিন কোথায় কি কি ছবি দেখানো হচ্ছে, সব রমার নখদর্পণে।

অথচ মজা এই, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ক'বার বা ক'টা ছবি দেখেছে সে, বোধ হয় আঙুল গুণেই বলা যায়।

ঝড় ওঠার কারণটাও এই।

একে তো আমার সময়ের একান্ত অভাব, তার ওপর সিনেমা দেখাটাকে আমি সময়ের চরম অপব্যবহার বলে মনে করি।—কি নিজের, কি অপরের।...তা' ছাড়াও আবার অপরাধ স্বীকার করছি—'তুতো ঠাকুরপো' বা 'পাতানো দিদির' বরের সঙ্গে যাওয়াটা আমার রীতিমত অপছন্দ।

কাজেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায় কি রমার!

ঘোল এক আধ দিন ঘুলিয়ে ওঠে।...একটা ভালো ছবি নাকের সামনে দিয়ে সপ্তাহের পর

সপ্তাহ কাটিয়ে, হয়তো বা জয়ন্তী-উৎসব পর্যন্ত সেরে, যখন হঠাৎ একদিন কেটে পড়ে, সেইদিনই খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে বিচলিত হয়ে ওঠে রমা। অনেক অভিযোগ অনুযোগ, হতাশ বেদনা উজাড় করে রমা শেষ মন্তব্য কবে—ছ'মাসে একদিন স্ত্রীকে নিয়ে সামান্য দু'ঘণ্টা সিনেমা দেখিয়ে আনার মতো সময়েরও যার অভাব, সে আবার বিয়ে করে কোন্ লজ্জায়? এগারো বছর আগের সেই নিদারুণ দুর্ঘটনাটি স্মরণ করে কে যে বেশি অনুতপ্ত হই কে জানে, তবু আমিই অনুতপ্তের ভান দেখাই।

অনুতাপের প্রমাণ দিতে সিনেমার টিকিট কেটে আনি।

আজও তাই গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার!

সদর দরজার কাছ থেকে জিনিস ছড়ানো—ট্রাঙ্ক আর সুটকেস, বাক্স আর বিছানা, কুঁজো আর হোল্ডঅলে পা ফেলবার জো নেই।

তারকদা এসেছেন। একলা নয় সস্ত্রীক—সপুত্রকন্যা। অপ্রত্যাশিত এই আসা।

শুনলাম তারকদার নিজের কর্মস্থল এবং তাঁর শ্বশুরের কর্মস্থল দৈবক্রমে এমন বিপরীতমুখী হয়ে উঠেছে যে কোনো প্রকারেই একলক্ষ্যে একদমে যাওয়া চলে না। কাজেই কলকাতায় এই ব্রেকজার্নি। দশদিনের ছুটিতে বৌকে বাপের-বাড়ি রেখে আসতে চলেছেন তারকদা।

শুনে আমিও হৈ-হৈ কারে উঠলাম—বলো কি, দশদিন ছুটি? আর বলছো কিনা কাল যাবে? অসম্ভব! যেতে দিলাম আর কি!

বাল্যে বহুদৃষ্ট এবং যৌবনে বহুদিন অ-দৃষ্ট মামাতো দাদাকে নিজের বাড়িতে পেয়ে এটুকু আগ্রহ না দেখালে চলে? অবশ্য তাঁর লটবহর আর সেনাবাহিনীর বহর দেখে আগ্রহটা যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল এমন নয়, কিন্তু করা যায় কি?

মফঃস্বলি বোকামির বশে আমার সৌজন্যটুকু নির্জলা মনে করে তারকদা আমার পিঠ ঠুকে দিয়ে অমায়িক হাসি হেসে বলেন—জানি তুই শুনলে রসাতল করবি, ছাড়বি না।...কেমন গো বলিনি?...উনি বলছিলেন—ওঁর পিত্রালয়ে ক'টা দিন থেকে আসতে, বুঝলি মণ্টু? আমি বললাম—মণ্টুর বাড়ি উঠলে তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার দিনটাও হাতে থাকে কি না দ্যাখো।

হা হা করে হেসে ওঠেন তারকদা।

আমিও—মানে আমাকেও হাসতে হয়।

তিনটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে একুনে এই ছ'টি।

ছোটটি ঠিক দস্যিবৃত্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি, বড়টি অপেক্ষাকৃত সভ্য। বাকি চারটি? তারা যে কী চীজ্ আমি এই একমিনিটেই বুঝে ফেলি। আমার এই নিঃসন্তান সংসারে এক মুহূর্তে যে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয় সে আপনাদের ধারণার বাইরে।

চারটি চৌকস ছেলেমেয়ের 'চাল্লি', আর তার সঙ্গে তারক বৌদির বাক্যস্রোত—ওমা কী করলি? তেলের বোতল ভাঙলি? কী কাণ্ড বাবা!...ঠাকুরপো, তোমরা কী অসাবধান ভাই? এতো নিচু শেলফে তেলের বোতল, শেভিং সেট রেখেছো? রাখ্ শিগগির। ধন্যি বলি রমা তোমাদের সাহসকে! এইখানে এতো হাতের কাছে ছুরি?...ঝড় বইতে থাকে।

আমাদের বাড়ীতে অবশ্য ওই রকমই ব্যবস্থা। রমার ভয়ে তেলের বোতল উঁচু তাকে তুলে রাখা উচিত কি না, অথবা আমার ভয়ে ছুরি আর ব্লেড্ ড্রয়ারে লুকানো উচিত কি না, সে প্রশ্ন করবার ফুরসৎই পাই না...ততক্ষণে বৌদি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন।

তারকদার 'অতাত' শরীর। তাঁর কাছে এগুলো যে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনামাত্র, মুখ দেখলেই বোঝা যায়।...সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমার সঙ্গে মনের আনন্দে গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে নিস্পৃহভাবে হলেন—এই বাচ্চু, আলমারীর মাথায় উঠছিস্ যে? ঠ্যাঙ্ ভাঙ্‌বি?...লতি, সোরাইয়ের জলটা সব ফেললি? দেখ, বিছানাটা ভেজেনি তো?...বাবলু কি হচ্ছে? নাঃ, তোরা আর কাকার কাছে এক ঘণ্টাও সভ্যতা দেখাতে পারলি না! দেখিস কাকা নিন্দে করবে!

—না না, সে কি? ছেলেপিলে দুরন্ত হবে বৈকি! দুরন্ত হওয়াই তো ভালো—বলে মাখনের কৌটায় খাবল বসানো হাত-ভর্তি মাখন সমেত ছেলেটাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিই।...তারকদা বিগলিত স্নেহে বলেন—তা যা বলেছিস, ম্যাদামাবা ছেলে আমার দু'চক্ষের বিষ!

অনেক চেষ্টায় বমাকে একবাব নির্জনে পেয়ে বলি—সিনেমার টিকিট দু'টোর কি গতি হবে?

কুটনোবাটনা, চা-জলখাবারের বিশাল অরণ্য থেকে মুখ তুলে রমা জ্বলন্ত স্বরে বলে—আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাওগে যাও!

নগদ আড়াই টাকার মাল! তা'ছাড়া রমার এই বিপন্ন মূর্তি দেখে মনটা কেমন করে ওঠে। সানুনয়ে বলি—মানে—খুবই বোকার মতো হচ্ছে কথাটা বুঝেও বলি—এদিকের খানিকটা গুছিয়ে রেখে যাওয়া যায় না? এসে না হয় রান্না করবে?

—ধাষ্টামো করো না, যাও।

এতো সংক্ষিপ্ত ও এমন প্রাঞ্জল ভাষা রমা বড় একটা ব্যবহার করে না। কিন্তু এখন সময়টা সংক্ষিপ্ত, কে কোন দিক থেকে শুনে ফেলে এই ভয়। তা'ছাড়া—মেজাজটাও ক্ষিপ্ত। কাজেই ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ এই বাণীটি প্রয়োগ করেন ভদ্রমহিলা।

—বাঃ, ঠাকুরপো বেশ—বৌদির কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে পিছনে—অমনি ভাঁড়ার-ঘরে এসে ঢুকেছো? বাবাঃ, একদণ্ড আর অদর্শন সয় না!

—তা' আপনাদেরই বা কি কম?

এটুকু পরিহাস করতেই হয়। না করলে চলে না। পরিহাসের উত্তরে হাঁড়িমুখ করে থাকা সভ্যতা-সঙ্গত নয়।

—আমাদের? তারক-বৌদি রুমাল দিয়ে মেঝের একাংশ ঝেড়ে নিয়ে বসে পড়ে সহাস্যে বলেন—আমাদের কথা আর বোলো না, চব্বিশ ঘণ্টা ঝগড়া!

এমন সুরে বলেন যার মানে—জীবনেও কোনদিন উঁচু কথাটি হয় না তাঁদের।

এদিকে আমি কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণি।

রমার ভাঁড়ারে কি আছে কি নেই, রমাই জানে। যা নেই হয়তো আমাকে জানাতো, তারপর সৌষ্ঠব করে ওদের সামনে ধরে দিতো চা-জলখাবারের থালা। তারপর আয়োজন সুরু করতো রান্নাবান্নার। মাঝখানে ইনি বসলেন!

কেটলির বদলে রমা যে একটা সস্‌প্যানে চায়ের জল তৈরী করে—এ সত্য এতো শিগগির প্রকাশ হয়ে যাওয়াটা রমা পছন্দ করবে কি?...কিছু বলবে না, মুখখানি আষাঢ়ের আকাশ করে রেখে দেবে হয়তো!

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে রমা হেসে ওঠে—তা' আর নয়? বট্‌ঠাকুরকে দেখলে আর কেউ বিশ্বাস করবে না যে ওঁর সঙ্গে আবার ঝগড়া হয় মানুষের। তা'হলে আপনি পাড়াকুঁদুলি।

—দেখছো ঠাকুরপো, তোমার বৌ আমাকে কি যা-তা বলছে?

—বলবো না কেন? আপনি আমার ভাসুরের নিন্দে করছেন কেন? সত্যি দিদি, আপনাদের দেখে যে কী আনন্দ হল! কখনো তো দেখিনি, সেই যা বিয়ের সময়। এতো ইচ্ছে করতো দেখতে! এবার থেকে কিন্তু আসতে হবে মাঝে মাঝে।

—এলেই হয়। আমারও ইচ্ছে হয় রে! তা'ছাড়া কলকাতার মুখ দেখিনি কতোদিন তার ঠিক নেই, কিন্তু ওই যে মানুষ! আঠারো মাসে বছর! 'যাচ্ছি যাবো' করতে করতে যুগ উল্টে যায়। নেহাৎ এবার মা বার বার লিখছিলেন তাই।...কি রে ডলি? কি? খোকা কাণ্ড করেছে?...কাকার খাটে?...ওমা তোরা কি বোকা রে, কাকার খাটে ওকে শোয়াতে আছে? এই সন্ধ্যেবেলা বিছানা ভিজিয়ে দিল?...দেখছিস্ তো রমা? তুই বাপু আছিস বেশ!

অবশ্য এমন সুরে বলেন, যার মানে দাঁড়ায় 'আহা মরে যাই, কী দুঃখী তুই!'

কিন্তু রমার এ ভাবের অর্থ কি?

আমার ওপর প্রতিহিংসা? কিন্তু প্রতিহিংসার বশে এত অমায়িক আর প্রসন্নতার ভান দেখাতে পারে মানুষে?

—যান দিদি গা'টা ধুয়ে আসুন, ট্রেনের গরমে সারা হয়ে যাচ্ছেন। ছেলেদেরও মুখটুখ ধুয়ে দেবেন।

অর্থাৎ জলখাওয়ার ওয়ার্নিং!

—মরে যাই, ওদের আবার মুখ ধোওয়া! চব্বিশ ঘণ্টা খাচ্ছে। আমি যাই। এসব কাপড়-চোপড় কোথায় ছেড়ে রাখবো ভাই? গোসলখানার কোণে?

আবার প্রমাদ গণি। কাপড়-চোপড় ছেড়ে রাখবার প্রথা আমাদের বাড়িতে নেই। একটি ঠিকে-ঝি, বাসন মাজা ঘর ধোওয়া করেই মনে করে মাথা কিনে নিচ্ছে, কাপড় কাচতে বললে তো তখুনি কাজ ছেড়ে দেবে।

রমা কিন্তু ইতস্ততঃ করে না, স্বচ্ছন্দে বলে—হ্যাঁ দিদি, তাই রাখুনগে। শিগগির আসবেন কিন্তু, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—আমার শিগগির? তা হ'লেই হয়েছে! বৌদি হি হি করে হেসে ওঠেন—এক ঘণ্টার কম আমার গা ধোওয়া হয় না। কি ক'রে যে লোকের শিগগির হয়!...হ্যাঁ, গোসলখানায় সাবান আছে তো? নতুন সাবান? আমি আবার ঘষা সাবান মাখতে পারিনে বাপু!

—সাবান?...ও! এই শুনছো, আমার টেবিলের টানায় সাবান আছে, বার করে দাও তো দিদিকে। সোপকেসে আছে।

এই সোপকেসের ইতিহাস জানি।

পছন্দসই এই সৌখিন সোপকেসটিতে একখানি ভালো সাবান ভরে রাখা রমার সখ। সর্বদা কিছু আর দামী সাবান ব্যবহার করতে পারি না আমরা। একখানি দামী সাবান সোপকেসে আছে—সেই সাবানটি।

বৌদি চলে যেতেই রমা কুইনিন-গেলা স্বরে বলে—ঘষা সাবান মাখতে পারেন না! লোকে নতুন সাবান কিনে চৌবাচ্চার পাড়ে রেখে এসেছে ওঁর জন্যে! ধন্যবাদ আক্কেলকে! একখানা সাবান মানুষ নিজে বার করে না?

আমি বললাম—আর তুমি যে কাপড় ছেড়ে রাখবার কথা বললে, তোমার নন্দর-মা কাল জবাব দিয়ে বসবে না তো?

—নন্দর মা! তা' আর নয়! আমাকেই কাচতে হবে ভোরবেলা উঠে। আশ্বাস দিলেন কি

না একঘণ্টা সময় চান কবতে লাগে। কি যে করবো আমি! তুমি তো দিব্যি দু'-পাঁচ দিনের নেমন্তন্ন করে রাখলে। তোমার আর কি?

আমার যে 'কিছুই' নয় তাই বা বলি কি করে? কিন্তু রমা কি গ্রাহ্য করবে? পকেটের দুরবস্থার কথা কি বৌরা বিশ্বাস করে? তাই ম্লানভাবে বলি—কি আর করি বলো, না বললেও তো ভাল দেখায় না।...কিন্তু টিকিটটাব কি হবে তাই ভাবছি।

—এই তো আগুন জ্বলছে উনুনে, দাও না ফেলে! অতো ভাবনার কি আছে?

চা-পর্ব সমাধা হ'তেই তাবকদা বললেন—চ'ল একটু বেড়িয়ে আসি।

আবার প্রমাদ!

এখন সখ করে বেড়াতে বেরোলে রমা রক্ষে বাখবে? আর সত্যি এতোগুলি মুখ হঠাৎ বেড়ে গেলে তার ব্যবস্থা আছে তো?

মাছ চাই, আলু চাই, পান চাই— মাছ না পেলে ডিম চাই! তা'ছাড়া হয়তো ঠিক আজকেই তেলের টিন খালি, ঘিযেব জার পেন্সন চাইছে—এরকম ক্ষেত্রে রমার মাথায় পাষাণভার চাপিয়ে বেড়াতে যাওয়া?

ইতস্ততঃ কবে বলি—এই কাল থেকে ট্রেনজার্নি, আবার বেড়াতে যাওয়া কেন? একটু বিশ্রাম কবো না?

—আরে দূব—তাবকদা হেসে ওঠেন—ওসব বিশ্রাম-টিশ্রাম তোদের কলকাতার বাবুদের জন্যে! আমরা জঙ্গলের লোক, না হাঁটলে আমাদেব ক্ষিদে হয় না।

ক্ষিধে না হওয়ার সংবাদ পেযেও যদি বেড়ানোর বিরুদ্ধে ওকালতি কবি, সেটার উল্টো মানে হবে না তো? মরিয়া হযে বলি—তবে চলো—

সঙ্গে সঙ্গে বৌদি এসে উদ্ধাব কবেন, 'ওগো শুনছো? বেবিও না। সিনেমা দেখে আসি চলো।'

—সিনেমা?—তাবকদা বলেন—আবে দূর, আবার এখন এক মুঠো টাকা খরচ কবে সিনেমা! এই মেযেদের, বুঝলি মন্টু, সিনেমা হচ্ছে ইষ্টমন্দির। সিনেমায় যাবার আর বৈকুণ্ঠে যাবার দু'টো টিকিট যদি দাও ওদের, কোনটা বেছে নেবে বল দিকি? ওই সিনেমা।

—বেশ তাইত! বৌদি লেশমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেন—এতে তোমাব পয়সা লাগবে না। ঠাকুরপোরা যাবে বলে কিনেছিল—রমা বলছে ওর ভীষণ মাথা ধরেছে, যেতে পারবে না। কেন ফেলা যাবে পয়সার জিনিস? আর আমাদের তো কলকাতায় এসে থিয়েটার সিনেমা দেখার কথা রয়েছে।

'কথা রয়েছে'! সিনেমা থিয়েটার দেখার কথা রয়েছে! অথচ এসেই বললেন—'কাল যাবো'। ওটা বোধ করি লাঠি ডুবিয়ে জল মেপে দেখা।

নিতান্তই কড়ির জিনিস ফেলা যাবার ভয়ে তারকদা রাজি হন।

জামাজুতো প'রে প্রস্তুত হয়েছেন, হঠাৎ—ঘরের মধ্যে বোমা পড়লো। শুধু বোমা? সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন নয়? কাঁচের আলমারীর মাথা থেকে কার্নিশ ভেঙে পড়ে গেছে লতি। রমার পুতুলের আলমারীর।

লতির হাত পা ভাঙলো কি না জানি না, তবে হাত পা নাক মুখ যাদের ভাঙলো তাদের দিকে চেয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। শব্দ শুনে রমা রান্নাঘর থেকে ছুটে আসবে এটা বিচিত্র নয়। ছুটে এসেছে সে। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আজন্ম সঞ্চিত এই পুতুলগুলির

ওপর রমার যা বাৎসল্যস্নেহ তা' তো আমার অজানা নয়!

—ওমা, কি কাণ্ড! লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! ভাঙলি তো পুতুলগুলো?—বৌদি ঘোরানো শাড়ির আঁচলটা কোমরে টান করে জড়িয়ে মেয়েব দিকে তেড়ে যান—মেয়ে তো নয়, দস্যি! একরাশ পুতুল সব শেষ করলে গো! কি পাহাড়ে মেয়ে বাবা!

এতক্ষণে মেয়ের গালে ঠাঁই করে একটা চড় পড়ে।

আর সঙ্গে সঙ্গে কলের পুতুলের মতো এগিয়ে যায় রমা লতির দিকে। মার কবল থেকে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে অবহেলাভরে বলে—দিদির সব বাড়াবাড়ি! ভারি তো দুটো কাঁচের পুতুল! তার জন্যে আবার মেয়েকে মারা! আমার যেন এখনো পুতুল খেলবার বয়েস আছে?...হ্যাঁরে বেশি লাগেনি তো? ওমা এই যে ছড়ে গেছে, কপালটা ঢিপি হয়ে উঠেছে! মরে যাই! আয় আইডিন লাগিয়ে দিই।...দিদি আপনারা বেরিয়ে পড়ুন, সময় হয়ে গেছে। অন্ধকারে হোঁচোট খেতে খেতে চেয়ার খুঁজে বেড়ানো বাপু আমার দু'চক্ষের বিষ।

তারক-দম্পতি চলে যান। কিন্তু গলা খুলে প্রাণের কথা বলবার পথ খোলা থাকে না। বড় মেয়েটি বছর বারো, লতিও দশের কম নয়। বাঙলা কথার মানে বুঝতে পারবে না এমন মনে করবার হেতু নেই।

যা বলাবলি গলা নামিয়ে।—বাজার যাবে, না সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে?

চমকে উঠে বলি—কি চাই?

কি না চাই?...মাছ, তরকারি, আদা, কাঁচালঙ্কা, দই, মিষ্টি, সরষের তেল, পাঁচফোড়ন। কুঁড়েমি করে দেরি করবে না। এখুনি এনে দিতে পার তো ভালো, নইলে দেখে নেব তোমায়।

—আর এই যে কাঁচ ভাঙা পড়ে রইল—

—থাক্ না, তোমার কি? তোমায় যা বলছি করো গে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, রোসনা।...আচ্ছা ওঁদের খামোকা সিনেমা যেতে বললে যে?

—কি করবো? এখানে এসেছেন, তোমার তো ওদের ভাল করে খাওয়ানো দাওয়ানো, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখানো উচিত। এ তবু সুবিধের হোলো।

—তা হলে থিয়েটারটা তোলা থাকলো? তুমি অতো বাড়াবাড়ি কোরো না রমা।

তা' কি করবো। সাতজন্মে আসেন না—শেষে পরে তুমিই হয়তো বলবে—'আর একটু যত্ন করা উচিত ছিল, তেমন হলো না', হ্যানো ত্যানো।

—আমার তো ভারি! নেহাৎ ছেলেবেলায় মামারবাড়ির আদরযত্ন মনে করেই একটু বলা। কিন্তু যা শয়তানের ধাড়ি ছেলেপুলে, চার পাঁচ দিন থাকলে তো পাগল হয়ে যাবো।

—পাগল শুধু? আমার তো মনে হচ্ছে হার্টফেল না করি।

বাজার থেকে আসার খানিক পরে ছোট ছেলেটা এমন কান্না সুরু করলো যে আমারই হার্টফেল হবার যোগাড়। অনেকক্ষণ পরে 'হিমসিমের' চরম অবস্থায় পৌঁছে বাধ্য হয়ে রমার শরনাপন্ন হ'তে হল। বললাম—কি করবে? একে একটু দুধ-টুধ খাওয়াবে?

রমা রন্ধন-সমুদ্র থেকে মুখ তুলে বলে—ও কি খায়, কি ক'রে জানবো?

—ছোটছেলে আবার কি খাবে—দুধ ছাড়া?

—আহা! ফুড্ খেতে পারে না যেন? বড়ো মেয়েটাকে জিগ্যেস করো তবে।

—সেটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

—ভালো। বড়োটি ঘুমিয়েছেন, পাহাড় ক'টি জেগে আছেন তো?...ওরে বাবা, দিচ্ছি দুধ খাইয়ে, রোসো।

সানাই তখন জগঝম্পয় পরিণত হযেছে।

অনভ্যস্ত হাতে চামচে করে দুধ খাওয়াতে গিযে মাছের ঝাল পুড়ে গেল রমার। অতঃপর এলেন তারকদা'রা।

তারক বৌদি সবিস্ময়ে বলেন—ওমা কেঁদেছিল বুঝি? কী আশ্চর্য্য! ও তো এতো শান্ত, ধারণা করতে পারবে না তুমি। খালি ঘুমোয়।...বোধ হয় গরম হয়েছে, যা চাপা ঘর তোমাদের! কি করে যে ফ্যান্ না নিয়ে থাকতে পারো! উঃ! খোকার আবার এমন ধাত, সারারাত মাথার কাছে টেবিল ফ্যান্ ঘোরা চাই।...কি করলে? রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বেড়ালে?

বাড়ির অখ্যাতিতে অপ্রস্তুত আমি তাড়াতাড়ি বলি—না না, গরম নয়, বেজায় ক্ষিধে পেয়েছিল। দুধ খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো।

—দুধ খেয়ে? বলো কি? কী দুধ খাওয়ালে? গয়লার দুধ?

—তা ছাড়া? তবে সত্যি গরুর দুধ...মানে, দুয়ে দিয়ে যায় সামনে।

—ও তোমাদের সামনে দোয়ার কথা বলো না, কলকাতার দুধের কথা আর জানতে বাকি নেই আমার। ছোট বাচ্চাব পক্ষে সাক্ষাৎ বিষ!...কি হবে, হ্যাঁগো?

তারকদা বলেন—কি আর হবে! একটু নাক্স খাইয়ে দিও।

ভাবলাম একটু মেজাজ দেখিয়ে বলি, তা'হলে আপনাদের বলে যাওয়া উচিত ছিল কি খাওয়ানো হবে। কিন্তু বললাম না। দুধের গ্লানিতেই অপরাধী ভাব দেখিয়ে বসে থাকলাম। যতোই হোক অতিথি! ভদ্রতা-সভ্যতা একটা কথা আছে তো?

তারপর—খাওয়া শোয়ার কাণ্ড!

সে এক মহাভারত।

"থলির ভিতর হাতী পোরা" শুনেছেন? যদি না শুনে থাকেন, অনুমান করুন।...আমাদের যুগল জীবনযাত্রার মতো সংসারে মাত্র আর আটজনকে স্থান দেওয়া? বিছানাটিছানা খুলতে চাইলেন না বৌদি। ক'দিন পরেই তো আবার বাঁধতে হবে।...ওঁর ছেলেমেয়েরা আবার বড়ো বড়ো থালা না হলে খায় না। ছোট ছোট লোকদের বড়ো বড়ো থালায় খাইয়ে আবার থালা মেজে নিয়ে তবে সত্যিকার বড়ো থালার দাবিদারদের খেতে দিতে হলো!

—এঃ রাতে ভাত! আরে আমরা যে পশ্চিমের মানুষ সে বুঝি খেয়াল ছিল না?

তারকদার মন্তব্যে অপ্রস্তুত আমি লজ্জায় লাল হয়ে বলি—খেয়াল থাকবে না কেন? রমার শরীরটা তেমন—ইয়ে—একা 'মাথা, বেলা' ক'রে নিয়ে—

—তা বেশ বেশ! যাক্ নতুনত্ব হল একদিন, কি বল গো?

তারকদার 'ওগো' সহাস্যে বলেন—আমার তো বাপু ভাতই পছন্দ, ভালই খাবো।

মনে হ'ল, সস্ত্রীক আমরা ধন্য হয়ে গেলাম।

পরদিন সকাল থেকে কি হ'ল লিখবো? অতো কথা কি এই ক্ষুদ্র পুঁথিতে লেখা সম্ভব? "ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র" দেখবার অভিজ্ঞতা হয়তো সকলের নেই, কিন্তু "ষোলোই আগষ্ট" প্রমত্ত পার্কসার্কাস, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলুটোলা, রাজাবাজার দেখেছেন নিশ্চয়ই? সবটা না হোক, কিছু

কিছু? ভুলে গেছেন কি? একেবারে ভুলে গিয়ে না থাকলে তো—হয়তো আমার সংসারের অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারবেন।

সাতদিন, না সাতবছর! এর মধ্যে আরো একদিন সাতজনের সিনেমার টিকিট, আর অপর একদিন দু'জনের থিয়েটার।...নইলে ভালো দেখাবে কেন?

সুযোগ পেলেই আমি রমাকে বলি—রমা, আর তো সহ্য হচ্ছে না, কি করা যায়?

সুবিধে পেলেই রমা আমাকে বলে—দেখো সাতদিন যে ফুরোচ্ছে না—যা হয় কিছু বলো ওদের!

আমার অফিসের হঠাৎ বদলির খবর, রমার মার হঠাৎ মারাত্মক অসুখ শুনে বাপের বাড়ি চলে যাওয়া, পাড়ায় কলেরার প্রাদুর্ভাব, শহরে ডাকাতের আমদানি প্রভৃতি কতো কি-ই ভাবলাম ক'দিনে। কিন্তু বলে ফেলতে পারলাম কই?

নৈতিক সাহসের অভাব!

তার বদলে যখন-তখন তাই তারকদাকে বলি—কী অন্যায় করেছ তারকদা, মাত্র এই কদিন ছুটি নিয়ে! এবার যখন আসবে, মাসখানেক ছুটি নিয়ে এসো কিন্তু বলে রাখছি।

তারকদা হেসে বললেন—তা সত্যি, অন্ততঃ মাসখানেক না থাকলে সব হয়ও না। কিছু তো দেখাই হ'ল না কলকাতার!

রমা বৌদিকে বলে—কী আনন্দেই যে কটা দিন কাটলো দিদি! একলাটি মুখ বুজে থাকি, সংসার করি না ভূতের ব্যাগার খাটি! আপনারা রয়েছেন, ছেলে-পুলে খেলে বেড়াচ্ছে, দেখে যেন চোখ জুড়োচ্ছে!

বৌদিদি হেসে বলেন—সে কথা মিথ্যে নয়, বাচ্ছাদের হাসি-খুসি গোলমাল নইলে বাড়ি মানায়?

অবশেষে যাত্রাকাল এলো।

বিষণ্ন মুখে বিদায় দিয়ে তারকদার হাত ধরে বলে দিলাম—ভুলো না কিন্তু, পুজোর সময় আসা চাই। এক মাসের ছুটিতে।

রমা বৌদিকে আলতা পরিয়ে দিতে দিতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে—শ্বশুরবাড়ি এসে পর্যন্ত একলা। আপনি যদি থাকতেন দিদি, কি যে ভালো লাগতো! আবার আসবেন কিন্তু, কিছুদিন থাকতে হবে।

—আচ্ছা! মণ্টু, জয় হিন্দ্!

—জয় হিন্দ্! আবার এসো তারকদা!

—দুর্গা, দুর্গা! চললাম রমা!

—আবার আসবেন দিদি! দুর্গা, দুর্গা!

[১৩৫৪]

একরাত্রি

"সদ্যফোটা এই জীবনের দলগুলি, দু'হাত ভরে দিলাম হে নাথ তোমার পায়ে অঞ্জলি, সদ্যফোটা

এই জীবনের—" গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে গাইতে আসছে অশোক।

মনের ভেতরে আনাগোনা করছে লাইন দুটো সুরের ঝঙ্কার বয়ে।

গলাখুলে গাইবে সে সাহস নেই। কস্মিনকালে চাষ নেই—

খুশির খেয়ালে হঠাৎ একদিন গলা খুলে গেয়ে উঠতে চাইলেই কণ্ঠে এসে অধিষ্ঠান হবেন—সুরসরস্বতী এতো কাঁচামেয়ে নয়, কাজেই দৈবাৎ একদিন প্রাণে খুশির জোয়ার এলে আক্ষেপ হয়, কেন পারছি না। কেন পারছি না মনোবিহারিণীকে বন্দিনী করতে কণ্ঠে!

নন্দিতার কণ্ঠে কি অনায়াস সুষমায় খেলা করে সুরেরা! স্বরের কোমলত্ব আর সুরের কারুকার্য কোনটাকে প্রাধান্য দেবে অশোক নন্দিতার গানে? সে জানে, ওসব কিছুই ভালো বোঝে না সে, তবু আজ যেন মদের নেশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে এই গান।

ফিরে ফিরে দুবার করে যা শোনাল তাকে নন্দিতা এইমাত্র।

শুধু গানের ছন্দে নয়, নন্দিতার সমস্ত দেহছন্দে ফুটে উঠেছে এই পরম নিবেদনের ভাষা।—"দু'হাত ভরে দিলাম হে নাথ তোমার পায়ে অঞ্জলি..." অশোক কে? অশোক কি? অশোক কতো তুচ্ছ? অশোকের জন্যে রচিত হয়েছে এই সুষমার নৈবেদ্য? এ কি সত্যি? এ কি সম্ভব?

হয়তো সম্ভব।

কতো অসম্ভব ঘটনাই তো ঘটছে প্রতিনিয়ত।

যে অশোক পায়ের নীচে পা রাখবার মতো একছটাক জমি পায়নি খুঁজে, আশীটাকার স্কুল মাস্টারীটা নেবার কথাও বার বার ভেবেছে, স্বর্গের একটুকরোর মতো সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে নন্দিতাকে চিন্তাজগত থেকে, সেই অশোক আজ দাঁড়াবার জন্যে পেয়ে গেছে এমন খানিকটা মজবুত জমি যেখানে স্বর্গের টুকরোটুকুকে এনে প্রতিষ্ঠা করাও শক্ত নয়।

নন্দিতার আগ্রহকে আজ আর ভীরুর মতো এড়িয়ে যেতে চায়নি অশোক, দিয়েছে প্রশ্রয়।...হয়তো নন্দিতার কণ্ঠেও তাই স্তবগান এতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আজ।...অশোকের ঔদাসীন্যে যা স্তব্ধ হয়ে থাকতো।...

মর্ত্যের মাটিতে যে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করবে তারই কল্পিত ছবি অধীর করে তোলে অশোককে।...সবুর সইছে না—নন্দিতাকে রেখে চলে এলো কি করে তাই ভাবছে অস্থির হয়ে।...মাঝখানের এই নীরেট দিনগুলো হাত দিয়ে ঠেলে দেওয়া যায় না?...

আশ্চর্য! এখনো—আজকের যুগেও মানুষকে চলতে হবে পাঁজীর হিসাব মেনে?

পঞ্চাশ মিনিটের পথ...পঞ্চাশ বছরের ভাবনা এগিয়ে যায় ওই সময়টুকুর মধ্যে।...বাড়ী যখন পৌঁছলো—মনে হল যেন কত যুগ পরে এসে ঢুকছে।...মনের মধ্যে রয়েছে সেই সুদূরের ব্যবধান।

পরিচিত পরিস্থিতিটা ঝাপসা...যোগসূত্রটা অবাস্তব।

—'কাকামণি বিকু?' বলে বাবলু খেলা ফেলে ছুটে এসেছে অশোককে দেখে। পকেট পর্যন্ত হাত পৌঁছয় না—পকেটটাকেই টেনে নামাতে চায় পাঞ্জাবির কোণ ধরে। কিন্তু ওর আবেদন কি পৌঁছেছে অশোকের মনের ভেতর পর্যন্ত? 'বিকু' নামক পরিভাষাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে? অভ্যাসের বশে ছেলেটাকে একটু আদর করে হেসে চলে যায়। বিস্কুট আনা সম্বন্ধে নিজের মারাত্মক ভ্রমের প্রতিক্রিয়াটা চেয়ে দেখবার কথা মনে পড়ে না, কানে ঢোকে না ছেলেকে মধ্যস্থ করে তার মাতৃদেবীর অতি মধুর শ্লেষবাণী।

সরাসরি নিজের ঘরে গিয়ে হাজির হবে এইটাই শুধু খেয়াল আছে।

ড্রয়ার থেকে বার করবে নন্দিতার ছোট্ট ফটোখানা।...দেখবে—ওর আজকের মুখের সঙ্গে কোথায় তফাৎ আছে অনেকদিন আগের সহজ স্বাভাবিক মুখের।

তিনতলায় অশোকের ঘর।

ঘর নয়—ঘরের সংক্ষিপ্ত নমুনা।

তবু একক। বড়ো সংসারে ওই ঢের—মস্ত পাওনা।...বিছানায় শুয়ে চোখ মেললে চোখে পড়ে খোলা আকাশ। আকাশের তারারা ঝিক্‌মিক্ করে চেয়ে দেখে ওর জানলা দিয়ে...গায়ে এসে পড়ে জ্যোৎস্নার ফালি।...এতোবড়ো বাড়ীখানার কোনো ঘরের নেই এই অপূর্ব সম্পদ।...এ ঘরের আশপাশে জমা হয়ে ওঠেনি সংসারের কাঠ খড় কেরাসিনের জঞ্জাল, তাই ভীড়ও নেই।

ছোট্ট ঘরের লাগোয়া মস্ত ছাদটার এক কোণে ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে তারাভরা আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে এমন কল্পনাও করা চলে—নন্দিতা রয়েছে কাছে। ওর ইজিচেয়ারের কোল ঘেঁষে মাদুর বিছিয়ে আনত মুখে বসেছে সেতার নিয়ে।

একতলা আর দোতলা মিলিয়ে যে সংসার জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসেছে মানুষের বুকে, এখানে তার ভার এসে পৌঁছয় না।

দোতলার সিঁড়িটা অর্ধেক পার হয়েছে, পিছন থেকে জেঠিমা ডাকলেন—শুকো, শোন!

'শুকো'! নিজের নামের এই অপভ্রংশ জ্ঞানাবধি সহ্য করে এসেছে অশোক, আজকেই হঠাৎ শব্দযন্ত্র এমন শক্ পেয়ে বিদ্রোহ করে উঠ্‌তে চাইলো কেন?...চাইলো—কিন্তু প্রতিবাদ করবার মতো ছেলেমানুষী সত্যিই কিছু করলো না—মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে তাকালো শুধু।

জেঠিমা অনাবশ্যক গোপনতায় ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—তিনতলায় আজ আর উঠিস্‌নে তুই, 'ঘুন্টি' শোবে ওঘরে।...ফিসফিসটা অশোকের অরুচিকর। ঘুন্টি যদি শোয়ই, এতো গোপনতার কি আছে?...কিন্তু ঘুন্টিই বা খামোখা তার ঘরে শুতে যাবে কেন সেটাও তো ভাববার কথা!

'ঘুন্টি আসবে'—এমনি একটা কি যেন শুনেছিল সকালবেলা, কিন্তু জেঠতুতো দিদির এক বোকা আহ্লাদী মেয়ে সম্বন্ধে এমন কিছু কৌতূহল নেই অশোকের যে সে এসে কি খাবে—কোথায় শোবে ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করতে বসবে।

শৈশবাবধি বহুবারই তো এসেছে এ বাড়ীতে ঘুন্টি, কই অশোকের ঘরে হানা দেবার কথা তো ওঠেনি কখনো!...হয়তো বিরক্ত নয়, অবাক অবাক কণ্ঠস্বরটা, তবু জেঠিমার কানে বিরক্তই শোনালো।—'ও ঘরে ঘুন্টি কেন?' অশোকের এই মূঢ় প্রশ্নে তাই আজ বলে উঠলেন জেঠিমা—বেওয়ারিশ ঘর আর ক'খানা আছে বাড়ীতে—তাই দেবো?

অর্থাৎ তিনতলার এই ঘরখানাকে বেওয়ারিশ হিসাবেই গন্য করা হয়।

হয়তো অন্যদিকে—গত কালকের দিনেও—কিছুই প্রতিবাদ করতো না অশোক, কিন্তু আজকে ও মানবে না এই অসঙ্গত প্রস্তাব।

—ওঘরে কারুর শুতে-টুতে হবে না—দোতলায় কি হয়েছে? বলে আবার উঠতে সুরু করে—আর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়েন জেঠিমা।

—তখনি জানি তুমি রাজী হবে না।...আজন্ম তো দেখছি—চিনতে বাকী নেই কাউকে! মেজ বৌকে তখন পইপই করে বললাম—বুঝেসুঝে ব্যবস্থা করো মেজ বৌ, ছেলে তোমার সুচাকের নয়—বাহাদুরি করে ব্যবস্থা করলেন, এখন বুঝুন এসে! থাক্, যাচ্ছি আমি, ডেকে দিচ্ছি ঘুন্টিকে, মেয়েদের ঘরে এসে শু'ক গে। প্রমথ বাড়ী চলে যাক, এখনো বাসট্রাম পাবে।

প্রমথ! এতক্ষণে চৈতন্য হয় অশোকের। সম্মানটা ঘুন্টির নয়—প্রমথর। এবার তাহলে ঘুন্টি

একলা আসেনি, বরটাকে আঁচলে বেঁধে এনেছে।

বিয়ে যে হয়েছে, তার প্রমাণ পত্রখানাই নিয়ে এসেছে একেবারে।

কুণ্ঠিত একটু হতেই হয়—না হলেও কুণ্ঠার ভানটা দেখানো দরকার।

—প্রমথ এসেছে? বলতে হয় সে কথা? আমার ঘর তো সেই বিশ্রী অগোছালো—

—গোছানো আর অগোছালো...জেঠিমা অধরোষ্ঠের সাহায্যে কথার চাইতে অনেক বেশী ভাব প্রকাশ করে ফেলেন—পাচ্ছে এই টের। এ সংসারে—কারুর সাধ-আহ্লাদ মানুষ মণিষ্যত্ব দেখাবার জো আছে? এই যে আজ তিনমাস হতে চললো বিয়ে হয়েছে মেয়েটার—আমি দিদিমা—একদিন নাত্নী-নাতজামাইকে আনতে পেরেছি? জানি যে—অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে।...মরণ আমার, তাই আবার রাধানাথকেও মানা করলাম বাড়ী যেতে—বলি সকাল বেলাই চলে যাবে শান্তি, সেই তো নিতে আসতে হবেই, রাতটুকুর জন্যে কেন আর কষ্টভোগা।...তা দেখছি অন্যায়ই করেছি। এ সংসারে আবার কিছু করতে আছে! ছিঃ!

একটিমাত্র 'ছিঃ'র মধ্যে এ সংসারের ওপর ঘৃণা বিরক্তি ধিক্কার সবকিছু ফুটিয়ে তুলে চলে গেলেন জেঠিমা অশোককে হতবাক করে দিয়ে।...আবার রাধানাথও! অর্থাৎ শ্বশুর জামাই দুজনেই আজ এ বাড়ীতে জামাই আদরের আস্বাদ পাবার আশা রাখেন।

গুণে গুণে বারোটা সিঁড়ি নেমে আসে অশোক।...কোথায় শুতে পাবে জানে না, কিন্তু একেবারে না পেলেই বা ক্ষতি কি? বরং ভালোই হয়—পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকবার ছুতো জোটে একটা।...

তা চলবে না—এতটা অনিয়ম বরদাস্ত করবে না কেউ। নীচের তলায় গুড়ের নাগ্‌রির মতো ঠাসাঠাসি করে শুতেই হবে কারুর না কারুর সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত মায়ের ঘরে।

ছোট ভাইবোনের সংখ্যা ঈশ্বর-ইচ্ছায় কম নয়, বিছানাটা ময়লা, ঘরে ভ্যাপসা গন্ধ, ঘরের মাঝখানে দড়ি টাঙিয়ে ভিজে কাঁথা শুকোতে দেওয়া...এই ঘরের একপাশে অপেক্ষাকৃত ফরসা একটা বিছানা পেতে রাখা হয়েছে অশোকের জন্যে। আর কতো বেশী করতে পারে লোকে বাড়ীর ছেলের জন্যে?...করবেই বা কেন?

...নন্দিতাই ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে নাকি?

...স্বর্গটা অবাস্তব?

অনেকক্ষণ অস্বস্তিকর অবস্থার পর এক সময় ঘুম এসে গিয়েছিল হয়তো বা—ভেঙে গেল। ঘরে আলো জ্বালা...ছোট খোকা উঠে বসে পরিত্রাহি চীৎকার করছে। বিছানায় রীতিমত একটা দুষ্কর্ম করে ফেলে মার কাছে খেয়েছে এক প্রবল চড়, কান্নাটা তার চাইতেও জোরালো করে মার অপরাধটা দ্বিগুণ প্রমাণিত করতে চায়।...

খুকী ওঠে...বড় খোকা ওঠে...বীণা ওঠে...বিছানা বালিশ মশারি চাদর নিয়ে এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হতে থাকে...বীণার ঝঙ্কারে অভিমানাহতা মা নিজের এবং অপরাধী পুত্রের একযোগে মৃত্যুকামনা করতে থাকেন...খুকী তারস্বরে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করতে থাকে...দাঁতে দাঁতে চেপে পড়ে থাকে অশোক নিজের বিছানায়।

কিন্তু কতোক্ষণ পারবে? সেই রাত্রে—রোগা ছেলেটার গায়ে যদি পাঁচ বালতি জল ঢালতে সুরু করেন অন্নপূর্ণা?

—মা, ও কি হচ্ছে? আজকেই কি শেষ করে ফেলতে চাও ওকে?

বড় ছেলে হঠাৎ উঠে এসে ধমক দেবে তা বোধ হয় ভাবেন নি অন্নপূর্ণা, কিছুটা থতমত খেয়ে উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বীণার কাছে কি উত্তর নেই? স্পষ্টবাদী বলে খ্যাতি আছে ওর বাড়ীতে।

—মার ওপর ধমক ফলাতে এলে এখন? কী কীর্তি হচ্ছিল এতক্ষণ টের পাওনি বুঝি দাদা?

—টের? সে তো পাড়াসুদ্ধু লোকেই পেয়েছে—কিন্তু আমি বলতে চাই, ও সবে জ্বর থেকে উঠেছে না? একটু গরম জল দিয়ে মুছিয়ে দিলেও—

কথা শেষ করতে হল না। বীণার ধারাল হাসির ছুরিতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কথার শেষাংশ—রাত্তির চারটেয় গরম জল? দাদা হঠাৎ রাতারাতি সাহেববাড়ীর জামাই হয়ে উঠলে নাকি? নাকি সেই পাঁচশো টাকার চাকরীটা পেয়ে গিয়েছ?...বড়মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তোমার বড় ছেলেটির মেজাজ যা হয়েছে মা আজকাল!

রাত্তির চারটে!

এ সময় কি পথে বেরোনো চলে না? অনেকে তো স্বাস্থ্য খুঁজতে বেরোয় এ সময়! পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় গঙ্গাস্নানার্থী দলকেও দেখেছে বেরোতে। তবে অশোককেই কি লোকে পাগল বলবে?

ছোট খোকার উচ্চ চীৎকারের মধ্যেও তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল—দেখলে মা তোমার বড় ছেলেটির কাণ্ড? রেগে ঠরঠর করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল এই রাতদুপুরে!...ঘরের জন্যে সন্ধ্যে থেকেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে কিনা!...বাব্বা, এখনই এই, বিয়ে হলে এ ছেলের কি হবে?...বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে—

ফুটপাথে নেমে আর বীণার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না।

ওরা তাহলে আগে থেকে ধরেই নিয়েছে এ বিয়ের কথা।

কিন্তু না, কিছুতেই না।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ক্রোধে আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে অশোকের। বীণার ওপর নয়—মার ওপর নয়—নিজের ওপর।...আকারহীন অকারণ একটা রাগ। প্রচণ্ড রাগ!...নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেললে যেন এই রাগ মেটে।...নিজেকে ধরে ফুটপাতে আছাড় মারতে পারলে যেন কিছুটা কমে।...

আঁস্তাকুড়ে শুয়ে স্বর্গের স্বপ্ন দেখার সাধ!

ভাবী শ্বশুরের দৌলতে একটা মোটা মাইনের চাকরী জোটাতে পেরেই ধন্য হয়ে গেল একেবারে? কেন? কেন? কেন সেই অতি-আত্মম্ভরী লোকটার অহঙ্কারের পরিপোষক হবে সে? কেন এতো খেলো করে এসেছে নিজেকে? রায়বাহাদুর বিজন বোস তার কে? কি সুবাদে তাঁর অনুগ্রহদত্ত উন্নতির সুযোগটুকু নেবে অশোক? তাঁর আত্মগর্বকে প্রশ্রয় দেবে? খুব বেশী যে পছন্দ করেন অশোককে এমন মনে করবারও হেতু নেই। নেহাৎই—অবাধ্য কন্যার প্রেমাস্পদ হিসাবে বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন মাত্র। সমাজে মুখ দেখাতে হলে—জামাইয়ের জন্যে ও চাকরীটা তাঁর চাই-ই। সংগ্রহ না করে উপায় নেই—তাই। তাছাড়া কিছু নয়।...কিন্তু নন্দিতাই বা কি?...যার তুলনা করতে—পার্থিব বস্তুতে কুলোতে পারে না অশোক, অপার্থিব জগৎ

হাজড়ে বেড়ায়! কিছু না—কিছু না—ওই বীণারই সমগোত্র।...অনেক পেয়েছে—তাই ওপরের পালিশটা মসৃণ কোমল, বীণা কিছুই পায়নি—তাই রং-চটা রুক্ষ কর্কশ। কই এর আগে কোনদিনই কি নন্দিতার কাছে পেয়েছে এমন অকুণ্ঠ প্রেম নিবেদন? পাঁচশো টাকার চাকুরীর খাতায় নাম সই করবার আগে? জাতে উঠলো—তাই না হাতে হাত রাখলো আজ? কে জানে হয়তো একদিন বীণার মতই নাক বাঁকিয়ে বিকৃত মুখে বলবে-—'যাই ভাগ্যিস আমার বাবার দয়ায় চাকরীটা পেয়েছিলে—তাই না—'

মেয়েরা সব পারে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ইচ্ছে হয়—অদ্ভুত আর দুর্দান্ত।

রায়বাহাদুরের তীক্ষ্ণ নাকের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দেবার ইচ্ছে।

তিনি যখন তাঁর ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্যাসান মার্কা কালো 'কার' ঝোলানো চশমাটির ভেতর থেকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হেনে অবহেলাভরে বলবেন—কই হে—এই যে, এই নাও তোমার নিয়োগ-পত্র এসেছে। একটু বুঝে সাম্‌লে চলো। দিল্লীতে আমার—

কথা শেষ করতে না দিয়ে 'ধাঁই' করে এক ঘুসি বসিয়ে দেবে অশোক শুকচঞ্চুর মতো তীক্ষ্ণ নাসিকার ঠিক ধারালো ডগায়। দিল্লীতে তাঁর কতোটা প্রতিপত্তি এবং কতোদূর পদমর্যাদা ছিল সে কথা আর উচ্চারণ করতে দেবে না...

রোদ উঠে গেছে।...

অশোক নিজেই অবাক হয়ে দেখে, সে বাড়ী ঢুকছে।...বাড়ী জিনিসটা কি ভয়ঙ্কর দৈত্য, ওর খর্পর থেকে উদ্ধারের উপায় নেই...যত বিতৃষ্ণাই থাক ঢুকতেই হবে একসময় না একসময়।...

চোখাচোখি হয়ে গেল বাপের সঙ্গে...সিঁড়ির মুখে সেজকাকার সঙ্গে...কেউ কিছু বললে না।...বলবে না তা জানে অশোক। বীণা ছাড়া মুখোমুখি কেউ কিছু বলে না ওকে, কিন্তু সশব্দ স্বগতোক্তি তো আছে?

'.....বাবু আজকাল মস্ত লায়েক হয়েছেন...মেজাজ তো সপ্তমে চড়েই আছে'...

...'বড় চাকরীটা পেয়ে আমার তো কাঁচকলা করবেন...বিদেশে গিয়ে কেতাদুরস্ত হয়ে থাকবেন...বড় মানুষের মেয়ের তোয়াজ করবেন, ব্যস ফুরিয়ে গেল।' 'সামান্য ওই ঘরটার জন্যে কাল দেখলে তো? দশ বিশ দিন নয়—একটা দিন! ভাগ্নীজামাইটা এসেছে—কী রাগ? গ্রাহ্য করে কথাই কন না মনিষ্যির সঙ্গে'...অলক্ষ্যে আর পরোক্ষে...অনেক কিছুই শুনতে পাওয়া যায়।...

পথের মোড় চোখে পড়ে পরিচিত মূর্তিটি।...অজন্তার ছাঁদের অলঙ্কারে সজ্জিত অজন্তা ছাঁদেরই সুঠাম দেহবল্লরী।...শুধু রূপ নয়, শ্রী।...শাড়ী পরার বিশেষ ভঙ্গীটি থেকে বারান্দার রেলিঙে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটি পর্যন্ত—অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত।

অশোক আসবে—এই প্রতীক্ষায় বারান্দার এই নির্দিষ্ট কোণটাতে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে এ সময়, পথের মোড় থেকে যাতে দেখা যায়।...

কিন্তু কি বাড়াবাড়ি রকম সেজেছে আজকে নন্দিতা!

মেয়েগুলো কী বেহায়া?

—তুমি আজকে রাস্তা থেকে তাকালে না যে বড়ো?

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ ফেরায় নন্দিতা।

অসহ্য ন্যাকামী!...

অশোক বাঁকা হাসি হাসে—ছোটলোকেব মতো রাস্তা থেকে হাঁ করে তাকিয়ে লাভ কি, বাড়ী ঢুকলেই যখন ভদ্রলোকের মতো দেখতে পাওয়া যাবে?

—ইস্! পাওয়া যাবে বলে একেবারে স্থিবনিশ্চিত! যদি সামনে না আসতাম?

—তাহলেও অন্ততঃ হার্টফেল্ কবতাম না।...

—ভাবী যে চাল দেখছি আজ? দেখো মজা—গান শোনাবো না।

—গান শোনা আব স্বর্গ দেখা ছাড়াও অনেক কাজ পৃথিবীতে—যাক্, সোমেন কোথায়? দরকার ছিল—

—জানিনে কোথায়। আড়ি, আড়ি, যাও...

ঘর ছেড়ে চলে যায়।...আবার আসে একমুখ হাসি নিয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে—এতো রাগিয়ে দিতে পারো তুমি!...ভীষণ চটে গিয়েছিলাম, জানো? দাদা কোথায় জিগ্যেস করা হচ্ছে—জানেন না যেন!

—আমি কি কবে জানবো?...শুধু শেষের কথাটারই উত্তর দেয় অশোক।

—বাঃ, জানবে না বইকি? তোমাদের বাড়ীই তো গেছে দাদা।

—আমাদের বাড়ী?...অস্বাভাবিক চেঁচিযে ওঠে অশোক—কেন, আমাদের বাড়ীতে কেন? কে তাকে যেতে বলেছে?

—কি আশ্চর্য! তোমার আজ হল কি? তোমাদের বাড়ী না গেলে কি করে সমস্ত হবে শুনি?

নন্দিতার দুই চোখে টলটল করে ওঠে দু-ফোঁটা জল।

কিন্তু অশোকের অতো দেখবার সময় নেই।...ও ভাবছে সোমেনের গাড়ী আর নিজেদের দরজা, সোমেন আর নিজেদের বৈঠকখানা।...নামে বৈঠকখানা হলেও মূলতঃ সেটা ঠাকুর-চাকরের শোবাব ঘব।...ভাবছে...ওব জ্যাঠামশাইয়ের ছোটো কাপড় পরে খালিগায়ে ঘুরে বেড়ানো।...রায় বাহাদুরের ড্রেসিংগাউন আর ওর বাবার পোশাক।

—না, আমাদের বাড়ী যাবার দরকার নেই, বুঝিয়ে দিও সোমেনকে। কারুর যাবার দরকার নেই।

—কারুর দরকার নেই?...জলভরা চোখে ফিক করে হেসে ফেলে নন্দিতা।...চোখটাও মুছে নেয় তাড়াতাড়ি...চাকরটা আসছে। যদিও নেহাৎ বাচ্চা, তবু দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ কম নয়।

—দিদিমণি, সাহেব জামাইবাবুকে তলব করছেন।

—জামাইবাবু? নন্দিতা এবার রীতিমতই হেসে ফেলে—তোর যে দেখি 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি' না কি বলে তাই? যাচ্ছেন...যা ভাগ!

—বসলেন এই এখুন যেতে।

কিন্তু অশোককে কি ভূতে পেলো? না নেশা লেগেছে? যথেচ্ছ কথা বলতে পারার নেশা! কী মজা! কী চমৎকার সুখ! ভবিষ্যতের লাভ-লোকসানের হিসেবটা খতাতে না হলে কী বেপরোয়া মুক্তি।...রায়বাহাদুরের নাকের ওপর ঘুসি বসিয়ে দেওয়া কী সহজ! সত্যিকার হাত দিয়ে না হোক—কথা দিয়েই!

—কোর্টের আসামী নই আমি যে তোমাব বাবা আমাকে তলব কবে পাঠাবেন। বুঝলে নন্দিতা, ব্যবহারটা একটু ভদ্র করতে বোলো তোমার বাবাকে।

নন্দিতা একটু কঠিন হয়ে ওঠে বৈকি, পুতুল তো নয়!

—সেটা শুধু বাবাকেই নয়—বুঝলে? 'তলব' কথাটা বাবাব মুখেব কথা নয়—সেটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি থাকা উচিত ছিল তোমার।

—বুদ্ধিটা আমার কমই—নিরুপায়। এই, তোর সাহেবকে বলগে যা—আমাব এখন সময় হবে না।

ছেলেটা দুই চক্ষু বড় করে বলে—ওরে বাস্!

অর্থাৎ এতো বড় সাহস তার নেই।

নন্দিতা কাছে সরে আসে...ছলছল চোখ তুলে বলে—তোমার আজ হঠাৎ কি যে হল! শরীর খারাপ হয়েছে না কি বল তো?...পাগলামী করছো কেন? তোমাব সঙ্গে কী সব দরকারি কথা আছে বলে বাবা চারটে থেকে তোমার খোঁজ করছেন।

—আমার অশেষ ভাগ্য। আচ্ছা—কিন্তু দরকাব তো সেই চাকরী নিয়ে? ও আমি করবো না।

—করবে না?

ক্ষীণ একটা আর্তনাদের মতো শোনালো নন্দিতার কণ্ঠস্বর।

—না, করবো না। ভেবে দেখলাম—শ্বশুরের কৃপাকটাক্ষ না পেয়েও যখন অনেকেরই সংসার চলে যাচ্ছে—আমারই বা যাবে না কেন?

—তার মানে? শ্বশুর কথাটারই তো কোনো অর্থ থাকে না তা হলে।...তুমি কি মনে করো ও কাজটা না নিলে বাবা আমাকে—

অভিমানে নন্দিতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

দরাজ গলায় হেসে উঠলো অশোক।...খুব যেন কৌতুককর কিছু শুনেছে।

—আমি কি মনে করি সেটা আর নাই শুনলে নন্দিতা! কি জানি যদি মূর্ছা যাও, তবে একটা কথা জেনে রেখো—তোমার বাবার অনুগ্রহলব্ধ ওই চাকরীটুকু বাদ দিলে আমাব নিজস্ব কোনো দাম যদি খুঁজে না পাও—আর যাই করো, দয়া করে যথাসর্বস্ব অঞ্জলি দিতে এসো না।...কই হে, চলো দেখি তোমার মহামহিমান্বিত প্রভুর দরবারে!

অভিমানে গলা বুজে এলেও আবার কথা কইতে হবে নন্দিতাকে।

—আজ তুমি সত্যিই দেখা করো না বাবার সঙ্গে, আমার অনুরোধ।...আমি বলে দেব শরীর খারাপ লাগছিলো, চলে গেছো।...শুনছো—তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না—

—শরীর খারাপ বলে ভদ্রতাটুকু না করলেও চলতো। মাথা খারাপ বললেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ভয় নেই নন্দিতা, মাথা আমার চমৎকার আছে।...এক্‌স্ট্রাঅর্ডিনারি ভালো।

অভ্যস্ত নিয়মে রায়বাহাদুর চশমার ভিতর থেকে একবার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিনিক্ষেপ করে মিনিট খানেক চুপ করে থাকবার সাধনা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সিদ্ধি হয় না।...ভেঙে যায় অশোকের উদ্ধত প্রশ্নে।

—আমায় কি বলছিলেন?

—তোমায়? বোসো না, বোসো একটু। তুমি যে একেবারে মিলিটারী হয়ে উঠেছ হে?

—হতে পারে। কিন্তু মাপ করবেন—আপনার ও চাকরী আমি নিচ্ছি না।

—নিচ্ছ না? ও! অবিশ্যি ওর থেকে ভালো চান্স যদি পেয়ে থাকো কেন ছাড়বে? তা কোথায় পাচ্ছো?

কথা নয় হুল।

কিন্তু অশোকের আজ কী মজা? এই উদ্ধত লোকটাকে দেখে নেবে। লোকটা যে ওকে দেখতে পারে না সে কি আর জানে না অশোক? শুধু—নন্দিতার বাপ বলেই না এতদিন সহ্য করেছে?...আর—বড় সাধের দিল্লীর চাকরীর আশায়—

সংক্ষেপে বলে—আপাততঃ কোথাও না।...তবে—কোনো এক জায়গায় জুটবেই আশা করি।...আচ্ছা নমস্কার।

নাকের আগাটা কি ভোঁতা হয়ে গেল লোকটার? গলার স্বরটা যে সত্যিই মিইয়ে এলো মনে হচ্ছে!

—তা হলে নন্দিতার আশাও ছাড়তে হবে সেটা ভুলো না।

—পাগল হয়েছেন? সে কথা কখনো ভুলি?...মেয়ের বিয়ে যে আপনারা মানুষের সঙ্গে দেন না—দেন একখানা পালিশকরা চেয়ারের সঙ্গে, সে কথা ভুলতে পারি?...

আবার বাড়ী।

যতো ইচ্ছে রাত করলেও...এক সময় ঢুকতেই হবে।

বাড়ী ঢুকতেই—আর কেউ নয়, বীণা।...একগাল হেসে বলে উঠলো—ধন্যি ছেলে বটে, কোথায় ছিলে দাদা?... তোমার শ্যালক মশাই এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে এই একটু আগে চলে গেল হতাশ হয়ে।...হয়েছে কি শোনো—বাড়ীসুদ্ধ সকলকে নেমন্তন্ন করে গেলো।...কী ফর্সা বাবা! বোনটিও নিশ্চয় ওই রকম? সাধে কি আর তুমি—হুঁঃ...কিন্তু কি সাদাসিধে ভাই? বড়মানুষী চালটাল কিচ্ছু নেই। মা জেঠিমাদের সঙ্গে দিব্যি গল্প।...আবার মজা শোনো—তোমার দেরী দেখে ছোটো ছেলেদের সকলকে ধরে ধরে গাড়ীতে চাপিয়ে লম্বা এক চক্কর দিয়ে আনলো। ফাউস্বরূপ গাদা করে চকোলেট টফি। বাবলুর সঙ্গে তো রীতিমত ভাব জমে গেছে।...

খুশিতে উপচে পড়ছে বীণার মুখ চোখ।...

প্রাপ্যের অতিরিক্ত এতটুকুতেই কি খুশি হয় এরা!

আজ সারা বাড়ীতেই একটা প্রসন্নতার হাওয়া।

ভবী কুটুম্ব কেবলমাত্র অশোকের সম্বন্ধটুকু না ধরে বাড়ীসুদ্ধ সকলের মর্যাদা রেখেছে—এটার দাম তো কম নয়।...

ঘুন্টি চলে গেছে।

আজ আর তিনতলায় উঠবার বাধা নেই।

ঘরের দরজাটা খুলতেই...একটা মিষ্ট মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। মুখে চোখে। দামী সেন্টের গন্ধ...বাসি হয়ে আরো কোমল মধুর হয়ে উঠেছে।...হয়তো জেঠিমা নববিবাহিতা নাতনীর মিলনশয্যায় সেন্টের শিশির যথেচ্ছ ব্যবহার করে গেছেন কাল।...

বিছানার উপর একটুকরো জ্যোৎস্না স্থির হয়ে পড়ে আছে।...অশোকের বিছানায়—যেমন পড়ে থাকতে পারতো প্রতীক্ষমানা নন্দিতা।...

কিন্তু খাটের বাজুর ওপর মালা কেন? কে রাখলো? ঘুন্টি? প্রমথ? আশ্চর্য!...আশ্চর্য!

না কি কিছুই আশ্চর্য নয় জগতে?...হয়তো—মুখরা বীণাও একদিন এমনি পুষ্পমাল্যের কোমল বেষ্টনে লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে...মূক নিবেদনে এলিয়ে দেবে নিজেকে ওই জ্যোৎস্নার টুকরোর মত।...হয়তো এ বাড়ীতেও নন্দিতাকে বেমানান লাগতো না।...হয়তো—ওদের প্রেমকেও অভিনন্দন করে নেওয়া হত মাল্যে চন্দনে পুষ্পসারের মদির সৌরভে।...হয়তো—

কিন্তু থাক—এইমাত্র সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়ে এসেছে অশোক।...কিন্তু কেন?

কেন, সে কথা এখন আর ভেবে ঠিক করতে পারে না অশোক। অথচ হয়তো এসব কিছুই হতোনা। যদি ঘুন্টি একটা রাত্রির জন্য তার ঘরটাকে দখল করতে না আসতো।

[১৩৫৪]

বাজে খরচ

কিন্তু সংসারের লোকগুলাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কোন হিসাবে? আজন্ম যাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে—অপিরিমিত ব্যয়েব অগাধ প্রাচুর্যের মধ্যে—আর ইচ্ছামত বাড়াইয়াছে অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের সংখ্যা—হঠাৎ তাহাদের ছাঁটিতে চাহিলে চলিবে কেন? ছাঁটিতে গেলে যে অনেক কিছুই ছাঁটা দরকার।

ঘুমের পবে দাঁতে বুরুশ চালানো হইতে শুরু করিয়া ঘুমের আগে চুলে চিরুনি চালানো পর্যন্ত সব কিছুতেই হাত চালাইতে হয়।

অবস্থাটা মনোরম নয, সংঘর্ষ না বাধিয়া উপায় নাই; বড় একটা কলহের ব্যাপার না ঘটিলেও—ছোট ছোট কারণে অসন্তোষের চাপা আগুন ধূমায়িত হইতে থাকে এবং বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মত যখন তখন জ্বলিয়া ওঠে।

খুশির খেয়ালে পাল তুলিয়া সংসার-তরণী যখন জোয়ারে গা ভাসাইয়া চলিত, মনোমালিন্যের মালিন্য ধরা পড়িত না। পাঁচজনে বলাবলি করিত 'সংসার করিতে হয় তো যামিনীমোহনের মত—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়'। যামিনীমোহনেরও মনে মনে তাহাতে একটা সগর্ব সায় ছিল। ইদানীং যেন গর্বটা খাটো হইতে বসিয়াছে।

দোষ গুণ যাই হোক, অমন নিরবচ্ছিন্ন সুখের অবস্থাটা হয়তো একই ভাবে স্থায়ী থাকিত, যদি সন্তোষিণীর শিথিল গৃহিণীপণার সঙ্গে তাল রাখিয়া যামিনীমোহনের মাত্রাজ্ঞানহীন উপার্জনের পথটা থাকিত খোলা।

কিন্তু রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে মা লক্ষ্মী খিড়কির দুয়ার হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অন্ধকারে আনাগোনার পথ বন্ধ হইয়াছে। আছে শুধু সরকারী দাক্ষিণ্যের ভিক্ষামুষ্টি। পুলিশ লাইনের অকিঞ্চিৎকর বেতনের ভগ্নাংশ মাত্র।

যামিনীমোহন এতদিন যেন নেশার ঘোরে ছিলেন। অজস্র অর্থ কোন ফাঁক দিয়া আসিতেছে, কোন ছিদ্র দিয়া বিদায় লইতেছে তাহার হিসাব নিকাশ ছিল না। হিতৈষী বন্ধুরা উপদেশ দিতে আসিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

রৌপ্যচক্রের চাকচিক্যময় আভায় ঘরে বাহিরে এবং মনে যে উদারতার হাওয়া বহিত, সেখানে এসব তুচ্ছ কথা দাঁড়াইতে জায়গা পাইত না।

শুধুই কি উদারতা?

অন্যের পিঠ চাপড়াইতে পারার মত একটা স্নিগ্ধ সুখ, একটুখানি বিনীত আত্মগর্ব! মা লক্ষ্মীর আসার পথটা চোরা-গোপ্তা গলি-ঘুঁজি যাই হোক, ক্ষতি কি?

সংসারে তো তাঁহার স্বর্ণ-সিংহাসন পাতা হইয়াছে? আঁকা হইয়াছে সুনিপুণ আলিম্পন? সর্বত্র পড়িয়াছে তাঁহাব পায়ের ছাপ!

দশের একজন হওয়ার সুখও তো কম নয়?

কেউ পাঁচ টাকা চাহিলে অবহেলায় দশটাকা ফেলিয়া দেওয়ার সুখই কি সোজা? কৃপণের সঞ্চয়ের নেশার মতই, অপবিমিত ব্যয়ের, অন্যায় অপচয়েরও একটা নেশা আছে।

উনিশ বছর বয়স হইতে পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত এই নেশায় মশ্‌গুল থাকিয়া হঠাৎ যেন কুম্ভকর্ণেব নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কর্মজীবনের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব চুকাইয়া আসিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া একটা খাঁ-খাঁ-করা শূন্যতা ছাড়া বড় কিছুই নজরে পড়িল না।

দীর্ঘকালের কাজের চাপে ঠাসা, সমারোহময় জীবনের পিছনে এত বড় শূন্যতা লুকাইয়া ছিল কোথায়? হয়তো এত ফাঁকা ঠেকিত না যদি ঘুম ভাঙিয়া দেখিতেন—চলিয়া যাইবার আগে চঞ্চলা লক্ষ্মীর অঞ্চলের একাংশ আটকাইয়া আছে যামিনীমোহনের ভাঁড়ারে।

কিন্তু আটকাইয়া রাখিবার কৌশলই কি তাঁহার জানা ছিল? চেষ্টা ছিল এক বিন্দু?

ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স এমনি অনুল্লেখ্য যে লোকে শুনিলে অবিশ্বাসের হাসি হাসে; মুঠা মুঠা যে ছড়াইল, দুই মুঠাও সে সরাইয়া রাখে নাই—এ কি একটা বিশ্বাস করিবার মত কথা?

ছেলেরা উচ্চশিক্ষিত, অল্পবিস্তর কৃতিও, কিন্তু ঠিক নির্ভরযোগ্য কাহাকেই বা বলা চলে?

যামিনীমোহনের উপযুক্ত চালে সংসার চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের পক্ষে আকাশকুসুম। অথচ চাল খাটো করিবার মত কঠিন ব্যাপারই বা কি আছে?

অব্যাহত আরাম ব্যাহত হইতে থাকে। বাড়ীর কর্তা যে ইচ্ছা করিয়াই সকলকে এরকম অসুবিধায় ফেলিয়াছেন, সে কথা মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট না বলিলেও, মুখের ভাবে স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে।

বুড়ো বয়সে বাবার এখন কিপটেমি রোগ ধরেছে—মুরলা নিজের ছেলেকে স্পোর্টিং ক্লাবের বাইশটা মাত্র টাকা চাঁদা দিবার অক্ষমতায় রাগে চোখমুখ রাঙা করিয়া বলে—কি করবো বল্‌, আমি তো আর ভাগের ভাগীদার নই? হেলায় ছেদ্দায় যে যেটুকু দেয়। বাবার কাছে টাকা কটা চাইতে গিয়ে লজ্জায় যেন গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হ'ল—ছিঃ ছিঃ, স্বচ্ছন্দে বললেন কি না—'টাকা কোথায় পাবো?'

বলিয়া মুরলা যেন এইমাত্র উক্ত অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর কথাটা শুনিয়াছে, এমনি করিয়া দুই চোখ বড় করিয়া স্তম্ভিত ভাবে তাকাইয়া থাকে।

যামিনীমোহনের সৌভাগ্যের মধ্যগগনে এই একটিমাত্র শোকের ঘটনা, বড় মেয়ে মুরলার অকালবৈধব্য। তা' সে শোকটুকু সামালাইয়া লইতে বেশি সময় লাগে নাই এবং মুরলাও বাপের বাড়ীর ঘি দুধ ক্ষীর ছানার প্রলেপে মাছের ল্যাজার বিরহ-ক্ষতটা শীঘ্রই শুকাইয়া লইয়াছিল।

বৌরা যতদিন না আসিয়াছে, মুরলাই ছিল বাড়ীর সর্বেসর্বা। শুধু মা বাপ বলিয়া নয়, ভাই বোনেরাও—বিধবা দিদি বলিয়া যতটা না হোক—উপার্জনশীল কর্তার আদুরে মেয়ে বলিয়া যথেষ্ট মানিয়া চলিত। এখন তিন ভাইয়েরই বিবাহ হইয়াছে। একে একে বৌরা আসিয়া নিজেদের জায়গা দখল করিয়া লইয়াছে। প্রতিপত্তি অনেকটাই হ্রাস হইয়াছে,—কিন্তু তাই বলিয়া এতদূর?

যামিনীমোহনের আদরের দৌহিত্র—মুরলার সবেধন নীলমণি—কুড়ি বাইশ টাকা মাত্র চাহিয়া পায় না?

অথচ বেশি দিনের কথা নয়—এই তো ও-বছর সুব্রত বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে মুসৌরী যাইবার বাহানা লইতেই যামিনীমোহন বিনা দ্বিধায় তিনশত টাকা হাতে তুলিয়া দিয়া মুচকি হাসির সঙ্গে বলিয়াছিলেন—যাচ্ছো তো—বলি, বন্ধু মশাইয়ের কোনও তরুনী বোন-টোন নেই তো? একেই তো শুনেছি ওসব জায়গা খারাপ—তাই না? কি বলেন 'বিব্রতবাবু', ঠিক বলিনি?

এটুকু পরিহাস অবশ্য ছেলেমেয়েদের সামনে করা চলে—তাদেরও উপভোগ করিতে আপত্তি নাই, হৈ-হৈ হাসির হল্লোড়ের মধ্যে কথাটা শেষ করিয়া যামিনীমোহন নাতিকে আবো যে সব মূল্যবান উপদেশ দিলেন, তা' পালন করিতেও যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়।

কিন্তু পাহাড়েই যখন যাওয়া হইতেছে, স্বাস্থ্যটা গড়িয়া তুলিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা চাই বই কি, না হয় লাগিলই আরো দু'দশ টাকা! প্রযোজন হইলেই তো শুধু একখানা পোস্টকার্ডের ওয়াস্তা, তেমন প্রয়োজন হইলে টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারও তো আছে।

এ ছাড়া দিদিমার ঘাড় ভাঙিয়া একটা দামী স্যুটকেস ও একজোড়া দামী স্যুট আদায় করিয়া ছাড়িয়াছিল সুব্রত। আর এখন কি না—রোষে ক্ষোভে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল মুরলা।

সুব্রত ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলিল—সামান্য কটা টাকার জন্যে ওঁর কাছেই বা গিয়েছিলে কেন? দিদিমাকে বললেই পারতে!

মুরলা অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইয়া উত্তর দিল—দিদিমা? তা হলেই হয়েছে, তোর দিদিমা যদি তেমন গিন্নি হোতেন, তা হলে আর ভাবনার কি ছিল?

কথাটা সত্য।

'তেমন' গিন্নি সন্তোষিণী নন্। কিন্তু তেমন 'তেমন' হইলেই বা মুরলার কি উপকার হইত? তেমন পাকা গিন্নিরা, সন্তান বলিযাই যে অন্ধস্নেহে বিভোর হইবেন এমন আশা করা যায় না।

বিধবা মেয়েকে পুষিতে হয—স্বামীকুলে ভাত দিবার কেহ না থাকিলে অবশ্য পোষ্য হিসাবেই ঘাড়ে লইতে হয—শুধু এইটুকু মানিয়া লওয়া ছাড়া আর বেশী কি করিতেন সন্তোষিণী 'পাকা গৃহিণী' হইলে?

'তেমন' নয় বলিযাই না মুরলার ছেলে দামী স্যুট ছাড়া পরে না, দামী সিগার ছাড়া খায় না, ফার্স্টক্লাস সিটে ভিন্ন সিনেমা দেখিতে ঘৃণা বোধ করে!

সত্যই ভারী সাদা-সিধা খোলা-মেলা মানুষ সন্তোষিণী। গৃহিণীত্বের মর্যাদা ও মেজাজ লইয়া সংসারের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া থাকিবার সখ তাঁহার নাই। শাসন তাঁহার আসে না।

অবাধ্য চাকরবাকরকে উচিত শাসন করিতে না পারার অনুযোগে তিনি স্বচ্ছন্দে উল্টা অনুযোগ করিয়া সাফাই হ'ন—পোড়ারমুখোরা আমার কথা শুনলে তো? বলে বলে তো মুখব্যথা হয়ে গেল—

মায়ের কানে তুলিলেই অবশ্য টাকাটা আদায় হয়, ছেলেমেয়ের মুখ শুখনো দেখিলে যে তাঁহার বুক ধড়ফড় করিয়া ওঠে, এ তথ্য তো আর মুরলার অজানা নয়?

কিন্তু চাহিতেই বা হয় কেন? চাহিবার লজ্জাও তো কম নয়?

গলগ্রহ বিধবা মেয়ে বলিয়াই না এত দুঃখ মুরলার? কই, বৌদের বেলায় তো অনুষ্ঠানের

ত্রুটি হয় না? নিজের স্বামী সংসার থাকিলে কি মুরলা মা বাপের কাছে হাত পাতিতে আসিত?

তাই হাত পাতার অপমান স্বীকার করিয়া লওয়ার পরিবর্তে মুখ চোখ রাঙা করিয়া কাঁদিতে বসে মুরলা। উনিশ বছরের পুরানো কবর খুঁড়িয়া মৃত শোককে বাহির করিয়া কাঁদিতে বসে—বিস্মৃতপ্রায় স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া বলিতে থাকে—গেলেই যদি তো মুরলাকে লইয়া গেলে না কেন? হতমান্য হইয়া বাঁচিয়া থাকার সুখ কি?...

টাকাটা মুরলা আদায় করিয়া দিতে পারিলে সুব্রতর ভালই লাগিত, কিন্তু নাকিকান্নাটা বরদাস্ত করিতে পারে না। সরিয়া পড়ে।

সরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু যাইবার সময় যামিনীমোহনের ঘরের সামনে দিয়া সশব্দ মতামত ব্যক্ত করিয়া যায়: এ বাড়িতে নাকি ভদ্রলোকের আর পোষায় না—মানে মানে সরিয়া পড়াই মঙ্গল।

কিন্তু যামিনীমোহনেরও অন্যায় কম নয়, এতদিন সব বিষয়ে চোখ কান বুজিয়া থাকিয়া হঠাৎ এত বেশী সজাগ হইবার কি প্রয়োজন ছিল তাঁহার?

মেয়ের এই করুণ কান্নাকে 'ন্যাকামী' আখ্যা দিয়া বসিবার মানে?

শেষ পর্যন্ত তো সন্তোষিণী হইতে শুরু করিয়া বাড়ীসুদ্ধ সকলে তাঁকেই লাঞ্ছনার একশেষ করিল! ভীমরথী ধরিবার মত বয়স হইবার অনেক আগেই ভীমরথী ধরিলে সহ্য করিবে কেন লোকে?

সেজবৌ সুশুভ্রা ননদকে যে 'সোনার চোক্ষে' দেখে এমন প্রমাণ কোন দিনই পাওয়া যায় নাই, তবু সেও ননদের দিক টানিয়া টানা টানা সুরে মন্তব্য প্রকাশ করে—বাস্তবিক, বাবার আজকাল কী অদ্ভুত স্বভাবই হয়েছে—যাকে যা খুশি বলছেন। কে কোথায় দু' পয়সা বেশী খরচ করে ফেললো সেই দিকে নজর দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই সেদিন—পাতে দু'টি ভাত ফেলেছিল বলে রাণুকে কী বকুনিটাই দিলেন। ধোপার কাপড়ে ছোটঠাকুরঝির ব্লাউস গোটাকতক বেশী ছিল বলে—কাঁদিয়েই ছাড়লেন মেয়েটাকে,—আশ্চর্য! এত পরিবর্তনও মানুষের হয়?

'অধঃপতন' কথাটা নেহাৎ উচ্চারণ করিতে বাধে বলিয়াই বোধ করি পরিবর্তন বলে।

অপ্রতিভ যামিনীমোহন অবশ্য একটি কথা কহিয়াই চুপ করিয়া যান, কিন্তু মানসিক অঙ্কের হিসাবটা আর কিছুতেই মিলাইতে পারেন না।

যামিনীমোহনের কাজের সমালোচনা করিবার উপযুক্ত সাহস ইহারা সংগ্রহ করিল কেমন করিয়া? কিছুদিন হইতেই এটা লক্ষ্য করিতেছেন তিনি। সকলেই যেন দুই কথা শুনাইয়া দিবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু কেন?

আর্থিক মূল্যের কষ্টিপাথরে তাঁহার নিজস্ব মূল্যের বিচার হইবে নাকি? পকেটের ভার কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যামিনীমোহনের নিজের দর কমিয়া গেল সংসারে?

যেন ইচ্ছা করিয়াই কৃপণতা করিতেছেন, যেন কোনদিনই স্বচ্ছন্দে রাখেন নাই উহাদের। দুই হাত বোঝাই করিয়া আনিয়া, দুই হাত উজাড় করিয়া দেওয়ার কথা এত শীঘ্র ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব?

কৃপণতা, কৃপণতা। ইসারায় ইঙ্গিতে এই কথাটাই ব্যক্ত করিতে চায় সকলে। 'নাই' একথা স্বীকারই করিতে চাহে না। এমন কি সন্তোষিণী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বলিয়া বসেন—'নেই' বললে চলবে কেন? 'নেই' 'নেই' করা এক রোগ হয়েছে তোমার, ছেলেপুলের খাওয়া-পরার কষ্ট দেখতে পারবো না আমি—তা' তুমি যাই বলো!

যেন সন্তোষিণীর 'দেখিতে পারাটাই' সবচেয়ে দামী কথা। সন্তোষিণীকেও নিতান্ত পর মনে হয় যামিনীমোহনের। স্ত্রীপুত্র-পরিবার সকলে যেন একযোগে সমস্ত অন্তরঙ্গতা ঘুচাইয়া ক্রমবর্ধমান গতিতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। বেশী করিয়া সন্তোষিণী।

সহানুভূতির লেশমাত্রও নাই, এতটুকু সহযোগিতার আশা নিতান্তই দুরাশা। ঝিয়ের ছেলেটার শুকনো মুখ দেখিলেও তাঁহার বুকে ফাট্ ধরে, ধরেনা কেবল যামিনীমোহনের বেলায়। বরং তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট গম্ভীর মুখ দেখিলেই নাকি 'গা জ্বলিয়া যায়' সন্তোষিণীর। পারতপক্ষে কাছে ঘেঁষিতে চান না।

সমস্ত সংসার যেন একটা পক্ষ, আর প্রতিপক্ষ যামিনীমোহন। দিব্য হাসিতেছে, গল্প করিতেছে, হয়তো খাওয়া-দাওয়ার ধুম লাগাইয়াছে, যামিনীমোহন উপস্থিত হইলেন কি সব চুপ।

কেহ উঠিয়া গেল, কাহারও মাথা ধরিয়া উঠিল, যে নিতান্তই বসিয়া রহিল সে কথার উত্তর দিল যেন বিরক্তি চাপিয়া।

অবশ্য কারণটা যে যামিনীমোহন একেবারে বোঝেন না তা নয়, মূল অর্থ সেই অর্থমনর্থম্। মাঝে মাঝে নিজেকে বোঝাইতে চেষ্টা করেন—দূর ছাই, সামান্য কিছু বলিতে গেলেই যখন এত মন্দ হওয়া, বলিয়া কাজ নেই, নিজেদের ভালোমন্দের ভার নিজেরাই বুঝুক ওরা—কিন্তু হয় না—মুখ ফস্কাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। চোখেও পড়িয়া যায় অপব্যয়ের তুচ্ছ খুঁটিনাটি।

অনর্থক কতক্ষণ লাইট জ্বলিয়া যাইতেছে—ধোবাকে কে দু'খানা কাপড় বেশি দিল, উনান কামাই দিয়া দিন ক'সেব কয়লা বাড়তি পোড়ায় ঠাকুব, এসব ব্যাপার তাঁহারই নজরে পড়িয়া যায় কেন?

সংসারে যে এত সব লক্ষ্যণীয় ব্যাপাব আছে, তাই বা কবে জানিতেন যামিনীমোহন? ঠকিয়া যাইবার ভয়ে গয়লার বাথানে গিয়া দুধ লইয়া আসিবার, ঘুঁটেওয়ালীর সামনে দাঁড়াইয়া ঘুঁটে গণিয়া লইবার, চাকরের পিছনে পিছনে অলক্ষ্যে বাজারে যাইবার মত দুষ্প্রবৃত্তি তো সত্যই ছিল না কখনো?

কিন্তু নেহাৎ খারাপও তো লাগে না কই? বরং বেশ লাগে।

'অধঃপতন' যদি বলিয়া থাকে কেউ, নিতান্ত মিথ্যা বলিয়াছে কি?

এই তো আজই সকালে চায়ের টেবিলে ঝড় উঠিয়া গেল। চায়ের পেয়ালায় দুইটা চুমুক দিয়াই নির্মল পেয়ালাটা সশব্দে নামাইয়া দিয়া কহিল—অখাদ্য। চা যা হচ্ছে আজকাল, এ চা খাওয়ার কোনো মানে হয় না। এর থেকে চিরেতার জল খাওয়া ভালো।

মেজ বৌয়ের হাতে প্রাতরাশের ভার, তিনি বোধ করি প্রস্তুত প্রণালীর নিন্দা হিসাবেই কথাটা গায়ে মাখিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলেন—দামেও চিরেতার সঙ্গে বেশী তফাৎ নেই। এরকম চা, এর চাইতে টেষ্টফুল হওয়া অসম্ভব, আর কেউ পারে তো করে যেন কাল থেকে।

বলা বাহুল্য সস্তার চা'টা যামিনীমোহনই আনিয়াছিলেন, তিনি বধূমাতাব সম্মান রাখিবার ছলে নিজের আত্মসম্মানই বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। বলেন—বড্ড খুঁৎকাড়া স্বভাব হচ্ছে তোমাদের আজকাল, কই খারাপ তো হয়নি? দিব্যি খেলাম আমি।

—আপনিই খাবেন—বলিয়া খবরের কাগজটা টানিয়া লয় নির্মল।

কিন্তু যামিনীমোহনেরও মেজাজ 'গঙ্গাজল' নয়। যেখানেই একটু লাগাম কষিতে যান, ছেলে বৌরা তাহার কদর্থ করিয়া বসে, কোন কিছুতে এতটুকু তারতম্য দেখিলেই ইহারা আর তাহার মানে খুঁজিয়া পায় না, এই বা কেমন কথা? বিরক্তকণ্ঠে বলেন—খেতেও পারেন না কেউ,

অথচ টিন টিন উড়েও যাচ্ছে দেখছি—

—বাধ্য হয়ে খেতে হয়, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

কথাটা পরিমল পরিহাসের সুরেই বলে, কিন্তু যামিনীমোহন উত্তর দিয়া বসেন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে। বলেন—এরপর এও জুটবে না, এত নবাবী চাল ক'দিন চলবে? আমার তো হয়ে গেছে—নিজেদের মুরোদ কত? পঞ্চাশ টাকার কেরানীর পাঁচশো টাকার চাল!

অতবড় ছেলেকে এত বড় কথা—সত্যকার গায়ে লাগিবার মত কথা যে বলিতে নাই—একি আর কিছুতেই শেখানো যাইবে না যামিনীমোহনকে? সন্তোষিণী রাগিয়া কাঁদিয়া এক করেন।

পরিমল নাকি বিনা ব্যঞ্জনে শুধু নুনভাত খাইয়া অফিস গেছে। মেজ বৌমা ক্ষুধাহীনতার অজুহাতে তিনতলায় গিয়া ফ্যান খুলিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন—এই সব ব্যাপার।

বাবারই অন্যায়—ছোট মেয়ে গীতশ্রী ইন্টারমিডিয়েট দিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছে। কাজেই প্রত্যেকের ন্যায় অন্যায় তাহার চোখে পড়ে। মায়ের কাছে আসিয়া বিরক্তকণ্ঠে বলিল—বাবারই অন্যায়—বাড়ীর কর্তা হলেই যে যাকে যা খুশি বলবার রাইট্ থাকবে তার কি মানে?

যেন হঠাৎ নতুন করিয়া কর্তা হইয়াছেন যামিনীমোহন। মেয়ের কথায় সায় দিয়াই বোধহয় সন্তোষিণী কিছু বলিতে যাইতেছিলেন—পিছন হইতে গোবিন্দর গলা বাজিয়া উঠিল—তা'বলে মামা কাউকে কিছু বলতে পাবে না? বাঃ!

এখানে গোবিন্দর একটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও পরিচয় তাহার দেওয়া শক্ত। খুঁজিলে পাতিলে যে সম্বন্ধটুকু আবিষ্কার করা যায়—সেটা ভাগিনেয়র কান ঘেঁষা, সেই সূত্রে যামিনীমোহন 'মামা'।

কবে কি ভাবে ঐ সংসাবে আসিয়া গোবিন্দ শিকড় গাড়িয়াছিল সে কথা কাহারও এখন স্মরণ নাই। হয়তো সন্তোষিণীর উদার দাক্ষিণ্যে—হয়তো যামিনীমোহনের ফেলাছড়ার সংসারে কেউ ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দিয়া গিয়াছিল। নির্মলের একবয়সী বলিয়া তাহাকেও সময়ে স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে যাহা হয়—নির্মল তর্‌তর্ করিয়া স্কুলের গণ্ডি ডিঙাইয়া কলেজে—এবং কলেজের পর্ব সারিয়া বাড়ী আসিয়া বসিল, আর গোবিন্দ পঞ্চম শ্রেণীর পর্বতে বার দুই মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় 'দাগার্ষাড়' হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

স্বাস্থ্যটাও তাহার তেমনি জোরালো। সত্যই কিছু আর যামিনীমোহনের নিজের ছেলেদের মত দুধ ফল মাখন টনিকের উপর মানুষ করা হয় নাই তাহাকে, তবু বাড়ীর মধ্যে তাহার চেহারাটাই দেখিবার মত।

মজার কথা এই—আর কিছু না হোক, বিবাহ-পর্বটাও তাহার যথাসময়ে—বরং সময় হইবার আগেই সারা হইয়া আছে।

এটি সন্তোষিণীর কীর্তি।

বিবাহবিরোধী নির্মলের উপর অভিমানের বশে গোবিন্দর সাহায্যে তিনি একটি দরিদ্রকন্যার 'হিল্লে' ও নিজের সত্যরক্ষা করিয়াছিলেন।

বধূটি বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিল বানরের গলায় মুক্তামালার দৃষ্টান্ত বহিয়া।

দরকার বোধ করিলে গোবিন্দ তাহাকে ঠেঙাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করে না এবং বড়দা মেজদার মত বৌয়ের আঁচলধরা হইয়া থাকাকে সে কাপুরুষতা বিবেচনা করে।

না বলিলেও চলে—অবজ্ঞা ছাড়া গোবিন্দর উপর আর কাহারও কোন ভাব নাই। তবে

গোবিন্দ হৃদয়বৃত্তির ধার বড় ধারেও না। সম্মান আর অপমানের আলাদা কোন অর্থ নাই তাহার কাছে। কেউ না মানিলেও সকলের উপর ফোঁপরদালালি করিতে আসে, গায়ে-পড়া হইয়া সব জায়গায় নিজের মতামত ব্যক্ত কবিযা বসে। কথার উত্তর না পাইলে শিস্ দিতে দিতে চলিয়া যায়। খায় বেশী, ঘুমায় বেশী, খাটিতে পাবে বেশী—সবটাই কেমন যেন অমার্জিত বন্য। যামিনীমোহনের ছেলেদের পাশে বিশ্রী বেমানান।

এতদিন অবশ্য তাহাকে লইয়া কেহ মাথা ঘামায় নাই। সংসারের একটা হাসিব খোরাক হিসাবেই ছিল। কিন্তু ইদানীং সকলেরই অল্প-বিস্তর টনক নড়িয়াছে। এই বাজারে দুই-দুইটা মানুষ পোষা সত্যই সামান্য কথা নয়।

কিন্তু ইসারা ইঙ্গিত সে বোঝে না এই মুস্কিল! অথচ স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে বলাই বা যায় কেমন করিয়া? সোজাসুজি 'যাও' বলা দুরূহ বৈকি।

তাই ছলে ও কৌশলে সকলেই আজকাল খোঁটা দিয়া কথা বলিতে শুরু করিয়াছে।

কিন্তু নীরেট গোবিন্দ এত শুনিযাও নির্বিবাদে মাত্র একবাটি ডালেব সাহায্যে দুইজনের ভাত শেষ করিযা অসঙ্কোচে আর একবার ভাত চাহিযা খায়। ক্ষুধাবোধ হইলেই—"মামী, কি আছে বার করো, পেটের মধ্যে খাণ্ডব-দাহন হচ্ছে"—বলিযা সোরগোল করিতে করিতে বাড়ী ঢোকে।

এ সংসারে যে তাহার সত্যকার কোনও দাবী নাই, এমন অবিশ্বাস্য কথাটা তাহাকে বোঝানো কঠিন। তা' না হইলে ইন্টার-মিডিয়েট পড়া যে মেয়ে তাহাকে 'দাদা' বলিতে পর্যন্ত ঘৃণা বোধ করে, শ্লেষ দিয়া 'গোবিন্দবাবু' বলে—তাহার কথায় কথা কহিবার প্রয়োজন কী?

তাহার এই সমানচালের কথা বার্তাটাই সকলের দুই চক্ষের বিয! ছেলেদের বিরক্তির ভয়ে অনেক সময় সন্তোষিণী আড়ালে ডাকিয়া বলেন, তুই সব কথায় থাকিস কেন গোবিন্দ? নিজের চরকার তেল দিগে না বাপু!

গোবিন্দ বলে—তোমার চরকা—আমার চরকা—বুঝি না মামী, অন্যায্য আমি সইতে পারিনে। গীতশ্রীকে প্রায় ধমক দিয়াই বলে—দু'খানা পাশ দিয়ে যেন চারখানা হাত বেরিয়েছে মেয়ের! মামার ওপর কথা কইতে আছে? বাড়ীর কর্তা, যাকে যা খুসী বলতে পারে—বলবার রাইট আছে—আলবাৎ আছে।

গীতশ্রী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া মাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল--তোমাকে এই বলে রাখছি মা, বাবাকে তুমি সাবধান করে দিও। মেজদা ভয়ানক অভিমানী, সাংঘাতিক কিছু করে বসতে পারে।

—কি করবে? অভিমানে টিউবওয়েলের জলে ডুবে মরবে? বলিয়া গোবিন্দ মুষ্টিবদ্ধ হাতে 'মাসল্' পরীক্ষা করিতে থাকে। এটা তাহার মুদ্রাদোষ।

—তুই থাম্ গোবিন্দ—বলিয়া সন্তোষিণী মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—আমি আবার কি বলবো? শুনবে কি আমার কথা? আমি যে এখন ওঁর দু' চোখের বালাই হয়েছি—

—মামীর এক কথা—বুড়ো বয়সে মামা তোমাকে মাথায় করে নাচবে নাকি?

গোবিন্দর কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন একমাত্র সন্তোষিণী ছাড়া কেহই অনুভব করে না, কিন্তু এরকম অসভ্যর মত কথায় ভারী চটিয়া যায় গীতশ্রী। তীব্রকণ্ঠে বলিয়া ওঠে—একটু ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলতে শিখবে কি তুমি?

—ভদ্দর—অভদ্দর বুঝিনে বাবা, আমি হচ্ছি চিরকেলে চাষা—বলিয়া সম্প্রতি দেখা একটা সিনেমার গানের এককলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়া যায় গোবিন্দ।

—মা, তুমি ওটির মায়া ছাড়বে কিনা? গীতশ্রী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—তোমার আস্কারাতেই এরকম হয়েছে—ভদ্রভাবে থাকতে পারতো থাকতো! তা' নইলে—এই বাজারে দুটো মানুষের খরচ তো সোজা নয়?

দেখা যায় এই একটি বিষয়ে ছেলে বুড়া সকলেই রীতিমত হিসাবী হইয়া উঠিয়াছে।

আস্কারা দেওয়ার অপবাদ সন্তোষিণীর নূতন নয়, তিনি আত্ম-সমর্থন করিতে অন্য একটা পয়েন্ট ধরেন। বলেন—ওর সঙ্গে ছেড়ে দিলে বৌটাকে যে কী হাঁড়ির হাল করবে তা' কে জানে হয়তো মেরেই ফেলবে।

গোবিন্দর মত বৌটাও অবশ্য বাড়ীর লোকের চক্ষুশূল নয়। তা'ছাড়া সংসারে খাটেও বিস্তর। সন্তোষিণীর বৌদের তো নামিতেই হয় না নীচে।

গীতশ্রী অল্প নরম হইয়া বলে—তা' বললে আর কি হবে—যার যা ভাগ্য।

গোবিন্দকে বিদায় করিবার কথাটা এইভাবে উঠিতে থাকে বার বাব, আবার চাপাও পড়িয়া যায়। সন্তোষিণীর যে তাহাকে নহিলে চলে না। গোবিন্দ ছাড়া তাঁহার নিজস্ব ফাই-ফরমাস খাটিবে কে? ছেলেবা তো কথা কানেই তোলে না।

মেজমেয়ে মণিমালার চিঠিখানা হাতে করিয়া সন্তোষিণীকে সেই যামিনীমোহনের কাছেই আসিতে হয়।.....ছেলেরা এক পয়সাও খরচ করিতে অক্ষম, অথচ মণি চিঠিতে বিবিধ তথ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জানাইয়াছে তাহার বড়ছেলের উপনয়ন উপলক্ষে শীঘ্রই নিমন্ত্রণের চিঠি যাইবে—সে তাই সময় থাকিতে জানাইয়া রাখিতেছে—ছেলের মামার বাড়ী হইতে যেন অন্ততঃ বেনারসীর জোড়, হীরার আংটি আর গায়ে হলুদ দিবার রূপার বাটি আসে, অন্যথায় শ্বশুরবাড়ীতে মুখ দেখানো অসম্ভব মণিমালার।

কিন্তু যামিনীমোহনের ওরকম কথাগুলো বলা কি ভালো হইল?

এই প্রথম ছেলে মণিমালার—কত সাধের আর আদরের! বাপ হইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে বলিয়া বসিলেন—মুখ দেখানো যদি নিতান্তই অসম্ভব হয় মণিমালার, মুখের ঘোমটা-টা যেন দীর্ঘ করিয়া টানে। 'অসম্ভব' নামক বাক্যটা যে কেবলমাত্র মণিমালার অভিধানেই আছে এমন নয়।

সন্তোষিণী অতঃপর কি কবেন?

চিরদিনের ভালমানুষ মানুষটাও যেন যামিনীমোহনের ব্যবহারে ক্রমে মুখরা হইয়া উঠিতেছেন। অসময়ে হেলাফেলা কবিয়া খবচ করিলেন—এখন প্রয়োজনের সময় হাত গুটাইলে চলিবে কেন?

তাই প্রায় চল্লিশ বছর পরে কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসেন—উচিত কর্তব্য যদি নাই করিতে পারিবেন তো—সংসার পাতিয়া বসার সখ হইয়াছিল কেন যামিনীমোহনের? সময়ে দুই পয়সা রাখিতে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়াছিল কে?

অবাক হইয়া চাহিয়া থাকেন ভদ্রলোক।

সন্তোষিণীও শেষে এই কথাই বলে? সারাজীবন কার মনস্তুষ্টি করিয়া আসিলেন যামিনীমোহন? নিঃসম্বল হইয়া বসিয়া আছেন কার অবহেলায়?

অনেক দিনের অনেক অপব্যয়ের বিস্মৃত ইতিহাস জীবন্ত হইয়া উড়িয়া চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে। সন্তোষিণীর বাপের বাড়ীর 'অভাবে'র সংসারে চিরদিন 'ভাব' যোগাইয়া আসিল কে?

ছেলেমেয়েদের বিবাহে অমন অজস্র স্ফূর্তির ব্যবস্থা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? লোক-লৌকিকতায় সাজে-সজ্জায় অমন দিলদরিয়া মেজাজ দেখাইবার হেতু ছিল কি?

সমস্ত অতীতটা হাতড়াইয়া বেড়াইয়া সারা প্রাণ একটা অব্যক্ত আফশোসে 'হায় হায়' করিতে থাকে।

বাজারও হইয়াছে তেমনি। যুদ্ধের আগুন কেবলমাত্র তো যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নাই, সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে।

'বাজারে'র মহিমা মনে আসিতেই ঝাঁ করিয়া মনে পড়িয়া যায় গোবিন্দর কথা। ওই একটা বাজে-খরচ এখনো—এই দুর্দিনেও টানিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কেন?

অকাল-কুষ্মাণ্ড ধৃষ্ট গোঁয়ারটাকে দেখিলে তো পিত্ত জ্বলিয়া যায়! এই ভূতসেবায় কী ইষ্টসিদ্ধি হইতেছে যামিনীমোহনের? নাঃ, হেস্তনেস্ত করার দরকার।

উঠানে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া গোবিন্দ লিলির অঙ্গসেবা করিয়া দিতেছিল। দেমু আসিয়া জোর গলায় তলব দিল—গোবিন্দ-কা' দাদু তোমায় ডাকছেন, চলো শিগ্‌গির।

গোবিন্দ বিরক্তির সুরে কহিল—চলো বললেই চলো? দেখছিস, এখন ওর চোখে-মুখে সাবানের ফেনা লেগে রয়েছে?

লিলি এককালে কর্তার প্রিয়পাত্র হিসাবেই ছিল। কিন্তু বাড়ীসুদ্ধ সকলের "দূর ছাই"য়ের জ্বালায় নেহাৎ অভিমানের বশেই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন যামিনীমোহন। অতঃপর বোধকরি সমজাতিত্ব-প্রীতির বশেই গোবিন্দ তাহার ভার লইয়াছিল। নিজের গায়ে ছ'মাসে একদিন সাবান না পড়িলেও—কুকুরের গায়ে নিত্য পড়ে।

দেবু এদিক-ওদিক চাহিয়া কহিল—দাদু তোমায় বাড়ী থেকে দূর করে দেবেন বলে ডাকছেন—বুঝলে গোবিন্দ-কা? বলছেন—'কাজ নেই, কর্ম নেই, খালি বসে খায়'—তুমি তো তিনজনেব ভাত একলা খেতে পারো—না গোবিন্দ-কা? মা বলে যে—

গোবিন্দ ক্রুদ্ধকণ্ঠে স্বব চড়াইয়া বলে—পারবো না তো কি? তোর মার মতন আধ ছটাক চালের ভাত খাবো আর সকাল বিকেল মূর্ছা যাবো? অত ফ্যাসান নেই বাবা। যা পালা, কাজের সময় দিক্ করিস নে—'কাজ নেই কম্ম নেই'—বলে মরবার ফুরসৎ নেই আমার। 'দূর করে দেবে'! দূর করা অমনি রাস্তায় পড়ে আছে কি না?

দেবু ছুটিয়া যায় দাদুকে উত্তরটা শোনাইতে।

মুরলা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলে—সেই যে একটা কথায় আছে না—"বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান, সুজনের এক কথা মরণ সমান"—এ বাড়ীতে হয়েছে তাই।

—এই এলেন এক ছড়াকাটুনী।—কথা শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।—বলিয়া পিত্তি জ্বলার প্রমাণস্বরূপ লিলির গায়ে সজোরে জলের ঝাপট্ মারিতে থাকে গোবিন্দ।

মুরলাকে সে দেখিতে পারে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে কুকুর ফেলিয়া উঠিতেই হয়। যামিনীমোহন ডাকের উপর ডাক পাঠান। এই দণ্ডেই দূর করিয়া দিবেন। সত্যই এত ধৃষ্টতা সহ্য করা কঠিন।

গোবিন্দ উপরে উঠিয়াই স্বভাবসিদ্ধ চড়া গলায় প্রশ্ন করে—হয়েছে কি বলো তো মামা? জমিদারী লাটে উঠে যাচ্ছিল নাকি তোমার? বাবাঃ! একটু যদি স্বস্তি আছে—নাও বলো, কি জন্যে এত ডাকাডাকি?

হঠাৎ যেন যামিনীমোহনই থতমত খাইয়া যান। তাই প্রায় নরম গলায় বলেন—বোস্, কথা আছে।

—ও বাবা, ভয় খাইয়ে দিচ্ছ যে!—চট্‌পট্‌ বলে ফেল, লিলিটা ওদিকে ভিজে গায়ে পড়ে আছে।

গুছাইয়া বলিবাব মত ক্ষমতাব অভাবেই হয়তো যামিনীমোহন ফট্‌ করিয়া বলিয়া বসেন—বলছি কি—তুমি এবাব নিজেব পথ দেখ। আমাব আব এমন ক্ষমতা নেই যে তোমাদেব দুজনকে পুযতে পারি।

মিনিট খানেক বোকাব মত চাহিয়া থাকিয়া বোধ কবি কথাটাব মর্ম গ্রহণ কবিতে পাবে গোবিন্দ, অথচ উত্তর খুঁজিযা পায না। আমতা আমতা কবিযা বলে—করছি তো চাকরী-বাকরীর চেষ্টা—

—করছো বুঝি? ও। তা তোমাকে চাকরী কে দেবে শুনি?

—দেবে না? আলবৎ দেবে—গোবিন্দ আবাব নিজস্ব সপ্রতিভতাকে ফিরিয়া পায়—চাকবী তো আজকাল পথেঘাটে পড়ে আছে মামা, ভেবো না তুমি—যোগাড় একটা করে নেবো ঠিক।

বলিয়া অনেক যেন সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে মামাকে এবং নিজেরও যথেষ্ট মুখরক্ষা হইয়াছে—এইভাবে হাতের মাস্‌ল ফোলাইতে থাকে।

কিন্তু যামিনীমোহন আব বোকামী করিবেন না—তাই বেশ গম্ভীর ভাবেই বলেন—তোমার ও-সব ছেঁদো কথা রেখে দাও, আসছে রবিবারের মধ্যে বৌমাকে নিয়ে অন্যত্র কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করো গে। নির্ঝঞ্ঝাট হতে দাও আমাকে।

—নির্ঝঞ্ঝাট হতে দাও আমাকে!

—নির্ঝঞ্ঝাট? আমি চলে গেলেই তোমাব সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে—না? বেশ বেশ! যাচ্ছি—আজই যাচ্ছি। নিজের তো রাবণের গুষ্ঠি! তা'দের বেলায় ঝঞ্ঝাট হয় না বুঝি? যত দোষ গোবিন্দর!

পায়ের শব্দে সমস্ত ক্রোধ ব্যক্ত করিতে করিতে নীচে নামিয়া যায় গোবিন্দ।

হঠাৎ কেন জানি না তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিযা পড়ে।

প্রবাদ আছে—এককান কাটা পথের ধার ঘেঁষিয়া চলিলেও দুইকান কাটা মাঝখান দিয়াই চলে। 'যাও' বলিয়া স্পষ্ট হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত যেটুকু চক্ষুলজ্জা ছিল, ইসারা ইঙ্গিত উপহাসের যে হাল্‌কা আবরণ ছিল, সেটুকু খসিয়া পড়ে। কেমন যেন হিংস্র আর বর্বর হইয়া ওঠে লোকে। সুবিধা পাইলেই 'কর্তা'র ব্যবহারের সমালোচনা না করিয়া এখন গোবিন্দর নির্লজ্জতারই আলোচনা চলে।

সুব্রত বলে—এই একটা লোক, গোবিন্দ মামা। আত্মসম্মান বলে কিছু যদি থাকে? ছিঃ! আমি হলে—

সে নিজে হইলে এরকম অবস্থায় কী যে ভয়ংকর একটা করিয়া বসিত সেটা আর স্পষ্ট বলে না, কথার পিছান ড্যাস টানিয়া দিয়া অনুমানকে বিস্তৃত করিবার সুযোগ দেয়।

সুশুভ্রা সুন্দর দাঁতে শুভ্র হাসি ফুটাইয়া গল্প করে—আমাদের বাড়ী অমনি একজন ছিল, বাবার জ্ঞাতি-কাকা। চিরকাল বাবার মাথায় কাঁটাল ভেঙে খেয়ে থেকে ছিলেন, নড়বার নাম নেই, শেষে আমাদের ভাই-বোনের বুদ্ধিতে তাঁকে বিদায় করা গেল। এঁর সম্বন্ধে যে এতদিনে বাবার চৈতন্য হল এও ভালো।

মেজ বৌ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলে—চৈতন্য অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। হয়নি এই

আশ্চর্য।

গীতশ্রী বিরক্ত স্বরে বলে—বাড়ীতে কি আলোচনাব মত অন্য কোন বিষয় নেই? আপদ গেলে বাঁচি বাবা।

মিতভাষিণী বড় বৌ বড় বেশী কিছু বলে না, শুধু থাকিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসে, বদ্রূপ যে কাহাকে করে বোঝা কঠিন।

ছেলেরা হিসাবে তৎপর হইয়া ওঠে—গোবিন্দ বিদায় হইলে তাহার অধিকৃত ঘরখানা গৃহস্থের কোন কাজে লাগানো হইবে। যে লোকসানটুকু বাঁচানো যাইতেছে তাহার দ্বারা নিজেদের কি সুখ-সুবিধাটুকু বজায় রাখা যাইবে।

সারা জগৎ জুড়িয়া যে দৈন্য, মানুষের মনেও তাহার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে বৈকি। ভাত খাইতে যে ভাতের খরচ লাগে—ভদ্রলোকে কে কবে স্বীকার করিয়াছে—চালের চল্লিশ টাকা মণ হইবার আগে? শাক বেগুন হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেকটি জিনিসের যুদ্ধ-পূর্ব মূল্যের হিসাব কষিতে কষিতে মানুষ ভারী হিসাবী আর সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুও বোধ করি চুমুক দিবার আগে বাটির দুধেব দামটা কষিয়া লয়। দুইটা মানুষ কমিয়া যাওয়া মানে যে বেশ কিছু বাঁচিয়া যাওয়া এ বোধটুকু আর হইবে না বয়স্থ মানুষদের?

তবে এত কথা গোবিন্দর কানে যায় না—শোনে গোবিন্দর বৌ। গোবিন্দ যে সেদিন হইতে কোথায় পালাইয়া বেড়াইতেছে সেই জানে। চুপি চুপি ঠাকুরের কাছে আসিয়া কোন ফাঁকে ভাত দুইটা খাইয়া যায়, শুইতে আসে গভীর রাত্রে।

মুরলা হাসে আর বলে—খাওয়াটি বাবুব ঠিক আছে।

রাত্রে মাথার দিব্য দেয় গোবিন্দর বৌ। বলে—'এ ভিটেয় তুমি যদি আর জল-গ্রহণ করবে, আত্মঘাতী হব আমি।

কিন্তু এতবড় কঠিন শপথেও খুব বেশী বিচলিত হইতে দেখা যায় না গোবিন্দকে। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে কনুইয়ের ধাক্কায় বিছানার একপাশে ঠেলিয়া দিয়া খিঁচাইয়া ওঠে—আর আমি শালা উপোস করে মরলে যে বিধবা হবে সে হুঁস আছে? এ ভিটেয় খাবো না?—বলি, রাস্তার ধারে কে আমার জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছে শুনি?

সত্যি। অতবড় শরীরে এই এক অদ্ভুত দুর্বলতা গোবিন্দর, এক-বেলার উপবাসে মাথা তুলিতে পারে না।

রবিবারের সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সে সোরগোল করিতে করিতে আসিয়া হাজির।

—মামী, ঘর ঠিক করে এলাম। খাপরার চাল। তা' হোক, গরীবের তাই ভালো। যার কেউ নেই, তার আবার অত। নাও, তোমাদের বৌকে কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিতে বলো। গাড়ী নিয়ে এসেছি একেবারে।

অবাক হইয়া যান সন্তোষিণী। সত্যই চলিয়া যাইবে গোবিন্দ, এটা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু বারণ করিলে যে শুনিবে না এও নিশ্চিত। নির্মল বলে—'গোঁয়ার গোবিন্দ'। খুব মিথ্যা বলে না।

বাক্স বিছানা বাঁধাছাঁদার ধুমে সারা বাড়ী যেন তচ্‌নচ্ করিয়া বেড়ায় গোবিন্দ।

মান্ধাতার আমলের কার একটা বাঁয়া তবলা ছিল। যামিনীমোহনের সভ্য ছেলেমেয়েরা কোনদিন তাহাতে একটা আঙুলও ঠেকায় নাই। সদ্ব্যবহার করিত গোবিন্দই।

ধূলা ঝাড়িয়া সেই দুটা গাড়ীতে তুলিতে যাইতেই পরিমল বাধা দিয়া কহিল—এ দুটো তুমি নিচ্ছ যে?

—নেবো না? বাঃ! বাজাব না? গোবিন্দ বিস্মিত প্রশ্ন করে।

—দোকানে বাজাবে তো অভাব নেই। এ দুটো থাক বাড়ীতে।

গোবিন্দ ক্রুদ্ধস্বরে বলে—থেকে কি হবে শুনি? বাজাবে তোমরা? একটা চাঁটি দিতে শিখেছ কোনোদিন?

—না বাজাই, চেলিয়ে জ্বালানী করবো—তা' বলে বাড়ীর জিনিস বাইরে যেতে দেব কেন?

কথাটা এত বেশী প্রাঞ্জল যে অতক্ষণ 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া থাকিবার কোনো মানে হয় না, নেহাৎ বোকা বলিয়াই বুঝিতে দেরী হয়।

জিনিস দুইটা সশব্দে উঠানে নামাইয়া দিয়া গোবিন্দ অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলে—দেখলে মামী, মেজদাব আক্কেল? চেলিয়ে পোড়াবেন, তবু আমায় দেবেন না। আমার হিংসেয় মরে যাচ্ছেন সব। আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি! ওঁরা সব নেবেন—আর—

হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। হয়তো রুদ্ধকণ্ঠ একেবারেই জবাব দেয়।

এমন অদ্ভুতভাবে বাড়ী ছাড়াটা দেখিতে খুব মোলায়েম নয় সত্য কিন্তু গোবিন্দর কাছে এর বেশী আর কে আশা করে?

সন্তোষিণী চোখের জল মুছিয়া বলেন—তোর মামার সঙ্গে দেখা হল না—

—বাবা! দেখা হলেই হয়েছে! সামনে দিয়ে বেরোনো যায়? তক্কে তক্কে ছিলাম, মামাও বেরোলো আমিও সুট্ করে ঢুকে পড়লাম। বলিয়াই সন্তোষিণীর পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া গোবিন্দ হঠাৎ চুপি চুপি বলিয়া ফেলে—মামার রাগ পড়লে একটা খবর দিও মামী।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যাশা করিয়াছিল সকলে সাধ্যসাধনা করিবে, মাথার দিব্য দিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিবে।

কিন্তু কই, আস্ত একটা বাড়ীর লোক বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও চৈতন্য হয় না কারুর!

রাগ পড়িলে সন্তোষিণী সত্যই খবর দিতেন কিনা কে জানে! কিন্তু তার আগেই ডাক পড়িয়া গেল যামিনীমোহনের।

ইদানীং অদ্ভুত এক খেয়াল হইয়াছিল যামিনীমোহনের। মুদির হিসাবের খাতার মত খেরোয় বাঁধানো মোটা একখানা খাতায় খুটিয়া খুঁটিয়া জমা-খরচের হিসাব লিখিতেন। উপস্থিত হিসাব নয়, বিস্মৃত অতীতের।

হারাইয়া যাওয়া অন্ধকার কুঠরি হাতড়াইয়া খুঁজিয়া বাহির করিতেন ব্যয় আর অপব্যয়ের আনুমানিক অঙ্ক। সারাজীবন হিসাব করিয়া চলিলে সঞ্চয়ের ঘরের অঙ্ক কত দীর্ঘ হইতে পারিত ছক কাটিয়া কাটিয়া তাহারই ঘর পূরণ করিতেন।

জীবিত মৃত কত লোকেরই নাম উঠিয়াছে তাঁহার অদ্ভুত হিসাবের খাতায়। আচারে অনুষ্ঠানে আদরে আবদারে কম তো লাগে নাই এক একজনের পিছনে? গোবিন্দর নামও আছে বৈকি। "বাজে খরচের" পাতায় আছে। আশৈশব যে খাইল পরিল, খরচের ঘরের অনেকটা জায়গাই, তো তাহার দখল করিয়া থাকিবার কথা। তাই বলিয়া এত বেশী আত্মহারা হইবার কথা নয় যামিনীমোহনের, যে লিখিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবেন?

ঝুঁকিয়া পড়িয়া লিখিতে লিখিতে কখন যে একটু বেশী ঝুঁকিয়াছেন—চিবুকটা ঘষিয়া যাইতেছে

খাতার পাতায়, লক্ষ্যই করে নাই কেহ।

নজর পড়িল স্নানাহারের তাগিদের বেলায়।

না, খুব বেশী হৈ-চৈ আর কি হইবে? ব্লাডপ্রেসারের রোগীর এমনি আকস্মিক মৃত্যুই তো স্বাভাবিক।

হৈ-চৈ করিল গোবিন্দ আসিয়া।

খবর যে কোথায় পাইল সে-ই জানে।—'হাউমাউ' করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল।

পুরুষমানুষের চীৎকার করিয়া কাঁদা যেমন হাস্যকর তেমনি বিরক্তিকর। আর, ধমক না দিলে যে লোক থামিবে না তাহাকে ধমক দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

ধমক খাইয়া চীৎকার বন্ধ হয় বটে, কান্না বন্ধ হয় না। দালানের মাঝখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেয়েমানুষের মত বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে থাকে, সে অভিমান করিয়া চলিয়া না গেলে মামা তাহাকে এমন করিয়া ফাঁকি দিত না।

শোকের প্রথম অবস্থাটা কাটিয়া গেলে সন্তোষিণী ছেলেদের ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, শ্রাদ্ধকার্যের সমারোহটা কতদূর কি হইবে?

পুরোহিতের ফর্দর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চার ভাই ছাঁটাই নীতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছিল, মায়ের প্রশ্নে শুষ্কমুখে উত্তব দিল, যতটা সংক্ষেপে সারা যায়, বাবা তো তাহাদের জন্য ন'শো পঞ্চাশ রাখিয়া যান নাই।

—কিন্তু কাজটা তো ভাল করে চাই বাবা। মানীলোক ছিলেন তিনি, কত ক্রিয়াকর্ম করে গেছেন—

—এমন কিছু বুদ্ধির কাজ কবেননি। যাক গে, তাঁর ছিল করেছেন—আমরা কোথা থেকে করবো?

সন্তোষিণী নিজের স্বভাব অনুযায়ী কথাই বলেন—তা বললে তো হবে না বাবা, যেমন করে হোক করতেই হবে যে। কাঙালী বিদায়, অধ্যাপক বিদায়, বৃষোৎসর্গ—এগুলো না করলে—

কথা অবশ্য তিনি শেষ করিতে পান না—সে সব ব্যবস্থা তা'হলে তুমিই কোরো কোমরের জোর থাকে যদি, আমাদের অত ক্ষমতা নেই, সোজা কথা।

বিরক্তমুখে উঠিয়া যায় চারজনেই।

সন্তোষিণী বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকেন। বোধ করি এত স্পষ্ট সোজা কথা শোনা অভ্যাস নাই বলিয়াই কথার উত্তর যোগায় না।

গোবিন্দ সেই যে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, কয়দিন আর আসে নাই। শ্রাদ্ধের আগের দিন হঠাৎ আসিয়া হাজির। যেখানে গোবিন্দ সেখানেই গোলমাল। চেঁচামেচির শব্দে সন্তোষিণী ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসেন।

—এই যে মামী—গোবিন্দ স্বাভাবিক ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে—মামার 'ছেরাদ্দয়' শুনলাম নাকি কিছুই ঘটা হবে না? কি, সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলে যে—মুখে কথা নেই কেন? বাক্যি হরে গেল নাকি?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সন্তোষিণী বলেন—তোমার দাদাদের জিগগেস করো।

—দাদাদের? ওদের নাম কোরো না আমার সামনে মামী। রাগ চড়ে যাবে আমার। ছোটলোক ছোটলোক, চামার একেবারে, 'শালা' বললেও রাগ যায় না। বলে কিনা পাঁচটি বামুন খাইয়ে 'শুদ্ধ' হবো! বলে কিনা—'না থাকলে কি চুরি করবো?' গয়লা ছোঁড়া সেদিন বাপের ছেরাদ্দয় 'বেরষো' করলে, দেখলিনি তোরা? নাকি চোখের মাথা খেয়েছিলি? ইজের জামা চড়িয়ে আপিস যাওয়ার মুখে মারো ঝাড়ু, বিদ্যের মুখে মারো ঝাঁটা—

সন্তোষিণী শংকিত স্বরে বলেন—তুই চুপ কর গোবিন্দ, ওরা রাগ করবে।

—রাগ করবে তো বয়ে গেল। গোবিন্দ কারুর আটচালায় বাস করে না। এই রইল টাকা—আর যা যা দরকার সব এনেছি ঘাড়ে ক'রে। 'বেরষো' আর ক্যাঙালীবিদেয় এ না হলে চলবে না বলে দিচ্ছি।

কাঁধের বৃষ ও মাথার ঝুড়িটি নামাইয়া নোটেতে রূপাতে একরাশ টাকা গোবিন্দ কোচার খুঁট খুলিয়া ঢালিয়া দেয়।

সন্তোষিণী চকিত হইয়া বলেন—এ সব কি?

—কি আবার? টাকা—

—টাকা তো বুঝলাম—পেলি কোথায়?

—আকাশ থেকে। বলে কিনা, পেলি কোথায়? গয়না বেচলে টাকা হয় এ তো কচি ছেলেও জানে। দিতে কি চায়? গয়নাঅন্ত প্রাণ যে—মেয়েমানুষের মরণ তো? দেখতে মিট্‌মিটে ভালমানুষ, শয়তানের একশেষ। লুকিয়ে রেখে চালাকি করতে এসেছে আমার কাছে! বলি দিয়েছিলো কে? দিলাম ঠেঙিয়ে টিট্ করে।

[১৩৫৪]

দৃষ্টি

গাড়ীভাড়া খরচা করে বড়দি ঊষা বারকয়েক এলেন হাসিকে বোঝাতে, বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে এই সর্বনাশা খেয়াল থেকে। কিন্তু হাসি সংকল্পে অটুট। কিছুতেই যে বুঝবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, তাকে কে বোঝাবে?

হাসির শাশুড়ী ঊষার হাত ধরে মিনতি করলেন, 'বোনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আটকে রেখে যাও মা, আমার অমলের প্রাণটা রক্ষে করো। বৌমা চলে গেলে ও কি একদিনও বাঁচবে?'

ঊষা হতাশসুরে বলে, 'কি করবো মা, এই তো এতক্ষণ পাখি-পড়া করালাম, কিছুতেই নয়! সেই এক জেদ ধরে বসে আছে। কী যে শয়তান ঘাড়ে চেপেছে!'

'শয়তানই বটে মা! আমার ভাগ্যে সে শয়তান যে কোথায় বসেছিল ওৎ পেতে, আমার সোনার সংসার ছারেখারে গেল। অমন চাঁদের মতন ছেলে আমার, গায়ে অসুরের বল, সেজেগুজে আপিস গেল, আর পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফিরলো। এ কি মানুষের ভাগ্যে কখনো কারুর হয়েছে?'

ঊষা নিরুপায় সান্ত্বনার সুরে বলে, 'মানুষের ভাগ্যেই হয় মা, ভগবান যে মানুষের জন্যেই সকল শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন।'

'তাও যেন মনকে প্রবোধ দিলাম,' লক্ষ্মীদেবী কেঁদে ফেলে বলেন, 'আমার অমন গুণের

বৌ কেন অমন হয়ে গেল? এক এক সময় ভাবি, মনের আক্ষেপে পাগল হয়ে গেল নাকি? নইলে যার একেবারে স্বামী-অন্ত প্রাণ ছিল, একবেলার জন্যে চোখছাড়া করে বাপের বাড়ি যেতে চাইত না, সেই স্বামীকে এই দুর্দশা দুর্দিনের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাবে বিদেশে চাকরী করতে! এ কী সহজ মানুষে পারে?'

ছোটবোনের দুর্মতির কথা মনে করে উষার আর কথা যোগায় না মুখে, তাই কথার বদলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

লক্ষ্মীদেবী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার কাতরভাবে বলেন, 'হ্যাঁ মা, ঘাড়ে ভূত না চাপলে কখনো তোমাদের কথা পর্যন্ত এমন অগ্রাহ্যি করে? বড় ভগ্নীপতিকে কতো মান্যভক্তি করে, সকল পরামর্শ শোনে—তাঁর কথা সুদ্ধ কেয়ার করলো না!'

'কই আর করলো মা! আমরা তো দুটো মানুষ হেরে গেলাম।'

'কি বলে কি?'

'বলে আর কি', উষা শুকনো মুখে বলে, 'বলছে, রোজগার করে টাকা পাঠাবে নার্স রাখতে। ওর অফিসের মাইনে তো অর্ধেক করে দিয়েছে—আর তাই বা ক'দিন দেবে বলুন? এই ছ'মাস দিচ্ছে এই ঢের। আরও নয় ছ'মাসই দিক।'

'টাকার কথা যদি বলো মা', লক্ষ্মীদেবী কিছু উৎসাহের সঙ্গে বলেন, 'আমার ঘরবাড়ি বেচেও আমি অমলের চিকিচ্ছে করাবো, আর ছেলে আমার ভালো হয়ে উঠবে না কখনো—ভগবানের বিচারে কি এমনই হবে? অমল ভালো হলে তখন আবার সব হবে।'

এই অসম্ভবের স্বপ্ন যে কোনদিনই সফল হবে না সেকথা লক্ষ্মীদেবী না বুঝলেও উষা বোঝে বই কি। কিম্বা লক্ষ্মীদেবীও বোঝেন হয়তো, শুধু বুঝতে চান না বলেই এই আকাশ-কুসুমের আলোচনা।

উষা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়, 'তা'হলে উঠি মা, হাসি এমনভাবে আমাদের গালে মুখে চুনকালি দেবে একথা কোনোদিন কল্পনাও করিনি। মুখ দেখাবার পথ রাখলো না, ছি ছি! বুঝলাম সংসারে টাকারও দরকার আছে, কিন্তু সে টাকা—তুই যদি নার্সের জন্যেই খরচ করবি, তা'হলে আর স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়া কেন? নিজেই সেবা কর?'

'এই তো মানুষের মতন কথা! বুদ্ধির কথা!' লক্ষ্মীদেবী ঘাড় নেড়ে বলেন, 'আমিও তো চব্বিশ ঘণ্টা তাই বলছি যে, বৌমা, তুমি চলে গেলে মনের আক্ষেপেই ওর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, তখন আর তোমার নার্সেই বা কি করবে, টাকাতেই বা কি হবে? তা'কে শোনে কার কথা!'

'কি বলে আপনাকে?'

'সেই পুরনো কথা যা বলেছে, কারুর অভাবে কেউ কখনো সত্যি করে মরে যায় না মা, হয়তো দেখবেন আমার অনুপস্থিতিতে ওর উপকারই হবে। অনেক সময়ে নাকি বেশী রাগ দুঃখ বা মনোকষ্টে পক্ষাঘাত সেরে যায়। বুঝিও না মা, ওসব কেতাবী কথা। একেই তো বাছা নিজের দুর্ভাগ্যে মরমে মরে আছে, আর কতো মনোকষ্ট চাই?'

লক্ষ্মীদেবীর কথায় অবশ্য যুক্তির বালাই খুব বেশী নেই, বরং হাসির কথাতে কিছুটা আছে। কারণ যেমন আকস্মিক ভাবে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে অমল, তেমনি আকস্মিক ভাবেই হয়তো ফিরে পেতে পারে কোনোরকম দুর্দান্ত মানসিক আঘাতে। পাক না পাক, তবু যুক্তিটাকে খুব অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু সেটাই সত্যিকার কারণ নয় হাসির। কারণ শুনে যে উষার

হাত পা আছড়াতে ইচ্ছে করছে। ছি ছি!

বলে কি না, 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু স্বামীকে ত্যাগ কবার বিধি শাস্ত্রে আছে দিদি, শাস্ত্র খুলে বরং দেখো বাড়ি গিয়ে—'

শোনো কথা!

শাস্ত্র মেনেই সব করা হচ্ছে যেন!

শাস্ত্রে কি না আছে? একটা পুরুষমানুষে একশোটা বিয়ে করতে পারে এ কথাও তো শাস্ত্রে আছে, কই করুক বিয়ে? আব কবলেই লোকে 'ধন্যি ধন্যি' করবে কিনা? আসল কথা, মাথারই কিছু দোষ ঘটে গেছে মেয়েটার!

কথাটা ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, কিন্তু সে ভাবনাটা যে নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা সেটা হাসিকে দেখলে আব বুঝতে দেরী হয় না।

এই তো দেখে এলো উষা, বিদেশে চাকরী করতে যাবার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতে কিছুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না হাসির।

নিজে থেকে গায়ে পড়েই বরং বললো, 'নতুন নতুন শাড়ী ব্লাউস গোছাচ্ছি দেখে অবাক হচ্ছো দিদি? কিন্তু সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে না দেখে বাস্তব অবস্থাটা কল্পনা করো—আমাব স্বামী অসুস্থ, আমার মন খারাপ, অতএব একটা বিদেশ-বিভুঁই জায়গায় একবস্ত্রে গিয়ে উঠলাম! কী চমৎকার! অ্যাঁ?'

এরপরই উষা হতাশ হয়ে উঠে পড়েছে।

তর্কের কাছে তর্ক চলে, ব্যঙ্গের কাছে যে যুক্তিতর্ক সবই অচল।

উষা চলেই গেল।

কিন্তু মেজদি সেজদিই বা ছোটবোনের এরকম অমানুষিক ব্যবহারে একেবারে নীরব থাকবে কেন? খবর পেয়ে চন্দননগর থেকে এলো মেজবোন লীলা। মাসছয়েক আগে এসেছিল একবার অমলের আকস্মিক দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি জানাতে। আর এই।

লীলাকে দেখেও লক্ষ্মীদেবী আর একবার হাঁউমাউ করে উঠলেন, 'এসেছো মা? এই খানিক আগে বড় মেয়ে গেলেন। এই দেখো আমার সব্বনাশের ওপর সব্বনাশ!'

লীলা গম্ভীরভাবে বলে ওঠে, 'দেখুন না, আমি ওর চাকরী করতে যাওয়া ঘোচাচ্ছি—পাগল না মাথাখারাপ! অমলকে এই অবস্থায় ফেলে ওর এক ঘণ্টার জন্যে নড়বার উপায় আছে নাকি! দাঁড়ান না, ওর খেয়ালের ভূত নামাচ্ছি ঘাড় থেকে। কে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে এসব?

'জানি না মা, আমার কপাল। আমার তো মরণ নেই? চারকাল এসেছি, আরও চারকাল থাকবো। পরমায়ুর শেষ নেই।'

নিজের অন্তহীন আয়ুর নির্মমতায় কপালে করাঘাত করেন লক্ষ্মীদেবী।

কিন্তু লীলার আস্ফালন বৃথাই হ'ল।

যে সমস্ত চোখা চোখা বাক্যবাণ তূণে সজ্জিত করে রণক্ষেত্রে এসে হাজির হয়েছিল সে, প্রতিপক্ষের অভূতপূর্ব অস্ত্রে যেন থতমত খেয়ে ভোঁতা হয়ে গেল সে বাণ।

লীলাকে দেখেই হাসি হেসে উঠে বলল, 'এই যে মেজদি, খবর পেয়ে ছুটে এসেছো? নাও বোসো সুস্থির হয়ে, এক পেয়ালা চা খেয়ে নাও বরং। তারপর আরম্ভ করো।'

'আরম্ভ মানে? কিসের আরম্ভ?'

লীলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'কিসের আবার? সুশিক্ষার—নীতিরত্নমালাব উপদেশাবলীর। 'পাপিষ্ঠা হাসি, তোর একি দুর্মতি! তুই আমাদের নাম ডোবালি, আমাদের মুখ হাসালি; তুই বুঝছিস না তুই কি করতে চলেছিস—এরকম গর্হিত কাজ করলে নরকেও তোর ঠাই হবে না'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

খিল খিল করে হেসে ওঠে হাসি।

লীলা বিমূঢ়ভাবে বলে, 'তুই হাসছিস?'

'উপায় কি? ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে যখন পারছি না।'

'কিন্তু ভেবে দেখ', লীলা আরম্ভ করে, 'ভেবে দেখ অমলের মনের অবস্থাটা? তোর কাছে এরকম ব্যবহার পেলে ও হার্টফেল করতে পারে, তা জানিস?'

'ক্ষেপেছো মেজদি? হার্টফেল করা অতো সোজা নয়। করলে সেই দিনই করতে পারতো, যেদিন একটু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে চিরদিনের মতো অকর্মণ্য হয়ে গেলো।'

লীলা হতাশভাবে হাসির মুখের দিকে তাকায়, একি ওর পরিচিত হাসি? চিরদিনের আদুরে ছোট বোনটি?

'তুই না ওকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলি?'

হঠাৎ যেন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে লীলা।

'মনে আছে সেকথা? মেমারি তোমার ভালই দেখছি মেজদি।'

'তোমার মতন পাষাণ তো সবাই নয়। সত্যি আমি ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি, তুই অমলকে ছেড়ে বিদেশে চলে যাবার কথা ভেবেছিস কি করে? একটা সুস্থ-মাথা-লোক এরকম কথা ভাবতে পারে?'

এবার হাসি একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমিও ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি মেজদি, তোমাদের এতো বাড়াবাড়ি শোকের ঘটা দেখে! একটা সুস্থ মানুষকে চিরদিনের জন্যে একটা ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেওয়াই কি ন্যায়ধর্মের নিদর্শন?'

'থাক! ধর্মের কথা আর তুলোনা তুমি।' লীলা আস্তে আস্তে তার হৃতশক্তি ফিরে পায়। বলে, ধর্মমান থাকলে আর এমন সৃষ্টিছাড়া তর্ক তুলতে আসতে পারতে না। যে দেশে—'

'থাক মেজদি, বেহুলা লক্ষহীরার গল্প বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে, নতুন কোনো নজীর থাকে তো বলো।'

'নজীর দিতে আমার দায় পড়েছে। সোজাসুজি বলছি, তোর কথাবার্তা শুনে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে আমার। কিন্তু এতই বয়ে গেছিস, লোকলজ্জাও কি তোর নেই?'

'আছে বলেই তো সময় থাকতে সাবধান হচ্ছি মেজদি। এরপর তোমাদের দরজায় হাত পেতে পেটের ভাত যোগাড় করতে হতো না কি? তাতে লজ্জা ছিল বৈকি!'

'কিন্তু অফিস থেকে তো ওকে মাইনে দিচ্ছে শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছ। তবে পুরো নয় অর্ধেক, কিন্তু চিরদিন তো দেবে না?'

লীলা স্তোক দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে, 'বেশ বাপু, তাহ'লে তখনই না হয় করিস চাকরী।'

'একটু ভুল করছো মেজদি। দুশো টাকার চাকরীটা চিরদিন ধরে অপেক্ষা করে থাকবে না আমার আশায়।'

'কথায় তো চিরদিন ওস্তাদ—কিন্তু এই যে চাকরীর বড়াই করছিস, এ কার দয়ায়? অমল যদি তোকে অত চেষ্টা করে মানুষ করে না তুলতো?'

'তুলেছে নাকি?' হাসি আর একবার হেসে ওঠে, 'মানুষ আর করলো কই? তোমরা তো সবাই বলছ অমানুষ।'

'একশোবার বলবো। কিন্তু কথা হচ্ছে লেখাপড়া শেখানোর। বিয়ের সময় কি ছিলি তুই? ভারী তো একটু ম্যাট্রিক পাশ, অমল না পড়ালে আজ তুই নিজের নামের পেছনে এম. এ. লিখতে পারতিস?'

'এ তোমার বাজে যুক্তি মেজদি। তা'হলে তো বলতে পারো—যেহেতু ওর ভাত খেয়ে এই আটবছর ধরে জীবনধারণ করেছি আমি, সেইহেতু ওর সেবাতেই এ জীবন নিয়োগ করা ছাড়া গতি নেই।'

'নেই তো।'

'তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মেজদি। আমাকে 'আমি' না ভেবে একটা মানুষ ভাবলে দোষ কি? ভাগ্যের অভিশাপে একজন অনড় পঙ্গু হয়ে গেল বলে আর একটা সহজ সুস্থ সবল জীবন অনড় করে রেখে দিতে হবে? তার সমস্ত ভবিষ্যৎ মুছে দিতে হবে একটা কালির পোঁচড়ায়? মাথায় তুলে দিতে হবে মানুষের সমাজের দেওয়া অভিশাপ?'

'তবে আর একটা বিয়ে করগে যা?'

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে ওঠে লীলা।

কিন্তু আশ্চর্য হাসির হাসবার শক্তি। এত বড় গালি খেয়েও হেসে ওঠে, 'তা আর পাচ্ছি কই? অতোটা উন্নতি করে উঠতে পারছি কই? শুধু একটু সরে গিয়ে হাঁফ নিতে চাই মেজদি, ওর সান্নিধ্য ছেড়ে ওর আওতা ছেড়ে। তা' ছাড়া—ভেবে দেখো—উপায় থাকতে, হাত পা থাকতে একটা পঙ্গু মানুষের গলগ্রহ হয়ে থাকাই কি ভালো? এখনো ওর প্রত্যাশায়ই থাকতে হবে অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনে—সেইটাই কি গৌরব?'

'জানি না। এসব কুতর্কের উত্তর নেই আমার কাছে। তবে এও বলছি হাসি, অমলের দীর্ঘনিশ্বাস তোর ভবিষ্যৎ জীবন ছারখার করে দেবে।'

'শাপ দিচ্ছো মেজদি?'

'শাপ নয়, সত্যি কথাই বলছি। এখনো ভেবে দেখ হাসি।'

'নাঃ মেজদি, ভাবাভাবি সব শেষ করে ফেলেছি। ছ'মাস ধরে ভেবেছি। প্রতিটি দিন রাত্রি প্রত্যেকটি ঘণ্টা মিনিট ভাবছি। দেখলাম, এ ছাড়া আর কিছু হয় না। ভালোবাসার খাতিরে বা নীতিধর্মের দোহাই দিয়ে—কোন কিছুতেই মৃতের সঙ্গে জীবিতকে এক সঙ্গে কবর দেওয়া চলে না।'

লীলারও বাক্য হরে যায়।

অতএব চলে যাওয়াই ভালো। ওদিকে ঘন ঘন তাগাদা আসছে ট্রেন ফেল হবার আশঙ্কায়। অমলের সঙ্গে দেখা করবার মুখ নেই। হাসির কুকীর্তির গ্লানি যেন তার দিদিদেরও স্পর্শ করেছে।

'মেয়েমানুষকে চিনলাম—'

গাড়ীতে উঠে প্রথম কথাটি উচ্চারণ করে লীলার বর।...আর আশ্চর্যের বিষয় লীলা থাকে চুপ করে। লীলার দাম্পত্য ইতিহাসে এরকম ঘটনা বোধ করি এই প্রথম। এতবড় অপমান সয়ে চুপ করে থাকা।

লীলা উষা মুখ দেখাতে পারেনি, কিন্তু হাসি দেখাতে গেল দিব্যি স্বচ্ছন্দে। যাবার সময়

গেল বিদায় নিতে।

'আমি তাহলে যাচ্ছি।'

খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললো হাসি।

'সাবধানে যেও,' অমলও সহজভাবেই বলে, 'সব ঠিকমত গুছিয়ে নিয়েছো তো? বাইরে গিয়ে আবার মুস্কিলে না পড়তে হয়—'

'নিয়েছি সব।'

'তবে আর কি—তোমার ট্রেনের সময় হয়ে এলো বোধ হয়।'

'এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী আছে।'

'তা' হোক, কিছুটা আগে যাওয়াই ভালো।'

মিনিট দুই নীরবে বসে থেকে উঠে দাঁড়ায় হাসি, 'তাহলে চললাম?'

'চললাম বলতে নেই, বলতে হয় আসি।' বলেই হেসে উঠলো অমল। বোধ কবি ছ'মাস পরে এই প্রথম।...ছ'মাসের মধ্যে একবারও এমন হেসে ফেলেনি অমল।

কেনই বা হাসবে? ভাগ্যেব বিড়ম্বনায় যার অহরহ দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয়, সে হাসবে কোন সুখে?

শুধু আজকের হাসিটা বোধ করি নিতান্ত ভাগ্যকে পরিহাস।

তবু হাসলো।

আশ্চর্য ঠিক আজকেই, যেদিন শ্রান্ত ক্লান্ত বেচারা হাসি পালিয়ে যাচ্ছে মৌনগম্ভীর অমলের সান্নিধ্য থেকে!

যাক আর কিছু বলবার নেই!

কী বা থাকতে পারে? পথে বেরোবার সময় হিতৈষী আত্মীয়ের যেমন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা উচিত, তা করেছে বৈ কি অমল, ভদ্রতার ত্রুটিও কিছু করেনি। এমন কি 'চললাম' না বলে যে 'আসি' বলতে হয় এটুকুও বলতে ভোলে নি।

তবে আর কি! সত্যিই যদি, তবে আর দেরী করে লাভ কি হাসির।

ঘর থেকে বেরিয়ে কেন কে জানে আর একবার পিছু ফিরে চাইলো হাসি, আর ঠিক সেই মুহূর্তে যেন পাথর হযে গেল।

কী অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে অমল!

ঘৃণা? ভয়? ধিক্কার? ব্যঙ্গ? কি আছে ওর দৃষ্টিতে?

চোখের তারা দুটো অমন জ্বলছে কেন?

কিছুই নয় হয় তো, হাসির মনের ভ্রম মাত্র।

অক্ষম অনড় মানুষ অমনিই চেয়ে তাকে চলন্ত মানুষদের পানে। হয়তো ছমাস ধরেই ওই বকম চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে অমল।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলে হাসি, একঘণ্টা সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়লো স্টেশনের উদ্দেশে।

কিন্তু সেই দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে কেন?

এই তিনশ' মাইল পথ ছায়ার মতো পিছু পিছু আসছে সেই চোখের দৃষ্টি?

হাসি কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে?

দিদিদের সঙ্গে যে এতো জোরালো ভাষায় তর্ক করলো হাসি, সেকি নিজের মনকে আশ্রয়

দিতে? ওকালতি করতে নিজের পক্ষে? কিন্তু সে জোর আর খুঁজে পাচ্ছে না কেন? সেই দৃষ্টি! হাসির মর্মমূলে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে সেই দৃষ্টি! অমলের সমস্ত সত্তা কি দুই চোখের দৃষ্টিতে এসে জড় হয়েছিল? তাই কিছুতেই ভুলতে পারছে না হাসি, মুছে ফেলতে পারছে না মন থেকেও!

এ দৃষ্টি কী কোনদিনই মিলিয়ে যাবে না?

এমনি করে দৃষ্টির পাহারা দিয়ে চিরদিনের জন্যে হাসিকে বেঁধে রাখবে নাকি অমল? অহরহ সম্মুখ থেকে বিদ্ধ করতে থাকবে—থাকবে পিছন থেকে অনুসরণ করতে?

তার চেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কটুভাষায় হাসিকে তিরস্কার করলো না কেন অমল? শুধু চেয়ে থাকলো কেন?

কিন্তু সে দৃষ্টি তো তিরস্কারের নয়!

তবে? তবে?

ঘৃণার নয়, ধিক্কারের নয়, বিদ্রূপের নয়,—তবে কি?

না না, এতক্ষণে বুঝতে পারছে হাসি, চিনতে পেরেছে সে দৃষ্টিকে।

সে দৃষ্টি ঔদার্যের—করুণার—কৃপার। শক্তিমানের চোখ যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অক্ষম দুর্বল মানুষের দিকে।

হাসির অক্ষমতাকে ক্ষমা করেছে অমল করুণা করে।

খাওয়া শোওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে যে অমল চেয়ে থাকতো হাসির করুণার মুখাপেক্ষী হয়ে।...হ্যাঁ, করুণা ছাড়া আব কি? অসহায় দুর্বলকে আর কি করা যায় করুণা ছাড়া? আর আজ অমল কৃপাদৃষ্টিতে চাইল হাসির পানে?

কিন্তু হাসি এ অপমান সইবে কেন?...

কেন লাফিয়ে পড়বে না চলন্ত ট্রেন থেকে?...

[১৩৫৪]

অভাব

দিনের বেলায় অত কথা ভাববার সময় কোথায়?

আঠারো ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে যে কেটে যায় কে জানে। ভাবনা চিন্তা যা কিছু তোলা থাকে রাত্রির নিশ্চিন্ত অবসরের জন্য। অগাধ অবসর নয়—মাত্র ঘণ্টা ছয়েকের ব্যাপার, তবু কম নয়।

আঠারো ঘণ্টা ভূতের মতো খেটে বাকী ছ'ঘণ্টা ভূতের মতোই ঘুমানো উচিত হয়তো, কিন্তু জোর ক'রে সেই সর্বনাশা ঘুমকে তাড়ায় অমিতা। না তাড়ালে বাঁচবে কি ক'রে?

রাত্রিটাও যদি দিনের মতোই অজ্ঞাতসারে কেটে যায়—কাজের চাপে না হোক—নিশ্ছিদ্র ঘুমের চাপে, নিজেকেই যে অমিতা বেমালুম ভুলে যাবে তা'হলে।...ভুলে যাবে—ওরও একদিন ষোল বছর বয়স ছিল।...ছিল গানের নেশা...কবিতা লেখার চর্চা করতো মাঝে মাঝে।...ভুলে যাবে—ওর সেই ষোল বছরে খুশিতে ছলছলিয়ে উঠতো মন, বর্ষার শেষে শরতের প্রথম

সোনালি রোদ দেখলে ইচ্ছে করতো প্রেমে পড়তে।

রাত্রির অন্ধকারে সেই সোনালি দিনের কথা, ভেবে ভেবে মনে রাখতে চেষ্টা করে অমিতা। বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে নিজেকে।

কিন্তু দিনের মেলায় অমিতাকে দেখলে কে বিশ্বাস করবে সে-কথা?

শানানো ক্ষুরের মতো শানানো জিভ নিয়ে সংসারসুদ্ধু সকলকে যেন টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবিশ্যি অনিলের বৌও কম মেয়ে নয়। অমিতার চেয়ে বছর দু'একের ছোট হলেও কথায় কোনোদিন হার মানে না সে। জিভের চাইতে বুদ্ধির ধার তার বেশি, মা-মরা বুড়ী আইবুড়ো ননদের চাইতে সংসারে যে তার দাম আর দাবী দুটোই অনেক জোরালো একথা তা'র অজানা নেই, তাই সকালবেলা ঘুম ভাঙা থেকে শুরু ক'রে দুপুররাত্রে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত ননদ-ভাজে যে আলাপ চলে সেটা আর যাই হোক রসালাপ নয়।

সাংসারিক অনেক খুঁটিনাটি নিয়ে হলেও কলহের প্রধান কেন্দ্র অনিলের ছোটভাই সুনীলকে নিয়ে। 'বুড়ো হাতি মিন্‌সে' হয়েও আজ পর্যন্ত যে একটা পয়সা ঘরে আনতে পারে না সুনীল, এটা রেণুকার অসহ্য। অথচ বিদ্যের জাহাজ নাকি ছেলে!

—অমন বিদ্যের কপালে আগুন—মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে রেণুকা বলে ওঠে—তুমি আর তোমার ছোড়দার বিদ্যের ব্যাখ্যানা কোরো না ঠাকুরঝি, গা জ্বালা করে শুনলে।

অমিতাও মুখঝামটা দিতে ছাড়ে না—গা তো জ্বলবেই, নিজের ভাইদের মতন না হ'লেই গা জ্বালা করে। ভাইদের তো 'ক অক্ষর গোমাংস'!

—তবু তো তারা আপনারা হাত-পা-মাথা খাটিয়ে 'করে' খাচ্ছে গো, কেউ কারুর ভাতে থাকে না। তোমার বিদ্যের জাহাজ ভাইয়ের মতন হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে দু'বেলা ভাতের থালাটির গোড়ায় এসে বসে না। রক্ষে করো বাবা, মুখ্যুই ভালো।

—বলি বৌদি, চব্বিশ ঘন্টা ছোড়দাকে ভাতের খোঁটা দিতে লজ্জা করে না তোমার, বাবা এখনো বেঁচে—

—গোড়া পেড়ে ঝগড়া করতে এসো না ঠাকুরঝি, এককথা বললেই দশকথা শুনতে হবে। বাবা বেঁচে আছেন বলেই কিছু আর মোট মোট টাকা আসছে না ঘরে যে, আদুরে খোকাটি বসে খেলে লোকের গায়ে লাগবে না। এই গুষ্টিবর্গ তো সব সেই একটা মানুষের ঘাড়ে, সেইটুকু বুঝে চললেই আর বেশী কথা শুনতে হয় না।

—মরে যাই! 'সেই একটা মানুষের' দরদে মরছেন একেবারে। দাদা তো আর কারুর আপনার লোক নয়, ওরই একলার!

—আপনার লোকের মতন ব্যাভার দেখলে আর দরদ করবার দরকার হ'ত না, দেখি না বলেই মরা। ব'লে কথায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে নিজের কাজে চলে যায় রেণুকা।

হাতের বঁটিটা নিজের মাথায় বসিয়ে মরতে ইচ্ছে করে অমিতার, কিন্তু অতোদূর আর হয়ে ওঠে না, শুধু হাতের কাছের আনাজপাতিগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুচি কুচি করতে থাকে। আর মিনিট পাঁচেক পরেই ঘুরে এসে রেণুকা বাঁকাচোখে তাকিয়ে বলে—সাধে কি আর দজ্জাল হয়েছি, অনেক দুঃখেই হ'তে হয়। এই যে দু'দিনের তরকারি একদিনে কুটে শেষ করলে ঠাকুরঝি, কাল সকালে আবার রাবণের গুষ্টির পেট ভরবে কিসে? যাকে রোজগার করতে হয় না সে আর বুঝবে কি ক'রে—কতো ধানে কতো চাল!

—রোজগারটা বুঝি আজকাল তুমি করছো বৌদি? তা' একরকম মন্দ নয়। —তীক্ষ্ণ একটা বিষমাখানো হাসি দিয়ে কথাটা শেষ করে অমিতা।

হাসিটা অবশ্য কুমারী মেয়ের উপযুক্ত নয়, কিন্তু চব্বিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ের কাছ থেকে কৌমার্যের কমনীয়তাটুকুই কি আশা করা চলে?...যে-মেয়ে ষোল থেকে চব্বিশে এসে পৌঁছলো—যুদ্ধ আর মহামারী, মন্বন্তর আর 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র আগুনের উপর দিয়ে,...যে মেয়ে অভাব আর অবহেলার বেড়া-আগুনে অহরহ খাক্ হচ্ছে।

আটবছর না আশীবছর? পৃতিবীব ইতিহাসে বিগত আটটি বছরের কী হিসাব লেখা হবে?

বুড়ো অবনীমোহনও কিন্তু ছেলের বৌয়ের দলে।

সুনীলের এই 'বসে খাওয়া' তারও দু'চক্ষের বিষ। জোয়ান ছেলে নীরবে এতো বাক্যবাণ হজম করে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থাকে, এটা চোখ চেয়ে দেখে সহ্য করা সহজও নয়। বৌ আর মেয়ের ঝগড়ার মাঝখানে এসে পড়লেই তাই মেয়েকে থামিযে দেন অবনীমোহন,—তুই থাম দিকি অমি, বুড়ো ঢেঁকির হয়ে ওকালতি করতে আসিস্‌নি। বাবু লাটসাহেব হরদম বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে কাব্যি চিন্তা করছেন! ছ্যা ছ্যা!

রেণুকা শ্বশুরের কান বাঁচিয়ে টেনে টেনে বলে—কি জানি বাবা, শুনতে দু'জনেই এক মায়ের পেটেব, ব্যাভার দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমাব তো মনে হয় একজন সতাতো ভাই। ওমা, সেই মানুষটা উদয়াস্ত খেটে খুন হয়ে বাড়ি এসে বসে আছে—খেলো কি না খেলো দৃকপাত নেই,—'ছোড়দার চা হলো কিনা'—'ছোড়দা খাবার খেয়েছে কিনা'—তারই খোঁজ! অবাক কাণ্ড বাবা!

—'সে মানুষটা'কে তো দেখবার লোকেব অভাব দেখি না বৌদি, ছোড়দাকে আমি না দেখলে খেতে পাবে ও?

—ওঃ, তাই বুঝি ছোড়দাব তদারকি করতে এ বাড়িতে পারমানেন্ট পোস্ট নিয়েছো ঠাকুরঝি?

রেণুকাও হাসিব সঙ্গে যে বিষটুকু ছড়ায় সেটা বাইশ বছরের উপযুক্ত নয়, কিন্তু দোষ দেওয়াই বা চলে কি কবে? অভাব আর অনটনের তীক্ষ্ণ কামড় তাকেও কি সহ্য করতে হচ্ছে না অবিরত?

পৃথিবী যেখানে দিনের পর দিন সংকীর্ণ হয়ে আসছে—আসছে বন্ধ্যা হয়ে, মানুষ কোথায় পাবে উদারতা? পাবে দাক্ষিণ্য?

অমিতা সুনীলের ঘরে এসে ওর মুখের দিকে না তাকিয়েই কটুকণ্ঠে বলে ওঠে—দেখো ছোড়দা, এই অপমানের ভাত ফের যদি খাও তুমি, ভালো হবে না বলছি। গলায দিতে দড়ি জোটে না তোমার? ছি ছি!

সুনীল উঠে বসে হাসতে থাকে, বলে—দড়ি জুটছে না কি করি, দে চা-টাই আপাতত দে—যেটা জুটছে—

—আমি হ'লে নর্দমায় ফেলে দিতাম এই চা।

ঠক্ করে পেয়ালাটা বসিয়ে রাখে অমিতা।

—পাগল হয়েছিস্! একপেয়ালা চায়ের আজকাল দাম কতো জানিস?

—জানবো না আবার! একজন চব্বিশঘণ্টা চোখে আঙুল দিয়ে দিয়ে সে হিসেব বুঝিয়ে ছাড়ছেন। তোমার আমার খাওয়া বাজে খরচ বৈ তো' নয়।

—নয়ই তো।—বলে পেয়ালাটা তুলে নেয় সুনীল।

অমিতা মিনিটখানেক চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তীক্ষ্ণ সুরে বললে—ছোড়দা?

—কি রে?

—আবার তোমার জ্বর হয়েছে?

—জ্বর? ও তো হয়েই আছে।

—তবু তুমি কাউকে বলবে না?

—পাগল হয়েছিস? বলে কী হবে?

—চিকিৎসা-পত্তর কিছু হবে না তাহলে?

—ক্ষেপেছিস! ভাত হয় না, চিকিৎসা!—সখ দেখো মেয়ের!

—এমনি করে পড়ে পড়ে মরতে চাও?

—'চাই' সেকথা তোকে কে বলছে রে বাপু? উপায় কী?

অমিতা একটা ভাঙা টুলে বসে পড়ে বলে—আমি কিন্তু আজ সবাইকে বলে দেবো!

—লাভের মধ্যে হবে—এই বিছানাটাও জুটবে না, সোজা ফুটপাথ দেখিয়ে দেবে সবাই।

—ছোড়দা!

তীক্ষ্ণ একটা জন্তুর মতো আওয়াজ বেরোয় অমিতাব কণ্ঠ থেকে।

—ছোড়দা, তুমি তা'হলে হাসপাতালেই যাও না, তবু তো চিকিৎসা হবে।

—তুই এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ আছিস অমি, হাসপাতালই কি ফুটপাথে পড়ে আছে? কতো কাঠখড় পোড়াতে হয় ওর জন্যে!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে স্বভাবছাড়া মিনতির সুরে বলে অমিতা—চুপি চুপি দাদাকে বলে দেখি না ছোড়দা?

—দাদাকে? সুনীল হেসে ওঠে—বলেছিলাম একদিন।

—বলেছিলে? কী বললেন দাদা?

—বললেন—ও কিছু না, স্নায়বিক দৌর্বল্য। অলসতার ফল।

—তা' বলবেন বৈ কি! কেমন গুরুর শিক্ষা পাচ্ছেন দিনরাত! উঃ, ইচ্ছে করে এ সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাই একদিন।

—আগুন? সে আর তুই নতুন ক'রে কী ধরাবি রে পাগলা মেয়ে। যা পালা এঘর থেকে।

—কেন, তোমার অসুখের ছোঁয়াচকে ভয় করব নাকি আমি?

—না রে, একজনের আসবার কথা আছে।

—কে সে?

—একজন বন্ধু—ডাক্তার।......যেন অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দেয় সুনীল।

—আমি থাকবো।

—তুই আবার কী করবি? না না, যা।

—যাবো না—খুশি আমার।

বলতে বলতেই বন্ধু ডাক্তারটি এসে হাজির হলো।

—ওর কী হয়েছে?

গম্ভীর আর নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করে অমিতা।

—ওর?

ডাক্তার-বন্ধু ঢোঁক গিলে বলেন—এই একটু উইক্ হয়ে পড়ছে, এই আর কি!

—জ্বর হয় কেন?

—ওটাও উইক্‌নেসের জন্যে।......ওর জন্যে কিছু না। এই টনিকটা আনিয়ে দেবেন, আর ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবেন একটু, এই আর কি। ঠিক হয়ে যাবে দু'চার সপ্তাহে। ভাববেন না কিছু,......ডিমটিম ফলটল দুধ-মাখন খাওয়াবেন কিছুদিন...আচ্ছা সুনীল চলি।...

অমিতার উপস্থিতির ভয়েই বোধ করি তাড়াতাড়ি চলে যান ভদ্রলোক।

—অমি, শুনলি তো? ডিমটিম, ফলটল, দুধছানা, মাখন-মিশ্রি! হো হো ক'রে হেসে ওঠে সুনীল।

রান্নাঘরে আসতেই রেণুকা যেন মুখিয়ে ওঠে—থাক্ থাক্ ঠাকুরঝি, কাজে আর হাত দিও না, তোমার পেয়ারের ছোটদার সঙ্গে গল্প করোগে যাও, একলাই পারবো আমি। আশীষদা' কতকাল পরে এসেছে, দুটো খেয়ে যেতে বলেছি। একলা বসে আছে বেচারা—ধড়ফড় ক'রে মরছি, আর উনি সেই যে চা দিতে গিয়েছেন—সে আজও গেছেন কালও গেছেন। এতো যে কিসের গল্প তা'ও জানি না। আমরা তো বাবা বরের সঙ্গে পাঁচমিনিট বই দশমিনিট কথা কইতে পারিনে। ঘুম পায়, হাই ওঠে। ভাইটিও যেমন কুনোবেরাল—

অন্যদিন হলে হয়তো অমিতা একটা কটু উত্তর দিয়ে বসতো, কিন্তু আশীষের নাম শুনে থতমত খেয়ে যায়। আশীষ?...কোন্ আশীষ? ক'টা আবার আশীষদা আছে রেণুকার!

আশীষ এসেছে, আর অমিতা টের পায়নি? আশ্চর্য!

কতক্ষণ এসেছে! অমিতার খোঁজ করেনি!

অনেক প্রশ্ন তোলাপাড়া করলেও একটা প্রশ্নই কবে অমিতা—আশীষদা এসেছেন? জানি না তো, কতক্ষণ এসেছেন?

অমিতার নম্রতায় রেণুকাও কিছুটা নরম হয়—এই তো খানিক আগে। খেয়ে যেতে বললাম। আজ ছ'সাত বছর পরে দেখা, শুধু-মুখে যেতে বলি কি ক'রে?...কী ভয়ানক সব যুদ্ধের গল্প, শুনলে হাতে পায়ে খিল ধ'রে যায় বাবা!...দেখো যদি এই কপির তরকারিটুকু ক'রে লুচি দু'খানা ভেজে নিয়ে যেতে পারো। আলু-বেগুন ভেজেছি আমি, মিষ্টি আনতে গেছেন তোমার দাদা।

দারিদ্র্যের জীর্ণতা ঢাকা দিতে একটু ভালোমতো আয়োজন না ক'রে উপায় থাকে না। আগের দিনের সেই নেহাৎ কলেজে-পড়া আড্ডাবাজ আশীষ তো নয়—জীবনে অনেক উন্নতি ক'রে ফিরেছে আশীষ—অনেক টাকার মালিক হয়ে।

রেণুকা চলে গেল 'ভয়ানক সব যুদ্ধের গল্প' শুনতে, পরিপাটি ক'রে রান্না ক'রে তুললো অমিতা।...আশ্চর্য! তরকারিতে নুন দিতে ভুলে গেল না, পানে চুন বেশি দিয়ে ফেললো না! দিব্যি নিখুঁত ভাবেই সব তৈরি হয়ে গেল।...আড়াল থেকে দেখলো খাওয়া দাওয়া।

দেখা হলো—খাবার পরে, চলে যাবার সময়।

ছেলে কাঁদছে বলে রেণুকা ঘরে চলে গেছে—আর অনিল বেরোল টিউশনিটা ঠেকাতে।...আশীষ মৃদু হেসে পানটা হাত থেকে নিয়ে বললে—ফুরসুৎ হলো?

—হলো।

শুধু এইটুকু বলতে পারলে মুখরা অমিতা।

—তুমি এতো রোগা হয়ে গেছো কেন? বিশ্রী হয়ে গেছো একেবারে!

নেহাৎ অনায়াসে মন্তব্যটা করতে পারলো আশীষ অমিতার সম্পর্কে। অমিতা পারছে না কেন? কই বলতে পারলো না তো, "তুমিইবা এতো মোটা হয়ে গেছো কেন? বিশ্রী হয়ে গেছো একেবারে।"

বলতে না পারুক, বুঝতে ভুল হয় না অমিতার—সত্যিই বিশ্রী হয়ে গেছে আশীষ। শুধু বাইরেটা নয়, ভিতরটাও বিশ্রী রকমের স্থূল হয়ে গিয়েছে তার। চোখের তারায় পড়েছে সেই স্থূলতার ছায়া।

কলেজে-পড়া খদ্দর-পরা চোখের তারায় আলো-জ্বলা সেই ছেলেটিকে আবিষ্কার করা শক্ত এই উগ্র সাহেবটির মধ্যে।

কিন্তু কেনই বা করা যাবে?

পৃথিবীর এই প্রলয়ের দিনগুলো কি ওর ওপর দিয়েও বয়ে যায়নি?

জীবনে উন্নতি করেছে বলে বয়েস বাড়বে না? দারিদ্র্যে বয়স বাড়ে—প্রাচুর্যেও বাড়ে বৈকি!

ওর উগ্র বিদেশী পোশাকটার সঙ্গে মানানসই উগ্র চুরুটের গন্ধটা বারে বারে সেই কথাই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

অনেক দিন আগের এমনি একটা সন্ধ্যা কল্পনা করেতে চেষ্টা করে অমিতা...'স্থান আর পাত্র' আছে অভিন্ন, শুধু কালটা বদলেছে।...ঠিক ওইখানটায় দাঁড়িয়েই সেদিন কুণ্ঠিত গলায় বলেছিল আশীষ—কতো কি দিতে ইচ্ছে করে তোমায়, কিন্তু কী-ই বা আছে আমার?

বুজে-আসা গলায় অমিতা উত্তর দিয়েছিল,...নিজের কাছে যা আছে তাই না হয় দাও না?

ভীরু দুর্বল ছেলে,—পারেনি...হেসে পালিয়ে গিয়েছিল। যে বয়সে হাতে হাতটুকু ঠেকালেই মনে হয় মস্ত একটা অপরাধ, এ সেই বয়সের কথা।

আজকের আশীষ আর একজন।...এর সঙ্গে হয়তো বা প্রেম করা যায়—প্রেমে পড়া যায় না। ওর আলো-নিভে-যাওয়া চোখের তারায় লেখা রয়েছে সেই নগ্ন পরিচয়।

আজকে ইচ্ছে করলে অনেক কিছু দিতে পারে আশীষ—অমিতা যদি চাইতে পারে। চাইলেই দিতে পারে—সুনীলের চিকিৎসার খরচ, পথ্যের দাম—সব কিছু। গায়েও লাগবে না নিশ্চয়। দশ বিশ হাজার টাকা নাকি পকেটেই ঘোরে ওর।

চলে যাবার সময় তবে ওর হাত চেপে ধরবে না কেন অমিতা?

—তোমার তো আজকাল অনেক টাকা, দাও না কিছু?

—টাকা?

আশীষ যেন আছাড় খায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, টাকা!...ওছাড়া আজ আর কী দেবার আছে তোমার? দাও না কিছু?

—কতো চাই?...অন্ধকারে প্রেতের মতো শোনায় আশীষের গলা।

—যা পারো—দুশো-চারশো-হাজার—

অনুচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে আশীষ—অতো নেই কাছে—এই নাও।

অন্ধকার হলেও বুঝতে দেরী হয় না—একটুকরো কাগজ হলেও একশো টাকা আছে ওতে।

একশো! তাই বা কী কম!

তবু তো কিছুদিন ভালো-ভালো খাওয়াতে পারবে সুনীলকে। টনিক কিনবে দু'বোতল।...বৌদির মুখ-নাড়াটা কিছু কমবে।

দু'যুগ পার হয়ে এসেও তবু অমিতা কোনোখানে একটু কাঁচা আছে বৈকি! এ হিসেব নেই অমিতার—টাকা খরচ করলেই হয় না, আয়ের পথটারও হিসেব দিতে হয় সংসারের লোককে।

রেণুকা বলে—কি জানি বাবা, এতো নবাবি কোথা থেকে হচ্ছে! 'ছোড়দা' 'ছোড়দা'—সোনাদানা খাওয়ানো হচ্ছে ছোড়দাকে। কী রাজ্যপদ পেলো ছোড়দা তাও জানি না।...শুনিয়ে শুনিয়ে আরো অনেক কিছু বলে—সাতজন্মে তো সংসারে একটি আধলা দেবার নাম নেই, দু'টাকা যদি রোজগার হয়েই থাকে, সেকি সবটাই নিজের পেটে পুরতে হয়!

সুনীল উপার্জন করলো—একথাও যেমন অসম্ভব, ছাদ ফুঁড়ে টাকা পড়াটাও তো তেমনি অসম্ভব! তাই নানাদিক থেকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মূল অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করে রেণুকা!...

বেশীদিন নয়, দিন কয়েক পরেই হদিশ মিললো। বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে আশীষের সঙ্গে দেখা হয়েছে রেণুকার।

এরপর—বাড়ি এসে সে যদি অমিতাকে মারতে বাকি রাখে সেটা আর অন্যায় কি হয়?

বাকি যে রেখেছে সেই যথেষ্ট। মারাই তো উচিত ছিল।

সমস্ত দিনে জিভের আর বিরাম হয় না রেণুকার।

—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! ছি ছি ছি! শুনে মনে হলো, পৃথিবী দু'ভাগ হও। লজ্জায় মরে গেলাম একেবারে। এই নিয়ে কম টী-টী পড়ে গেছে ওখানে?...আশীষদা যখন হেসে হেসে বললে—'তোর ননদের স্বভাব-চরিত্র ভালো আছে তো রেণু'? তখন যেন বিষ খেতে ইচ্ছে হলো আমার।...হাত ধরে যদি টাকা চাইতেই পেরেছ ঠাকুরঝি, তবে আর—

বাকিটুকু আর বলে না রেণুকা, বোধ করি ঘৃণার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পায় না বলেই কিংবা বাইশ বছর বয়সের ধ্বংসাবশেষ ওর বক্তব্যের দরজা আটকে ধরে।

বাকিটুকু অমিতাই ভাবে।...ভাবতে থাকে দিন আর রাত্রি। স্বভাব! কিসে নষ্ট হয় ওটা? তেমন নষ্ট হয়ে যাবার মতো অভাব কি এখনো আসেনি? তাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে আশীষ? ঘৃণায় লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হ'তে অনুরোধ করেছে রেণুকা!

[১৩৫৪]

দ্বন্দ্ব

বাড়ি দেখে কমলার খুশির আর অন্ত নেই।

অশক্ত দুর্বল শরীর নিয়েও ছেলেমানুষের মতো ছুটোছুটি করতে সুরু করে দেয়। 'দেখ দেখ কী চমৎকার, চারিদিকে সিঁড়ি, দূর থেকে ঠিক যেন একটা রথের মতো দেখতে লাগে। বারান্দার চালাটা কি নিচু গো? হাতে ছোঁওয়া যাচ্ছে যে—'

'আচ্ছা ইঁদারা আর কুয়োতে তফাৎ কি বলো তো? আমি বলেছি 'ইঁদারা' আর তোমার নতুন দাইটা হেসে মরে যাচ্ছে। আহা চিরকাল যদি এখানে থাকতে পেতাম...'

মনোজও হাসে ওর ছেলেমানুষিতে, বলে—'একমাস থাকলেই হয়তো কলকাতার জন্যে মন কেমন করবে। তখন অতিষ্ঠ করে তুলবে আমায়।'

'দেখো! নিশ্চয় আমি মন টেঁকিয়ে থাকব—কলকাতার জন্যে আবার মন কেমন! ভারি

তো কলকাতা। একটা বাড়িতে একশো জন লোক...হাঁফ্ ফেলবার জায়গা নেই।'

'বেশ, খুব হাঁফ্ ফেলো এখানে। কিন্তু বেশী দৌরাত্মি করে হাঁফিয়ে পড়ো না যেন লক্ষ্মীটি! এই এখ্খুনিই তুমি যা আরম্ভ করেছ।'

'বারে, তুমিই তো বলেছিলে এসব দেশে পা দিতে না দিতে গায়ে জোর হয়—তাই হচ্ছে!'

আবার ছুটে আসে, হেসে বলে—'যাই ভাগ্যিস টাইফইয়েডে ভুগলাম, তাই না এত মজা হলো? কি বলো, হাঁগো, তাই না?'

'হ্যাঁ গো তাই'—মনোজ ওকে একটু আদর করে নেয়—'তোমার মজা আর আমার সাজা, এই আর কি। উঃ, তুমি তো ভুগলে টাইফয়েডে, আর আমি? আমার ভোগান্তি তোমার চেয়েও বেশি হয়েছে—কম ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে?'

'ভয় হ'তো আমি মরে যাবো—না? কিন্তু মরলেই বা ক্ষতি কি ছিল?'

'ছি! ওসব কথা বলতে নেই কমু, এসো, দেখিয়ে দাও কি ভাবে তোমার ঘরসংসার গুছিয়ে দেব। একটুও খাটতে পাবে না কিন্তু। ওই দাইটাকে দিয়ে সব করিয়ে নেবে, আর আমি তো একটি পুরাতন ভৃত্য আছিই। তোমার সমস্ত ফরমাস চালাবে এই ভৃত্যটির ওপর বুঝলে?'

'আহা কি কথার ছিরি, ওই জন্যে দু'মাস ছুটি নেওয়া হয়েছে বুঝি?'

'না তো কি?'

'তবে এই নাও নতুন চাকরির প্রথম পাঠ—আমার খোকাটিকে একটু খাওয়ানোর দরকার—স্টোভটা জ্বালতে হবে।'

মনোজ স্টোভ জ্বালতে বসে।

কমলার কথার বিরাম নেই...বসলো এসে মনোজের কাছে, বললে—'আচ্ছা সেই স্টোভ তো জ্বালবেই, আমাদের একটু চা খেলে হয় না?'

'চা? দু'বার চা খায় না দুষ্টু মেয়ে। বরং তোমায় একটু গ্ল্যাক্সো করে দিই—'

'দায় পড়েছে আমার গ্ল্যাক্সো খেতে,'—অভিমানে মুখ ভার করে কমলা বরের কোলের উপর শুয়ে পড়ে—'এখানেও বুঝি তুমি আমায় রুগী বানিয়ে রাখবে? দ্যাখো কি রকম সেরে গেছি আমি, ইচ্ছে করলেই এখন রান্না করে খাওয়াতে পারি তোমায়—'

'অত সুখে কাজ নেই আমার কমলরানী, খেয়ে উপকার করলেই বেঁচে যাই।'

'আচ্ছা দেখা যাবে। এর পর যখন খিদে খিদে করে অস্থির করবো—তখন বকবে হয়তো।'

'বকবোই তো, বকব না? মারা উচিত তোমায়, ওই দাইটা দেখতে পাচ্ছে আর তুমি এরকম অসভ্যের মতন কোলে শুয়ে আছো? ওঠো ওঠো—'

কমলা আরো নিবিড় করে নেয় নিজেকে।

'ভাববে আবার কি? ভাববে এটাই কলকাতার সভ্যতা।'

'সভ্যতার নমুনাটা বেশ দেখাচ্ছো বটে। যাক্ গে—ধারণাটা ভালো করেই এগোক'—বলে মনোজ হেঁট হয়ে কমলার ছোট্ট কপালটির ওপর মুখ রাখে।

উঃ! এই কমলাকে হারাতে বসেছিল সে। দীর্ঘ একচল্লিশ দিন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে, অবশেষে জয় হ'ল প্রেমের। হাড় ক'খানা যখন ফিরে পেয়েছে, আবার তা'তে আনবে নতুন রক্তের জোয়ার, ভরে দেবে সজীব প্রাণশক্তি। স্বাস্থ্যে লাবণ্যে টল্‌টল্ কমলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে জয়লব্ধ ঐশ্বর্যের মত।

কমলাও আদরে আবদারে হয়েছে খুকীর মত, বেঁচে উঠে যেন মনোজকে কৃতার্থ করে দিয়েছে।

তার উপর সংসারের সমস্ত বাধাবন্ধন থেকে দূরে এসে শুধু স্বামীটি সন্তানটি নিয়ে সংসার করার সুখ কি কম?

এত সুখ রাখবে কোথায় কমলা?

যদি না মুখর আনন্দে ঝলমল করবে—বালিকার মত হয়ে উঠবে অস্থির চপল!

যে বাড়ি নিয়ে আনন্দের সীমা নেই কমলার, কি বা অপূর্ব বাড়ি সেখানা?

মোটে দু'খানি ঘর। আর বাইরে ভিতরে দুদিকে খাপ্‌রার চাল দেওয়া নিচু নিচু বারান্দা। শান বাঁধানো উঠোনের মাঝখানে দিব্যি খোলা 'কুয়োতলা'। কিন্তু খোলা হলেই বা ক্ষতি কি? আব্রুর প্রয়োজনও খুব নেই, কারণ বেশ কিছু দূরের মধ্যে এমন কোনো বাড়ি নেই, যাতে অপরের কৌতূহলের খোরাক হতে পারে কমলার স্বচ্ছন্দ জীবনলীলা।

প্রকাণ্ড একটা রুক্ষ মাঠ পার হয়ে যে ছোট গোছের সাঁওতালি বস্তিটা আছে, বলতে গেলে তারাই ভরসা, সেখান থেকেই একটা দাই যোগাড় করে এনেছে মনোজ।

খোকা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে—মনোজ ব্যস্ত হয়ে পেয়ালায় গরম জল রেখে চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে বিদেশের আমদানী দুগ্ধচূর্ণ, মার কাছে শিশুর দাবী দাওয়া কিছু নেই, আগেও ছিল না—এখন তো থাকবেই না।

'কেমন জব্দ? নিজে থেকে নিয়েছ চাকরি...এখন আর রাগ করতে পাবে না—খাওয়াও খোকনকে, আমি মজা দেখি বসে বসে।'

বসে বসে দেখবো বললেও বসে থাকতে পারে না, নেমে যায় উঠোনে যেখানে কুয়োতলায় দাই কাপড়জামাগুলো কাচছে।

'দাই, ও দাই, কুয়ো থেকে জল তোল না দেখি'—

মনোজ কমলার কাণ্ড দেখে হাসবে না রাগ করবে ভেবে পাচ্ছে না, তবু ঈষৎ শাসনের সুরে ঘরের ভিতর থেকে ডাকে—'আচ্ছা কমলা, কি হচ্ছে? দাইটা যে পাগল ভাববে তোমায়।'

'ভাবুক গে। তুমি যে দাই কী ভাববে তাই ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছ!'

...'দাই, এই দাই, তোর নাম কিরে?......'ঝুমরি'? ওমা, ঝুমরি আবার কিরে?......'

খোকনটা ভারি দামাল! হাঁটতে শেখেনি তবু হাঁটা চাই, বড় বড় মাথা আব মুখ, অথচ ছোট্ট ছোট্ট পা-ওয়ালা মানুষটাকে টলতে টলতে উঁচু রোয়াকের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখলে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে না? কমলার মোটাসোটা ছেলেটিকে কোলে করা বারণ, অত কি মনে থাকে? কোলে করে ঘরে আনতেই মনোজ চমকে ওঠে, ছেলে কেড়ে নিয়ে বকতে সুরু করে দেয়—'ছি ছি, তোমাকে কি করে সামলাই বল তো কমলা? তুমি যে খোকনের চেয়েও দামাল হয়ে উঠছো? কি বলে ওকে কোলে তুলে নিয়ে এলে এতটা?'

'আর ও পড়ে গেলে ভালো হ'ত বুঝি?'

'হ্যাঁ খুব ভালো হতো! কেমন চমৎকার বুদ্ধি! ধরে রেখে আমায় ডাকতে পারতে।'

'বাঃ, আমি বুঝি আর কোনদিন সেরে উঠব না? দেখ দিকিন, কি রকম মোটা হয়ে উঠেছি? এই তো আগেকার ব্লাউজগুলো গায়ে আঁটছে না—দেখ না, দেখ—'

বলে ফরসা নিটোল হাতখানি বাড়িয়ে এনে স্বামীর হাতের উপর তুলে ধরে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্বাস্থ্যের লাবণ্যে উজ্জ্বল সুপুষ্ট বাহুটিই ওর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

মনোজ একবার মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো। অসুখের সময় কেটে-ফেলা খাটো পাতলা চুলগুলি আগের মতই ঘন হয়ে এসেছে, পুরন্ত গালের পাশে দুলছে কোঁকড়ানো চারটি ঝুরো চুল।

এ যেন নতুন কমলা। বিধাতাব সৃষ্ট নয়, মনোজের নিজের সৃষ্টি।

খোকন বোধ করি বাবার মুগ্ধদৃষ্টিটা একমাত্র মা'র মুখের উপরই নিবদ্ধ থাকা পছন্দ করছিল না। দু'হাতে বাবার মুখটা টানাটানি সুরু করে দেয়।

—'বাব্‌বা বাব্‌বা বাব্‌বা...'

ছেলেকে বুকের উপর চেপে ধরে আদরে ডবে দেয় মনোজ।—'হ্যাঁগো বাব্‌বা বাব্‌বা, আমার নাকটা খাদ্যবস্তু নয়, বুঝলে মশাই! ওই তোর মা'র নাকটা খেয়ে নে—খুব টিকলো, খুব মিষ্টি।'

'হ্যাঁ, তুমি খেয়ে দেখেছো যে? রাগ ধরে। এখন থেকেই ছেলেকে কুশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একেই তো আমার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালোবাসে।'

মনোজ দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে—'আর তুমি কাকে বেশী ভালোবাসো?'

'আমি? সক্কলের চেয়ে ভালোবাসি—ওই গুঁফো গয়লাটাকে, ভোরবেলায় যে এসে 'বহুজী, দুধ' শব্দে পেটের পিলে চম্‌কে দেয়।'

'হায় ভগবান! আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা গুঁফো গয়লা! কপালে এও ছিল!'

সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্নায় ধোওয়া উঠোনে বেঞ্চি পেতে বসে থাকে দুজনে। খোকন ঘুমিয়ে থাকে ঘবে। আবোলতাবোল অর্থহীন বকুনি কমলাব...খোকন বড় হয়ে কী হবে...ডাক্তার? ব্যারিস্টার? আই সি এস? কমলার ইচ্ছে খোকন দেশনেতা হয়।...ফুলের মালা আর প্রশংসাভারে বিনম্র মানুষটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবে...আস্তে আস্তে ঘুচে যাবে ওর লজ্জার আড়াল, মুছে যাবে বিনয়ের আবরণ, জ্বলন্ত আগুনের মত উত্তপ্ত ভাষায় অসংখ্য জনতাকে জাগিয়ে তুলবে—মাতিয়ে তুলবে...সাধাবণ জনতার সঙ্গে মিশে কমলা দেখবে ছেলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত মুখ...শুনতে শুনতে রোমাঞ্চ হবে ওব গায়ে,...চোখে আসবে অশ্রু।...পাশের লোক ভাববে সেন্টিমেন্ট...ভাববে বক্তৃতার অগ্নিস্রোতে লোহা গলতে সুরু করেছে...জানবে না কমলা কে! জানবে না ওই আশ্চর্য মানুষটি একদিন কমলার কোলে বসে 'আয় আয়' দিয়ে দিয়ে চাঁদ ডেকেছিল...আজও ঘরে ফিরে কোলের কাছে বসে বলবে—'খিদে পেয়েছে মা, বকে বকে গলা শুকিয়ে গেছে।'

মনোজ ধৈর্য ধরে শোনে কমলার পাগলামি; কথা শেষ হলে হেসে উঠে বলে—'রক্ষা করো, আমার এত সাধের খোকনকে বিলিয়ে দিতে চাই না আমি, আমাদের জিনিস আমাদের থাক বাবা।'

'তবে? তোমার কী ইচ্ছে?'

'আমার ইচ্ছে? বেশ মোটাসোটা ভুঁড়িওলা একটি ব্যবসাদার, পাটের নয় তো তিসির গুদোম আছে। পেরকাণ্ড বাড়ি, অগাধ টাকা ব্যাঙ্কে—'

'যাও!' কমলা রেগে মুখ ফিরিয়ে বসে।

'ব্যাঙ্কে টাকা থাকাটা তা'হলে খারাপ? এই ধরো যদি আমারই ব্যাঙ্কে অগাধ টাকা থাকতো, তা খুব খারাপ লাগতো তোমার? বছরে দু'বার করে আসতাম চেঞ্জে, নিজেরই বাড়ি করে রাখতাম ভালো ভালো জায়গায়, তিসির গোলাটা সহ্য করে নিতে পারতে না?'

'তোমার যত সব আজগুবী! দেশনেতা হলে বুঝি আর টাকা থাকতে নেই?'

'হ্যাঁ, দেশের লোকের মাথায় হাত বুলোতে পারলে 'আছে'—কিন্তু আমার মতে তার চেয়ে পাটের গুদামও ভালো। আমার ভাবী বৌমার দিকটাও তো ভাবতে হবে আমায়? ছেলে তৈরি করে তোলা নিজেদের জন্যে নয় কমু, সেই ভবিষ্যৎ অধিকারিণীর জন্যে।'

কথাটা কমলার পছন্দ নয়। খোকন একান্ত তার নিজস্ব। ওর কোনো ভাগীদার কখনো থাকবে এ কমলার অসহ্য।...তাই চাপা দিয়ে দেয় খোকনের ভবিষ্যৎ চিন্তা...বর্তমানের সুখস্রোতে ভাসিয়ে দেয় নিজেকে।

সকালবেলা মনোজ বেরিয়েছে, বেলা এগারোটা বাজে...এখনো দেখা নেই, বেজায় চটে যাচ্ছে কমলা। আজকাল ও এবেলাটা রান্না করছে, 'ইক্‌মিক্‌-কুকার'কে ছুটি দেওয়া হয়েছে, কাজেই এতক্ষণ হাঁড়ি আগলে থাকতে ভালো লাগছে না। তেমনি কী দুষ্টুমি করছে খোকনটা!...কেন যে সেই ভোর থেকে কান্না জুড়ে দিয়েছে ওই জানে...একফোঁটা দুধ খায়নি, অতীব প্রিয় 'বিকু' বা বিস্কুটের টুকরোটুকু পর্যন্ত মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, খায়নি।

মনোজ এলে বাঁচে কমলা।

আরো খানিক পরে মনোজ এলো। রোদে রাঙা মুখ, কেমন যেন আম্‌লে পড়ছে। কমলা অত লক্ষ্য করেনি...আসতে না আসতেই বকে ওঠে...'বেশ লোক তুমি!...কখন বেরিয়েছ? আর এই এত বেলায় আসা? আমার বুঝি ভালো লাগে? খোকনটা আবার তেমনি জ্বালাতন করছে।'

গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে হাওয়ায় মেলে বসে পড়ে, খোকনকে কোলে টেনে নেয় মনোজ, বলে—'ভারি মা হয়েছেন, ছেলে সামলাতে পারেন না! আয় রে খোকন, আমরা বাপ-বেটায় যুক্তি করে তোর মাকে জব্দ করি।...এই, এই, আবার নাক কামড়াবার চেষ্টা? আচ্ছা এত জিনিস খেতে শিখছিস, তবু নাসিকা-ভক্ষণটি ছাড়তে পারছিস্‌ না? কী অসভ্য রে?'

'হয়েছে! ছেলের সোহাগ রাখো।'—কমলা তোয়ালেখানা ছুঁড়ে দেয় স্বামীর গায়ে—'যাও চান করো গে—এত বেলা করলে কেন শুনি?'

'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—মানে এখানকার ডাক্তার, বাড়িটা বেশী দূর নয় এখান থেকে, এতদিন দেখিনি এই আশ্চর্য। চমৎকার লোক, যদিও বেহারী, তবে বাংলাও মন্দ বলেন না, তোমার সঙ্গে ভাব করিয়ে দেব বলে একদিন নেমন্তন্ন করে এসেছি।'

'হিন্দুস্থানীর সঙ্গে আবার ভাব!'

কমলা মুখ উল্টোয়।

'আরে বাপু ডাক্তার মানুষের সঙ্গে একটু ভাব করা ভালো—বিদেশে হঠাৎ যদি কিছু দরকার পড়ে—'

'থাক্‌, আর ডাক্তারকে দরকার পড়ে কাজ নেই। এই দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল আসা হয়েছে, আর ক'দিনই বা থাকতে পাবো? খুব জোর দিন পনেরো ষোল। এর মধ্যে আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ কি?'

মনোজ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়, ভদ্রলোককে সে বার বার বলেছে আসতে। বলে—'ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'একটা কথা বলা বা এক পেয়ালা চা করে দেওয়ার মধ্যে ঝামেলার কী আছে?'

'তা কি বলছি? আমার কাছ থেকে তোমাকে খানিকক্ষণ কেড়ে নেবে তো? অনর্থক দুজনের মাঝখানে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি। আর ক'দিনই বা! কলকাতায় ফিরে গেলেই তো হয়ে গেল!

সব সুখ ফুরোবে!'

'ছি কমলা, অমন কথা মুখে আনতে নেই। সুখ জিনিসটা কি বাইরের ঘটনা? তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই বা কার আছে?...কিন্তু দেখ, খোকনের শরীরটা তেমন ভালো নেই বোধ হয, গা-টা যেন গরম-গরম লাগছে...ঘুমিয়েও পড়লো।'

স্নান করে এসে খেতে বসলো বটে, কিন্তু খেতে ভালো করে সেও পারলো না।...শরীর মন দুই তেমন সুবিধে নই। খোকনটার জ্বর হ'ল? এই এতদিন এসেছে, একদিনের জন্যে কিছু হয়নি, বরং জল হাওয়ার গুণে দিন দিন বেড়ে উঠছিল, রীতিমত ওজনে ভারী হয়ে গিয়েছিল ইদানীং।

মনটা মনোজের একটু মেয়েলি। এই চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।...আজকেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, আর আজই জ্বর হ'ল খোকনের? হয়তো বেড়ে উঠবে অসুখ...মারাত্মক কিছু হবে না তো? ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তো?

কমলার মুখ থেকেই বা হঠাৎ অমন অশুভ কথাটা বেরোল কেন?...হে ভগবান! ছোট প্রাণের ছোট সুখটুকু কেড়ে নিও না যেন...

'তুমি যে কিছুই খেলে না?'...কমলা দুধের বাটিটা পাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে—'পিত্তি পড়ে গেছে বোধ হয়—দেখ ভাত ভালো না লাগে দুধটুকু খাও শুধু।'

'দুধও খাবো না, মোটে ইচ্ছে করছে না। শোনো, উনুনে আগুন আছে?'

'কেন?'

'একটু নুনজল করে দাও তো, কয়েকটা 'কুল্লি' করি, গলাটায় কেমন ব্যথা করে উঠলো।'

সন্ধ্যাবেলা আজও দুজনে উঠোনের বেঞ্চিতে বসেছিল, কিন্তু মুখরতা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। খোকনের জ্বর আর নিঃঝুম ভাবটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। অত অল্প জ্বরে অত নির্জীব হয়ে পড়েছে কেন ছেলে? কাঁদছে তাও যেন দুর্বলভাবে, দুর্দান্ত দস্যি ছেলের দুষ্টুমিতে অস্থির হয়ে উঠতে হয়, কিন্তু সে ছেলে এক মুহূর্ত শান্ত হয়ে থাকলেও তো ভালো লাগে না।...কেমন যেন একটা অশরীরী আতঙ্ক প্রেতের মতো ছায়া ফেলেছে মনের কোণায়...তাড়াবার চেষ্টা করলেও যেতে চাইছে না! বাচ্চা ছেলে, অসুখ-বিসুখ তো করবেই...একবারও অসুখে না ভুগে ছেলে মানুষ করা যায়?...এ যে মনোজের অন্যায় আবদার...তা ছাড়া সামান্য একটু জ্বরে এত দুশ্চিন্তার কী আছে? জোর করে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে মনোজ।

কিন্তু দুশ্চিন্তাও তো ইচ্ছে করে করছে না সে...এমনি বসে থাকতে থাকতে সেই আতঙ্কের ছায়া মন থেকে সংক্রামিত হচ্ছে পারিপার্শ্বিকতায়...ছড়িয়ে পড়েছে গাছেপাতায় সামনে পিছনে...ম্লান জ্যোৎস্নায়-ছাওয়া বিষণ্ণ প্রাঙ্গণে...দরমার ঘের-দেওয়া 'কুয়োতলার' ঘন অন্ধকার কোণটায়...দীর্ঘছায়া ফেলে কে যেন বসে আছে, কোথায় যেন তার হিমশীতল নিশ্বাস আসন্ন শীতের শিহরণের সঙ্গে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠছে সর্বাঙ্গে।

মনোজ ভাবে...হয়তো ফিরে যাবার দিন নিকটবর্তী হয়ে আসছে বলেই এই অজ্ঞাত বিরহ। মনের মধ্যে আনাগোনা করছে একটা বিচ্ছেদের সুর, গুটিয়ে নিতে হবে 'তল্পি তল্পা'...ভেঙ্গে ফেলতে হবে সাজানো সংসার...করতে হবে যাত্রার আয়োজন।

যেতে হবে...যেতে হবে...পড়ে থাকবে এই ঘরদুয়ার বারান্দা তাদের অনেক সুখের স্মৃতি বুকে নিয়ে। দেয়ালের গায়ে অসংখ্য জায়গায় খোকনের ছোট্ট হাতের ছাপ, তেলকালি আলতা

সিঁদুর ভিজে উঠোনের কাদার। 'পরের বাড়ি' বলে হিতোপদেশে সামলাতে পারা যায় নি তাকে।

মলিন জ্যোৎস্নার চাদর বিছানো মূক প্রাঙ্গণ রহস্যময় আকাশের পানে মৌন দৃষ্টি মেলে নিঃশব্দে পড়ে থাকবে। মুখর হয়ে উঠবে না তাদের দুজনার প্রেমগুঞ্জনে, কমলার কলহাস্যে।

যাবার সময়—এই অনেকদিনের অনেক স্মৃতিমণ্ডিত বেঞ্চিখানা তুলে রেখে যেতে হবে ঘরে। তারপর ধীরে ধীরে এই বাড়ির চেহারা যাবে বদলে। বারান্দার, ঘরের মেঝেয় পড়বে পুরু ধূলার আস্তরণ, জানালা দরজার কপাট আটকে যাবে অব্যবহারে। যেমন দেখেছিল দেড়মাস আগে এসে।

হঠাৎ কমলা ওর একখানা হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে—'ঘরে চলো, ভয় করছে।'

ভয় তো মনোজেরও করছিল, কিন্তু ব্যক্ত করে না সে-কথা ভীরু কমলার কাছে। সস্নেহে বলে—'চলো যাই, কিন্তু ভয় কিসের?'

'কি জানি কেমন গা-ছম্‌ছম্‌ করছে—খোকন একলা রয়েছে।'

অথচ কমলাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বসেছিল মনোজের আপত্তি সত্ত্বেও, ছেলেকে একলা রাখতে হলে আগলাবার কৌশল সে জানে। বালিশের তলায় চাবি রেখে দিলে ছেলেকে কারুর ছোঁবার জো আছে নাকি? শিশুর যারা অনিষ্ট করতে চায় তারা সব করতে পারে, পারে না শুধু লোহা ছুঁতে। এ তথ্য শিখেছে সে ঠাকুরমার কাছে। তবু ওর গা ছম্‌ছম্‌ করছে।

মনোজ উঠে দাঁড়িয়ে একটা আলস্য ভেঙ্গে বলে—'চলো যাই—আর ঠাণ্ডা লাগাবো না, গলার ব্যথাটা তো বেশ বেড়ে উঠেছে দেখছি, শরীরটাও ভালো ঠেকছে না, আমারও না জ্বর হয়!'

'আর কি, খুব করে ভয় দেখাও আমায় দুজনে মিলে!'

'ভয় আর কি—অসুখ হয় না মানুষের? যাক গে, আমার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, লোহার শরীর টস্‌কাবে না। দেখি খোকনের যদি সকালে জ্বরটা না ছাড়ে, একবার সেই ডাক্তারটিকে ডেকে আনবো।'

কিন্তু ডেকে আনবার সামর্থ্য সকালে আর রইল না মনোজের। জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকলো...খোকন আর খোকনের বাবা। বেচারা কমলা, কী করেছে সে—শুধু একটু বার্লি করে খাওয়ানো ছাড়া? ডাক্তারের বাড়ি সে চেনে না। চিনলেও এই দুটি অর্ধঅচেতন রোগীকে ফেলে রেখে কোথায় যাবে? কে বসবে রোগীর বিছানায়? কলকাতার বাড়ির সেই অবান্তর মানুষগুলোও এখন যেন রীতিমত দামী হয়ে উঠছে কমলার মনের কাছে।

শেষ পর্যন্ত সাঁওতালী মেয়েটা। বুড়ি দাই কাজ করে গেছে—আর দয়াপরবশ হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে মেয়েকে। মায়ের সঙ্গে আগে একদিন এসেছিল......খোঁপায় ফুল গোঁজা, গোছা-ভর্তি কাঁচের চুড়ি হাতে, ছিটের ব্লাউজ আর রঙিন শাড়ি পরা এই উদ্ধত যুবতী মেয়েটাকে দেখে সেদিন হাড় জ্বলে গিয়েছিল কমলার। আরো গিয়েছিল তার কথা শুনে—পরিপাটি বাংলা কথা।...এ বাড়ির পূর্বতন বাসিন্দাদের কোনো এক প্রেমিক যুবকের সঙ্গে তার অবৈধ সম্বন্ধের ইতিহাস ইশারায় ব্যক্ত করে হেসে কুটি কুটি একেবারে। এমন খাসা বাংলা শিখেছে সে তার সেই প্রণয়ীর কাছে।...কমলা চটে গিয়ে আড়ালে দাইকে বলে দিয়েছিল, 'মেয়েকে আর এনো না দাই, বাবু এসব পছন্দ করেন না।'

কিন্তু আজ যখন দাই প্রস্তাব করলো, তাকে আগলাবার জন্যে মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে—'না' করবার ক্ষমতা থাকলো না কমলার।

মাথায় ফুল গোঁজা, কাঁচের চুড়ি পড়া এই প্রগল্‌ভ মেয়েটাই যেন মস্ত ভরসা মনে হ'ল। মনোজ সকাল থেকে ভাবছে ডাক্তারের কথা, কোনো প্রকারে খবর দেওয়া যায় কিনা...কিন্তু দেবে কে? সকাল থেকে অনেকবার চেষ্টা করেছে ওঠবার জন্যে কিন্তু ক্রমশই সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। ডিপথিরিয়া কেস্। নিজেই অনুভব করেছে সে, একই দুর্দান্ত রোগ গ্রাস করতে এসেছে বাপ ছেলে তাদের দুজনকে। কিন্তু আশ্চর্য! এত বড় মানুষটার এ কী ছেলেমানুষী রোগ? এমনও হয়? শেষকালে কিনা খোকনের সঙ্গে মনোজের সুদ্ধ ডিপথিরিয়া! লোহার মত শরীর...অটুট স্বাস্থ্য...ভেঙে পড়লো এই ঘণ্টাকয়েকের আক্রমণে?

খোকন? ছোট্ট খোকন কতটুকু যুঝতে পারবে সে, মৃত্যুর সঙ্গে? বিনা চিকিৎসার সঙ্গে?...ডাক্তার...ওষুধ...ইনজেকসান-সিরাম...নানা চিন্তা ভিড় করছে ওর দুর্বল মস্তিষ্কে...কিন্তু বুজে আসছে গলা, কণ্ঠনালী চেপে ধরে কে যেন শ্বাসরোধ করে ফেলতে চায়! তবু জোর করে ঠেকিয়ে রাখতে চায় চৈতন্যের অবলুপ্তি...কে আনবে ডাক্তার, কে বাঁচাবে খোকনকে?...কমলাকে কে দেখবে তার নিজের মৃত্যু হ'লে?...প্রতিবেশীর কোলাহল সইবে না বলে কেন বাসা করেছিল লোকালয়ের বাইরে?...কমলার কী হবে?...খোকনের কী হবে?...

বিকেলের দিকে ডাক্তার ভদ্রলোক নিজেই এলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। লম্বাচওড়া প্রকাণ্ড মানুষটি, হাসিখুশি মুখে খাদির টুপিটি মাথা থেকে খুলে সাইকেলের হ্যান্ডেলে আটকে রেখে টুংটাং করে সাইকেলের বেল বাজাচ্ছেন...ভিতরের লোকের লক্ষ্য আকর্ষণের আশায়। হঠাৎ সাঁওতালী মেয়েটা বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা জানালো।

ভদ্রলোক প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে গেলেন...তারপরই জেগে উঠলো ভিতরকার চিকিৎসক। দুটি রোগীকেই পরীক্ষা করে দেখলেন নানাভাবে...নাঃ, সন্দেহের কিছু নেই। ডিপথিরিয়া কেস...কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের এলাকার মধ্যে আছে কি এখনো?...আর কোথায় বা সেই অমোঘ ঔষধ? যুদ্ধের আগুনে বড় বড় শহর থেকে যে সব জিনিস বাষ্প হ'যে উড়ে গেছে!...সে দুষ্প্রাপ্য জিনিস কোথায় মিলবে এই অখ্যাত গ্রামে? সংগ্রহ করবার চেষ্টাই বা করবে কে?

হায় ঈশ্বর, এমন বিপজ্জনক অবস্থাতেও মানুষ পড়ে?

কিন্তু সত্যিই সুস্থ হাত পা থাকতে—দুটো দুটো মানুষকে মরতে দেখা যায় না বসে বসে! করতেই হবে কিছু...কোনো আশা না থাকলেও অসম্ভবের আশায় ছুটোছুটি করতে হবে, নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া যা হয় কিছু করা।

'আপনি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবেন?'

'আপনি চলে যাবেন?'...কমলা যেন শিউরে ওঠে। ডাক্তার আসার পরে ডাক্তারের হতাশ মুখ দেখে রোগের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে...তবু ডাক্তার আছেন। অনেকটা বুকের বল। একটা কিছু উপায় হবেই...চাঙ্গা হয়ে উঠবে খোকন আর মনোজ, হয়তো একটু পরেই ক্ষীণকণ্ঠে আদেশ করবে...'ডাক্তারবাবুকে একটু চা করে দাও না।'...খোকন তার মোমের মতো ছোট্ট হাত পা নেড়ে খুদে খুদে দাঁতে হাসবে আর ডাকবে, 'মাম্ মা মাঃ'।

কিন্তু কই? এ যে ক্রমেই নীল হয়ে আসছে।...এ কি সন্ধ্যার ছায়া? না তার ভয়ার্ত মনের ভ্রম? দেবদূতের মতো—ডাক্তারের হঠাৎ আর্বিভাবে যে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল, সে-বিশ্বাসের মূল ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছে কেন?...তাই ব্যাকুলকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো...'আপনি

চলে যাবেন না ডাক্তারবাবু।'

'সিরামের খোঁজ করতে হবে যে...অবশ্য পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত।'

'ডাক্তারবাবু! ওরা...দুজনেই...?'

কমলার উদ্যত কান্নাকে ধমকের চোটেই বন্ধ করে দেন ডাক্তার,—'চুপ করুন, থামুন, অস্থির হবার সময় নয় এটা। মনকে তো কঠিন করতেই হবে...টেলিগ্রাম করবার দরকার আছে? যদি বলেন—'

টেলিগ্রাম?...টেলিগ্রাম তো করতেই হবে! কী আশ্চর্য! এতক্ষণ মনেই পড়েনি একথা! মনোজের মা-বাপ ভাই-বোন কোথায় তারা সব? তাদের কাছ থেকে যে একলা কমলা নিয়ে এসেছে তাকে, সে কি অনধিকার-চর্চা নয়?...এরপর জবাবদিহি দেবে কী?—'হ্যাঁ হ্যাঁ করে দিন...এই যে ঠিকানা আর টাকা...অনেক ধন্যবাদ আপনাকে—'

'ধন্যবাদের সময় আসেনি এখনো, সাবধানে থাকবেন, লক্ষ্য রাখবেন উভয়ের ওপর'—ডাক্তার সাইকেল নিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যান।

বিকেল গড়িয়ে নামলো সন্ধ্যা...তারপর ভয়াবহ রাত্রি...মাঝে মাঝে অসহায় শিশুর অস্ফুট কাতরোক্তি আর মনোজের অস্বচ্ছন্দ নিশ্বাস পতনের ভারী শব্দ ছাড়া টুঁ শাব্দ নেই। বাচাল সাঁওতালী মেয়েটা পর্যন্ত স্তব্ধ গম্ভীর মুখে অবিরাম পাখা চালাচ্ছে।...কিন্তু কোথায় ডাক্তার? কে আনবে মৃতসঞ্জীবনী?

প্রায় নটার সময় আবার বেজে উঠলো সাইকেলের বেল্।

ডাক্তার এসেছেন।

'মাত্র একজনকে বাঁচানো যাবে'—বাংলাভাষা বটে তবে উচ্চারণের ভঙ্গিতে বেহারী 'টান' স্পষ্ট। কমলা কি শুনতে কিছু ভুল করেছে? কী বলছে ডাক্তার?...'ওষুধ পাওয়া যায়নি?'...প্রশ্ন নয়, একটা আর্তনাদ।

'পাওয়া গেছে, আবশ্যকের উপযুক্ত নয়। মাত্র একজনকে দেওয়া যাবে।'

ডাক্তার ইনজেক্শনের যোগাড় করতে থাকেন।...হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু সময়, যেন কমলাকে বিবেচনা করবার সময় দিতে।

'আমার শেষ শক্তি পর্যন্ত ব্যয় করেছি—'

'তা'হলে কী হবে?'

শুধু এইটুকুই বলতে পারে কমলা।

'একজনের জন্যে শেষ চেষ্টা দেখতে হবে—বলুন কাকে দেব?'

এ আবার কী অসম্ভব প্রশ্ন? এর উত্তর দিতে হবে কমলাকে? যে-কমলা খাটো চুল দুলিয়ে হেসে খেলে গান গেয়ে বেড়ায়? মিনিটে মিনিটে মনোজের ওপর অভিমান করে?...এটা কি সত্যই একটা প্রশ্ন?...এটা কি বাংলাভাষা?

'দেখুন, প্রত্যেক সেকেণ্ডে রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে—মিথ্যে দেরী করে লাভ কী? মিষ্টার চৌধুরীকেই দেওয়া যাক?'

'আর খোকা?'

যেন মৃতের কণ্ঠ থেকে একটা অসাড় শব্দ বেরিয়ে এল।

'কিন্তু দুজনের মতো যে নেই।'—ডাক্তার হতাশভাবে মাথা নাড়েন। 'একজনের আশা ছাড়তেই হবে।'

কমলা কি জড়পদার্থ? কথার উত্তর দিতে পারছে না কেন? আঙুলটি পর্যন্ত নাড়বার ক্ষমতা চলে গেছে যে!

ডাক্তার সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যান মনোজের কাছে।...সাঁওতালী মেয়েটা তৎপর হয়ে উঠেছে।...কমলার কোলে খোকন...এতক্ষণ গেঙিয়ে গেঙিয়ে এইবার চুপ করে গেছে...শুধু খোলা হাওয়া...বুকভরা একটু নিশ্বাস নেবার জন্যে একটা মর্মন্তুদ আকৃতি।...কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে এই নিষ্ফল চেষ্টা।...থেমে যাবে শেষ স্পন্দনটুকু, মাতৃহৃদয়ের সমস্ত আকুলতা দিয়েও আটকাতে পারবে না কমলা। খোকন...খোকন...লুপ্ত হয়ে যাবে এই নাম—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে এই ছোট্ট ফুলটি!

'ডাক্তারবাবু'—কমলা খোকনকে কোল থেকে নামিয়ে উন্মাদের মতো ছুটে এসে ডাক্তারের হাত চেপে ধরলো।

কিন্তু মনোজ তো সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায়নি। শুধু কথা কইবার ক্ষমতা নেই বলেই চুপ করে আছে।

'আপনি কি উন্মাদ হয়ে গেলেন মিসেস্ চৌধুরী, হাত ছাড়ুন, আমার কর্তব্য করতে দিন আমাকে।'

'আর খোকন? এই অসহায় শিশুটিকে বাঁচানো আপনার কর্তব্য নয় ডাক্তারবাবু?'

'হায় ঈশ্বর! দেখতে পাচ্ছেন আমি নিরুপায়!'

'আমায় মেরে ফেলুন ডাক্তারবাবু, দয়া করুন আমায়।'

সিরিঞ্জটা নামিয়ে রেখে কমলার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ডাক্তার হতাশভঙ্গীতে চেয়ারের পিঠে নিজেকে এলিয়ে দেন।—হায় ভগবান! এ রকম অদ্ভুত অবস্থায় কোনো চিকিৎসককে কখনো পড়তে হয়েছে? কী প্রয়োজন ছিল ডাক্তারের আজই বেড়াতে আসার?

'আপনি তাহলে শিশুটিকেই বাঁচাতে চান?'

গম্ভীর প্রশ্ন করেন ডাক্তার।

হঠাৎ সাঁওতালী মেয়েটা অবোধ্য ভাষায় তীব্র চীৎকার করে ওঠে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার সে বুঝতে চেষ্টা করছিল এতক্ষণ। বাংলা বলতে হয়তো পারে সে, কিন্তু এখন উত্তেজিত অবেগে যা বললো সেটা সম্পূর্ণ দেশজ ভাষা।

ডাক্তার খাড়া হয়ে বসে কমলাকে উদ্দেশ করে বললেন—'ও কী বলতে চাচ্ছে জানেন? বলছে...সন্তান হাবালে আবার সন্তানের আশা আছে—কিন্তু স্বামী হারালে?—আর দেরী করতে পারছি না আমি, আপনি পাশের ঘরে চলে যান, ভগবানের উপর ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে।'

'খোকনকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।'

'আমি একজন পাগলের কথা শুনতে রাজী নই।' ডাক্তার দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করে নেন নিজেকে...'এক্ষেত্রে প্রাণের মূল্য বিচার করা ছাড়া উপায় নেই, মিস্টার চৌধুরীকে আমি অনেক বেশী মূল্যবান মনে করছি।'

মনোজের কাছে যেতেই সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মনোজ ডাক্তারের হাতটা সরিয়ে দিলো...খোকন—খোকনই ভোগ করুক পৃথিবীর আলো বাতাস...নূতন দিনের সূর্য।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে...ছোট্ট বাচ্চাটির কাছে হেঁট হয়ে বসলেন—'বেশ, আপনাদের যা ইচ্ছা। অনেক লেট হয়ে গেছে, কাজ হবে কিনা কিছুই বলা যায় না। এখনো বিবেচনা করুন, আপনি কাকে চান? 'আপনার হাজব্যান্ডকে, না এই বাচ্চাকে?'

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে কি দিতে হয়েছে এই অস্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর? কাকে সে চায়—স্বামী না সন্তান? কে তার কাছে অধিকতর মূল্যবান?

'ভেবে দেখুন আপনার ভবিষ্যতের অসহায় অবস্থা! এই বাচ্চাটি রক্ষা করতে পারবে আপনাকে? হয়তো এও মারা যাবে, যুদ্ধ করবার ক্ষমতা এর মধ্যে কতটুকু?'

হায়! হায়! ক্ষমতা নেই বলেই না কমলার সমস্ত হৃদয় বিগলিত স্নেহে ওকে রক্ষা করতে চাইছে!

নিজের প্রয়োজনের মূল্যটাই সবচেয়ে বড়?

'আপনি একেই দিন।'

কমলার স্বরটা কিছু স্বাভাবিক শোনালো, মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে হয়তো।

'বেশ। আমার বিবেকের বিরুদ্ধেই যেতে হচ্ছে আমাকে।'

এতটুকু একটু শিশু, ও তো ডাক্তারের কাছে একটা মাংসপিণ্ড বৈ আর কিছু নয়।...প্রায় অধৈর্য হয়েই ডাক্তার চটপট দিয়ে ফেলেন ইন্‌জেকসান। সাঁওতালী মেয়েটা দুই চোখে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বেলে তাকিয়ে আছে সেই অসহায় মাংসপিণ্ডটার পানে।

পাখার বাতাস করতেও আর মনে নেই ওর।

রাত্রে ডাক্তারকে থাকতেই হবে, ঘণ্টাকয়েক পরে আবার একবার চালাতে হবে যমরাজের বিরুদ্ধে অভিযান। কিন্তু কে হার মানবে! মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে...ঘর থেকে বাইরে...উঠান থেকে বারান্দায়। 'খস্ খস হিস্ হিস্' সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে। সমস্ত শিরায় শিরায় জীবন্ত প্রাণী কয়টির চলমান রক্তস্রোতও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে সেই শব্দে। দেয়ালের গায়ে দীর্ঘ ছায়া...মৃত্যুর দূত অপেক্ষা করছে সময়ের, সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে প্রভুর অনির্বাণ ক্ষুধার আহুতি।...রাত্রি কত দীর্ঘ! যুগযুগান্তর ধরে যেন এই রাত্রি নেমেছে পৃথিবীর বুকে...চেপে বসে আছে বিরাট পাহাড়ের মতো। এ রাত্রির শেষ নেই।

কিন্তু কমলার কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেল?

দ্বিতীয়বার ইনজেকশনের জন্য প্রস্তুত ডাক্তারের হাত চেপে ধরেছে কেন আবার?

'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু আমায় ক্ষমা করুন, এঁকে দেখুন, বাঁচিয়ে দিন আমার স্বামীকে—আপনার পায়ে পড়ছি ডাক্তারবাবু, রক্ষা করুন আমার স্বামীকে, আমার স্বামীকে! ছেলে চাই না আমি—ওকে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিন।'

'পাগলের প্রলাপ শোনবার জন্যে আমি এখানে আসিনি।—এই, এঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যা।'

বিরক্ত হয়েই ডাক্তার সাঁওতালী মেয়েটাকে হুকুম করেন।

আশ্চর্য! কমলা আস্তে আস্তে উঠে ওর সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল।

আশ্চর্য, সবটাই আশ্চর্য! সারা মন হাতড়ে খোকনের জন্যে আর একবিন্দু সহানুভূতি খুঁজে পাচ্ছে না সে। বাসিফুলের মতো ওই বিবর্ণ মাংসপিণ্ডটুকুর জন্যে কী হারিয়ে ফেললো কমলা? কতখানি ঐশ্বর্য?...মনোজ ছাড়া কমলা কে? কী তার মূল্য? কোথায় তার সত্তা? সমাজের কাছে কি সংসারের সমস্ত পৃথিবীর কাছে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে মনোজকে হারিয়ে? আর মনোজের মা বাপ ভাই বোন? তাদের কী বলবে? খোকন? সে তো কেবলমাত্র কমলার একান্তই তার নিজের! আর মনোজ? মনোজ যে সকলের, সারা জগতের। কোন অধিকারে কমলা নষ্ট করতে বসেছে সেই সকলের সম্পত্তি?

কমলা কী করলো?...কমলা কী করবে?

কমলা কেন পাগল হয়ে যাচ্ছে না?...কেন হার্টফেল করছে না?

দুরন্ত টাইফয়েড জ্বরে কমলা মরেনি কেন?...

সকালবেলা আর একবার মৃতসঞ্জীবনীর শেষ বিন্দুটুকু খোকনের দেহে সঞ্চারিত করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার—বললেন...'একে সাবধানে রাখুন, শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখবেন ভালো করে। বেঁচে যাবে আপনার ছেলে।...আর ওঁর জন্য—চরম চেষ্টা দেখব আমি, অপারেশন করে যদি কোন ফল পাওয়া যায়।..বাট্ ইট ইজ টু-লেট।'

যন্ত্রপাতি এবং আর একজন সাহায্যকারীর জন্য ডাক্তার আবার সাইকেল চেপে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। রাত্রে গেলে কোনো লাভ হ'ত না, কারণ কম্পাউণ্ডার 'সুখন' সাতটার সময় এসে ডিস্‌পেনসারি খোলে সাতমাইল রাস্তা ভেঙে। আরো 'দেহাতে' তার বাড়ি।

ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে খোকনের, বিষে আচ্ছন্ন শরীর সজীব হয়ে উঠছে...হালকা হয়ে আসছে ভারী ভারী চোখের পাতা নতুন সূর্যের আলো দেখবার আশায়।...ভাবীকালের মানব পৃথিবীর কাছে তার দাবী জানাচ্ছে।

'ই-ইয়ে...মাইজী,...বাবু মরগেই'...সাঁওতালী মেয়েটা বন্যজন্তুর মত বীভৎস চীৎকার করে ওঠে...

'মরগেই'? 'মরগেই' মানে কী?

হুড়মুড় করে ছুটে এসেছে কমলা মনোজের বিছানার পাশে...খোকনের মাথাব বালিশ স্থানচ্যুত হয়ে গেল ওর পায়ের ধাক্কায়...ফুল-লতা-কাটা ভারী কাঁথাখানা কমলার কোল থেকে কোথায় ছিটকে পড়লো কে জানে।...

মনোজ মারা গেছে! চরম চেষ্টার আগেই চরমপত্র পেয়ে গেছে সে বিধাতার দরবারে!...এখন এই প্রাণহীন দেহটা নিয়ে কি করবে করুক কমলা। চৌকির কোণে মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হলেও কি একফোঁটা করুণা পাবে মনোজের?...'কী ছেলেমানুষি করছো কমু' বলে একটা হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে কাছে?...কমলার অবিশ্বাস্য দুর্ব্যবহারে যেন পাথর হয়ে গেছে মনোজ।

কিন্তু খোকনই বা পাথর হয়ে গেল কেন?...কমলাই শুধু পাথর হয়ে যাবে না?...বেড়াবে রক্ত-মাংসের বোঝা নিয়ে?

বাইরে থেকে বুঝেই এসেছিলেন ডাক্তার কমলার তীব্র চীৎকারে, তবু যন্ত্রচালিতের মতো ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন,—বোধ করি নিশ্চিত বুঝে নিতে!...নাঃ, সন্দেহের কিছু নেই...শেষবারের মতো পৃথিবীর অফুরন্ত বায়ুপ্রবাহের এক কণার জন্য কাড়াকাড়ি করতে করতে হেরে গিয়ে পরাজিত মনোজ চৌধুরী যেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে তার নিষ্ঠুর কৃপণতার দিকে।

কিন্তু কাঁথা চাপা দেওয়া ওটা কি পড়ে?

'হা ঈশ্বর! বাচ্চাটির এ অবস্থা কে করলো?' ডাক্তার হেঁট হয়ে তুলে নিলেন ছেলেটিকে।...কিন্তু বেঁচে থাকা তো আর সম্ভব নয়?...মুমূর্ষু শিশু অতক্ষণ ধরে মুখের উপর ভারী কাঁথাটার ভার সইবে কি করে? এই সামান্য আবরণটুকুই তাকে বঞ্চিত করেছে সেই অফুরন্ত বায়ুপ্রবাহ থেকে। হেরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে নেই—বিনীত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে চোখদুটি মুদে আছে।

[১৩৫৪]

সর্পশিশু

জন্ম-ইতিহাসটা অজ্ঞাত।

সদ্যোজাত একটা শিশু ডোবার ধারে না বাঁশবাগানের কানাচে পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে পৃথিবীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছিল—হয়তো একসময় নিস্তব্ধ হইয়া যাইত সেই নিষ্ফল প্রতিবাদের ক্ষীণ স্বর, গ্রামের বিরিঞ্চি পাগলা তাকে কুড়াইয়া আনিয়া একেবারে বামুনবাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

গারদে দিবার মত উন্মাদ পাগল নয় বিরিঞ্চি, আগে মজুরী খাটিয়া খাইত, যা' কিছু গোলমাল ছিল কেবল পয়সার হিসাব লইয়া। জগতের লোক যে শুধু ঠকাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া আছে এই রহস্যটা যেন বড় বেশী ফাঁস হইয়া গিয়াছিল বিরিঞ্চির কাছে। তাই এক বাড়ীর মজুরীর পয়সা লইয়া গ্রামসুদ্ধ সকলের কাছে হিসাব বুঝিতে যাইত।

এখন আর সে বালাই নাই। পাঁচবাড়ী চাহিয়া-চিন্তিয়া পেটের ব্যবস্থাটি বজায় রাখে, আর একমুখ দাড়িগোঁফ লইয়া কোথা হইতে সংগ্রহ-করা একটা পুরনো চটের থলি হাতে সারাটা দিন ছেঁড়া ন্যাকড়া, পচা কাগজ, ভাঙা কাচ, আর টিনের টুকরা কুড়াইয়া বেড়ায়। পৃথিবীর কোনো জিনিস নাকি অপচয় হইতে দিতে রাজী নয় সে।

আঁস্তাকুড় মানে না, ময়লার বিচার করে না, অব্যাহত গতিতে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তা' নয় তো ভদ্রলোকে বা সুস্থ কোনো লোকে কোন্ কাজে সারা গ্রামের 'ওঁচলা' জঞ্জালফেলা এই অখদ্যে জায়গাটায় উঁকি দিতে আসিত?

মেয়েটাকে যে ফেলিয়া গিয়াছিল—সে বোধ করি মনুষ্যত্বের শেষ অবশিষ্টটুকুর প্রমাণ দিতে নিতান্ত নিরাবরণভাব না ফেলিয়া দিয়া অনেকগুলি কাপড়ে-চোপড়ে মুড়িয়া যত্নের ভান করিয়া শোওয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ছেঁড়া ন্যাকড়ার লোভে আকৃষ্ট বিরিঞ্চি ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাজ্জব বনিয়া গেল।

পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য স্থির করিতে অবশ্য এক সেকেণ্ডও সময় লাগে নাই বিরিঞ্চির, লাগিবেই বা কেন? আস্ত একটা এতবড় বস্তুকে তো অপচয় হইতে দিতে পারে না সে? পাগল বলিয়াই হয়তো আদর্শচ্যুত হয় না, অথবা আদর্শচ্যুত হইতে পারে না বলিয়াই পাগল।

কিন্তু বামুনগিন্নী তো পাগল নয়!

বিরিঞ্চির মুখে ভাতের বদলে দুধের আবদার শুনিয়া 'মার মার' করিয়া উঠিলেন—দুগ্‌গা দুগ্‌গা, সক্কালবেলা এ কি পাপ! বেরো হতচ্ছাড়া আমার বাড়ী থেকে! কোন্ চুলো থেকে পেলি ওকে? কী আপদ!

বিরিঞ্চি মুখের ভাব যথাসাধ্য করুণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলে—ডোবার ধারে পড়ে কাঁদতেছিল বড়োমা। তা—একটুকুন দুধ তো এরে দিতে হয়, কেষ্টর জীবটা অনাহারে হত্যে হ'তে পারে না তো?

—মরে যাই রে—ওই কেষ্টর জীবটিকে দুধ খাইয়ে জীইয়ে তুলে কোন্ সগ্‌গে বাতি দেবে রে আমার? বলি গাঁয়ে কি আর বাড়ী খুঁজে পেলিনে মুখপোড়া, তাই আমার হাড় জ্বালাতে এলি?

—তোমার ঘরে যে দুধের সাঁতার পাথার বড়োমা গোয়াল ভর্ত্তি গরু। কেঁড়ে খোয়া জল

এক ছিট্রে দিলেও ছুঁড়ির জীবনটা রক্ষে হয়।

বামুনগিন্নী ঈষৎ নরম হইয়া বলেন—তা' যেন রক্ষে হ'ল, কিন্তু রক্ষে হয়ে কি হবে শুনি? কার উপকারে লাগবে?

বিরিঞ্চি দার্শনিক উদারতায় গম্ভীরভাবে বলে—উপগারের কথা ছেড়ে দাও বাপু, বিরিঞ্চি পাগলা কার উপগারে লাগছে? মুখের গোড়ায় ভাত পাথরটা দিচ্ছ তো ধরে নিত্যি, না কি দিচ্ছ না? ন্যাও এখন তক্কাতক্কি রেখে একখুরি দুধ বের করো দিকিন।

বামুনগিন্নী হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—দুধ যেন দিলাম, খাওয়াতে পারবি?

বিরিঞ্চি একগাল হাসিয়া ফেলিয়া বলে—মদ্দামানুষ তাই কি পারে? তোমার তো এখনো 'ছ্যান' হয়নি—ঘাটে যাবার আগে—

বামুনগিন্নী ক্ষণপূর্ব্বের কৌতুক বিস্মৃত হইয়া এবার যথার্থই প্রবল রোষে চীৎকার করিয়া ওঠেন—বেরো লক্ষ্মীছাড়া, বেরো আমার উঠোন থেকে। ওই আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে বসবো আমি?

কিন্তু গালাগালি দিয়া ভূত ভাগানো বরঞ্চ সম্ভব কিন্তু পাগল ভাগানো সম্ভব নয়। বিরিঞ্চি ন্যাকড়া-কানি সমেত সেই আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালটাকে প্রায় বামুনগিন্নীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বেশ একটু বাহাদুরির হাসি হাসিয়া বলে—বেশ, এই রইল হেথায় পড়ে, ন্যাও এখন কি করবে করো। বিচেরে হয় এক ফোঁটা দুধ দিয়ে বাঁচাবে—না হয় গলাটা টিপে শেষ করে দেবে। ব্যস্, এই সোজা কথা।

বামুনগিন্নী বিপদ গণিয়া ডাক দেন—বৌমা, বৌমা, এই দেখ এসে তোমার আদরের খোকার কাণ্ড। নিত্যি ভাত দিয়ে দিয়ে আস্কারা বাড়িয়ে দিয়েছো, এখন পাগলের উপদ্রব পোহাও!

কথাটা মিথ্যা নয়, বৌমার প্রশ্রয়েই মাসের মধ্যে দশদিনের ভাত বিরিঞ্চির এই একটা বাড়ীতেই জোটে। বামুনগিন্নী রাগঝাল করেন বটে, তবে অতবড় বৌয়ের ইচ্ছাটাকে একেবারে ফেলনা করিতেও পারেন না।...কিন্তু ফেলাছড়ার সংসারে দুটি ভাত দেওয়া এক, আর এহেন অভিনব উপদ্রব সহ্য করা আলাদা।

ডাক শুনিয়া বৌমা আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য অবাক হইল না—দোতলার জানলা হইতে দেখিতেছিল সবই, শুধু শাশুড়ীর ভয়ে এতক্ষণ নীচে নামে নাই।

নীচে নামিয়া আসিয়া ভালোমানুষের মত অবাক ভঙ্গীতে বলে—এ আবার কি?

—ওই দেখ গেরো! নাও এখন এই পাগলকে সামলাও! এ কি পাপ বাড়ীর ভেতর এনে ঢোকানো!

—বড়োমার এক কথা! বলে 'শিশু নারায়ণ', ওইটুকু অবোধ শিশুর আবার পাপপুণ্যি কি?...তোমার শাশুড়ীর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ছোটমা, যাক্ গে—ঝট্ করে দুধ একফোঁটা খাইয়ে দাও দিকিন ওটাকে। বলে বলে মুখে ব্যথা হয়ে গেল বাবা! বেরালে কুকুরে কত সামগ্রী খাচ্ছে আর এ তো মনিষ্যির সন্তান।

নীহার একবার শঙ্কিতভাবে শাশুড়ীর মুখপানে চাহিয়া বিরক্তির ভানে বলে—পাগল বলে কি তুই একেবারে বদ্ধ পাগল বিরিঞ্চি? আমি কখনো ওকে ছুঁতে পারি? স্নান করে নারায়ণের ভোগ রাঁধতে যাচ্ছি যে—তুই বরং পলতে করে খাইয়ে দে।

বিরিঞ্চি ঈষৎ শান্তসুরে বলে—তবে তাই আনো তোমার পলতে-মলতে, আর কলকৌশলটাও অমনি শিখিয়ে দিয়ে যাও। নারায়ণ তো তোমার গলা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে না—ভোগের ভাত

বরং দু'দণ্ড পরে রাঁধলে চলবে।

গোড়ার ইতিহাসটা এই।

অতঃপর কেমন করিয়া যে সেই 'মনিষ্যির সন্তানটি' মানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল সেই এক রহস্য! বোধ করি—পথের কুকুর-বিড়ালগুলো যেমন বাঁচিয়া থাকে, যথানিয়মে বাড়িয়াও ওঠে—তেমনিভাবে বাড়িতে লাগিল 'ফেলি'।

তা' 'ফেলি' ছাড়া আর কি ভালো নাম জুটিবে তার—জন্মদাত্রী মা যাহাকে জন্মমাত্র ফেলিয়া গিয়াছে?...বামুনগিন্নীই এই উপযুক্ত নামটি দিয়াছেন তাকে।

নীহার নাকি কবে যেন বলিয়াছিল—'করুণা' বলিয়া ডাকিলে হয় মেয়েটাকে, পৃথিবীর করুণা কুড়াইয়াই তো টিকিয়া থাকিতে হইবে বেচারাকে—হাসিব খোরাক হিসাবে এখনো মাঝে মাঝে ওঠে কথাটা। ফেলির বিষয়ে বিরক্তিকর কোন কথা উঠিলেই বামুনগিন্নী ব্যঙ্গহাস্যে বলেন—বেশী বলবো না বাবা, উটি আবার বৌমার পুষ্যি কন্যে কিনা! কি যেন নাম রেখেছিলে বৌমা—ললিতলবঙ্গলতা না কি?...

প্রতিবেশিনীরা এমন হাসিয়া ওঠেন যে, নীহার মুখ লুকাইবাব পথ পায় না।

বছর পাঁচেক বয়স পর্য্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বিরিঞ্চি ছিল। হয়তো নিতান্ত মেয়েটার পরমায়ুর জোর ছিল বলিয়াই পাগলার এত ঝোঁক চাপিয়াছিল তার উপর। অনভ্যস্ত হাতে পলিতা ধরিয়া আর শামুকের খোলার ঝিনুকে দুধ খাওয়ানো হইতে সুরু করিয়া নিজের পাতের মাখা ভাতের ভাগ দিয়া দিয়া পাঁচবছরেরটি করিয়া তুলিয়াছিল বিরিঞ্চি, কিন্তু আব টিকিল না।

গ্রামের মধ্যে নিজের জায়গায় ফেলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া বিরিঞ্চি একদিন চৈত্রের ঝড়ে গাছ-চাপা পড়িয়া মারা গেল।

বিরিঞ্চির মতই ফেলিও হইল বারোয়ারী।

বিরিঞ্চির মত সারাদিন যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায় আর হঠাৎ পেটের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিলে যে-কোন একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়া উঠানের ধারে বসিয়া কাঁদিতে থাকে।

ফেলির কান্নার কারণটা কাহারো অজানা নয়, তবু বিনাবাক্যব্যয়ে দু'মুঠা ভাত ফেলিয়া দিবার উদারতা বড় কাহারো দেখিতে পাওয়া যায় না—আ মরণ, এ ছুঁড়ি আবার মরতে এখানে এলো কেন? এই লক্ষ্মীছাড়ী, শুধু শুধু কেঁদে মরছিস যে?...ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে ফেলি যখন কান্নার মাত্রা আরো বাড়াইয়া বলে—'ক্ষিদে পেয়েছে—পেটের মধ্যে ব্যথা করতেছে—' তখন নিতান্ত অবহেলায় পাতকুড়ানো এঁটোকাঁটা দুই মুঠা ভাত দিয়া দয়াবতীরা দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

একমাত্র নীহারের কাছেই এর কিছুটা ব্যতিক্রম হয় বটে—কিন্তু সেটা বামুনগিন্নীর অনুপস্থিতির মাহেন্দ্রযোগ না ঘটিলে নয়।

ভাত খাইয়া পাতা ফেলিতে হয়, গোবর ঘষিয়া ঘষিয়া এঁটো পাড়িতে হয়, বিরিঞ্চি মরিয়া এইসব অসুবিধাগুলো বাড়িয়াছে ফেলির।

বিরিঞ্চির জন্য মাঝে মাঝে মন-কেমন করে।

অবশ্য তার অনেকটাই স্বার্থপ্রসূত। চড়া রোদ উঠিলে যে বিরিঞ্চি মাটিতে পা ফেলিতে দিত না ফেলিকে, কাঁধে করিয়া ঘুরিত, ঝড়বৃষ্টির সময় আশ্রয় খুঁজিয়া আগলাইয়া রাখিত, ক্ষুধার সময় ভাতের আবেদনের ভারটা লইত, এসব একটু আধটু আজকাল বুঝিতে পারে সে। কষ্ট

হইলেই তাই বিরিঞ্চিকে মনে পড়ে তার।

তবে তার বেশী নয়।

ভালোবাসা উদ্রেক করিবার মত মানুষ বিরিঞ্চি নয়।

হ্যাঁ, ভালোবাসিতে হয় তো বামুনকর্ত্তার ছেলে ছোটোবাবুকে। যেমন টকটকে সুন্দর রং, তেমনি পোশাকের পারিপাট্য; যেন গল্পের রাজামশাই। নীহারের মেয়ে লীলার উপর অদ্ভুত একটা ঈর্ষা হয়; লীলার মত যদি 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে পাইত ছোটবাবুকে, তবে বোধ করি ধন্য হইয়া যাইত ফেলি!

কিন্তু ডাকা সহজ নয়।

একদিন ইচ্ছাকৃত অসাবধানে ডাকিয়া ফেলার অপরাধে বামুনগিন্নী শুধু গর্দ্দান লইতে বাকী রাখিয়াছিলেন তার। একেই তো নীহারের প্রশ্রয়ে পাড়ার সকলের চাইতে তাঁর বাড়ীতেই ফেলির দাবীদাওয়াটা জোরালো—তার উপর আবার এমন আদিখ্যেতার ডাক ডাকিলে বলিবে কি লোকে?

তা বামুনগিন্নীরই বা অন্যায়টা কোথায়?

ফেলিরও তো স্পর্দ্ধা কম নয়।

ভিক্ষার ভাত খাইয়াও গায়ে 'গত্তি'টি তো মন্দ লাগে নাই, সাত বছর বয়সেই বছর দশেকের মত দেখিতে লাগে। অনায়াসেই এখন লোকের গোয়ালটা পরিষ্কার করা বা বাসন দু'খানা মাজিয়া আনার কাজ করিয়া দিতে পারে ফেলি। কাঁহাতক আর ব্যাগারের ভাত খরচ করিবে লোকে? তা' নয়—লীলার মত বই শ্লেট লইয়া পড়িতে যাইবেন তিনি!

শোন আব্দার! দেখ স্পর্দ্ধা!

কথাটা শুনিয়া আসিলেন বামুনগিন্নী পাড়ায়।

লীলা নাকি স্কুলে বলিয়াছে—ফেলিও পড়িতে আসিবে। পাড়ার ভদ্রমহিলারা তাই একজোট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এমন অনাচার ঘটিলে নিজেদের মেয়ে তাঁহারা ছাড়াইয়া লইবেন। মুখ্যু থাকে সেও ভাল, তাই বলিয়া ফেলির সঙ্গে এক বেঞ্চে বসিয়া পড়া? গলায় দিতে দড়ি জুটিবে না তাদের?

বামুনগিন্নী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করেন—বৌমা, অ বৌমা! বলি তুমি বা কি ঠাউরেছ বাছা?

নীহার শঙ্কিতভাবে চাহিয়া থাকে।

—হাঁ করে চেয়ে আছে যে? বলি ফেলি হারামজাদীকে ইস্কুলে দেবার কথা কে তুলেছে?

নীহার মৃদুস্বরে বলে—তোলাতুলি আর কি? মেয়েটাই ঘ্যানঘ্যান করছিল "দিদিমণির সঙ্গে ইস্কুলে যাবো যাবো" বলে—তাই বলেছিলাম, আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে যদি ফ্রী করে দেওয়া যায়।

—তবে আর তোলার বাকীটাই বা কি রেখেছ? আমি কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি তোমায় বৌমা, অতি কিছু ভালো নয়, ওকে অত আস্কারা দিও না।

নীহার ঈষৎ অনুনয়ের স্বরে বলে—একটু লেখাপড়া শিখলে তো কোনো ক্ষতি নেই মা, ছেলেমানুষ—অত সাধ হয়েছে—

—হাড়জ্বালানে কথাগুলো বোলো না বৌমা, 'সাধ হয়েছে'—আরো কত শুনব! বলি পাড়ার আর সব ভদ্দরলোকের মেয়েরা ইস্কুল ছাড়ুক এই তবে তুমি চাও?

কথাটা এই যে—স্কুলের সেক্রেটারী বামুনগিন্নীর নিজের ছেলে হইলেও নীহারের বর, কাজেই

নীহার আব্দার ধরিলে কি হয় বলা যায় না।

নীহার সাশ্চর্য্যে বলে—তারা ইস্কুল ছাড়বে কেন মা? ও যদি পড়েই—মাটিতে একপাশে বসে থাকবে বৈ তো নয়? ফটিক বাগদীর মেয়েটাও তো সেবার—

—তুমি থামো বাছা, হাড়িই হোক বাগ্দীই হোক তবু সে মা-বাপের ছেলে তো বটে। তার সঙ্গে ওই আঁস্তাকুড়ের তুলনা?...খবরদার, বলে রাখছি ও সব অনাচার চলবে না। তবু গোয়ালটা-গোবরটা করতে শিখছিল—তা' নয়,—ইস্কুলে যাবেন! ইস্কুলের ভাতটা বোধহয় তুমিই রাঁধবে?

একটুখানি বিষ হাসি হাসিয়া বামুনগিন্নী তখনকার মত কথাটার ইতি করেন।

বলা বাহুল্য স্কুল-সেক্রেটারীর গৃহিণীত্বের মর্য্যাদা সত্ত্বেও আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালকে স্কুলের উঠানেও ঠাঁই দেওয়াইতে পারিল না নীহার। গোয়াল পরিষ্কার ও ঘুঁটে দেওয়ার কাজটাই কায়েম হইল ফেলির, নিয়মিত ভাতের বদলে।

ফেলিও তা'তে খুব অখুশি নয়—পাঁচবাড়ী চাহিয়া খাইতে তারও আব ভালো লাগে না। শুধু এক-আধবার যদি লীলার মত বই খাতা লইয়া বসিতে পাইত!

স্কুলের আশায় হতাশ ফেলি যখন-তখন তাই নীহারকেই খোসামোদ করে—হেই ছোটমা, পায়ে ধরি তোমার, একখানা পেরথম ভাগই নয় দাও আমায়, দিদিমণির পড়া শুনে শুনে শিখব।

নীহার হাসিয়া বলে—পড়া শিখেই বা তোর কি হবে রে?

ফেলি ম্লানমুখে বলে—কি আর হবে? সক্কল মেয়ে শেখে কেন তবে, এ্যাঁ? ফেলি যেন মানুষ নয়!

কিন্তু ফেলি আবার মানুষ হইল কখন? বিরিঞ্চি পাগল ছিল, তাই 'মনিষ্যিব সন্তান' বলিয়া গণ্য করিয়াছিল ফেলিকে। সুস্থ মানুষে তো তা পারে না। 'ফেলি' ফেলিই, তার বেশী কিছু নয়।

আচ্ছা ফেলিরই বা নিজের অবস্থায় সন্তোষ নাই কেন?

বামুনবাড়ীর মেয়েদের মত সভ্য ভব্য হইবার দুরন্ত সখ কেন তাহার? লেখাপড়া শিখিতে পাইল না বলিয়া গোয়ালঘরে বসিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিবে এই বা কি কথা?

নিজেকে মানুষ বলিয়া ভাবিবার অমন প্রবল ইচ্ছা কেন?

ভদ্রজীবনের উপর অমন লুব্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে কেন? বালিকা লীলাও সেকথা টের পায় যেন। পাকা পাকা সুরে বলে—দেখছো ঠাকুমা দেখছো, রাক্কুসী কি রকম হাঁ করে চেয়ে আছে আমার দিকে—যেন গিলে ফেলবে।...খবরদার ফেলি, আমার পড়ার সামনে এসে বসবি না। আমি কষ্ট করে পড়ব আর উনি মুখস্থ করে নেবেন, আবদার!...ফেলি, ঘরে ঢুকছিস যে বড়ো? বলে দেব ঠাকুরমাকে?

ফেলির সীমানা উঠানের উপরে নয়। ফেলি আবার ঘরে ঢুকিবে কি?

ধীরে ধীরে ঝি-গিরিতে প্রমোশন পাইতে থাকে ফেলি।

বারো বছর বয়স হইতে না হইতেই সারা সংসারের বাসনমাজা, কাপড়কাচা, উঠান ঝাঁটানো, আর গোরুর কাজের ভার লইতে হইয়াছে তাহাকে। বামুন গিন্নী আরো একটু বুড়া হইয়াছেন,

তাই আরো বেশী খিটখিটে হইয়াছেন, চক্ষুশূল মেয়েটা যত খাটে, তাঁর গাত্রদাহটা তত প্রবল হয়। গালাগালের মাত্রাটা বাড়ে।

ময়লা ছেঁড়া আটহাত একখানা শাড়ি পরণে, একমাথা রুক্ষ চুল, হাঁটু অবধি ধূলা, ভাঙা ঝুড়ি কাঁখে করিয়া ফেলি যখন গোবর কুড়াইয়া বেড়ায়, কে বলিবে ফেলি স্বপ্ন দেখিতেছে সভ্য সুন্দর ভদ্র জীবনের! ঝি-গিরিটা তার কাছে যেন অবাস্তব, যেন সাময়িক ছদ্মবেশ মাত্র, এই শ্রীহীন জীবনের সঙ্গে হৃদয়ের কোনো যোগ নাই ফেলির।

'ফেলি' নামটা কী কুৎসিত! অনেকদিন একথা ভাবিয়াছে সে—দয়া করিয়া যাহারা পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিবার রসদ যোগাইয়াছিল, তুচ্ছ একটা নামের বেলায় এত কার্পণ্য কেন তাদের?...ফেলি না বলিয়া 'রাণী' বলিতেই বা লোকসানটা কি ছিল? পয়সা খরচ তো নাই।

লেখাপড়ার কথা আর তোলে না ফেলি, নূতন এক অনাসৃষ্টি বায়না ধরিয়াছে আবার! পাগলের হাতে মানুষ হইয়াছিল বলিয়াই কি ফেলি এমন বাস্তববুদ্ধিহীন?

আলাদা একখানা ঘর চাই তার। নিজের বলিতে একখানা ঘর।

নীহার অবাক হইয়া বলে—ঘর তুই কি করবি ফেলি? এমন কথাও তো শুনিনি!

ফেলি মুখভার করিয়া বলে—তা' শুনবে কেন—নিজেদের পঞ্চাশখানা ঘর নেই যেন? আমি বুঝি চিরকাল ঢেঁকিঘরে পড়ে থাকবো!

—পড়ে আর তুই থাকিস কখন রে?...নীহার সকৌতুকে বলে—শুধু রাতটুকুন শোওয়া বই তো নয়। চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করে মরছিস, ঘর নিয়ে করবি কি?

—আমি ঠাকুর পিতিষ্টে করবো।

মরীয়া হইয়া অনেকদিনের গুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করিয়া ফেলে ফেলি।

—ঠাকুর-প্রতিষ্টা! সে আবার কি?

—দেখো না তখন—সোৎসাহে উত্তর করে ফেলি—তোমার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ওই গোপালঠাকুরের পটটুকুনি শুধু দাও আমায়, আর একটুকু জায়গা—দেখ কেমন সাজাই। রাত্তির চারটের সময় উঠবো, বুঝলে ছোটমা, ফুল আনবো—'পেতে' ভর্ত্তি করে এই এ্যাতো ফুল এনে গোপালঠাকুরকে সাজাবো। মালাও গাঁথতে পারি আমি, তোমরা তো ন্যাও না আমার মালা, নইলে এইসান বড় বড় মালা গেঁথে দিতাম তোমার লক্ষ্মীনারায়ণকে! দ্যাও না ছোটমা পটখানা, তুমি ফুল-লতা দে' পূজো করো, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

তুচ্ছ একখানা ক্যালেণ্ডারের ছবি, খুলিয়া লইলে ঘরের শোভার এমন কিছু হ্রস্বতারক হইবার কথা নয়; দু'চারদিন চোখেও পড়ে নাই কারুর, হঠাৎ ধরা পড়িল লীলার কাছে।

এবং সেই তুচ্ছ ছবিখানা উপলক্ষ্য করিয়া বাড়ীতে যা গোলমাল সুরু হইল, স্বয়ং গোপালঠাকুর উপস্থিত থাকিলে বোধ করি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন।

ছোটবাবু পর্য্যন্ত হাল ধরিয়াছেন এবার—স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলেন—তুমিই মাথা খেলে মেয়েটার, উচ্ছন্ন গেছে একেবারে। যা খুশি তাই বায়না! চাঁদ চাইলে চাঁদ পেড়ে এনে দিতে হবে? ঠাকুরের ছবিখানা কি বলে দিলে ওকে?

—'ভারী তো একখানা ক্যালেণ্ডারের ছবি, এমন করছো তোমরা—নীহার শ্রান্ত স্বরে বললে।

—'ভারী-তো হালকা-তো'র কথা হচ্ছে না, দেবে কেন? ওরই বা চাইতে সাহস হয় কেন? এত প্রশ্রয় কিসের? বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে এই ঢের, আবার—

—ঠাঁই দেবার দাম তো উশুল করে নিচ্ছ—বলিয়া নীহার উঠিয়া যায়।

ছোটবাবুও কি ভাবিয়া হঠাৎ থামিয়া যান; কিন্তু কর্ত্তাবাবু তো আছেন? আছে লীলা!

—কি বললি? ফেলি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করছে?

বুড়ো কর্ত্তা সোজা হইয়া দাঁড়ান—চল্ দিকিনি দেখি তার আস্পদ্দা!

বামুনগিন্নী নাতনীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন—আস্পদ্দা আর হবে না কেন? আসকারা পায়! ফেলি চাইলে তোমার বৌ বোধ হয় শালগ্রামটুকুও দিতে পারে। যতই হোক, পট তো? কথায় বলে ঘট আর পট, ভগবানের আবির্ভাবের ঠাঁই, সেই জিনিস তোমার বৌমা ওকে দিলেন খেলা করতে ! ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয়ও কি নেই ছাই?

নীহারের না থাক্, অভিভাবকবর্গের আছে বৈ কি।

চুপড়িসুদ্ধ ফুল নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া ছবি কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলার মত পবিত্র ধর্ম্মজ্ঞান যদি মুখুয্যে মশাইয়ের না থাকিবে—বৃথাই তবে জীবনভোর লক্ষ্মীনারায়াণের সেবা করিয়া আসিলেন তিনি।

গোপালঠাকুরের ছবির টুকরাগুলি সারা উঠানে উড়িয়া বেড়ায়—আর ধবধবে ফুলগুলো নর্দ্দমার ঘোলা জলে কুৎসিত বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকে।

ফেলি কাঁদে না—কেমন বোকার মত চাহিয়া থাকে।

কাঠঘুঁটের ঘরটা পরিষ্কার করিয়া ঠাকুরের সিংহাসন পাতিতে যে প্রাণপাত পরিশ্রম হইয়াছে তার, সে কথা মনে করিয়াও কাঁদে না।

কাঁদিবেই বা কখন? সারা সংসারের কাজ পড়িয়া আছে, ক্রটি পাইলে কি রক্ষা রাখিবেন বামুনগিন্নী?...কাঁদেও না, হাসেও না, গম্ভীরভাবে শুধু কাজ করিয়া চলে।...

নীহার মাঝে মাঝে আবেদন করে—আর একটা লোক নইলে আর চলে না বাপু, বাতাসীর মাকে অন্তত গোরুর কাজটার জন্যেও রাখলে হ'ত, যতই হোক ওটা ছেলেমানুষ!

শাশুড়ী বিজ্ঞ আর বহুদর্শী লোক, তাই বিজ্ঞ পরামর্শ দেন—'ছেলেমানুষ' নামে আর অরুচি ধরিও না বৌমা, বলো 'সোমত্ত মাগী'! বোঝো না তুমি, এ বয়সে হাতপায়েব ছুটি হলেই কুচিন্তা আসবে মনে।

কুচিন্তা আসিবার ভয়ে হাতপায়ের বিশ্রাম দিতে দেন না পরহিতব্রতী বামুনগিন্নী। পরহিতব্রতী বৈকি, নয়তো তাঁর নিজের নাতনী লীলা চব্বিশ ঘণ্টা হাত পা কোলে করিয়া নাটকে নভেল পড়িতেছে—তাকাইয়া দেখিবার ফুরসুৎ হয় না তাঁর, অথচ ফেলির জন্য উৎকণ্ঠার সীমা নাই। বিধাতার বিচারও যে ন্যায্য নয় তা' নয়তো এত যত্ন করিয়াও বিয়ের যুগ্যি মেয়ে লীলার হাড়ের উপর মাস গজায় না, আর সারা সংসারের খাটুনি খাটিয়াও দুইবেলা দু'কাঁসি ভাতের জোরে ফেলি দিন দিন সত্যই সোমত্ত মাগী হইয়া উঠিতেছে!

দেখিলে গা জ্বলিয়া যায় কি আর সাধে?

গায়ে মাস না গজাক, 'পুঁয়ে পাওয়া' হোক, বয়সের মেয়ের বিয়েটা তো দেওয়া চাই।...তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ এই একটা উপলক্ষ্যে আশ মিটাইয়া উৎসব করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছেন মুখুয্যে দম্পতি।

লীলার বিয়ে?

কত সাধ-আহ্লাদের ব্যাপার। কত কাপড়, কত অলঙ্কার...কত ফুল কত আলো...ভোজের আয়োজনে কী রাজসূয় কাণ্ড! দেখিতে দেখিতে দিশেহারা হইয়া যায় ফেলি।

ফেলি যদি লীলা হইত!

হয়তো এমনি আগুনরঙা শাড়ী আর কনেচন্দনে সাজাইয়া আলপনা-আঁকা পীঁড়িতে বসাইয়া রাখা হইত ফেলিকে।...গোড়েমালা পরা বর আসিত ফেলির জন্য। ফেলিকে ঘিরিয়া সমারোহের আর শেষ থাকিত না।

বিবাহ উপলক্ষ্যে একখানা শাড়ী পাইয়াছে ফেলি।

কোরা লালপাড় কন্ট্রোলের শাড়ী। তা হোক, তবু নূতন তো বটে, জীবনের প্রথম নববস্ত্র।

তা সে শাড়ীও এখনো পরিবার অবসর হয় নাই তার। ফেলি নতুন কাপড় পরিয়া বাহার দিয়া বেড়াইলে রাজ্যের এঁটো পাতা ফেলিবে কে?

অনেক রাত্রে সকল কাজের জের মিটাইয়া কোরা শাড়ীখানা জড়াইয়া ফেলি ধীরে ধীরে বাসরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়...অতি পরিশ্রমের ফলে পিঠ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে, দুই পা বিশ মণ ভারী...ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে...তবু এই স্বর্গলোকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না ফেলি।

আর ঘরের ভিতর দৃষ্টি ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রবলে সমস্ত শ্রান্তি উপিয়া যায়।...গানের আর হাসির হর্‌রা উঠিয়াছে।...বর নাকি বলিয়াছে ঠানদির দল বাজনা বাজাইলে সে গাহিতে রাজী আছে।...সদাবিরক্ত বামুনগিন্নী একগাল হাসি লইয়া কোমরে গোট্ আর পায়ে পাঁয়জোর পরিয়া নাত-জামাইয়ের সামনে আসিয়া বসিয়াছেন...বাজনা কেন—ঠানদি'রা কি নাচিতেই পিছপা? এমন নাচ দেখাইয়া দিবেন—তোমাদের উদয়শঙ্কর কোথায় লাগে।

আত্মবিস্মৃত ফেলি যে শতরঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইবে একথা কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবে নাই।...

হঠাৎ অনেকগুলো কণ্ঠের হাসি থামিয়া গিয়া উঠিল তীব্র ঝড়।

—'এটা কে ফেলি না?'...'আ মরণ! এ আপদ আবার এখানে কেন?'...'অযাত্রা কোথাকার...বেরো বেরো এখান থেকে'...'ওমা সব ছিষ্টি ছুঁয়ে জয়জয়কার করলে গো'...'যত রাজ্যের নোংরা জঞ্জাল ঘেঁটে এলো—না চান না কিছু'...'আহা চান করে এলেই ফেলি একেবারে গোসাঁইকন্যে হয়ে আসরে বসবার যুগ্যি হবে যে!'...'আসপদ্দা দেখ একবার, দোরের বাইরে থেকে উঁকি দে—তা' নয়, একেবারে বাসরের বিছানা ছোঁওয়া!'...

ঝড়ের তাড়ায় তত্‌ক্ষণে চৌকাঠের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে ফেলি।

—হেথায় বসে শুধু গান শুনবো ঠাকুমা—করুণ মিনতি ফেলির প্রার্থনায়।

কিন্তু বামুনগিন্নী আদিখ্যেতা দেওয়ার মধ্যে নাই। ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন—আর কি! তুমি গান শোনো আর আমি যাই এঁটো পাত ফেলতে! বলি—কাল সকালের জন্যে বাসন-কোসন চারটি মেজে রাখলেও তো হ'ত? সকালে তো আর একটা কাজ নয়—পঞ্চাশটা কাজ পড়বে। চায়ের বাসন ধুয়ে রেখেছিস্?

ফেলিকে আর দেখা যায় না।

কিন্তু সকালের বাসন আবার মাজিল কখন সে? যেমন তেমনি পড়িয়া আছে না?...পঞ্চাশটা কাজের একটা কাজেও যে পাওয়া গেল না তাকে!

নীচে, উপরে, গোয়ালে আর ঢেঁকিঘরে...সারা পাড়ায় ফেলি নাই! যাক্ ফেলি হারাইয়া

গেছে আপদ গেছে, কিন্তু লীলার নূতন ফ্যাশানের দুই জোড়া কানপাশার একজোড়া আর রুপালী জরিদার ঢাকাইখানা বেমালুম হারাইয়া যাইবে?

যাইবে বই কি। দুধকলা দিয়া কালসাপ পুষিলে তার ফলভোগ করিতে হইবে না?

অধর্ম্মের চারা বাড়িয়া বিষফল দিবে না তো কি অমৃতফল দিবে?...

ফেলি যে শুধু চোরই নয়, চরিত্রহীনাও—সে সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ থাকে না। তাহার চালচলন দেখিলেই গা জ্বলিয়া যাইত লোকের। কেমন যেন 'ঢলানি' ভাব। গোয়ালের পিছনে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায়ই কার সঙ্গে যেন চুপি চুপি কথা কহিতে দেখা যাইত ফেলিকে...অনেকেই নাকি দেখিয়াছে। এই তো কাল রাত্রেও বরযাত্রীদের মধ্যে একটা ইয়ার গোছের ছোঁড়া ফেলিকে মিঠা পানের খিলি ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল আর ফেলি হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল তার সামনে। এমনি অনেক প্রমাণ।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।

অবিশ্বাসের আছেই বা কি? জাত-সাপের বাচ্ছা তো বটে?

হয়তো সত্যই তাই। এতগুলো পাকাপোক্ত সংসারী মানুষের অনুমানে ভুল নাই।

জন্মলগ্নের নিষ্ঠুরতার শোধ লইতে—একদিন হয়তো সর্পিণীর মতই ক্রূর হইয়া উঠিবে ফেলি...বিষের থলি পুঁজি করিয়া—গৃহস্থের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া নীতি আর ধর্ম্ম, সমাজ আর শৃঙ্খলার গায়ে ছোবল হানিয়া বেড়াইবে।

[১৩৫৪]

আত্মহত্যা

বিছানাটা ময়লা, বালিশটা তেলচিটে, তোশক থেকে বিশ্রী একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। সারা বর্ষা রোদে পড়েছে কিনা সন্দেহ।...এ বিছানায় শুয়ে বরং লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা যায়, কিন্তু স্বপ্ন দেখা যায় না সুদুর্লভ প্রিয়ার।

মেসের বিছানা নয়—বাড়ীরই, তবে বাড়ীতেও, মানে মোহনদের মত বাড়ীতে এর চাইতে ভাল কিছু আশা করা যায় না। শোবার জন্যে যে হাতচারেক জমি পেয়েছে এই যথেষ্ট।

অথচ বিছানা ছাড়া আর কোথায় পারে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতে?...দৈনন্দিন জীবনের প্রচণ্ড সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোথায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে মানসী মূর্তির?

জীবনলীলা নয়, জীবনযুদ্ধ!

সংসারকে আর এখন 'তরণী'র সঙ্গে তুলনা করা চলে না, বরং তুলনা করা যায় পাঁকে পুঁতে যাওয়া চাকা-ভাঙা গরুর গাড়ীর সঙ্গে।...সেকেলের লোকের সংসার করা মনে করলে হাসি পায়। পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেয়ে দশবারোটি ষষ্ঠীর বাছাকে মাছ-ভাত খাইয়ে পুষেছে, বিয়ে দিয়েছে গোটা পাঁচেক মেয়ের, দান-ধ্যান তীর্থধর্ম, অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেনি কিছু।...

ধীরে-সুস্থে বেঁচে থেকেছে, মরণকালেও তাড়াহুড়ো করেনি। সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করে ইষ্টনাম জপ করতে করতে ধীরে-সুস্থেই মরেছে। সেকালের লোক রক্তের চাপ বেড়ে ফুটপাথে হুমড়ি

খেয়ে পড়ে মরত না। যেমন মারা পড়লেন সেদিন মোহনের বাবা—অফিস ফেরৎ টিউশনি করতে যাবার পথে।

তবু মোহনের বাবা রক্তের চাপ বৃদ্ধি অনুভব করেছিলেন তিপ্পান্ন বছর বয়সে—মোহনের মত তেইশ বছর বয়সে নয়। করেছিলেন—নিতান্তই অর্থাভাবে আর অর্ধাহারে। তবু মোহনের মত এত অসুখী আর অসন্তুষ্ট কি ছিলেন তিনি? ঠিক উল্টো, তাঁর অল্পে সন্তুষ্টি, তুচ্ছ কারণে আনন্দ প্রকাশ, উচ্চাশাহীন স্বভাব দেখে ঘৃণায় বিরক্তিতে কি রকম বিতৃষ্ণ হয়ে উঠত মন, সেকথা এখনো ভুলে যায়নি মোহন।

বোধ করি মানসরাজ্যে মানসীর বালাই ছিল না বলেই তেলচিটে বালিশটাতে মাথা ফেলতে না ফেলতে অত সহজে ঘুমিয়ে পড়তে আটকাতো না তাঁর।...বিস্মৃতপ্রায় শৈশব থেকে এই একই রকম দেখে এসেছে মোহন।

যাক, আজ তাঁর কথা অপ্রাসঙ্গিক। শেষবারের মত ঘুমিয়ে পড়বার সময় তেলচিটে সেই তাকিয়াটিও যে জোটেনি তাঁর এ আফসোসে মোহনের মা যতই আছড়া-আছড়ি করুন, মোহন মোটেই কাতর নয়।...

ফুটপাথে পড়ে মারা যাওয়ার জন্য যেটুকু বা আড়ম্বর জুটেছিল মৃত্যুকালে, ভ্যাপসাগন্ধওলা স্যাঁৎসেতে এই ঘরে শুয়ে ভুগে মরলে সেটুকুই কি জুটত? লাভের মধ্যে হয়তো মোহনের মা আর বোনের গায়ে যে সোনার ছিটেটুকু ছিল, যেত বিক্রমপুরে। দারিদ্র্য আর ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জীবনীশক্তি আসত ক্ষয় হয়ে, আর মোহনের মাথায় চাপত আরও কিছু ঋণভার।

এসব চিন্তার ফলাফল উচ্চারণ করলে আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে হবে না মোহনকে।—'নরাধম' 'পাষণ্ড' 'অকৃতজ্ঞ' 'বেইমান' প্রভৃতি বিশেষণগুলো তবে আছে কি করতে?

কিন্তু চিন্তা করতে দোষ কি?

ওই একটিমাত্র বিষয়ে চিরদিনই স্বাধীনতা থাকবে মানুষের। মনে মনে তাই বাপের সদ্বিবেচনার প্রশংসা না করে পারে না মোহন।

যাক্ এসব বিগত ইতিহাস।

বর্তমানে একটা দেশী ব্যাঙ্কে যৎসামান্য মূল্যে নিজেকে ভাড়া দিয়েছে মোহন। এটা অবশ্য ওর নিজের সুচিন্তিত মতামত। এই চাকরিটা যে মোহনের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের নিয়ামক এমন কিছু নয়।...'দাসত্ব-শয়তানে'র কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করে ফেলবে মোহন? অসম্ভব।...নিতান্ত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্যে ভাড়া দিয়েছে নিজেকে।

বাপ মারা যাবার পর যেমন ভাড়া দিয়েছে বাড়ীর দুখানা ঘর।

সাময়িকভাবেই হোক আর যা-ই হোক—'দশটা-পাঁচটা' অফিস তাকে করতেই হয়, আরও ঘণ্টা তিনেক সময় ব্যয় হয় বি-কম্ ক্লাসটা বজায় রাখতে, অবসর এই রাত্রে!

যম-যন্ত্রণা ভোগ করবার অবসর।

উষসীর মুখটা মনে পড়তেই নিজের উপর রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল। এই বিছানায় শুয়ে প্রিয়া-মূর্তির ধ্যান!...ছি ছি! মনে মনে যেন হাত দিয়ে সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখটা মুছে ফেলে উঠে পড়ল মোহন।...ভাঙা একখানা হাতপাখা নিয়ে নাড়তে লাগল বসে বসে। পাখার পক্ষ-সঞ্চালনে বাতাসটা না হোক, শব্দটা হচ্ছিল দস্তুরমত জোরালো।

প্রত্যেক রাত্রে মনে ভাবে, সকালে উঠে আর কিছু না হোক একখানা পাখা কিনে আনবে, কিন্তু সকালে উঠে কোনদিনই আর সেই তুচ্ছ বস্তুটার কথা মনে থাকে না।

সশব্দ বাতাসে বিরক্ত হয়ে ঠিক পাখাখানা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মত মনের অবস্থায় হঠাৎ মেঝের বিছানা থেকে জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল—এই আরম্ভ হল দাদার পাখার ঠকঠকানি! বাবাঃ, সারাদিন খেটে-খুটে এসে একটু যে ঘুমোবো তার জো নেই।

বাড়ীসুদ্ধ সকলকে একঘরে শুতে হয়।

ঘর ভাড়া দেওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবেই মেনে নিতে হয়েছে এটাকে। দারিদ্র্যের অনেক অসুবিধার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য লাগে এইটে, তবু বিদ্রোহ করবার মুখ নেই। সারামাস ছুটোছুটি করে, আর নিজের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে মোহন সংসারের যেটুকু সাশ্রয় করে, বালির-আস্তর-খসা ইঁট-বার-করা দীর্ঘ ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত ঘর দু-খানা যদি চুপচাপ বসে থেকে প্রায় ততটাই করে, অসুবিধে একটু সহ্য করে নিতে হবে বৈকি।

ঘর দু'খানা তো খায়ও না, পরেও না। সে হিসেবে ওর চেয়ে মোহনের দাম কম। তাই সারাঘর ভর্তি বিছানা মাড়িয়ে মাড়িয়ে চোখকান বুজে নিজের তক্তপোশটার ওপর উঠে এসে শুয়ে পড়া ছাড়া গতি কি।

কিন্তু মুখরা জয়ন্তীর জ্বালায় এক এক রত্রে বাড়ীটায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে!...আশ্চর্য! দেশজোড়া হাঙ্গামার ফলে কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কত সুখী আর সমৃদ্ধ পরিবার!...আর মোহনদের এই জরাজীর্ণ বাড়ীখানার একটা ইঁটও খসল না!

পাখাখানা ফেলে দেবার ইচ্ছে সত্ত্বেও জয়ন্তীর প্রতিবাদের প্রতিবাদকল্পে আরও জোরে নাড়তে থাকে মোহন।

—মা, দেখছ? জয়ন্তী মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে—ইচ্ছে করে আরও বাড়ানো হচ্ছে বাবুর!

—কি করবে বল্—তরুলতার শ্রান্ত আপোষসূচক কণ্ঠস্বর যেন অন্ধকারের মধ্যে উপায় হাতড়ে বেড়ায়—কি করবে?...এই গরমে পাখা না নেড়ে থাকতে পারে মানুষ? সারাটা দিন খেটেখুটে—

—না—পারে না! আমরা তো আর মানুষ নই? সারাটা দিন গদি পেতে শুয়ে থাকি যে—বেটাছেলের খাটুনি আবার খাটুনি! ঝি-রাঁধুনীর কাজ থেকে জুতোসেলাই চণ্ডীপাঠ করতে হলে বুঝতাম। ফুলফোর্স পাখার তলায় চেয়ারে বসে আসন সৌখিন কাজ সবাই করতে পারে।

মোহন বিদ্রূপতিক্তস্বরে বলে ওঠে—একদিন না হয় কাজটা বদল করে দেখুন না মহাশয়া? তা সে তো এ, বি, সি, ডি, লিখতে কলম ভেঙে যাবে!

সঙ্গে সঙ্গে মুখরা জয়ন্তী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—যাবে—সেটা আমার পক্ষে ততটা লজ্জার নয়, যতটা তোমাদের। বুঝলে? আকাশে থুথু ছুঁড়লে নিজের গায়েই পড়ে তা মনে রেখো।

—রাখব বই কি। কত কি-ই মনে রাখছি অষ্টপ্রহর, আর এইটুকু রাখব না?

—চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বোলো না দাদা, শুনলে গায়ে বিষ ছড়ায়। বাবা নেই, আমাদের স্বচ্ছন্দে রাখবার দায়িত্ব তোমার, তা জানো?

—খুব জানি। মোহন হেসে ওঠে—শুধু স্বচ্ছন্দে রাখবার? মার বাতের চিকিৎসা করাবার,—খুকির পেটের পিলে সারাবার—শোভনকে বিলেতে পাঠাবার—আর তোমাকে রাজপুত্র খুঁজে এনে বিয়ে দেবার—এসব দায়িত্ব?

—নিশ্চয়ই তো।...জয়ন্তীও যে বিছানায় উঠে বসেছে অন্ধকারেও টের পাওয়া যায়—অন্ধকারের

ওপর যেন কেটে কেটে বসছে তার কথাগুলো—ভেঙচাতে লজ্জা করে না তোমার? মানুষ যদি হতে, তাহলে মনের ঘেন্নায় মাটিতে মিশিয়ে থাকতে।

—জয়া, কি হচ্ছে! তরুলতা ধম্‌কে ওঠেন...ধমকের সুরে নয়, অসহায় সুরে। মেয়েকে এঁটে ওঠবার ক্ষমতা তাঁর নেই, শুধু প্রতিবাদ না করলে নয় বলেই করা।

—আহা বলুক বলুক—মোহনের তীব্র ব্যঙ্গ যেন ছুরির ফলার মত ঝলসে ওঠে—কথা বলতে তো ট্যাক্স লাগে না! গভর্ণমেন্ট-কন্ট্রোলও নেই ওতে—বলুক না যত খুশি।

—আমাকে ঠাট্টা করে নিজের ত্রুটি ঢাকতে চেষ্টা করছ, কিন্তু মনে রেখো দাদা, জগতে তুমি একাই বুদ্ধিমান্ নয়!

—আচ্ছা, তুইও খুব বুদ্ধিমান্—তরুলতা অনেক কষ্টে কণ্ঠে একটু কর্তৃত্বের সুর আমদানি করেন—এখন শো দিকি। ও বেচারা সারাদিন আপিসের খাটুনি খেটে...আবার পাশের পড়া পড়ে এই একটু শুয়েছে, লাগতে গেল ওর সঙ্গে।...গরমে সারা হয়ে যাচ্ছে, পাখা নাড়বে না! তোর যেন সবই জবরদস্তি। অতবড় ছেলে—এই ভেড়ার গোয়ালে শোওয়া, কম কষ্ট?

—কষ্ট করতে কে বলেছে? আনুক না মাসে পাঁচশো টাকা করে, রাজার হালে থাকবে। তুমি খালি দাদার দিকটাই দেখতে পাও, শোভনটার কথা ভাবো দিকি? ওইটুকু ছেলে কী না করছে সংসারের? দাদা কোনদিন দু'পয়সার জিনিস কিনে এনে উপ্‌গার করেছে তোমার? কী যেন এক লাটসাহেব বিলেত থেকে এসেছেন—তোমাদের বাড়ীতে থেকে কেতাথ করছেন তোমাদের! দেখতে পারি না ওই নবাবি। হাড় জ্বলে যায়।

—তোমাদের কথাগুলিও ঠিক অন্যের কানে মধুবর্ষণ করে না, বুঝলে? এখন দয়া করে থামবে? না পার্কের বেঞ্চে গিয়ে শুতে হবে?—মোহন ঠাণ্ডা গলায় বলে।

—যাও না, কে বারণ করেছে—জয়ন্তী ধুপ্ করে শুয়ে পড়ে আবার—তবু তো পার্কের বেঞ্চিও আছে তোমাদের, আমাদের তো ক্যাওড়াতলা ছাড়া আর গতি নেই।

তরুলতা বিরক্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন—তোর আজকাল কী মুখই হয়েছে জয়া! উনি গিয়ে পর্যন্ত তুই যেন কী হয়ে গেছিস!

—বেশ তো, বাবার সঙ্গে আমাকেও দিলে না কেন বিদেয় করে, হাড়ে বাতাস লাগতো তোমাদের! দজ্জাল দস্যি লক্ষ্মীছাড়ীকে রাখবার দরকার কি?

তীক্ষ্ণ স্বর ভারী হয়ে আসে।

আর কি, এইবার আরম্ভ কর ফোঁসফোঁসানি!...যা খুশি বললাম আর বেগতিক দেখলেই কেঁদে জিতলাম—মেয়েমানুষ হওয়া মন্দ নয়।

পাখাটা ফেলে দিয়ে মোহন বিছানা থেকে নেমে পড়ে। ছোট ভাইবোনদের হাত পা মাড়িয়ে কোন রকমে এগোয় দরজার দিকে।

—কোথায় যাচ্ছিস?

তরুলতা উঠে আর্তস্বরে প্রশ্ন করেন।

—ভয় নেই, ক্যাওড়াতলার দিকে নয়।...মোহন হেসে ওঠে—নিশ্চিন্ত থাকো, শেষ পর্যন্ত এই ভেড়ার গোয়ালেই ফিরে আসব। শুধু বাইরের হাওয়া একটু লাগিয়ে আসি মাথায়।

—সাধ করে বলি 'নবাব'! আর একবার জয়ন্তীর গলা শোনা যায়—এতগুলো লোক ঘুমোতে পারে এই ঘরে, ওঁর আবার রাতদুপুরে মগজে হাওয়া লাগাতে না গেলে হয় না।

—জয়ী, ফের?...তরুলতা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মেয়ের চুলের ঝুঁটিটা নেড়ে দেন, বোধ

করি বেশী ভীরুরাই মরীয়া হয়ে উঠে হঠাৎ একটা দুঃসাহসের কাজ করে বসতে পারে তাই—তীব্রস্বরে বলেন—কেবল কথার ওপর কথা? তোর কেন মরণ হয় না লক্ষ্মীছাড়ি!

অন্ধকারে জয়ন্তী হেসে ওঠে—আঃ, গেল খোঁপাটা। আমার মবণ হলে তোমার সুখটা কি বাড়বে, মনে কব? বাতের ব্যথায় তো নড়তে পারো না, নইলে মরে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

—অত সোজা নয়। মোহনের তীব্র স্বর যেন অন্ধকারের বুকে নিদারুণ রেখা টেনে টেনে চলে—মরা অত সোজা হলে আর ভাবনা ছিল না। এ বাড়ীর কারুরই বেঁচে থাকবার রাইট নেই, বুঝলি? তোর নয়, আমার নয়, মার নয়, শোভন, খুকি কারুর নয়। তবু বাঁচতে হবে। বাঁচা নয়—বেঁচে থাকা। পৃথিবীর ধান চালের ভাগীদার হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বেঁচে থাকতে হবে। গলায় দড়ি!...

ছেঁড়া চটিটার শব্দ হয়।

সদর দরজা খোলার শব্দর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় সে শব্দ।

তরুলতা বাতগ্রস্ত পা-টাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে বসে পড়ে গোঙাতে থাকেন...আর গালি পাড়েন মেয়েকে।...সব্বনেশে মেয়ে! তোর জ্বালাতেই ও একদিন আত্মঘাতী হবে!

—আত্মঘাতী হওয়া অত সোজা নয় মা। শোও দিকি স্থির হয়ে।

—তুই আর বলবি না কেন দস্যি! মায়ের প্রাণ তো নয়!...তরুলতা হতাশভাবে বলেন—কি মতলবে বেরিয়ে গেল তাই বা কে জানে—

—কিছু মতলব নয় মা, কেন ভাবছ? গোটা দুই সিগারেট ধ্বং'সে এখুনি ফিরে আসবে মাথা ঠাণ্ডা করে—দেখো।...

মেয়ের ভবিষ্যৎবাণীতে তরুলতা আশ্বস্ত হতে পাবেন না। প্রথমে গজ্‌গজ করেন, তারপব কান্না জুড়ে দেন। কিন্তু জয়ন্তীর ভবিষ্যৎবাণীটা সত্যিই মাঠে মারা যায়। সে-রাত্রে আর ফিরে আসে না মোহন, পরদিন সকালেও না।

টাকা, টাকা! অনেক টাকা...অজস্র টাকা!

পার্কের রেলিং টপকে ঢুকে একটা বেঞ্চ দখল করে আকাশমুখী হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে মোহন। মাত্র মাসে পাঁচশো টাকা নয়...অজস্র টাকা। বাড়ীর প্রত্যেকটি ইঁট কাঠ পর্যন্ত যেন তারস্বরে চীৎকার করছে...'টাকা চাই টাকা।'...কী কুৎসিত মুখভঙ্গী জয়ন্তীর! মায়ের মুখে কী মৌন তিরস্কারের ভঙ্গী!

চোখের সামনে নেই ঝুলকালি পড়া কড়িবরগা যে সমস্ত কল্পনা ব্যাহত হয়ে ফিরে আসবে। তারাভরা খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতে বাধে না। কল্পনা করে মোহন, সেই ঐশ্বর্যের। গোণাগাঁথা টাকা নয়...দু'হাতে মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা যায়, এত টাকা! সেই টাকায় মুখ বন্ধ হবে জয়ন্তীর, কৃতার্থ অনুগত হয়ে থাকবে সদা-বির উদ্ধত ছোট ভাইবোনেরা।...শোধ করা যাবে মাতৃঋণ...উদ্ধার করা যাবে নিজের আত্মাকে...কে যাবে উষসীকে। কেন নয়? কী না হয় টাকায়? উষসীকেও কেনা যায় টাকায়। শুনতে খারাপ হলেও প্রখর সত্য। নির্লজ্জ সত্য।

শুধু অর্থটা চাই যথেষ্ট। কিংবা আরো বেশি।...যথেষ্টর অতিরিক্ত।

সেই টাকা যদি ওই ঊর্ধ্বলোক থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে!...পড়লে অবশ্য মোহনের পক্ষে চমৎকার হত, কিন্তু 'ঊর্ধ্বলোকবাসীরা' অত বোকা নয়।...টাকার বদলে ঝরঝর ক...

নিকটা স্নিগ্ধ তাস বর্ষণ করলেই যদি তখনকার কাজ চলে যায়, মন্দ কি?

সমস্ত দাবী ব্র সমস্ত প্রশ্ন বিস্মৃত হয়ে অন্তত তখনকার মত তো শান্ত হয়ে গেল মোহন!...

ঘুম ভাঙল...একেবারে ভোরে।...

উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো আশেপাশে ছড়ানো আছে কিনা টাকা...প্রত্যেকটি কোণ মার বেঞ্চির তলা, গাছের গোড়া আর ঘাসের ফাঁকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে—হাজার টাকার নোটের গোছা ফেলে গেছে কিনা কেউ।...

পেলে পরে ভগবানে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে মনস্থ করেছিল...হল না বিশ্বাসী হওয়া!

কিন্তু সারাদিন অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়ালেও রাত্রে আর কোথায় যাবে? ভেড়ার গোয়াল ছাড়া? কাল সারারাত খোলা মাঠে শুয়ে, আর আজ সারাদিন অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় এলোমেলো ঘুরে জ্বর আসছে যেন।...ছাড়া ক'দিন আর কামাই করা যায় অফিসের?....বাড়ীতে ফিরতে হবে বৈকি।

কিন্তু বাড়ীতে যে এমন অদ্ভুত ব্যাপার অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে তা' কে ভেবেছিল?

টাকা নয়—একটি পাইপয়সাও নয়, বিনা খরচে মুখ বন্ধ হয়ে গেছে জয়ন্তীর।...দিনেদুপুরে ঘরের খিল বন্ধ করে একগাছা দড়ি গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে গলার স্বরটাকে বন্ধ করে ফেলেছে সে।..

বাড়ী ঢুকে বাড়ীটাকে যেন চিনতে পারে না মোহন।

কোথা থেকে যে এত লোক জড়ো হয়েছে, এ-ও এক রহস্য।

জীবনের কোনখানে একতিল সমারোহ নেই বলেই কি ব্যালেন্স রাখতে মৃত্যুটা আসছে এমন সমারোহে নিয়ে?...বাবার এল, এল জয়ন্তীর?

জয়ন্তী যে আর কোনদিন কথা বলবে না এইটে ভেবেই ভারি অবাক লাগে মোহনের।...মুখরা জয়ন্তী!

বতর ব্যথা নিয়ে ছুটে এসে আছাড় খাবার ক্ষমতা নেই বলেই ছেলেকে দেখে নতুন করে ডুকরে ওঠেন তরুলতা।...মেয়ের ওপর যে একদিনের জন্যে কোন কর্তব্য করতে পারেন নি..খেতে পায়নি, পরতে পায়নি, মায়ের সংসারে দাসীবৃত্তি করতে করতেই যে তার জীবনে ধিক্কার এসে গিয়েছিল, এই কথাটাই ফলাও করে বিলাপ করতে থাকেন তরুলতা...বলেন—বাছা আমার মনের ঘেন্নায় আত্মঘাতী হল রে মোহন!

মনের ঘেন্না!

জিনিসটার বালাই জয়ন্তীরও ছিল নাকি? মূর্খ অশিক্ষিত মুখরা জয়ন্তী, ভব্যতালেশশূন্য সভ্যতাজ্ঞানহীন জয়ন্তী, উষসীর মত মেয়েদের সামনে যাকে বার করাই চলে না—তারও আবার মনে ঘেন্না এত জোরালো হয়?...গলায় দড়ি দেবার মত জোরালো!...জয়ন্তীর মত মেয়েরও মন থাকে? চিন্তাজগৎ থাকে?

মনের ঘেন্নায় মোহন আত্মঘাতী হল না—হল জয়ন্তী?

কিংবা জয়ন্তী বলেই সম্ভব হল।

অশিক্ষিত অসভ্য বলেই বোধ করি ওর আবেগের বাহ্যিক প্রকাশটা এত প্রচণ্ড! সভ্য সুশিক্ষিত যারা মনের ঘেন্নায় বড়জোর একটা অশান্ত রাত্রি কাটাতে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পার্কের বেঞ্চে শুয়ে থাকতে পারে, একটা তিক্ত বিষাদগ্রস্ত দিনকে সহ্য করে নিতে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে

পারে, তার বেশী নয়!

মনের ঘেন্নাকে পরিপাক করতে না শি[illegible] আর শিক্ষা কি? সভ্যতা কি?

ভাড়ার মেয়াদ বাড়াতে বাড়াতে শেষ পর্যন্ত হয়তো শয়তানের কাছেই বিক্রি হয়ে যাবে আত্মা তাই বলে—আত্মহত্যা? ছিঃ! যেন একটা সস্তা নাটকের বাজে অভিনয়!

— দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত —